NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

SELF LEARNING MATERIAL

POST GRADUATE DEGREE PROGRAMME

PGJM 2

MA IN JOURNALISM & MASS COMMUNICATION

PGJM-2A MEDIA LAW & ETHICS

PGJM-2B PRINT JOURNALISM

A & B

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হয়ে চলেছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার সুবিধা পেয়ে যাবেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : মে, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau
of the University Grants Commission.

PGJM

M.A. in Journalism & Mass Communication (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

PGJM - Paper IIA : মিডিয়া আইন এবং নীতি (Media Law & Ethics)

	রচনা (Content Writer)	সম্পাদনা (Editor)
মডিউল ১	**ড. সৌরভ গুপ্ত,** অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, ওড়িশা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়	**স্নেহাশিস সুর** প্রবীণ সাংবাদিক, দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা
মডিউল ২ একক ১,২	**ড. সান্ত্বন চট্টোপাধ্যায়,** প্রফেসর ও প্রধান অ্যাডাল্ট এ্যান্ড কনটিনিউং এডুকেশন এ্যান্ড এক্সটেনশন বিভাগ, কো-অর্ডিনেটর গণজ্ঞাপন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	
একক ৩,৪	**অরিজিৎ ঘোষ,** অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন), মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	
মডিউল ৩ একক ১,২	**ড. সান্ত্বন চট্টোপাধ্যায়**	
একক ৩,৪	**অরিজিৎ ঘোষ**	
একক ৫	**জয় সরকার,** প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	
মডিউল ৪	**ড. রীমা রায়,** অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, আশুতোষ কলেজ	

বিন্যাস ও প্রুফ-পরিমার্জনা : অরিজিৎ ঘোষ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

স্নাতকোত্তর বিষয় সমিতি (PG Board of Studies)

অধ্যাপক শাশ্বতী গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক, গণজ্ঞাপন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

স্নেহাশিস সুর, প্রবীণ সাংবাদিক, দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা

ড. দেবজ্যোতি চন্দ, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, গণজ্ঞাপন ও ভিডিওগ্রাফি বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ড. পল্লব মুখোপাধ্যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অরিজিৎ ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, ডিরেক্টর, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

PGJM

দ্বিতীয় পত্র ঃ প্রথম পর্যায় - IIA

মিডিয়া আইন এবং নীতি (Media Law and Ethics)

মডিউল - ১ : মিডিয়া নীতি

একক □ ১	গণমাধ্যমের নীতি ও আইন	7-15
একক □ ২	গণমাধ্যম ও নীতিগত সমস্যা	16-27
একক □ ৩	পীত সাংবাদিকতা-চেকবুক সাংবাদিকতা -পেইড নিউজ- ফেক নিউজ-প্লেজিয়ারিজম	28-36
একক □ ৪	গণমাধ্যমের মালিকানা ও নৈতিক প্রসঙ্গ—ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রদত্ত নীতিমালা	37-51

মডিউল - ২ : ভারতের প্রেস / মিডিয়া আইনগুলির ইতিহাস

একক □ ১	ভারতীয় সংবিধানের প্রাথমিক ধারণা	52-59
একক □ ২	সংবাদপত্র এবং পুস্তকের নিবন্ধীকরণ আইন, ১৮৬৭, সরকারি গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩, রচনা স্বত্ব আইন, ১৯৫৭	60-66
একক □ ৩	আইনসভা প্রতিবেদনের বিধান; সংসদীয় সুযোগসুবিধা - সংসদ অবমাননা এবং সাংবাদিকতা সুরক্ষা	67-71
একক □ ৪	মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণা পত্র- ইউনেস্কোর প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ	72-79

মডিউল - ৩ : প্রেস এবং মিডিয়া আইন

একক □ ১	মানহানি ও সাংবাদিকতা সুরক্ষা - আদালত অবমাননা এবং সাংবাদিকতা সুরক্ষা - রাষ্ট্রদ্রোহের বিষয় সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ	80-84
একক □ ২	কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মচারীদের বা কর্মীদের চাকরির শর্ত এবং বিধি বিধান আইন, ১৯৫৫ - মহিলাদের অশোভন প্রকাশ নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮৬	85-88

একক ◻ ৩	ডাব্লুটিও চুক্তি এবং বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকার আইন, কপিরাইট আইন, ট্রেড মার্কস অ্যাক্ট এবং পেটেন্ট আইন - তথ্য অধিকার আইন ২০০৫- হুইস্‌ল্ ব্লোয়ার প্রোটেকশন অ্যাক্ট (২০১১)	89-96
একক ◻ ৪	সিনেমাটোগ্রাফ আইন, ১৯৫২ - প্রসার ভারতী আইন - বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলির বিধি-কেবল টিভি রেগুলেশন আইন- ভারতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের নীতিমালা গাইডলাইন - কমিউনিটি রেডিও লাইসেন্স পদ্ধতি - ভারতে কমিউনিটি রেডিও বিধি -আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এর সম্প্রচার কোড -বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলির স্ব-নিয়ন্ত্রণ	97-106
একক ◻ ৫	বিজ্ঞাপন এবং জনসংযোগের জন্য নীতিমালা	107-112

মডিউল - ৪ : সাইবার আইন

একক ◻ ১	ডিজিটাল সময়ে প্রেসের স্বাধীনতা	113-122
একক ◻ ২	ডিজিটাল মাধ্যম ও আইন	123-142
একক ◻ ৩	মুক্ত মাধ্যম ও আইন	143-154

মডিউল - ১ : মিডিয়া নীতি

একক ১ ❐ গণমাধ্যমের নীতি ও আইন

গঠন :

১.১.১ উদ্দেশ্য

১.১.২ প্রস্তাবনা

১.১.৩ গণমাধ্যম-এর নীতি ও আইন

১.১.৪ গণমাধ্যম-এর স্বাধীনতা

১.১.৫ গণমাধ্যম-এর সামাজিক দায়বদ্ধতা

১.১.৬ গণমাধ্যমে স্বনিয়ন্ত্রণ

১.১.৭ সারাংশ

১.১.৮ অনুশীলনী

১.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে সেগুলো হলো :

- গণমাধ্যমে নীতি এবং আইনের তাৎপর্য
- গণমাধ্যমের নীতি এবং আইন-এর পার্থক্য
- গণমাধ্যমের স্বাধীনতার তাৎপর্য
- গণমাধ্যমের সামাজিক ভূমিকা
- গণমাধ্যমে স্বনিয়ন্ত্রণের পরিধি

১.১.২ প্রস্তাবনা

জ্ঞাপন-এর প্রাথমিক চাহিদা থেকেই জ্ঞাপন-এর প্রক্রিয়া শুরু হয়। শরীরী ভাষা একসময় বিকশিত হয় কথ্যভাষায় এবং লিখিত রূপে। মুদ্রণ প্রযুক্তির উদ্ভাবন-এর সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাপন পরিণত হয় গণজ্ঞাপনে; ক্রমে ক্রমে আসে গণমাধ্যম-এর বিভিন্ন রূপ। যেমন সংবাদপত্র, সাময়িকী, বেতার, টেলিভিশন এবং বর্তমানের সোশ্যাল মিডিয়া। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংবাদপত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মিশনারী আদর্শে প্রাণিত হয়ে কেরি এবং মার্শম্যান প্রকাশ করেছিলেন দিগদর্শন ও সমাচার দর্পণ। ক্রমে শিক্ষা এবং তার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের সামাজিক গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পায়। সাংবাদিকতা হয়ে ওঠে এক পেশা ও বৃত্তি। সংবাদপত্র এক শিল্পের আকার নেয়। জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের নীতি তৈরি হয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্র সংবাদপত্র ও সাংবাদিককে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা নিরন্তর চালায়। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশরা সরকার বিরোধীতাকে রুখতে একের পর এক আইন প্রণয়ন করে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে সংবাদ শিল্পের রূপ ধারণ করায় এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে তাল মেলাতে এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে দেশ রাষ্ট্র ও সামজের বাকি অংশের ভারসাম্য রাখতে প্রণয়ন হয়েছিল আরো আইন। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবাদমাধ্যমের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা হলো নীতি ও ন্যায়পরায়ণতার প্রশ্ন। স্বাধীনতা সংগ্রামের

সময়কার আদর্শবাদী ভাবনা ও নীতি এখন এক ইতিহাস। ‘মিশন’ অনেক ক্ষেত্রেই ‘প্রফেশনে’ পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু নীতির সাথে জড়িত রয়েছে দায়বদ্ধতা, বিশ্বাসযোগ্যতা। নীতির প্রশ্নে, মূল্যবোধের প্রশ্নে আইন সংবাদ মাধ্যমের অস্তিত্বের উপর প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিতে পারে। তাই, এর সবিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন প্রয়োজন যা এই এককের মূল আলোচনার বিষয়।

১.১.৩ গণমাধ্যম-এর নীতি ও আইন

এথিক্স (Ethics) অথবা নীতির জন্ম সভ্যতার গোড়াপত্তনের দিন থেকেই। কারণ তা মানুষের একক তথা সমাজের যৌথ চরিত্রের সঙ্গে জড়িত। সভ্যতার বিকাশে সমাজজীবনের পরিকাঠামোও প্রসারিত হয়েছে। জ্ঞান ও দর্শনের জগতে যুগে যুগে পণ্ডিতদের ভাবনাচিন্তার হাত ধরে বিকশিত হয়েছে নীতির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা। নীতির যেমন এক তাত্ত্বিক রূপ আছে, তেমনি ব্যবহারিক রূপও আছে। প্রতিদিন ব্যক্তি মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে নানা রকমের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন যেমন হয়, তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজকে যুক্ত করে জীবন ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নীতিগুলো অনুসরণ করতে হয়। নানা পরিস্থিতি, দেশ-কাল-সীমানার পরিস্থিতি এবং ধর্মের ভিত্তিতে বিবর্তিত হয় নীতি।

প্রাচীন গ্রিসে দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রেরও আলোচনা শুরু হয়। সক্রেটিস প্রশ্ন ও বিতর্কের উপরে জোর দিয়েছিলেন। তার বক্তব্য ছিল যে প্রতিটি মানুষের ভেতরে নিজস্ব সত্ত্বা আছে যাকে বিতর্ক ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আবিষ্কার করতে হবে। রাষ্ট্রের বলে দেওয়া নীতির প্রতিবাদে এক ব্যক্তিগত নীতি ন্যায় বোধ গড়ে তোলা উচিত।

বলাবাহুল্য সক্রেটিস দেবদেবীদের অস্তিত্বকেও চ্যালেঞ্জ করেন এবং শেষ পর্যন্ত এথেন্সের শাসকদের রোষে পড়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সক্রেটিসের সুযোগ্য ছাত্র, এবং বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, প্লেটো নীতির প্রশ্নে যুক্তিবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে নীতি গণিতের মতোই পৃথিবীতে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং তা রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে সমান, কিন্তু আলাদা নয়। তার রিপাবলিক গ্রন্থে প্লেটো এই বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তার ছাত্র আরেক বিখ্যাত দার্শনিক তাত্ত্বিক, অ্যারিস্টোটল কিন্তু নীতির প্রশ্নে অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি। অ্যারিস্টোটল মনে করতেন দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বিচার-বুদ্ধি ও পরিস্থিতি অনুসারে নীতির প্রণয়ন করে থাকেন। তিনি মানুষকে নিজের কর্মের প্রতি নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ থাকার কথা বলেছেন।

ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের থেকে অনেক প্রাচীন। ঋক বেদে আমরা ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্মের বিস্তারিত আলোচনা পাই। হিন্দু পুরাণে, বিশেষতঃ শ্রীমৎভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী ‘কর্মণ্যেবাদিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন’, মহাভারতের সৌজন্যে খুবই জনপ্রিয়। মূলত হিন্দু শাস্ত্রে নীতির ভিত হিসেবে ধর্ম, কর্ম, কর্তব্যকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পেশা ও নীতির প্রশ্নে গোড়ার দিকে অন্যতম তত্ত্ব হিসেবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র উল্লেখ্যযোগ্য। মগধের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্তকে অধিষ্ঠিত করে রাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে তার প্রধান উপদেষ্টা চাণক্য এই আকর গ্রন্থ রচনা করেন। নিজ নিজ কর্মে এবং পেশায় সততা ও নিষ্ঠার দ্বারা ধর্মাচারণ, একথা চাণক্য, অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলেন। এই গ্রন্থে দুর্নীতির কথাও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মে নীতির নানা রকম পরিভাষা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যুগে যুগে তার পরিবর্তন হয়েছে। নীতির ধর্মীয় ব্যাখ্যা কখনো কখনো খুবই বিভ্রান্তকারী, কখনো কখনো বৈপরীত্যে ভরপুর। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ থেকে হজরত মোহম্মদ, যীশু থেকে গুরু নানক, নীতির প্রশ্নে বহুলাংশেই একমত। ধর্মাচরণের প্রশ্নে হিউম্যানিজম বা মানবকল্যাণের কথা সবাই বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন, "...ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই", কার্ল মার্ক্সও কমিউনিজমের তত্ত্বে জনকল্যাণকেই আধার করেছেন।

অতএব, ব্যক্তিগত নীতি, সামাজিক নীতি, পেশাদারী নীতি এক অর্থে ভিন্ন হলেও কোথাও হয়তো একে অন্যের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। পরবর্তী অংশে আমরা সংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত নীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

সাংবাদিকতার নীতি ও আইন

তুলনামূলক আলোচনা: পুরাকাল থেকেই শাসক গণমাধ্যমকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। রাজতন্ত্রে রাজার আজ্ঞাবহ কর্মচারীরা ঢেঁড়া পিটিয়ে জনগণকে খবর পৌঁছে দিতেন। রাজার আদেশেই শিলালিপি তৈরি হতো। দেওয়ালে বার্তা খোদাই করা হতো। রাজা তার সভায় মাইনে করা লেখককে দিয়ে গল্প, কবিতা লেখাতেন এবং পাঠ করাতেন। কখনো কখনো নাটকের দলকে দিয়ে পছন্দ মতো স্ক্রিপ্ট লিখিয়ে অভিনয় করাতেন। এসব সৃষ্টি মোটামুটি আগের থেকেই প্রশংসার সুরে বাধা এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। ফলে এখানে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই এবং স্বাধীনতার সাথে নিয়ন্ত্রণের সংঘাত নেই। কিন্তু যখন সংবাদমাধ্যম এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিসরে আত্মপ্রকাশ করতে চাইল তখন সে সৃজনশীলতার জোরে জনপ্রিয় হলো এবং এই জনপ্রিয়তা শাসককে উৎসাহিত করলো তাকে নিয়ন্ত্রণ করার নতুন উপায় খুঁজতে। এই ভাবেই আইন প্রণয়নের পথ প্রশস্ত হল।

আইন ও নীতির মূল পার্থক্যগুলি হল :

(১) আইন শাসকের দ্বারা প্রণীত, নীতি ব্যক্তি মানুষের দ্বারা।

(২) আইনের মূল উদ্দেশ্য রাজধর্মের পালন, নীতির মূল উদ্দেশ্য স্বধর্মের পালন।

(৩) আইন সব পরিস্থিতিতে সবার জন্যই এক। নীতি, স্থান ও সংস্কৃতির পার্থক্যে তারতম্য ঘটতে পারে। ভারতীয় সমাজে যা নীতিবিরুদ্ধ, মার্কিন সমাজে তা নীতিবিরুদ্ধ নাও হতে পারে।

(৪) আইনের লঙ্ঘনে শাস্তির বিধান আছে, নীতির লঙ্ঘনে শাস্তির বিধান নেই।

(৫) আইন রাষ্ট্র বলবৎ করে থাকে। নীতির রূপায়ণ ব্যক্তির নিজস্ব পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(৬) আইন লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু নীতি কোথাও সেভাবে লেখা থাকে না। বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র।

আইন ও নীতির মধ্যে একাধিক মিল রয়েছে :

(১) আইন ও নীতি ব্যক্তিগত জীবন চর্চার ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োগ হয় তেমনি কাজের ক্ষেত্রে, পেশাদারি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(২) আইন ও নীতির দুইয়ের লক্ষ্য সমাজ ও মানুষের হিত-সাধন, শান্তি ও সাম্য আনা।

গণমাধ্যমের আইন ও নীতির তুলনামূলক পর্যালোচনা

নীতি ও আইনের যে পার্থক্য ও মিলগুলি ইতিপূর্বে আলোচিত তা সবকটি গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে খাটে তবে একটু

পরিবর্তিত ভাবে। গণমাধ্যমের ক্ষমতা আছে মানুষের কাছে তথ্য নিয়ে যাওয়ার এবং মানুষকে প্রভাবিত করার। সেই জায়গা থেকে রাষ্ট্রের গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টাগুলির অন্যতম হলো আইন। গণমাধ্যম যখন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, সে ক্ষেত্রেও আইন প্রযোজ্য। অপরদিকে পেশাগত নীতির প্রয়োজন রয়েছে সব পেশাতেই। সাংবাদিকতার পেশাগত নীতিমালা সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

প্রাথমিক স্তরে যখন শুধুই মুদ্রিত মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ছিল গণমাধ্যম তখন ছাপার বিষয়বস্তু অর্থাৎ বই, সংবাদপত্র ও সাময়িকী বিষয়বস্তুতে আপত্তিকর ও আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্রভাব নির্মূল করাই ছিল আইনের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে গণমাধ্যমের চরিত্র বদলালো, তখন প্রয়োজন হলো নতুন আইনের। বস্তুত, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের, টিভি-র এবং সাম্প্রতিককালে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে যে আইনগুলি প্রণয়ন হয়েছে তার বেশির ভাগটাই প্রযুক্তি সংক্রান্ত যেমন সম্প্রচার, স্যাটেলাইট, স্পেক্ট্রাম, সিগন্যাল, ব্যান্ডউইথ ইত্যাদি বিষয়গুলি আসছে মূল প্রকরণ হিসেবে। নীতির ক্ষেত্রে খুব একটা বিশেষ হেরফের কিন্তু হয়নি। বস্তুনিষ্ঠতা, ন্যায়-পরায়ণতা, রাষ্ট্রদ্রোহ, শ্লীলতা-অশ্লীলতা, উচিত-অনুচিতের ঘেরাটোপেই এই নীতির ঘোরাফেরা। শুধু, মাধ্যম অনুযায়ী জনগণের হেরফের। সাংবাদিক নিজের পেশায় নীতিনিষ্ঠ থাকছেন কিনা তার বিচার এখন অন্য মাত্রা পেয়ে গেছে। 'নাগরিক সাংবাদিকতার' যুগে যখন প্রতিটি গণমাধ্যমের উপভোক্তা এখন নিজেরাই 'কনটেন্ট প্রডিউসার' অর্থাৎ বিষয় উৎপাদনকারী, সৌজন্যে 'ডিজিটাল সোশ্যাল মিডিয়া', ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি। সমাজের মূল্যবোধের সীমারেখা বা 'parameter' দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে। পাশ্চত্যের প্রভাবে দেশীয় মূল্যবোধের বিবর্তন ঘটছে। সুতরাং নীতিরও পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে। গত ৩০ বছরে ভারতবর্ষে গণমাধ্যমের আইন ও নীতি অনেক পাল্টেছে এবং আরো পাল্টাবে বলাই বাহুল্য।

১.১.৪ গণমাধ্যম-এর স্বাধীনতা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরি। ইতিপূর্বেই আলোচিত যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা শাসককুলকে বারংবার অস্বস্তিতে ফেলেছে। প্রেস আইনগুলি মূলত এই স্বাধীনতা প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায় থেকেই প্রণীত। ভারতবর্ষে এই প্রক্রিয়া শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ওপর আক্রমণ নেমে আসা থেকেই শুরু। মধ্যযুগে ভারতের ধ্রুপদী শিল্পচর্চা স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'-এর সম্পাদক জেমস হিকি তো তার স্বদেশীয় সরকারের রোষানলে দগ্ধ হয়েছিলেন। চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মনে থাকবে সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে হীরক রাজা লোক গায়ক চরণ দাসের 'কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়' গানটি শুনে তাকে বন্দি করেছিলেন। এ ছিল সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা। কিন্তু একথাও ঠিক যে স্বাধীনতার সাথেই আসে দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ। আর কোনো স্বাধীনতাই অবাধ হতে পারে না। কিছু যুক্তিযুক্ত নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই থাকে। এই দুটি বিষয় কিন্তু সাংবাদিকতা নীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এই নীতি রক্ষার অনেকাংশ সাংবাদিকদের নিজেদের ওপরেই বর্তায়।

বিশ্বের কিছু দেশের সংবাদমাধ্যম বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা একটি স্বীকৃত অধিকার। ভারতের সংবিধানের ১৯(১)ক ধারায় বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এক মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃত এবং এ থেকেই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার অধিকার আসে। এখানে প্রশ্ন উঠে আসে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে মূলত ব্যক্তি সাংবাদিক অথবা সম্পাদকের স্বাধীনতাকেই বোঝানো হচ্ছে। অবশ্য এই নিয়ে কিন্তু আধুনিক ব্যাখ্যা হল যে যেহেতু সংবাদমাধ্যম বর্তমানে সম্পাদকের নয় মালিকের অঙ্গুলিহেলনে চলে ফলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে মালিক বা মালিক গোষ্ঠির

স্বাধীনতাকে বোঝাচ্ছে। যাই হোক না কেন সাংবাদিক বা সম্পাদক, মালিক সবাই সংবাদমাধ্যমের অন্দরের লোক অর্থাৎ সংবাদমাধ্যমের সাথে যুক্ত লোকেরাই স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং তাদেরই দায়িত্ব এই স্বাধীনতার যোগ্য ব্যবহার এবং সর্বোপরি পেশাদারি নীতিসম্মত কাজ করার। এইখানে সংবাদমাধ্যমের সামাজিক দায়-দায়িত্বের আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১.১.৫ গণমাধ্যম-এর সামাজিক দায়বদ্ধতা

গণমাধ্যম বিশেষত সংবাদমাধ্যম ও জনগণের মধ্যে এক নির্ভরযোগ্য ও পরিষেবামূলক সম্পর্ক আছে। জনগণ সঠিক খবরের জন্য সংবাদমাধ্যমের ওপর এই বিশ্বাস রাখেন, নির্ভর করেন। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা ব্যাপারে, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, এছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানুষ তাকিয়ে থাকেন সংবাদমাধ্যমের দিকে। সংবাদমাধ্যমও সঠিক, সময়োচিত তথ্য এবং বিশ্লেষণ প্রস্তুত করে জনগণকে সঠিক পথে চালিত করে। এই ভূমিকার জন্যই তাকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। গণতান্ত্রিক দেশে জনকল্যাণের ব্যবস্থায় আইনসভা, আমলাতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সব চাইতে কাছের, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, সমস্যা, অন্যায়-অবিচারের কথা মানুষের প্রতিনিধি ও কণ্ঠস্বর হয়ে সোচ্চারে বলার কাজটি সংবাদমাধ্যমের করার কথা। এই সামাজিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় আর্থিক বাধ্যবাধকতা, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং কখনও কখনও নীতির উপস্থিতি।

সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে গণমাধ্যমের যে নীতিসমূহ আলোচনায় আসে সেগুলি হল :

(১) **বস্তুনিষ্ঠতা :** সংবাদ হবে বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ সত্য, সঠিক, পক্ষপাতহীন। নৈর্ব্যক্তিকভাবে, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্দ্ধে উঠে সাংবাদিককে একটি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে এবং সে ঘটনার সামাজিক প্রভাব ব্যাখ্যা করতে হবে, যাতে মানুষ ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। এক্ষেত্রে সংবাদ একপেশে হবে না, কোন বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনে ভারাক্রান্ত হবে না, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য তুলে ধরে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। তা না হলে নীতিগতভাবে সংবাদটি যথার্থ হবে না।

(২) **চেকবুক সাংবাদিকতা বা পেইড নিউজ :** যে সংবাদের সাথে বৃহৎ ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে সেখানে কায়েমী স্বার্থওয়ালারা বস্তুনিষ্ঠতা থেকে সরে আসতে প্রভাবিত করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সাংবাদিক অর্থ তথা অন্যান্য প্রলোভন এড়াতে পারবেন যদি তার নীতিবোধ সুদৃঢ় হয়। অর্থের বিনিময়ে পক্ষপাতদুষ্ট খবর সরবরাহ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার এই প্রচেষ্টা থেকেই 'চেকবুক জার্নালিজম' বা 'পেইড নিউজ' শব্দগুলির জন্ম।

(৩) **গোপনীয়তা :** গোপনীয়তা মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত। জনপ্রিয়তার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় অনেক গণমাধ্যমই ব্যক্তির গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে থাকে যা আদৌ নীতিসম্মত নয়। এ ব্যাপারে পরবর্তী এককে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

(৪) **সংবাদপত্রের আয় কাঠামো :** বিক্রি বা জনপ্রিয়তা নয়, বিজ্ঞাপনই গণমাধ্যমের আয়ের মূলসূত্র। বিশেষতঃ বহুজাতিক, ব্যবসায়িক সংস্থা বা কর্পোরেট বিজ্ঞাপনই গণমাধ্যমের জীয়নকাঠি। কর্পোরেট সংস্থাকে খুশি রাখতে গিয়ে নীতির সাথে আপস করতে হয় গণমাধ্যমকে। এইভাবে সংবাদমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণও পরোক্ষভাবে

কর্পোরেটের হাতে চলে যাচ্ছে। সাংবাদিকদের পেশাদারী সততা ও স্বাধীনতা বিপন্ন হচ্ছে; যদিও নীতিগতভাবে এগুলি সমর্থনযোগ্য নয়।

(৫) **রুচি ও শালীনতা :** রুচি ও শালীনতা এগুলি কোনও নিয়ম-কানুনের খাতায় সরকারি কাগজে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে না। সমাজের মনন, রুচি, সংস্কৃতি মানুষে মানুষে যোগাযোগ, সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠে এবং একেক সমাজ, দেশ সাপেক্ষে ভিন্নতাও থাকে। মার্কিন মূল্যবোধ, রুচিবোধ ইংরেজের সাথে মেলে না, ইংরেজেরও ভারতের সাথে মেলে না। চুম্বন দৃশ্য ভারতে অশ্লীল হলেও বিলেতে সহজভাবে নেওয়া হয়। ভালো ছবি এমনই হবে যা সামাজিক স্বার্থ ও রুচিবোধকে আঘাত না করে। অবশ্য সময়ের সাথে দ্রুত এই বিষয়গুলি পরিবর্তিত হচ্ছে। তাছাড়া শালীনতার সাথে কিন্তু আইনগত দিক জড়িত, এক্ষেত্রে নীতিগত জায়গাটা বজায় রেখে সুস্থ রুচিসম্পন্ন কনটেন্ট মানুষকে দিতে পারলে আইনি জটিলতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। শালীনতার মাত্রা পেরিয়ে যাওয়ার প্রলোভন এড়ানো আজকের গণমাধ্যমের কাছে এক কঠিন নীতিগত চ্যালেঞ্জ। একদিকে সস্তা জনপ্রিয়তার হাতছানি, অপরদিকে নীতি লঙ্ঘনের বিষয় — যা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়।

(৬) **দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব :** গণমাধ্যমকে সমাজ ও দেশের গণ্ডির মধ্যেই কাজ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে তাকেও নিজেকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তুলে ধরতে হয়। সংবাদ পরিবেশন যেন সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি না করে, বিভ্রান্তি বা আতঙ্ক না ছড়ায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ না করে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি যাতে না ঘটে, দেশে সুরক্ষা শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন না করে এবং দেশের শত্রুদের হাত শক্ত না করে অথবা সন্ত্রাসবাদকে পুষ্ট না করে, এই বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে কারণ এ ব্যাপারে ভুল হলে তা দেশ ও দেশবাসীকে বিপদে ফেলবে।

উপরোক্ত ছয়টি বিষয় ছাড়াও নীতি সংক্রান্ত পেশাদারি আরো বিভিন্ন বিষয় আছে যেগুলি পরবর্তী অংশে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১.৬ গণমাধ্যমে স্বনিয়ন্ত্রণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বহু তৃতীয় বিশ্বের দেশ নিজেরা ইউরোপীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। রুশ বিপ্লব, চিনা বিপ্লব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এরকম নানাবিধ প্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক পরিসরে আলোচিত হয় এবং স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যম তার মধ্যে অন্যতম এবং সর্বজনসম্মত। স্টুয়ার্ট মিলের মতো দার্শনিক তার 'অন লিবার্টি' গ্রন্থে জোরালো সওয়াল করেছেন যে মুক্ত গণমাধ্যমই গণতন্ত্রের বিকাশের পথ। কিন্তু গণমাধ্যমের শক্তিও তো অপার, জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে সে। তাই তার স্বাধীনতা তো সম্পূর্ণ মুক্ত ও অবাধ হতে পারেনা। এইখান থেকেই গণতন্ত্রে গণমাধ্যমের স্বনিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব উঠে আসে অর্থাৎ গণমাধ্যম নিজেই নিজের ওপর নজরদারি করবে এবং নীতির পালন করবে এবং নীতি লঙ্ঘন করবে না।

গণমাধ্যমের স্বনিয়ন্ত্রণ-এর দার্শনিক ভিত্তি হলো এক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়া। এর দ্বারা মুক্তি, স্বাধীনতার বিষয়কে এক সম্মানজনক সীমানার মধ্যে আনা যায়। একদিকে যেমন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে মতপ্রকাশের, তেমনি মানুষের অধিকার আছে সঠিক তথ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়ার। সুতরাং এই স্বাধীনতা ও অধিকারের ভারসাম্য আনতে স্বনিয়ন্ত্রণ-এর ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্র ও বাজার এই দুই নির্ণায়ক শক্তির মাঝে দাঁড়িয়ে গণমাধ্যম তার স্বনিয়ন্ত্রণের দ্বারাই বাণিজ্য ও গণতন্ত্রের মধ্যে নিজের অবস্থান ঠিক করবে।

অর্থাৎ স্বনিয়ন্ত্রণের মূল প্রতিপাদ্য হলো যে গণমাধ্যম ও তার প্রতিনিধিরাই নিজেদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব

পালন করবে। অনেক দেশেই গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া হয়েছে স্বনিয়ন্ত্রণ সংস্থা বা Regulatory Body। এই সংস্থাই নৈতিক বিচ্যুতির বিচার করবে, বিচ্যুতি ঠেকাবে নজরদারি দিয়ে এবং নীতিগতভাবে গণমাধ্যমের কাজ সঠিক না গর্হিত তার নিদান দেবে। স্বনিয়ন্ত্রণ দুই প্রকারের—

(ক) আভ্যন্তরীণ স্বনিয়ন্ত্রণ

(খ) বাহ্যিক স্বনিয়ন্ত্রণ

আভ্যন্তরীণ স্বনিয়ন্ত্রণ (Ombudsman)

আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি গণমাধ্যম সংস্থা একজন 'নজরদার বা ওমবুদসম্যান' নিয়োগ করতে পারেন। বিদেশে 'দ্য গার্ডিয়ান' 'RE' বা 'Reader's Editor' পদ সৃষ্টি করে। ওমবুদসম্যান নিয়োগে পরবর্তীতে ভারতে 'দ্য হিন্দু' ও 'টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া' একই পথে হাঁটে।

অভ্যন্তরীণ ওমবুদসম্যান সংস্থাকে অনৈতিক পথে যাওয়ার থেকে আটকায় এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে পেশাদারিত্বের দিক থেকে চালিত করে। জনপরিসরে ও বাজারে প্রকাশিত হওয়ার আগে, নজরদারদের দ্বারা সমালোচিত হওয়ার আগে প্রথম 'চেকপোস্ট' হল ওমবুদসম্যান। এখনো বেশিরভাগ গণমাধ্যম সংস্থা কিন্তু এ ব্যাপারে উদাসীন।

বাহ্যিক স্বনিয়ন্ত্রণ (Press Council)

বাহ্যিক স্বনিয়ন্ত্রণ সরকার দ্বারা গঠিত অথবা সরকারি আইন দ্বারা সৃষ্ট একটি ব্যবস্থা। গণমাধ্যমের নীতিগত বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করবে। সাধারণত গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের সংস্থায় গণমাধ্যমের সর্বস্তরের প্রতিনিধিরাই থাকেন। অর্থাৎ এই শিল্পের সাথে যুক্ত লোকেরাই নীতিগত ব্যবস্থাপনা ও নজরদারি চালান। এতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বহুলাংশ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং মান বজায় থাকে, অপ্রয়োজনীয় সরকারি হস্তক্ষেপ এড়ানো যায় এবং আইনি পাঁচ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

ভারতীয় গণমাধ্যম ও স্বনিয়ন্ত্রণ

যখন সংবাদপত্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠল তখনই ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের খাঁড়া নেমে এলো সম্পাদক ও সাংবাদিকদের ওপর। সংবাদপত্রকে হাতিয়ার করেছিলেন গান্ধীজী, তিলক, সুভাষচন্দ্র এবং নেহরুর মতো নেতারা। স্বাধীন ভারতে নেহরু সরকার ১৯৫২ সালে গঠন করে প্রথম প্রেস কমিশন। এই প্রেস কমিশনের সুপারিশে ১৯৫৬ সালে সংসদে প্রেস কাউন্সিল বিল পেশ করা হয়। ১৯৬৫ সালে বিলটি দ্বিতীয়বার সংসদে পেশ করা হয়, গৃহীত হয় এবং ১৯৬৬ সালে 'ভারতের প্রেস কাউন্সিল' গঠিত হয়। জরুরি অবস্থা জারি হলে ১৯৭৫ সালে প্রেস কাউন্সিল বাতিল হয়। ১৯৭৮ সালে পুনরায় প্রেস কাউন্সিল বিল গৃহীত হয়। ১ জন চেয়ারম্যান এবং ২৮ জন সদস্য নিয়ে বোর্ড গঠিত হয়। এদের মধ্যে চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং বাকিরা গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন। মূলত এই প্রেস কাউন্সিলের কাজ নজরদারি করা, অনৈতিক কাজ করলে সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা এবং বিচ্যুতির জন্য ভৎর্সনা করা। কিন্তু খুব গুরুতর শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা এই আধা বৈচারিক (Quasi Judicial)-এর সংস্থার নেই। কিন্তু এই সংস্থার সবচেয়ে বড় অবদান সাংবাদিকদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আচার সংহিতা (Code of Ethics) প্রণয়ন। সরকার যদি সাংবাদিক ও সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন বেআইনি বা অনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয় এই কাউন্সিল তাও পর্যালোচনা করে।

বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম

ভারতের বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম ক্ষেত্রটি দীর্ঘদিন ধরেই আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের দখলে ছিল। এই দুটি সরকারি সংস্থাই 'public service broadcasting' বা জনকল্যাণমূলক সম্প্রচারের তত্ত্বে নিয়োজিত, এবং এর ওপর ভিত্তি করেই নিজস্ব আচার সংহিতা মেনে চলে।

'৯০-এর দশকে ভারতীয় অর্থনৈতিক উদারনীতি চালু হলে গণমাধ্যমের বাজারে ঢুকে পড়ে বেসরকারি ও বিদেশী টিভি, রেডিও চ্যানেলগুলি। এর পরেই বিপন্ন হয় নীতিগত আচরণ কারণ প্রেস কাউন্সিলের আওতায় বৈদ্যুতিন মাধ্যম পড়ে না। পরবর্তীতে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা যায়। IT Act প্রভৃতি আইনের মাধ্যমে সরকার নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার চেষ্টা করে। ইতি মধ্যে তৃতীয় প্রেস কমিশন তথা মিডিয়া কাউন্সিলের দাবি উঠেছে। বৈদ্যুতিন চ্যানেলগুলি সম্প্রতি নিজস্ব উদ্যোগে ব্রডকাস্টিং কনটেন্ট কমপ্লেটস কাউন্সিল BCCN-এর মত স্বনিয়ন্ত্রণধর্মী সংস্থা তৈরি করে নীতির প্রশ্নে সদিচ্ছা দেখিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান বিনোদনমূলক টিভি চ্যানেলের শীর্ষ সমিতি ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং ফেডারেশন দ্বারা পরিচালিত। এটি বাহ্যিক হলেও সরকারি নয়। সংবাদ প্রচারকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলির শীর্ষ প্রতিষ্ঠান নিউজ ব্রডকাস্টারস অ্যাসোসিয়েশনেরও এ ধরনের সংস্থা রয়েছে, তা হল ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি (এনবিএসএ)।

১.১.৭ সারাংশ

নীতি মানুষের নিজস্ব দায়, সাংবাদিকতা তথা গণমাধ্যম শিল্পেও তাই। আইন ভাঙলে শাস্তি আছে, নীতি ভাঙলে শাস্তি নেই। অর্থাৎ নিজেকে নিজেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে সজাগ হতে হবে। গণমাধ্যম মানুষকে প্রভাবিত করে তাই তার গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। সেজন্যই আসে নীতিপরায়ণতা। পেশাদারি মান এবং নীতিগত মূল্যবোধ বজায় রাখা আজ গণমাধ্যমের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। বাজার, রাজস্ব, গণতান্ত্রিকতা ও মূল্যবোধ-এসব একে অন্যের সাথে যুক্ত। রাষ্ট্র সর্বদাই গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে পারে। বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে গণমাধ্যম নীতি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। স্বনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চেষ্টা হচ্ছে নথি ধরে রাখার। মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবর্তীত সময়ের প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও রাজস্বের সমীকরণ এসবের জন্য গণমাধ্যমের নীতিবোধ আজ বিপন্ন। এই একক নীতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করলো।

১.১.৮ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

ক. রাষ্ট্র ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

খ. নীতির মূল প্রতিপাদ্য ভিত্তি আলোচনা করুন।

গ. সাংবাদিকতার নীতি ও আইনের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

ঘ. গণমাধ্যম-এর নীতির অন্তর্গত মূল তথা মুখ্য বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করুন।

চ. গণমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

২। টীকা লিখুন :

ক. আইন ও নীতির পার্থক্য

খ. বিভিন্ন প্রকারের নীতি

গ. ওমবুডসম্যান

ঘ. নীতি আচার সংহিতা

ঙ. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

চ. গোপনীয়তা

ছ. গণমাধ্যমে আয় কাঠামো

জ. গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা

ঝ. চেকবুক সাংবাদিকতা, পেইড নিউজ

১.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. *Media and Ethics* — S. K. Agarwal (Shipra Publication)

২. *সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত* — ডঃ নন্দনাল ভট্টাচার্য্য (লিপিকা)

৩. *আধুনিক গণমাধ্যম* — ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (বুকস্ এ্যান্ড অ্যালায়েড)

একক ২ ❒ গণমাধ্যম ও নীতিগত সমস্যা

গঠন :

১.২.১ উদ্দেশ্য

১.২.২ প্রস্তাবনা

১.২.৩ ব্যক্তি গোপনীয়তার অধিকার এবং গণমাধ্যমের নীতিগত সমস্যা

১.২.৩.১ স্টিং অপারেশন

১.২.৩.২ প্রত্যুত্তরের অধিকার

১.২.৩.৩ সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতিবেদন

১.২.৩.৪ নারী নিগ্রহ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

১.২.৩.৫ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

১.২.৪ সারাংশ

১.২.৫ অনুশীলনী

১.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.২.১ উদ্দেশ্য

এর আগের এককে গণমাধ্যম ও প্রেস সংক্রান্ত নীতির তত্ত্বগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নীতি ও আইনের পার্থক্য নিয়েও তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের নানা রকমের অসুবিধা, দ্বিধা ও সিদ্ধান্তহীনতার সম্মুখীন হতে হয়। এক দিকে জনপ্রিয়তার চাপ অন্যদিকে নীতির ভ্রুকুটি — পেশাদারি ক্ষেত্রে নানাবিধ ঘটনা ঘটে যা আমাদের নীতিগত সমস্যাকে পুনর্বিচার করতে বাধ্য করে। সময়, প্রযুক্তি, রাষ্ট্রনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে সাংবাদিকদের সমস্যাগুলিও পরিবর্তিত হয়, নতুন চেহারায় প্রকাশ পায়, তার পেশাদারি দৃষ্টিকোণও পাল্টে যায়। বর্তমান এককে এরকমই কিছু সমস্যা উদাহরণ ও কেস স্টাডি সহ আলোচিত হয়েছে। আশা করা যায় যে এই একককটি পড়ে কর্মরত সাংবাদিক তথা সাংবাদিকতার ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং কর্মক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

১.২.২ প্রস্তাবনা

১৭৮০ সালে যখন হিকি সাহেবের গেজেট দিয়ে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়, তখনই নীতির প্রশ্নে সংকট দেখা দেয়। হিকির সংবাদপত্রটি ইংরেজি ভাষায় ছিল এবং এর পাঠক মূলত ছিলেন ইয়োরাপ থেকে জীবিকার সন্ধানে আগত বিলাতি মানুষ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিকারিকগণ এবং তাদের পরিবার। বেঙ্গল গেজেটকে জনপ্রিয় করতে হিকি উচ্চপদে আসীন ইংরেজ অফিসারদের ব্যক্তিগত জীবনের কেচ্ছা ছাপতে শুরু করলেন। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রীর সাথে আরেক আধিকারিক-এর তথাকথিত বিবাহবহির্ভূত প্রণয় সম্পর্কের কথা প্রকাশ পেতে লাগলো বেঙ্গল গেজেটে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের রোষানলে পড়ে বেঙ্গল গেজেটের যেমন অপমৃত্যু ঘটে তেমনি হিকিও ব্যক্তিগতভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এই বহুল কথিত ঘটনাটি সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে একসাথে অনেকগুলি প্রশ্ন

তুলে দিয়ে যায়। যথা—

১। রাষ্ট্র ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক

২। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩। ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার

৪। সংবাদ মাধ্যমের নৈতিকতা

উপরোক্ত ৩টি বিষয়ের মধ্যে ২ ও ৩নং বিষয়টি যেন একে অন্যের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে আছে, বা বলা ভাল যে এ দুটির মধ্যে দ্বন্দ্বের একটি জায়গা সৃষ্টি হয়েছে। আবার ২ ও ৩ দুটিই ৪নং বিষয়ের সাথে জড়িত। যতদিন সংবাদপত্র দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল বা সমাজসংস্কারের মাধ্যম ছিল, যতদিন জনকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণের পবিত্র অনুপ্রেরণায় প্রাণিত হয়ে রাজা রামমোহন রায়, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতো সম্পাদকেরা সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন ততদিন কখনোই উপরে বর্ণিত দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দেয়নি। সমস্যাটা দেখা দিল স্বাধীনতার পরে যখন সংবাদপত্র ধীরে ধীরে ব্যবসায়িক শিল্পে পরিণত হল। বিলাতে ততদিনে ‘পীত সাংবাদিকতা’ এবং ‘ট্যাবলয়েড জার্নালিজম’-এর বাড়বাড়ন্ত এবং রাজপরিবারের সদস্য, হলিউড তারকা, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত জীবনে অনুপ্রবেশ এক জনপ্রিয় ও নিয়মিত ‘কনটেন্ট’ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ প্রভাব ভারতীয় গণমাধ্যমেও পড়তে বেশি সময় লাগল না। বিশেষতঃ, বিশ্বায়নের ফলে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলি যখন নিজেদের মধ্যে টি.আর.পি-র লড়াইয়ে মেতে উঠল, তখন জনপ্রিয়তার স্বার্থে তারা নৈতিকতাকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করল না, এবং ব্যক্তির গোপনীয়তার যে অধিকার তা বারংবার লঙ্ঘিত হতে লাগল। সাংবাদিকতার নতুন শাখা তদন্তমূলক সাংবাদিকতা এবং তার অন্যতম হাতিয়ার ‘স্টিং অপারেশন’-এর শিকার হল ব্যক্তি গোপনীয়তা। বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটল যা নতুন করে আমাদের ভাবতে বাধ্য করল গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিধি এবং ব্যক্তি গোপনীয়তার অধিকারের পরিধি-র মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে কীভাবে ভারসাম্য আনা যায়। এর পরের অংশে বিষয়টি বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে।

১.২.৩ ব্যক্তি গোপনীয়তার অধিকার এবং গণমাধ্যমের নীতিগত সমস্যা

মানুষের অধিকার মূলত দুই প্রকারের — স্বাভাবিক অধিকার বা Natural Rights এবং আইনসিদ্ধ অধিকার বা Legal Rights। স্বাভাবিক অধিকার জন্মগত এবং দেশ-কাল-সীমানার গণ্ডি অতিক্রম করে চিরশাশ্বত অর্থাৎ সব অবস্থাতেই এ অধিকার সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন। আইনসিদ্ধ অধিকার বা Legal Rights আইন প্রদত্ত অধিকার যা দেশ বা রাজ্য বিশেষে পাল্টাতে পারে কারণ বিভিন্ন দেশের আইন বিভিন্ন রকমের। গোপনীয়তার অধিকার স্বাভাবিক যা Natural Rights-এর মধ্যে গণ্য হয়।

১৮৯০ সালে ‘The Right to Privacy’ প্রবন্ধে আমরা গোপনীয়তার অধিকার আলোচিত হতে দেখি। মার্কিন জার্ণাল ‘The Harvard Law Review’-এ প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন স্যামুয়েল ওয়ারেন ও লুই ব্র্যান্ডেস। ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একা থাকার অধিকার ছিল এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরবর্তীকালে ব্র্যান্ডেস মনে করেছিলেন যে সরকার এবং রাষ্টযন্ত্র ব্যক্তি গোপনীয়তার লংঘনকারী হতে সচেষ্ট। এক্ষেত্রে সরকার প্রযুক্তির অপব্যবহার করে থাকে বলেও তিনি মনে করেন। ‘ফোন-ট্যাপিং’ বা ‘ফোনে আড়ি পাতা’ ও ‘কল রেকর্ড’ ইত্যাদি বিষয়গুলি এখান থেকে উঠে আসে। আমরা রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের হামেশাই অন্য

রাজনৈতিক বিপক্ষের বিরুদ্ধে 'ফোন-ট্যাপিং'-এর অভিযোগ আনতে শুনি।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অ্যালান ওয়েষ্টিন (Alan Westin), মনে করেন যে প্রযুক্তির উন্নতির সাথে গোপনীয়তা ও প্রকাশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় কারণ প্রযুক্তি সর্বদাই চেষ্টা করে গোপনীয়তাকে লঙ্ঘন করতে। ব্যক্তি মানুষও নিজের মতো করে, নিজেকে প্রকাশ করার অথবা মনের কথা জ্ঞাপন করা বা না করা, মনের কথা ও জীবন গোপন রাখার মধ্যে এক ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে চলে, নতুন প্রযুক্তির সাথে মানিয়ে নিয়ে।

তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং স্যাটেলাইট সিগন্যাল নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা আদতে গোপনীয়তাকে বিপন্ন করে, এ কথা বহু তাত্ত্বিক মনে করেন। তাঁরা একথাও মনে করেন যে এই উন্নত তথ্য প্রযুক্তিকে রাষ্ট্র নজরদারির ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে। এঁদের আশংকা যে অমূলক নয় তা বোঝা গেছিল যখন ২০১৩ সালে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা NSA-র কর্মী এডওয়ার্ড স্নোডেন যখন Global Surveillance Disclosure-এর মাধ্যমে ফাঁস করে দেন যে আমেরিকাসহ বহু দেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপরে নজরদারি চালাচ্ছে। রাষ্ট্রের নজরদারি এবং গোপনীয়তার প্রসঙ্গটি সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যখন আধার কার্ডকে বাধ্যতামূলক করার প্রচেষ্টা হয়। এ প্রসঙ্গে পেগাসাস বিতর্ক স্মরণ করা যেতে পারে।

ফিরে আসা যাক গণমাধ্যম ও গোপনীয়তার অধিকার প্রসঙ্গে। ১৮৮৫ সাল থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত তুঙ্গে ছিল যোসেফ পুলিতজারের 'নিউ ইয়র্ক জার্ণাল' বনাম উইলিয়াম হার্স্ট-এর 'নিউ ইয়র্ক জার্ণাল'-এর জনপ্রিয়তার লড়াই। এই দুটি সাংবাদপত্রকেই অনাবশ্যক উত্তেজনা সৃষ্টি করার দায়ে বা সংবাদকে 'Sensationalize' করার দায়ে চিহ্নিত করা হয় এবং সাংবাদিকতার এক নতুন ধারা — 'পীত সাংবাদিকতা' বা 'Yellow Journalism'-এর উদ্ভব ঘটে এই লড়াই থেকে। নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর সম্পাদক আরউইন ওয়ার্ডম্যান এই বাক্যবন্ধটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। সংবাদকে অহেতুক উত্তেজনাপ্রবণ, মুখরোচক ও রোমাঞ্চকর করতে গিয়ে অনেক সময়ই বস্তুনিষ্ঠতা থেকে সরে গিয়ে গুজবের ওপর ভিত্তি করে সংবাদ পরিবেশন হচ্ছিল। এই প্রবণতাই বিপজ্জনক হয়ে উঠল যখন নতুন খবর জোগাড় করার তাগিদে সাংবাদিকরা ব্যক্তির গোপনীয়তা ভঙ্গ করতে শুরু করলেন অথবা ব্যক্তির একান্ত গোপন পরিসরে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করলেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য হতে লাগলেন সেলিব্রিটি ও গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত মানুষেরা — রাজনৈতিক নেতা, রাজ পরিবারের সদস্যরা, খেলোয়াড় এবং চলচ্চিত্র তারকারা। তাঁদের জীবনের গোপন কাহিনী ও কেচ্ছা হু হু করে বিকোতে লাগল এবং এখান থেকেই ব্রডশীট সংবাদপত্রের পাশাপাশি ট্যাবলয়েড উঠে এল। এখনও পর্যন্ত নব-নব রূপে পীত সাংবাদিকতা ফুলে ফেঁপে উঠছে। প্রযুক্তির কল্যাণে ইলেক্ট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়াও এই পীত সাংবাদিকতায় মেতে উঠেছে।

১৯৪৮ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা প্রকাশিত মানবাধিকার সনদ বা Universal Charter of Human Rights। এই নথিতে গোপনীয়তার অধিকারকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে গোপনীয়তার অধিকার এক অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। রাষ্ট্র ও গণমাধ্যমকে নিজেদের কার্যপ্রণালী যথা আইন প্রণয়ন এবং সংবাদ সংগ্রহ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হয়। সময়ের সাথে সাথে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যা এই বিষয়টির সাথে গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে বারবার আলোচনায় নিয়ে আসে এবং নানা তর্ক-বিতর্ক-আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিষয়টি চলছে।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা কেস স্টাডির মতো নিম্নে দেওয়া হল বিষয়টি ভালো করে বোঝার জন্য।

১। **অটো শংকর** — গোপনীয়তা এবং ভারতীয় সংবিধান ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ১২-১০-১৯৯৫ তারিখ সম্বলিত এক পর্যবেক্ষণ-এর মাধ্যমে জানান যে সরকারি আধিকারিকদের মর্যাদা/মান হানীকর কিছু ছাপার ক্ষেত্রে সরকার

সংবাদমাধ্যমকে বাধা দিতে পারে না। তামিল পত্রিকা নকীরণ কুখ্যাত অপরাধী 'অটো' শংকর-এর আত্মজীবনী প্রকাশ করছিল এবং সেখানে শংকর তাঁর সাথে অনেক সরকারি আধিকারিকের যোগাযোগ আছে বলে জানান। সুপ্রীম কোর্ট জানাল যে ঐ আত্মজীবনীতে 'পাব্লিক রেকর্ডস্' বা সর্বজনীন তথ্যভাণ্ডার থেকে নেওয়া যে কোনও তথ্য বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করা যাবে এবং তাতে কোনওরকম মানহানি বা গোপনীয়তা লংঘন বলে গণ্য হবে না। তবে এ ছাড়া যদি কিছু লেখকের বিনা অনুমতিতে প্রকাশিত হয়, তাহলে তা গোপনীয়তার লংঘন বলে গণ্য করা হবে।

ভারতীয় সংবিধানের ২১নং ধারা

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণে ভারতীয় সংবিধানের ২১নং ধারা উল্লেখ করে মহামান্য আদালত বলেন যে প্রত্যেক নাগরিকের নিজের, পরিবারের এবং পারিবারিক বিষয়ে গোপনীয়তা অবলম্বন করার অধিকার আছে এবং কেউ তাঁর বিনা অনুমতিতে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করলে গোপনীয়তা ভঙ্গের দায় তথা তৎসংক্রান্ত পরিণতির সম্মুখিন হবেন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গোপনীয়তার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত তো বটেই, বিচার ব্যবস্থাও তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। '৯০-এর দশকে বিশ্বায়নের জেরে ভারতের গণমাধ্যম বাজারে প্রচুর বেসরকারি সংবাদ চ্যানেল-এর আবির্ভাব হয়। ইন্টারনেট নিউজ পোর্টাল-ও আবির্ভাব হয়। ইন্টারনেট নিউজ পোর্টাল-ও শুরু হয় স্যাটেলাইট প্রযুক্তির কল্যাণে। শুরু হয় টি আর পি বা জনপ্রিয়তার ভয়ংকর প্রতিযোগিতা। এর ফলে এক্সক্লুসিভ বা সম্পূর্ণ নতুন সংবাদের খোঁজে মরিয়া হয়ে ওঠে সংবাদমাধ্যমগুলি এবং সংবাদ সংগ্রহের নতুন পদ্ধতি উঠে আসে।

১.২.৩.১ স্টিং অপারেশন

শ্রী তরুণ তেজপাল এবং অনিরুদ্ধ বহল-এর নেতৃত্বে তহলকা পত্রিকা ভারতীয় সাংবাদিকতায় এক নতুন মোড় নিয়ে আসে। ইতিপূর্বেও বোফর্স ইত্যাদি বিখ্যাত কুকাণ্ডে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার দ্বারা অনেক সাংবাদিকই বড় বড় রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন এবং তা নিয়ে বিতর্কও যথেষ্ট হয়েছিল। যেমন 'দ্য হিন্দু' সংবাদপত্রে সাংবাদিক এন.রাম-এর বোফর্স সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক, মামলা, মোকদ্দমা ইত্যাদি হয়। প্রথাগত তদন্তমূলক সাংবাদিকতায় কোথাও যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণের অভাবে প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যায় বা মানহানি অথবা নীতিভ্রষ্টতার দায়ে অভিযুক্ত হয়। ঠিক এই ফাঁক ভরাট করতেই তহলকা নিয়ে আসে এক নতুন অস্ত্র — স্টিং অপারেশন।

২০০০ সালে ক্রিকেট ম্যাচ ফিক্সিং দিয়ে তহলকার স্টিং অপারেশনের যাত্রা শুরু। ২০০১-এ 'অপারেশন ওয়েস্ট এন্ড'-এ এই পদ্ধতি বিপুল সাফল্য পায় এবং জনমানসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বরাত পাইয়ে দেওয়ার জন্য তহলকার প্রতিনিধিরা সামরিক বাহিনী, সরকার ও রাজনীতির প্রভাবশালীদের ঘুষ দেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সেই ঘুষ গ্রহণ করে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে মধ্যস্থতা করতে রাজিও হন। এই পুরো কথোপকথন এবং ঘুষের লেনদেন গোপন ক্যামেরায় রেকর্ড করে পরে প্রকাশ করে তহলকা। এই গোপন ক্যামেরার ব্যবহার করে যাঁর বক্তব্য রেকর্ড হচ্ছে তাঁর অজান্তে রেকর্ড করাকেই 'স্টিং অপারেশন' বলে অভিহিত করা হয়।

পরবর্তীকালে তহলকা তো বটেই, স্টিং অপারেশন পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করে আরও বহু সংবাদসংস্থা, চ্যানেল ও পত্রিকা। এই 'স্টিং'-এ বিদ্ধ হতে থাকেন বহু বড় বড় রাজনৈতিক দল ও অন্য জগতের ব্যক্তিত্বরা। কিন্তু স্টিং অপারেশন যত বৃদ্ধি পেয়েছে তত বিতর্ক হয়েছে এর নীতিগত দিকটি নিয়ে। একদিকে এই পদ্ধতি সত্য উদ্ঘাটন করতে সাহায্য করে এবং প্রতিবেদনের স্বপক্ষে প্রমাণও যোগায় কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়, যথা—

১। কাউকে না জানিয়ে তার বক্তব্য রেকর্ড করা কি সঠিক? এতে কি তাঁর গোপনীয়তা ভঙ্গ হচ্ছে না?

২। কারুর অজান্তে রেকর্ড করা বক্তব্যকে কি জনসমক্ষে আনা উচিত?

৩। ঘুষ বা অন্য প্রলোভন দিয়ে একটি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কারুর প্রতিক্রিয়াকে কি তার মানসিকতার প্রকৃত প্রতিফলন বলা যায়?

এই সমস্ত ঘটনাক্রম এবং সাংবাদিকতা ও আইন জগতের নানা আলোচনা থেকে মূলত দুটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় উঠে আসে :

(ক) গোপন ক্যামেরার ব্যবহার বা স্টিং অপারেশন কখনোই প্রথমে করা উচিত নয়। সত্য অনুসন্ধান ও প্রমাণ যোগাড়ের ক্ষেত্রে সবকটি চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর যদি কাঙ্খিত ফল না মেলে, তখন এটি শেষ পন্থা হতে পারে।

(খ) স্টিং অপারেশনের প্রয়োজনীয়তার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত জনস্বার্থ। যে সত্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য সাংবাদিককে কারুর গোপনীয়তা লংঘন করতে হচ্ছে, সে সত্য/তথ্য যেন উদ্‌ঘাটনযোগ্য হয়, সমাজ ও বহু মানুষের স্বার্থসিদ্ধি করে। না হলে নিছক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য স্টিং অপারেশন করা অত্যন্ত গর্হিত ও সাংবাদিকতার নীতি-বহির্ভূত হবে।

আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে নীতি ভঙ্গে কোনও শাস্তি হয় না। কিন্তু নীতি স্খলন যদি মানহানীর পর্যায়ে যায় তাহলে কিন্তু সংবাদমাধ্যম বা সম্পাদক বা সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে আদালতের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এক্ষেত্রে একমাত্র জনস্বার্থই তার ঢাল হতে পারে। তাই সর্বদাই ভেবে চিন্তে স্টিং অপারেশনের পথে এগোনো উচিত। পাঠক বা দর্শকরাও কিন্তু প্রতিবেদনে নিজের স্বার্থ খুঁজে না পেলে, তাকে বর্জন করবেন। কিছু অল্পসংখ্যক হয়তো বা উত্তেজনার আগুনের আঁচ নিতে পারেন কিন্তু তাদের নিয়ে গণমাধ্যম সংস্থা বাজারে টিকে থাকতে পারবে না। বহু মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে আছে, তথ্য উদঘাটন প্রকৃত অর্থেই সবার (দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র) হিতসাধন করবে, সেক্ষেত্রেই 'স্টিং অপারেশন'-এর কথা ভাবা যেতে পারে। এই বক্তব্যের প্রতিফলন ভারতের প্রেস কাউন্সিল দ্বারা প্রকাশিত ২০১০ সালের আচার সংহিতায় ৮৫ পৃষ্ঠায় আছে।

১.২.৩.২ প্রত্যুত্তরের অধিকার

দুটি ঘটনা দিয়ে এই অংশটি শুরু করলে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝতে সুবিধা হবে। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি-তে ১৯৭৮ সালের ২২ অক্টোবর সত্যজিৎ রায় নির্দেশিত 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' ছবির একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক রাজবন্স খন্না সত্যজিৎ-এর চিত্রায়নের ওয়াজেদ আলি শাহকে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ ঐ পত্রিকাতেই সত্যজিৎ-এর বিশাল এক চিঠি ছাপা হয় এবং তার প্রত্যুত্তরে খন্নার-ও আরেকটি চিঠি ছাপা হয়, ঐ একই দিনে। এইরকমই এক ঘটনা ঘটেছিল 'চারুলতা' ছবিটিকে নিয়েও। সমালোচকের সাথে দীর্ঘ পত্রাঘাত চলে এক সংবাদপত্রে। এমনকি, মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম' ছবিটি নিয়েও তাঁর সাথে পত্রযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন সত্যজিৎ।

যে কোনও স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দেশে নিজের মতামত দেওয়ার স্বাধীনতা সব নাগরিকেরই আছে। বিশেষত যদি তাকে নিয়ে গণমাধ্যমে কিছু প্রকাশিত হয় যাতে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে অথবা তা সত্য নয়, সে ক্ষেত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের উত্তর দেওয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। একেই 'Right to reply' বা প্রত্যুত্তরের অধিকার বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এই অধিকার মূলত দু' রকমের—

(ক) ব্যক্তির প্রত্যুত্তরের অধিকার

(খ) সংস্থার প্রত্যুত্তরের অধিকার

উপরোক্ত দুইটি ঘটনা 'ক'-এর উদাহরণ। অনেক সময় রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়িক সংস্থা, ধর্মীয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যা আংশিক সত্য বা সেই সংস্থার ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে অবমাননাকর বা মানহানীকর। এমনকি দেশ, রাষ্ট্র ও সরকারকেও এই সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। যেমন, কিছু বছর আগে সাহারাশ্রী সুব্রত রায় ব্যবসা সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হন এবং কারাবরণ করেন। এই সময় 'সাহারা' সংস্থাকে নিয়ে এতরকমের ভ্রান্ত সংবাদ প্রকাশ হচ্ছিল, যে তা সংস্থার শেয়ারের বাজারমূল্য চড়চড় করে নামিয়ে দিচ্ছিল। তখন সাহারা সমস্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভ্রান্ত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং হৃত সম্মান ও ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে।

২০১৮ সালে বেশ কিছু সংবাদপত্রে/চ্যানেলে খবর আসে যে ভারত ও চিনের মধ্যে ডোকলাম সীমান্তে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। এই ভ্রান্ত সংবাদ পরিবেশনার ফলে ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রককে একটি প্রত্যুত্তর দিতে হয়। গণমাধ্যমকে একটি চিঠির মাধ্যমে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানান যে সীমান্তে স্থিতাবস্থা বা 'Status quo' বজায় আছে।

উপরোক্ত দুটি ঘটনায় — সাহারা এবং বিদেশ মন্ত্রক জ্ঞাপনের যে মাধ্যমটি ব্যবহার করেছেন, তাকে বলা হয় Rejoinder অর্থাৎ একটি/একাধিক প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে প্রত্যুত্তর গণমাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। 'Re' কথাটির তাৎপর্য এখানে যে এই জিনিসটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রতিবেদন প্রকাশের পরে এসে তথ্যকে সম্পূর্ণতা দেয় অথবা ভুল তথ্যকে সংশোধন করার চেষ্টা করে অর্থাৎ 'join' তাই একে 'rejoinder' বলা হয়।

এই অংশের গোড়াতে ব্যক্তি প্রত্যুত্তর এবং তারপরের উদাহরণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্যুত্তর দুটি-র যে দর্শনটি এখানে কাজ করছে তাহল প্রত্যুত্তরের অধিকার। এখন প্রশ্ন হল, সংবাদমাধ্যম এখানে জনগণ এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যুত্তর-এর অধিকারকে স্বীকৃত দেওয়া গণমাধ্যমের নীতিগত পবিত্র কর্তব্য। গণমাধ্যমে প্রকাশিত কোনও বিষয়ে যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির কোনও বক্তব্য থাকে তাকে/তাদের সেই বক্তব্য পেশ করতে দেওয়া এবং জগণের কাছে সেই বক্তব্য তুলে ধরা সংবাদপত্র/চ্যানেলের কর্তব্য। সাংবাদিকতার নীতি সর্বদাই সত্য ও বস্তুনিষ্ঠতার কথা বলে থাকে। প্রত্যুত্তরের অধিকার সত্য অন্বেষণের প্রক্রিয়াকেই জোরদার করে এবং নীতিনিষ্ঠতাকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

তবে, এক্ষেত্রে একটা কথা বলা দরকার যে যদি কোনও ঘটনা খুব বেশি বিতর্কের জন্ম দেয়, জনগণকে নাড়া দেয় তাহলে চিঠিপত্রের মাধ্যমে উত্তর-প্রত্যুত্তরের পালা চলতেই থাকে। ঠিক যেমনটি হয়েছিল সত্যজিৎ রায় বনাম মৃণাল সেন 'আকাশ কুসুম' বিতর্কের সময়ে। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদকের স্বাধীনতা থাকে নিজ বিচার-বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান দিয়ে ঠিক করার যে তিনি কতদিন অথবা কতবার এই চিঠিগুলি প্রকাশ করবেন এবং কোথায় এই পালায় ইতি টানবেন কারণ কোনও কিছুই সংবাদপত্রের পাতায় বা টেলিভিশনের পর্দায় অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। এই বক্তব্যের প্রতিফলন আমরা ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রকাশিত সাংবাদিকদের আচার সংহিতার (২০১০)১৭৯৮ নং পৃষ্ঠায় পাই।

রাষ্ট্রপুঞ্জ ১৯৬২ সালে সংশোধনের আন্তর্জাতিক অধিকার শীর্ষকে এক কনভেনশনের আয়োজন করে এবং সেখানে

এই অধিকারকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রত্যুত্তরের অধিকার সংশোধনের অধিকারেরই নামান্তর। ২৪ অগস্ট ১৯৬২ থেকে এই অধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বলবৎ আছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম সংস্থা, পত্র-পত্রিকা, এমনকি আকাদেমিক জার্নালও নিজস্ব সংশোধন/প্রত্যুত্তর সংক্রান্ত নির্দেশিকা তৈরি করেছে। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন গণমাধ্যম সংস্থার সম্পাদকীয় নীতি বলে—

"যদি আমাদের প্রকাশিত কোনও প্রতিবেদনে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোনও সমালোচনা করে যাতে তার কোনও ক্ষতিসাধন হয়, সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যুত্তরের সুযোগ দেওয়া হবে, যাতে তিনি/তারা তাদের প্রতি ওঠা অভিযোগের সাফাই দেওয়ার ন্যায়সঙ্গত সুযোগ পান।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ন্যায়পরায়ণতা, নীতিসম্পন্নতা, বস্তুনিষ্ঠতা প্রত্যুত্তরের অধিকারের সাথে জড়িয়ে আছে এবং এক মানবিক অধিকারের সমগোত্রীয় যাকে কোনওভাবেই সংবাদমাধ্যম অবহেলা করতে পারে না। করলে, তা নীতিভ্রষ্টতার পর্যায়ে পড়বে।

পাশ্চাত্যের বহু দেশে প্রত্যুত্তরের অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতে সমতার অধিকার এবং ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার আওতায় এই অধিকার চলে আসে। ২০০৫-এ বলবৎ হওয়া তথ্যের অধিকার আইন এই অধিকারকে পুষ্ট করেছে। ১৯৯৪ সালে 'The Right to Reply in the Press Bill 1994' রাজ্যসভায় পেশ হয়েও পরবর্তীকালে তুলে নেওয়া হয়। ভারতের প্রেস পরিষদ দ্বারা প্রকাশিত সাংবাদিকদের পেশাদারী আচরণবিধি (Norms of Journalistic Conduct)-এ ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠায় প্রত্যুত্তরের অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা সুপারিশ করা আছে।

১.২.৩.৩ সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতিবেদন

ভারতবর্ষ বহু ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দেশ। ঐতিহাসিক ভাবে ভারতে সব ধর্মের মানুষ, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান-শিখ মিলেমিশে শান্তিতে থেকেছে। কিন্তু অশান্তিও হয়েছে প্রচুর। রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষত ইংরেজরা ভারতের শাসক হওয়ার পর ধর্মীয় ভেদাভেদকে নিজেদের 'Divide and rule' নীতির অন্যতম হাতিয়ার করে।

এই ধরনের ঘটনাগুলিকে কভার করে প্রতিবেদন রচনা যে কোনও সাংবাদিকের কাছে চ্যালেঞ্জ। ভাষা অথবা বিশ্লেষণের সামান্য বিচ্যুতি বা তারতম্যে প্রতিবেদনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, ঘটনাকে আরও তীব্রতর করতে পারে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়লে সেই প্রতিবেদন অন্য সম্প্রদায়কে হিংসা ও প্রতিহিংসাপ্রবণ করে তুলতেও পারে এবং গুরুতর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে। এছাড়া দাঙ্গার মতো স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখাও গণমাধ্যমের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এবার দেখা যাক সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও পরিস্থিতির রিপোর্টিং সম্পর্কে সাংবাদিকতার নীতি কী বলে। ভারতের প্রেস কাউন্সিলের নীতিমালায় (২০১০) আছে :

১। গুজব, সন্দেহ এবং অপ্রত্যয়িত তথ্যের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সংক্রান্ত প্রতিবেদন করা উচিত নয়।

২। ভাষা সংযত রাখা উচিত।

৩। প্ররোচনা সত্ত্বেও হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

৪। সমস্যার অতিরঞ্জন করা ঠিক নয়।

৫। কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে অহেতুক আক্রমণ করা ঠিক নয়। ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করাও ঠিক নয়।

৬। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যুক্ত আছেন এমন ঘটনায় মিথ্যা সাম্প্রদায়িক রং লাগানো উচিত নয়।

৭। যে সমস্ত বিষয় সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, তিক্ততা অবিশ্বাসকে বৃদ্ধি করে সেই সব বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা/ঘটনা-র ক্ষেত্রে রাজ্যসরকার ও সাংবাদিকদের জন্য প্রেস কাউন্সিল কিছু আচরণবিধি সুপারিশ করে :

(ক) উস্কানিমূলক শিরোনাম বর্জনীয়। শিরোনামের সাথে মূল বক্তব্যর যেন সামঞ্জস্য থাকে।

(খ) মন্তব্য এবং রায়দান থেকে বিরত থাকা উচিত।

(গ) মৃত ও হতাহতের সংখ্যার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যথা সরকারি তথ্য বা উপযুক্ত প্রমাণসহ সংখ্যা বলা উচিত। যথেষ্ট প্রমাণ না থাকলে, সংখ্যা কম বলাই ভালো।

এছাড়াও কাউন্সিল রাজ্য সরকারকেও সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিহিংসামূলক আচরণ না দেখাতে সুপারিশ করেছে।

১.২.৩.৪ নারী নিগ্রহ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

নারীনিগ্রহ গোটা পৃথিবীতে বটেই বিশেষ করে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে এক পরিচিত সামাজিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও প্রথম বিশ্বের দেশের নারীর অধিকার সম্মানের সাথে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিনিয়ত ভারতে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানী, কর্মক্ষেত্রে লাঞ্ছনা, বাড়িতে অত্যাচার, অ্যাসিড আক্রমণ, যৌন নিপীড়ন, লিঙ্গবৈষম্য, নারীপাচার এরকম নানাবিধ নিগ্রহের শিকার হয়ে চলেছেন ভারতীয় নারীরা। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে গণমাধ্যম তথা সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে যে তারা নারী নিগ্রহের ঘটনাগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে নিগৃহীত নারীকে যে শুধুমাত্র প্রতিকারের রাস্তা দেখাবে শুধুমাত্র তা নয়, বরং এ বিষয়ে বৃহত্তর সমাজকে জাগ্রত করবে, সচেতন করবে এবং নারী নিগ্রহকে হ্রাস করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। অনেকেরই মনে থাকার কথা জেসিকা লাল হত্যাকাণ্ড এবং আরও সাম্প্রতিক নির্ভয়া ধর্ষণ কাণ্ড, যা শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। গণমাধ্যমের তৎপরতায় এবং প্রশাসনের সক্রিয়তায় বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হয়। কিন্তু দেশের প্রতিটি কোনায় জেসিকা ও নির্ভয়াদের ছড়াছড়ি। গণমাধ্যমের কাছে তাই আরও বেশি সক্রিয়তা আর সদর্থক ভূমিকার প্রত্যাশা মানুষের। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সাংবাদিক এই জাতীয় প্রতিবেদন লেখার সময় নীতিনিষ্ঠ থাকছেন না এবং প্রকারান্তরে তা নিগৃহীতার ক্ষতিসাধন করছে। এ বিষয়ে সাংবাদিকতার নীতি কী হওয়া উচিত তা নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা নানাবিধ আলোচনাসাপেক্ষে মতামত দিয়েছেন। আমরা একবার এই জাতীয় সুপারিশগুলি দেখে নেবো।

(ক) রাষ্ট্রপুঞ্জ

রাষ্ট্রপুঞ্জ সর্বদাই নারী নিগ্রহ, বিশেষতঃ লিঙ্গ বৈষম্য ও লিঙ্গ হিংসার ব্যাপারে অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে যার পোষাকি নাম— 'Declaration on the Elimination of Violence Against Women'। এটি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহিত হয়। এর দ্বারা সারা বিশ্বে নারীর অধিকারকে

স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। এই ঘোষণাপত্রের দর্শন ১৯৪৮ সালের মানবাধিকার সনদের অনুসারী। ১৯৯৯-এ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণসভা ২৫ নভেম্বরকে ''নারীনিগ্রহ নিশ্চিহ্ন করার আন্তর্জাতিক দিবস" হিসেবে ঘোষণা করে। Gender Based Violence বা GBV রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্ভাবিত একটি টার্ম এবং বিভিন্ন সময়ে যখন পৃথিবীর কোনও প্রান্তে কোনওরকম বড় যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদির মতো ঘটনা ঘটেছে, নারীদের বিষয়গুলিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও তার অধীনস্থ সংস্থাগুলি গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা এবং আলোচনার মাধ্যমে, নানা সনদ-নথি প্রকাশের মাধ্যমে নিজেদের সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। এই রকমই একটি নথি, 'Ethical Guidelines for Journalist' বা সাংবাদিকদের নীতিসংহিতা যা ডিসেম্বর ২০১৬-য় 'United Nations Communication Group, Afghanistan' দ্বারা প্রকাশিত। এর ৭ম পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে—

''গণমাধ্যমে মহিলাদের বক্তব্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা নারী নিগ্রহে লিপ্ত তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। যারা নিগ্রহের শিকার, তারা যাতে সুযোগ-সুবিধা পান সেটাও দেখতে হবে; এই ধরনের ঘটনা আটকাতে 'শূন্য সহিষ্ণুতা' (Zero tolerance)-কে উৎসাহ দেওয়া সাংবাদিকদের কর্তব্য, তা সে ঘটনা নারী, পুরুষ, নাবালক যার বিরুদ্ধেই হোক না কেন।"

GBV সংক্রান্ত সাংবাদিকতায় যে সমস্ত বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল—

(১) **যথার্থতা :** সাংবাদিকতার প্রাথমিক শর্তই হল সঠিক তথ্যের পরিবেশন। GBV-র ক্ষেত্রেও তাই। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারগুলি খুবই স্পর্শকাতর হয় কিন্তু সাংবাদিককে তার প্রতিবেদনে তথ্যের যথার্থতা আনতেই হবে। অনেক সময়ই ভাষার সামান্য তারতম্যে তথ্যের বিকৃতি ঘটে।

(২) **পক্ষপাতহীনতা :** যারা যৌন হয়রানি বা নারীনিগ্রহের শিকার, তাদের সাথে কথা বলার সময়, সাংবাদিককে fair অথবা পক্ষপাতহীন হতে হবে এবং যে সব তথ্যের সূত্র প্রকাশ হলে নির্যাত্রিতা বিপদে পড়তে পারে, তাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তাকে জানানো দরকার যে গণমাধ্যমে তার বক্তব্য প্রকাশিত হলে তাকে কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই নারী নিগৃহিতা গণমাধ্যমে এসে পরবর্তীকালে সামাজিকভাবে একঘরে হয়েছেন অথবা প্রতিহিংসামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। সাংবাদিক হিসেবে এই বিষয়গুলি তাকে আগেই বুঝিয়ে বলা উচিত।

(৩) **বস্তুনিষ্ঠতা :** সাংবাদিক কোনও নিগ্রহের ঘটনাকে ব্যক্তিগতভাবে বিচার করবেন না। বরং তাকে নির্মোহভাবে বিষয়টি প্রকাশ করতে হবে। এমন কোনও কথা লেখা উচিত না যাতে ঘটনায় এমন কোনও রং লাগে বা দৃষ্টিকোণ যোগ হয় যাতে নিগৃহিতাকে দায়ী করা হয়।

(৪) **জনস্বার্থ :** সাংবাদিককে বুঝতে হবে যে নারীনিগ্রহের কোনও ঘটনা লোকগোচরে আমলে জনস্বার্থ ও জনহিতকর হবে। কিছু ঘটনা ঘটে যেখানে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনেক গোপন তথ্য থাকে, তা জনচিত্তবিনোদনকারী হলেও সর্বদা জনকল্যাণকর নাও হতে পারে।

(৫) **গোপনীয়তা :** কোনও ভাবেই যেন নিগৃহিতার গোপনীয়তা ক্ষুন্ন বা লংঘন না হয়। কারণ, পাঠক/ দর্শকরা কিন্তু কৌতুহলীভাবে বোঝার চেষ্টা করেন পরিচয়। কিন্তু নিগৃহিতার পরিচয় রক্ষা করা সাংবাদিকের নীতিগত দায়িত্ব। সাধারণত ছবি, বা ভয়েস ভিডিও তোলার আগে তার অনুমতি নেওয়া উচিত। ভিডিও বা ছবিতে নিগৃহিতার মুখমণ্ডল আবছা (Blur) করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যে সমস্ত মহিলারা স্পর্শকাতর অঞ্চলে থাকেন বা ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় যুক্ত আছেন বা অসুবিধাজনক সামাজিক পরিস্থিতিতে আছেন, যেমন HIV রোগী, যৌনকর্মী, ড্রাগ নেশাগ্রস্ত বা নিগৃহিতা নারী — এদের ক্ষেত্রে পরিচয় গোপন রাখাই ভালো কারণ না হলে এরা বিপদে/অসুবিধায় পড়তে পারেন।

২০১৫ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময়েও রাষ্ট্রপুঞ্জ সাংবাদিকদের জন্য মহিলা নিগ্রহ সংক্রান্ত অনুরূপ নীতি-নির্দেশিকার প্রণয়ন করে।

(খ) **ভারতের প্রেস কাউন্সিল** প্রণীত আচার সংহিতাতেও কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা আছে যার সাথে নারী নিগ্রহের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এর মধ্যে আছে তথ্য যাচাই করা, অশ্লীলতা, উত্তেজক শিরোনাম এবং বিশেষ জাত, ধর্ম ও গোষ্ঠির উল্লেখ না করা, তথ্যে সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা। এই বিষয়গুলি নারী নিগ্রহের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

(গ) **আই.এফ.জে** আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের সংগঠন। IFJ তাদের নীতিমালায় নারী নিগ্রহকে ঠিকমত চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে ১৯৯৩ রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছে। নিগৃহীতার অনুমতি সাপেক্ষেই তাকে নিগৃহিতা বলে অভিহিত করতে হবে, নচেৎ নয়। নিগৃহিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এই নীতিমালার ছত্রে ছত্রে। পুরো ঘটনাকে নিরপেক্ষ ভাবে, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও পরিসংখ্যান দিয়ে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে প্রতিবেদককে। যথাযথ গোপনীয়তা বজায় রাখতেও বলা হয়েছে।

১.২.৩.৫ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

একটি গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তাদের মতাদর্শ এবং প্রার্থীদের প্রতি দেশের জনগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং জয়ী দল / জোট সরকার পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইরকম একটি প্রক্রিয়ায় এটা খুবই জরুরি যে গণমাধ্যম দেশের জনগণের কাছে প্রয়োজনীয়, সঠিক ও পক্ষপাতহীন তথ্য পৌঁছে দিক এবং তাদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করুন। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বহুলাংশেই গণমাধ্যমের দায়িত্ববোধের সাথে যুক্ত। বস্তুনিষ্ঠ এবং নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতাই নির্বাচনের সময় কাম্য।

ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রণীত নীতিমালায় নিম্নোক্ত নির্দেশিকাগুলি আছে :

১। সংবাদমাধ্যম পক্ষপাতহীন ভাবে নির্বাচনী প্রচারের প্রতিবেদন দেবে। প্রতিটি প্রার্থীকে সমান গুরুত্বসহকারে প্রতিবেদনে নিয়ে আসতে হবে। কোনও মতেই যেন গণমাধ্যম কোনও বিশেষ প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলকে বিশেষ বা অতিরিক্ত প্রচার/সময়/জায়গা না দেয়। সমস্ত যুযুধান পক্ষের বক্তব্য সমান গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে হবে।

২। নির্বাচনী ধারায় কোনওরকম সাম্প্রদায়িক বা জাতপাত-এর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নির্বাচনী প্রচার করার অনুমতি নেই। সাংবাদিকরাও এই প্রচারের বিষয় সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা উচিত নয় যা মানুষের মধ্যে ধর্ম, জাত, গোষ্ঠী বা ভাষার ভিত্তিতে হানাহানি বা বৈরিতায় মদত দেয়।

৩। কোনও প্রার্থীর ব্যক্তিগত জীবন/চরিত্র ও বিষয় আলোচনা থেকে সংবাদমাধ্যম বিরত থাকবে।

৪। বিশেষ কোনও প্রার্থীকে সংবাদে তুলে ধরার জন্য তার থেকে আর্থিক সুবিধা/উৎকোচ গ্রহণ করা নীতিবিরুদ্ধ

আচরণ। কোনওভাবেই কোনও বিশেষ প্রার্থীর হয়ে সরাসরি প্রচার বা campaign করা গণমাধ্যমের কাজ নয়। সেক্ষেত্রে অপর পক্ষ/অন্যান্য প্রার্থী ও দলকে প্রত্যুত্তরের অধিকার দিতে হবে। এইভাবে অর্থ নিয়ে সংবাদ করাকে 'Paid News' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৫। সরকারি টাকায় কোনও পার্টি বা ক্ষমতাসীন সরকারের বিজ্ঞাপন সংবাদমাধ্যম গ্রহণ করবেন না।

৬। ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রণীত নিয়মাবলী এবং তার আধিকারিকদের গণমাধ্যম শ্রদ্ধা করবে ও সহযোগিতা করবে।

৭। প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা প্রকাশের শর্ত হল যে সেখানে সমীক্ষার পদ্ধতি এবং নমুনা সংখ্যা ইত্যাদি বিশদে বর্ণনা করতে হবে। 'Margin of Error' অথবা 'ভুলের সম্ভাবনা'ও ব্যক্ত করে রাখতে হবে একই সঙ্গে। নির্বাচন চলাকালীন এই সমীক্ষা প্রকাশ করা যাবে না।

৮। বুথ ফেরৎ সমীক্ষার ফলাফল নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পরই প্রকাশ করা যাবে। নির্বাচন চলাকালীন বা তার আগে এটি প্রকাশ করলে তা ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে।

১.২.৪ সারাংশ

গণমাধ্যম ব্যবসায়িক স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত এবং সেই কারণে সাংবাদিকদের বারংবার নীতিগত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নীতিমালার নির্দেশিকা এবং বাস্তব পরিস্থিতি রয়েছে একে অন্যের বিপ্রতীপে। এই পরিস্থিতিতে নীতি শাস্ত্র ও নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে তবেই একজন সাংবাদিক নীতিনিষ্ঠ থাকতে পারবে। এই এককে আমরা শিখেছি বিভিন্ন তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাংবাদিকের কী করণীয় যথা গোপনীয়তার অধিকার কীভাবে রক্ষা পাবে, কখন ও কীভাবে স্টিং অপারেশন করা যেতে পারে, প্রত্যুত্তরের অধিকার কী এবং সেখানে সম্পাদকের কী কর্তব্য। সাম্প্রদায়িক সমস্যা, নারীনিগ্রহ এবং নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে সাংবাদিকের নীতিগত দায় ও কর্তব্য কী। এক কথায় এই একক একজন পেশাগত সাংবাদিকের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধ গঠনে সাহায্য করে।

১.২.৫ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন।

(ক) গোপনীয়তার অধিকার কি সাংবাদিকতার জন্য এক বাধা? যুক্তিসহ নীতির আলোয় ব্যাখ্যা করুন।

(খ) প্রত্যুত্তরের অধিকারের সীমারেখা কে ঠিক করেন এবং কিসের ভিত্তিতে? উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করুন।

(গ) সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার প্রতিবেদন রচনা গণমাধ্যমের কাছে এক নীতিগত চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

(ঘ) "নিগৃহীতার ক্ষমতায়ন নারী নিগ্রহের সমস্যার দ্রুত অবসান ঘটাবে।" — এই বক্তব্যের সাথে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকার যোগসূত্র বর্ণনা করুন।

(ঙ) নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদনে কিভাবে পক্ষপাতদুষ্টতা এড়ানো যায়? এ ব্যাপারে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের নির্দেশিকা কী বলছে বর্ণনা করুন।

২। টীকা লিখুন :

(ক) জেমস অগাস্টাস হিকি

(খ) পীত সাংবাদিকতা

(গ) স্টিং অপারেশন

(ঘ) গোপনীয়তার অধিকার

(ঙ) রাষ্ট্রের নজরদারি

(চ) রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সনদ

(ছ) গোপীনয়তার অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি

(জ) রিজয়েণ্ডার (Rejoinder)

(ঝ) পেইড নিউজ

১.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. *Norms of Journalistic Conduct (2010)* — Press Council of India

২. *Ethical Guidelines for Journalists* — United Nations Communications Group (UNG), Afghanistan (Dec' 2016)

৩. *Guidelines for Reporting on Violence Against Women* — IFJ

একক - ৩ ❑ পীত সাংবাদিকতা-চেকবুক সাংবাদিকতা-পেইড নিউজ- ফেক নিউজ— প্লেজিয়ারিজম

গঠন

১.৩.১ উদ্দেশ্য
১.৩.২ প্রস্তাবনা
১.৩.৩ পীত সাংবাদিকতা
১.৩.৪ চেকবুক সাংবাদিকতা
১.৩.৫ পেইড নিউজ
১.৩.৬ ফেক নিউজ
১.৩.৭ প্লেজিয়ারিজম
১.৩.৮ সারাংশ
১.৩.৯ অনুশীলনী
১.৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১.৩.১ উদ্দেশ্য

সারা বিশ্বে পুঁজিবাদ যত জাঁকিয়ে বসছে, ভোগবাদ তত মাথা-চাড়া দিচ্ছে এবং মানুষের নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে চলেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে এই মানবিক এবং পেশাদারি মূল্যবোধের অবক্ষয় তার করাল থাবা বসিয়েছে। গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতাও পেশা ও শিল্প হিসেবে এই অবক্ষয় থেকে বাঁচতে পারেনি। ভারতে জেমস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র হিসেবে নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সতর্ক-ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। মহাত্মা গান্ধী সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ে এক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। নিজের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থেকে বারবার নিজের লেখায় সাংবাদিকতায় নীতিনিষ্ঠতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে সাংবাদিকতা পেশা ও বাণিজ্যিক শিল্প হিসেবে বিকশিত হয়।

অন্যান্য শিল্পের মতই ভয়ংকর এক প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং জনপ্রিয়তার লড়াইয়ে টিকে থাকার দৌড়ে পাল্লা দিয়ে শুরু হয় নীতি ও মূল্যবোধের সাথে সমঝোতা বা 'কম্প্রোমাইস'। সাম্প্রতিককালেও এই সমঝোতার নানাবিধ ভয়ংকর রূপ সামনে এসেছে। বর্তমান এককে এরকমই কিছু সাংবাদিকতার সাম্প্রতিক ধারা উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হল দুটি — ইতিহাসকে জানা, নেতিবাচক ইতিহাসও জানা প্রয়োজন এবং নিজস্ব ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে বর্ণিত ঘটনাগুলিকে যাচাই করে মতামত গঠন করা যাতে পরবর্তীকালে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকা যায় এবং এই নেতিবাচক পদ্ধতিগুলিকে পরিহার করা যায়।

১.৩.২ প্রস্তাবনা

এই পর্বে আমরা পীত সাংবাদিকতার উদ্ভব ও বিকাশ-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ফিরে দেখতে চাইব। ''পীত'' বা Yellow সাংবাদিকতার শিকড় আমেরিকায়। শব্দটির তাৎপর্য নানা লোকে নানারকম ব্যাখ্যা করেছে। তবে সর্বাধিক

গ্রহণযোগ্য হল যে নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড ও নিউ ইয়র্ক জার্ণাল, এই দুটি সংবাদপত্রেই প্রকাশিত কমিক স্ট্রিপ 'দ্য ইয়েলো কিড' থেকেই ইয়েলো বা পীত সাংবাদিকতার উৎপত্তি। বস্তুতঃ এই দুই সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা থেকেই পীত সাংবাদিকতার ধারা শুরু হয়। নিউ ইয়র্ক প্রেস-এর সম্পাদক আরউইন ওয়ার্ডম্যান এই কথাটির প্রণেতা।

১৮৮৩ সালে জোসেফ পুলিৎজার 'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' সংবাদপত্রটি কিনে নেন। পুলিৎজার চেয়েছিলেন যে এই সংবাদপত্রটি মূলতঃ বিনোদনমূলক হোক। তাই ছবি, গেমস, প্রতিযোগিতা অপরাধমূলক প্রতিবেদন ইত্যাদি নানাবিধ চিত্তাকর্ষক বিষয় দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন এই সংবাপত্রকে। শীঘ্রই এই সংবাদপত্র জনপ্রিয়তার শীর্ষ চলে আসে। যদিও প্রভূত সমালোচনার শিকারও হন পুলিৎজার।

'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড'-এর জনপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উইলিয়াম র‍্যাণ্ডল্‌ফ হার্স্ট ১৮৮৭ সালে 'সান ফ্রান্সিসকো এগজামিনার' সংবাদপত্রটি পারিবারিক সূত্রে অধিগ্রহণ করেন এবং অপরাধ, যৌনতা এবং উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এগজামিনার-এর সাফল্য প্রাণিত হার্স্ট ১৮৯৫ সালে কিনে নেন 'নিউ ইয়র্ক জার্ণাল' এবং পুলিৎজারের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। দুই সম্পাদক কাগজের দাম এবং বিষয়বস্তু নিয়ে নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালান। একে অন্যের বিজ্ঞাপনে ভাগ বসান এবং সাংবাদিকদের বেশি মাইনের প্রলোভন দেখিয়ে নিজের দিকে টেনে নেন। এই রেষারেষির ফলেই জন্ম নেয় দুটি একই রকমের 'ইয়েলো কিড' কমিক স্ট্রিপ। দুই কাগজেই পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে 'সেনসেশনালিজম' অর্থাৎ দুপক্ষই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টায় একটি ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে পরিবেশন করার প্রচেষ্টা করতে থাকে। এর ফলে ঘটনা বস্তুনিষ্ঠতা ও সত্যতা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে এবং এই অতিরঞ্জনের জন্য ক্রমশ নীতির অবক্ষয় ঘটতে থাকে। এমনকি বিশ্বাসযোগ্য সূত্র ছেড়ে সাংবাদিকেরা 'এক্সক্লুসিভ' সংবাদের নেশায় গুজবের ভিত্তিতে খবর করে দিচ্ছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় আরও একটি ধারা যুক্ত হল — ব্যক্তি গোপনীয়তার লঙ্ঘন। এই ধারাতে এতটাই বাড়াবাড়ি হয় যে এরই প্রতিরোধে ১৮৯০ সালে স্যামুয়েল ওয়ারেণ এবং লুই ব্র্যাণ্ডেস প্রকাশ করেন তাদের বিখ্যাত 'দ্য রাইট টু প্রাইভেসি'। এই অতিরঞ্জন চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছায় ১৮৯৫ সালে যখন কিউবাতে বিদ্রোহ ঘোষণা হয় এবং স্পেন তাকে দমন করার চেষ্টা করে। এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন পুলিৎজার এবং হার্স্ট-এর কাগজে এক উত্তেজনাপূর্ণ এবং অসত্য সংবাদ পরিবেশন করে যে তাতে সাধারণ মানুষ তো বটেই, সরকারও বিভ্রান্ত হয়। শেষ পর্যন্ত যে স্পেন-মার্কিন যুদ্ধ লাগে তার পেছনে এই পীত সাংবাদিকতার যথেষ্ট অবদান ছিল।

এই প্রবণতা সারা বিশ্বের সাংবাদিকতায় কম-বেশি ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডে এর নাম হয় 'ট্যাবলয়েড জার্নালিজম'। ট্যাবলয়েড সাধারণত দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রকাশিত বিস্তারিত সংবাদপত্র যেখানে মূলত চাঞ্চল্যকর সংবাদ থাকে। এই সংবাদেরও সত্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সংশয় আছে।

১.৩.৩ পীত সাংবাদিকতা

পুলিৎজার-হার্স্ট যুদ্ধের বিশ্লেষণ করেছেন অনেক সমাজবিজ্ঞানী। এঁদের মধ্যে আছেন যোসেফ ক্যাম্পবেল এবং ফ্রাংক লুথার। এঁদের বিশ্লেষণ থেকে যে বিষয়গুলি উঠে আসে তা হল—

১। অনাবশ্যক বৃহদাকার শিরোনাম।

২। ছবির ব্যবহার প্রশস্ত, কখনো কাল্পনিক রেখাচিত্রর।

৩। মিথ্যা/ভুয়ো সাক্ষাৎকার, বিভ্রান্তকারী শিরোনাম, ভ্রান্ত দাবি এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি।

৪। রবিবারে সম্পূর্ণ রঙিন সাপ্লিমেন্ট, কমিক স্ট্রিপ সহ।

৫। ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা।

১.৩.৪ চেকবুক সাংবাদিকতা

১৯৭৮ সালে লন্ডনের একটি হাসপাতালে বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি জন্ম নেয়। যখন সংবাদমাধ্যম বাবা-মা'র সাক্ষাৎকার নিতে চায়, তখন তাঁরা শর্ত দাবি করেন এবং শুরু হয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে রেষারেষি, যা প্রায় নিলামের পর্যায়ে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত 'ডেইলি মেল' ৬০,০০০ ডলারে বাজিমাৎ করে। অর্থের বিনিময়ে সংবাদ সংগ্রহের যে পদ্ধতি তাকেই 'চেকবুক জার্নালিজম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাধারণত সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে এই অর্থ কোনও ব্যক্তিকে দেওয়া হয় বিশেষ কিছু তথ্য পাইয়ে দেওয়ার জন্য।

রাজতন্ত্রের সময় থেকেই ইউরোপে খবরের সূত্রকে অর্থ দেওয়ার প্রচলন। রাজ্যশাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি পরবর্তীকালে সাংবাদিকতায় চলে আসে। শিক্ষার প্রসারের সাথে সংবাদপত্র এক বৃহৎ শিল্পের আকার ধারণ করে। প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিটি সংবাদপত্রই নতুন, এক্সক্লুসিভ খবর সংগ্রহে মরিয়া। ট্যাবলয়েড, পীত সাংবাদিকতা, অতিরঞ্জন এই সব যত আমদানি হল, তত উত্তেজক, আকর্ষণীয় খবরের খোঁজ হল তীব্র। এইখানেই নীতিভ্রষ্ট হওয়ার হাতছানি এল সাংবাদিকদের কাছে। অর্থের বিনিময়ে খবর কেনার প্রলোভন হল জোরদার।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে পদ্ধতি বহুকাল ধরে আছে, তা অনৈতিক হবে কেন? টাকা দিয়ে খবর কিনলে অসুবিধা কী আছে? এক কথায় এর উত্তর হয় না। প্রশ্নটা নীতির অবশ্যই, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি এই প্রসঙ্গে বিচারযোগ্য—

১। ইংল্যান্ড এবং ইউরাপে এই অর্থদানের বিনিময়ে খবর সংগ্রহের প্রচলন থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বের বহু দেশে একে অনৈতিক মনে করা হয়। USA এবং সেইসব দেশে সংবাদপত্রের প্রাতিষ্ঠানিক নীতিতে এই পদ্ধতি বারণ করা আছে।

২। অর্থের বিনিময়ে যে তথ্য পাওয়া যায় তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

৩। যেহেতু সোর্সকে টাকা দিলে এক ধরনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন হয়, এ পরিস্থিতি সাংবাদিককে বস্তুনিষ্ঠ থাকতে দেয় না।

৪। প্রকাশকের পক্ষপাতহীন থাকা উচিত। এক্ষেত্রে তার সাথে সোর্সের স্বার্থের সংঘাত ঘটছে।

৫। প্রথাগত সংবাদপত্রের চেয়ে ট্যাবলয়েডগুলি এইভাবে খবর সংগ্রহ করতে আগ্রহী বেশি, কারণ তাদের তাগিদ থাকে রোমাঞ্চক সংবাদ পরিবেশন করার।

৬। চেকবুক জার্নালিজম্-এর ফলে বিখ্যাত মানুষদের গোপনীয়তা আক্রান্ত হচ্ছে। এবং মানুষ এক ধরনের নেতিবাচক নিষিদ্ধ দর্শন (পাবলিক ভয়ারিজম্)-এর জন্য লালায়িত হচ্ছেন।

৭। ভুল, ভ্রান্ত তথ্য অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করে প্রকাশ করায় বহু মানুষ, প্রতিষ্ঠান অহেতুক সমস্যায় পড়েছেন। যারা বিখ্যাত মানুষ, এর ফলে তাদের জনমানসে ভাবমূর্তি (public image)-এ জোর ধাক্কা খায়।

৮। এর ফলে সাংবাদিকতার মান নিম্নগামী হয়। কারণ, প্রতিবেদক কখনই আর কষ্ট করে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে যাবার তাগিদ পাবেন না।

৯। ইন্টারনেট-এর বিকাশের সাথে সাথে অনলাইন ডিজিটাল আর্কাইভ ও তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। ফলে

তথ্য এখন সুলভে পাওয়া যাচ্ছে অনলাইনে। যদিও কিছু ওয়েবসাইট/পোর্টাল-এ অর্থের বিনিময়ে তথ্য পাওয়া যায়, তবু তার হিসাব থাকে, টাকা কে দিল, কাকে দিল, সেটা রেকর্ডেড থাকে।

১০। বিশ্ব জুড়ে তথ্যের অধিকার আন্দোলন জোরদার হওয়ায়, বেশিরভাগ সরকারি তথ্যও এখন হাতের নাগালে। ভারতেও ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইন বলবৎ হয়েছে যদিও বেসরকারি ক্ষেত্রকে এর বাইরে রাখা হয়েছে।

১.৩.৫ পেইড নিউজ

চেকবুক জার্ণালিজম-এর মাধ্যমে অর্থ সংবাদ এবং সংবাদপত্রের মাঝে ঢুকে পড়েছে। আর 'পেইড নিউজ' 'চেকবুক'-এর বিপরীত ক্রিয়া। অর্থাৎ এখানে সাংবাদিক অথবা সংবাদ সংস্থাকে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে যাতে কোনও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে একেটি সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এখানে বলাই বাহুল্য, যে যিনি অর্থ দিচ্ছেন, তিনিই ঠিক করে দেবেন যে সংবাদের দৃষ্টিকোণ ঠিক কী হবে, কোন বিষয় নিয়ে কী ধরনের আলোচনা হবে, কার বিপক্ষে যাবে, কার স্বপক্ষে যাবে অর্থাৎ এই সংবাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অর্থপ্রদানকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী সংবাদ প্রকাশ করে জনমত প্রভাবিত করার চেষ্টা করা। অনেক সময়ই এই প্রক্রিয়া একটি মাত্র সংবাদে থেমে থাকে না, বরং ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশ হতে থাকে।

কারা অর্থ দিচ্ছেন?

অর্থের বিনিময়ে নানাবিধ অন্যায় সুযোগ সুবিধা নেবার যে প্রক্রিয়া, তার শিকড় অনেক গভীরে এবং বহু প্রাচীন। এখান থেকেই আমরা 'উৎকোচ', পরর্বতীকালে 'ঘুষ' এবং 'দুর্নীতি' কথাগুলি পাই এবং সমাজে তার প্রভাব দেখতে পাই। একথা ঠিক যে ভারতে সাংবাদিকতার প্রসার ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতা এবং সমাজ সংস্কারের পুণ্য ও পবিত্র লক্ষ্য থেকেই হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শিল্প-বাণিজ্য এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশের সাথে সাথে শিক্ষারও বিকাশ ঘটে এবং সংবাদপত্রের সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি পেল, ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারালেন যে সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে জনমতকেও প্রভাবিত করা যায়। তারপরই অর্থের বিনিময়ে, কখনোও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে ইচ্ছে মতো লিখিয়ে নেওয়া, ছাপিয়ে নেওয়ার এই পদ্ধতির বাড়বাড়ন্ত। ব্যবসায়ীক সংস্থার দরকার বিক্রি, মুনাফা, রাজনৈতিক দলের চাই ভোট, জনসমর্থন এবং সংবাদমাধ্যমের চাই বিজ্ঞাপন বা অন্য যে কোনও রূপে আর্থিক সহায়তা। এই তিন স্বার্থ চমৎকার ভাবে মিলে যায় 'পেইড নিউজ'-এ তাই রমরম করে চলছে এই ব্যাপারটি, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

২০০৯ পর্যন্ত এটি ছিল ভারতে 'ওপেন সিক্রেট'। ২০০৯-এর সাধারণ নির্বাচনে এক রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে দেশের এক শীর্ষ ইংরেজি সংবাদপত্রকে অর্থের বিনিময়ে নিজের স্বপক্ষে সংবাদ প্রকাশ করানোর। নির্বাচনের সময়ে এই ধরনের গুরুতর অভিযোগ নিয়ে স্বভাবতই অন্যান্য রাজনৈতিক দলও নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানান। নড়ে চড়ে বসে ভারতের প্রেস কাউন্সিল। একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে তারা এ নিয়ে তদন্ত করার জন্য। কমিটি এক সবিস্তার রিপোর্ট তৈরি করে কাউন্সিলে জমা দেয়। কিন্তু কাউন্সিল সেই রিপোর্ট পুরোপুরি প্রকাশ করেনি।

২০১০-এর জুলাইয়ে প্রকাশিত সেই রিপোর্টে এই কথা স্বীকার করা হয়েছে যে 'পেইড নিউজ' ভারতে এক উচ্চমানের সংগঠিত প্রক্রিয়া, যেখানে গণমাধ্যম তার 'স্পেস' এবং ইতিবাচক কভারেজ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে

দেয়। একথাও বলা হয়েছে যে ১৯৫০ থেকে এই প্রক্রিয়া চলছে। নগদ অর্থের পাশাপাশি 'শেয়ার'-এর বিনিময়েও এই পদ্ধতি চলছে।

তবে সরকারি রেকর্ড থেকে জানা যায় যে ২০০৯ থেকে ২০১৩-এর মধ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে 'পেইড নিউজ'-এর মোট ১,৪০০ অভিযোগ জমা পড়েছে। ২০১৮ সালে কোবরা পোস্ট ডট কম, একটি নিউজ পোর্টাল ভারতের শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া সংস্থাগুলিকে এক নির্দিষ্ট সংবাদ প্রকাশের জন্য অর্থ দিতে চাইলে, তারা এক কথায় রাজি হয়ে যান। এটি কোবরা পোস্ট-এর এক গোপন তদন্তমূলক অভিযান ছিল 'পেইড নিউজ'কে প্রমাণিত করার জন্য। এই অভিযানের থেকে স্পষ্ট হয় যে অর্থের জন্য ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সাম্প্রদায়িক সংবাদ সম্প্রচার করে ভারতের ভোটার মেরুকরণ করতেও একপায়ে খাড়া। কোবরা পোস্ট-এর অভিযান থেকে দেখা যায় যে সংবাদ সংস্থা ও গণমাধ্যমের নিচুতলা থেকে উপরতলা এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত।

১.৩.৬ ফেক নিউজ

ইংরেজী 'ফেক' কথাটার অর্থ নকল বা জাল। সেই অর্থে 'ফেক নিউজ' বলতে এমন সংবাদকে বোঝায় যাতে ভুল, অসত্য তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে অর্থাৎ এমন সংবাদ যা সত্য নয় বা যার সারবত্তা নেই। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, যদি সত্যই না হবে তাহলে 'নিউজ' হয় কি করে, অর্থাৎ 'ফেক' কথাটির সাথে 'নিউজ' কথাটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু এটাই ঘটনা যে সংবাদমাধ্যমে এই জাতীয় ভুল, ভ্রান্ত, সংবাদের প্রাচুর্য্য এবং আধিক্য বিদ্যমান। প্রতিনিয়ত শস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার লোভে চ্যানেলগুলি 'ব্রেকিং নিউজ' এবং 'এক্সক্লুসিভ' দিচ্ছে যেগুলি অধিকাংশই পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে সারবত্তাহীন অর্থাৎ 'ফেক'। এবং এর ফলে হয়রান হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কোনও বিশেষ বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে 'ফেক' নিউজের বাড়-বাড়ন্ত দেখা যায়। যেমন, সম্প্রতি কোরোনা ভাইরাস (Covid-19) সংক্রমণের আবহে এই সংক্রান্ত এত 'ফেক' সংবাদ বাজারে ছড়িয়েছে সংবাদপত্র, চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়ায় যে এ এক তথ্য অতিমারির (infodemic)-এর আকার ধারণ করেছে। কোরোনা সংক্রমণ সংক্রান্ত নানাবিধ 'ফেক' তথ্যের দাপটে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত এবং দিশাহীন, ঠিক কোনটা, ভুল কোনটা কিছুই তারা বুঝতে পারছেন না যেহেতু একই বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম ভিন্ন তথ্য, ভিন্ন মতামত সম্প্রচার করছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা 'ফেক'-কে দুইটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—

১। মিসইনফর্মেশন — অর্থাৎ ভুল তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

২। ডিসইনফর্মেশন — অসম্পূর্ণ, অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসাঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

উপরোক্ত দুটি নাম কোরোনা-কালের অবদান। কিন্তু এর আগেও 'ফেক' সংবাদকে অনেকরকম নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন, 'জাঙ্ক নিউজ', 'সিউডো নিউজ' (pseudo) 'হোক্স নিউজ' ইত্যাদি।

'৯০-এর দশকের বিশ্বায়ন ও তদ্দজ্জনীত স্যাটেলাইট প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বজুড়ে যে 'তথ্য সমাজ' বা 'Information Society'-র সৃষ্টি হয়েছে তাতে তথ্য এখন মানুষের হাতের নাগালে এসে গেছে। মাউসের এক ক্লিকে বা স্মার্টফোনে আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় আমরা যে কোনও অবস্থান থেকে যে কোনও তথ্যের নাগাল পেতে পারি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে একে অন্যের সাথে যুক্ত হতে পারি। চোখের নিমেষে একটি তথ্য হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকবাহিত হয়ে অসংখ্য লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। গণমাধ্যমের সংখ্যা প্রচুর, বিষয়বস্তু বা 'Content Generation'ও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এবং অন্তর্জালে তা উপলব্ধ। এইরকম পরিস্থিতিতে অনেক গণমাধ্যম বা ব্যক্তি জনপ্রিয়তা লাভের আশায় — ওয়েবসাইট-এ হিট, ইউটিউব-এ সাবসক্রাইব ও লাইক এবং হোয়াটস অ্যাপ-এ শেয়ার/

ফরওয়ার্ড-এর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য নানাবিধ আকর্ষণীয়, উত্তেজক কিন্তু ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন। অনেক সময় কম্পিউটার সফটওয়্যারের বা অ্যাপের সাহায্যে ভিডিও বা ফটোকে 'fabricate' বা পরিবর্তন করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে 'Media Literacy' বা গণমাধ্যম স্বাক্ষরতা (এক কথায় গণমাধ্যমের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সম্যক ধারণা) না থাকলে এই কারসাজি ধরা অসম্ভব। তাই 'ফেক নিউজ'-এর প্রসার ক্রমবর্ধমান। এই সামাজিক অবস্থা বা 'Post Truth Society'-তে ফেক নিউজ এক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফেক নিউজে ইতিপূর্বে আলোচিত সংবাদমাধ্যমের সমস্ত অনৈতিক উপাদনগুলি বিদ্যমান। অর্থাৎ ফেক নিউজ একাধারে পীত সাংবাদিকতারই নামান্তর, কারণ এর সূত্র হয় অবিশ্বস্ত, গুজব অথবা কল্পনা। এর মধ্যে 'Sensenationalize' বা উত্তেজক অথবা অতিরঞ্জন পুরো মাত্রায় আছে। কখনো কখনো 'পেইড নিউজ' এই 'ফেক নিউজ'-এর রূপে আসে। বেশিরভাগ 'পেইড নিউজ' মিথ্যাকে সত্যি বানানোর এক অপচেষ্টা। 'ফেক নিউজ'-কে সত্যের মতো পরিবেশন করতে গিয়ে কখনো মিথ্যা বক্তব্য, মিথ্যা সাক্ষী অথবা ভুয়ো ভিডিও/অডিও ফুটেজ/ক্লিপিংস্ ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে চেকবুক সাংবাদিকতার প্রয়োগও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

'ফার্স্ট ড্রাফট নিউজ'-এর ক্লেয়ার ওয়ার্ডল্ মোট সাত রকমের পেক নিউজ নির্ণয় করেছেন। সেগুলি হল :

১। প্রহসন/পারোডি — বোকা বানানোর জন্য, কৌতুকের

২। অসামঞ্জস্য/মিসলিডিং — শিরোনাম বা ছবির সাথে বিষয়বস্তুর কোনও মিল নেই।

৩। বিভ্রান্তি/কনফিউসন — কোনও বিষয় বা ব্যক্তিকে ভুল তথ্যের সাহায্যে বিকৃত করা।

৪। প্রেক্ষাপট/কনটেক্সট — সঠিক বিষয় ও তথ্যকে ভ্রান্ত প্রেক্ষাপটে পরিবেশন করা।

৫। সোর্স/সূত্র — মিথ্যা বা বানানো/সাজানো সূত্রের উল্লেখ করে সংবাদ পরিবেশন করা।

৬। Manipulated/Doctored/বিকৃতি — তথ্য বা ছবির বিকৃতি ঘটিয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন।

৭। Fabricated/সম্পূর্ণ ভুল — যখন সম্পূর্ণরূপে ভুল তথ্যকে ইচ্ছা করে পরিবেশন করা হয় মানুষকে ঠকানোর জন্য।

সামাজিক মাধ্যমে ফেক নিউজে অন্য স্থানের অন্য পারিপার্শ্বিকের ছবি ব্যবহার ধরে ফেলতে অন্তর্জালে বিভিন্ন পদ্ধতি এখন জনপ্রিয়। এর মাধ্যমে সত্যতা যাচাই করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

কেস স্টাডি/উদাহরণ

কোভিড-১৯ : দুনিয়া এখন কোভিড-১৯ বা কোরোনা ভাইরাস সংক্রমণের মধ্যে যাচ্ছে। এই সময় দেখা যাচ্ছে ফেক নিউজের বাড়বাড়ন্ত। হঠাৎই দেখা গেল, সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়াচ্ছে যে এই ভাইরাস চীন থেকে এসেছে এবং একে 'চায়না ভাইরাস' বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এরপর এল একটি অডিও ক্লিপ যেখানে চীন প্রবাসী ভারতীয় হিন্দি ভাষায় দাবি করলেন যে গরমজল এবং চা খেলে নাকি কোরোনা সংক্রমণ ঠেকানো যাবে। তারপর এক সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল যে সরকার বলেছে মাস্ক পরার কোনও দরকার নেই। বলাই বাহুল্য, এই তিনটি বিষয়ের একটির স্বপক্ষেও কোনও সরকারি বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ICMR-ও এই বক্তব্য সমর্থন করেনি। কিন্তু এই সব বিভ্রান্তিকর সংবাদে সমাজে যারপরনাই বিশৃঙ্খলা, প্যানিকের সৃষ্টি হয়। মানুষ ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন বিভিন্ন চ্যানেল ও সংবাদপত্রের নানারকমের কভারেজ দেখে।

১.৩.৭ প্লেজিয়ারিজম (PLAGIARISM)

কারুর মৌলিক লেখাকে নিজের নামে প্রকাশ করার যে অনৈতিক এবং অবৈধ অভ্যাসকে 'প্লেজিয়ারিজম' বলা হয়। এক্ষেত্রে লেখার মধ্যে লেখকের ভাষা এবং চিন্তাভাবনার মৌলিকত্বও থাকে। এর উৎপত্তি মূলতঃ গবেষণা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে। দেখা গেছে যে কারুর মৌলিক গবেষণা পত্রকে হুবহু বা বহুলাংশে আরেকজন নিজের নামে ছেপেছেনে। এক্ষেত্রে আকাদেমিক মহলে কিছু শাসিত বিধান আছে। এমফিল ও পিএইচডির মতো ডিগ্রি প্লেজিয়ারিজম-এর দায়ে প্রমাণিত হলে খারিজ পর্যন্ত হয়ে যায়।

সাংবাদিকতার জগতেও প্লেজিয়ারিজম-এর আধিক্য সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে। একটি প্রতিবেদন থেকে সম্পূর্ণ টুকে এক সাংবাদিক নিজের নামে ছেপেছেন। এ তো সম্পূর্ণ অনৈতিক বটেই এবং যদি যেখান থেকে টুকেছেন তার কপিরাইট থাকে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সাম্প্রতিককালে গণমাধ্যমের বৃদ্ধি বিশেষত ২৪ ঘণ্টার সংবাদ চ্যানেল এবং অনলাইন পোর্টালগুলিতে বিষয়বস্তু বা কন্টেন্ট-এর চাহিদা খুব বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন সাংবাদিকরা। অনেকেই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট লেখা তৈরি করতে না পেরে 'প্লেজিয়ারিজম'-এর পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। এখন ইন্টারনেটে কনটেন্ট প্রচুর এবং সেখান থেকেই বেশিরভাগ প্লেজিয়ারিজম হয়। প্লেজিয়ারিজম'-এর জন্য বহু সাংবাদিকের চাকরি চলে গেছে। প্রায় সব সংবাদসংস্থাই তাদের প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, নিয়ম কানুনে 'প্লেজিয়ারিজম'-এর জন্য কড়া শাস্তির বিধান রেখেছে।

প্লেজিয়ারিজম নানাবিধ আছে, যেমন—

১। আংশিক প্লেজিয়ারিজম — কিছুটা নিজের কিন্তু বেশির ভাগই অন্য কারুর লেখা থেকে টোকা।

২। সম্পূর্ণ প্লেজিয়ারিজম — অন্য কারুর লেখা সম্পূর্ণ নিজের নামে চালানো।

৩। ইচ্ছাকৃত প্লেজিয়ারিজম — ব্যক্তি জেনে বুঝে সজ্ঞানে টুকেছেন।

৪। অনিচ্ছাকৃত প্লেজিয়ারিজম — ব্যক্তি বুঝতে না পেরে অথবা নিজের অজান্তে অন্য কারো লেখাকে নিজের লেখায় জায়গা দিয়েছেন।

প্লেজিয়ারিজম কেন অনৈতিক?

একজন মানুষ তার বিচার-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিবেচনা ও গবেষণার লব্ধ ফলকে অত্যন্ত কষ্টে এক জায়গায় করে একটি লেখা (প্রবন্ধ/গল্প/উপন্যাস/গবেষণাপত্র) তৈরি করেন। তার বিনা অনুমতিতে তার লেখা টুকে আরেকজন নিজের নামে ছাপালেন। এতে যিনি টুকলেন তিনি আসল লেখককে তো ঠকালেনই, যে মানুষেরা তার লেখা পড়লেন তাদেরও ঠকালেন। এবং যদি এই কাজ করে তিনি কোনও উপাধী, যশ বা অর্থ পান তাহলে তো তা সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বলিউড-এ সঙ্গীত পরিচালকদের বিরুদ্ধে সুর চুরির অভিযোগ এসেছিল।

কিভাবে প্লেজিয়ারিজম এড়ানো যায়?

প্লেজিয়ারিজম এড়ানোর সবচাইতে ভালো পন্থা হল যেখান থেকে আপনি তুলে নিজের লেখায় দিচ্ছেন, সেই সূত্রকে স্বীকৃতি দিন। অর্থাৎ পরিষ্কার করে উল্লেখ করতে হবে কোন অংশটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে। আকাদেমিক গবেষণার ক্ষেত্রে একে 'Citation' এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একে 'Referencing' বলা হয়। এরও নির্দিষ্ট কায়দা আছে যা শিখে রাখাও সাংবাদিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

তাছাড়া আজকাল Turnitin, Urkund এবং Grammarly-র মত শত শত কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং মোবাইল অ্যাপ বেরিয়ে গেছে যেখানে খুব সহজেই প্লেজিয়ারিজম চেক বা সংশোধন করা যায়। সাংবাদিকরা কিন্তু অনেকেই এই সব পদ্ধতি না মেনে সহজেই কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সাহায্যে বলীয়ান হয়ে 'কাট, কপি, পেস্ট' অর্থাৎ টুকে মেরে দিচ্ছেন। এতে আখেরে তাঁর নিজের এবং তার সংস্থার মর্যাদাহানি হবে। সাম্প্রতিককালে প্লেজিয়ারিজমকে কেন্দ্র করে বহু অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ চাপান-উতোর চলছে এবং অভিযুক্ত মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা একটা ধাক্কা খায়।

অনেক সাংবাদিক নিজেদের পুরানো ছাপা লেখাকেই সামান্য পরিবর্তন করে নতুন করে ছাপিয়ে দেন। এই কাজও 'self plagiarism'-এর মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রেও সাংবাদিকের নিজের পুরনো লেখার রেফারেন্স দিতে হবে।

নীতিমালা

বর্তমান এককে যথাক্রমে আলোচিত হয়েছে যে বিষয়গুলি তার সবকটিই সাংবাদিকতা পেশার ব্যবহারিক দিকের সাথে যুক্ত। সাংবাদিকতার পেশাদারি আচার সংহিতায় এ নিয়ে কি আছে তা দেখা যাক—

(ক) **পীত সাংবাদিকতা :** ভারতের প্রেস কাউন্সিলের নীতিমালায় ১ ও ২নং পয়েন্টে যথাক্রমে বস্তুনীষ্ঠতা এবং প্রাক্-প্রকাশ তথ্য যাচাই-এর কথা বলা আছে। সেক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার যে পীত সাংবাদিকতা যেহেতু অতিরঞ্জিত এবং উত্তেজক, তা কখনোই বস্তুনীষ্ঠ হতে পারে না। পীত সাংবাদিকতা বহুলাংশেই গুজব ও কল্পনার ওপর নির্ভরশীল ফলে এখানে সংবাদ সূত্র ও তথ্য যাচাই করার কোনও সুযোগ নেই। এছাড়া ৩ নং পয়েন্টে যা কিছু মানহানিকর তা না ছাপতে বলা হয়েছে কিন্তু অনেক সময়ই পীত সাংবাদিকতা ট্যাবলয়েডের মূল অবলম্বন এবং এর দ্বারা ব্যক্তি ও সংস্থার সম্মানহানি ঘটে।

(খ) **চেক বুক সাংবাদিকতা :** যদিও ইংল্যান্ড ও ইয়োরোপে চেক বুক সাংবাদিকতা নিয়ম ও নীতিসঞ্জাত। আমেরিকা, ভারত সহ বহু দেশে তা নয়। বৃহৎ সংবাদপত্র যেমন 'লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস' এবং 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স' তাদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে একে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। 'সোসাইটি পর প্রফেশনাল জার্নালিস্টস' (SPJ) তাদের আচার সংহিতায় এই পদ্ধতিকে অনৈতিক ঘোষণা করেছে কারণ প্রথমতঃ এতে খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না এবং দ্বিতীয়তঃ এতে স্বার্থের সংঘাত ঘটে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে। এতে সূত্র ও সাংবাদিকের মধ্যে এক ব্যবসায়িক সম্পর্কের সূত্রপাত হয় যা সাংবাদিকতা পেশার শক্তিকে দুর্বল করে।

(গ) **পেইড নিউজ :** 'সোসাসটি ফর প্রফেশনাল জার্নালিস্টস' (SPJ) আচার সংহিতায় 'Act Independently' বা 'স্বাধীনভাবে কাজ করুন' বিভাগে সংবাদ বা তথ্যের জন্য কোনও রকম অর্থ, সুযোগ-সুবিধা গ্রহণকে অনৈতিক বলা হয়। এই কাজ পেশাদারি আচরণ-এর লংঘন। একই কথা Editor's Guild এবং ভারতের প্রেস কাউন্সিল-এর আচার সংহিতায় (নং ২৮ ও ৩০)-এ বলা আছে।

(ঘ) **প্লেজিয়ারিজম :** ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রদত্ত আচার সংহিতার (২০১০) ২৮ নং পৃষ্ঠায় ৩২, ৩৩ ও ৩৪ নং পয়েন্ট প্লেজিয়ারিজম্-এর ঘটনা ও ক্রিয়াকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অনৈতিক বলা হয়েছে। অন্যের আইডিয়া বা লেখাকে স্বীকৃতি না দিয়ে নিজের বলে চালানো, কপিরাইট লংঘন, অন্য সংবাদপত্রের প্রতিবেদন টোকা, অনুমতি ছাড়া কোনও পুনঃপ্রকাশ এ সবই সাংবাদিকের পেশাদারী আচরণের পরিপন্থী।

১.৩.৮ সারাংশ

এই এককটি মূলত সাংবাদিকতার অনৈতিক যে অভ্যাস বা ধারা চলছে তার বর্ণনা দিয়েছে। পীত সাংবাদিকতা, চেক বুক সাংবাদিকতা, পেইড নিউজ, ফেক নিউজ এবং প্লেজিয়ারিজম, এসব কটিই একে অন্যের দোসর এবং একটি আসলে

অন্যটিও সহজেই আসে। একজন সচেতন, আত্মনির্ভর, সৎ এবং পেশাদারী সাংবাদিক কখনওই এই বদ অভ্যাসগুলি অনুশীলন করবেন না। তিনি এই শর্টকাটে সাফল্য পাওয়ার রাস্তা পরিহার করে বরং নিজের সাংবাদিকতার শক্তি ও ক্ষমতায় শান দেবেন এবং কঠোর পরিশ্রম-এর মাধ্যমে নিজের জায়গা পোক্ত করবেন। কারণ, অনৈতিক পদ্ধতিতে পাওয়া সাফল্য চিরস্থায়ী হয় না। তবে, এ কথা অনস্বীকার্য যে দিনে দিনে যে ভাবে সংবাদ ও গণমাধ্যম সংস্থাগুলির মধ্যে যে ভাবে প্রতিযোগিতা বাড়ছে তাতে সাংবাদিকদের ওপর ভয়ংকর চাপ বাড়ছে এবং অনৈতিক পথে যাওয়ার হাতছানিও বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষিত ও নীতিসম্পন্ন সাংবাদিকের শুভবুদ্ধি ও দায়িত্ববোধের ওপরেই সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে, শুধুমাত্র আচার সংহিতা যথেষ্ঠ নয়।

১.৩.৯ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন।

(ক) পীত সাংবাদিকতার ইতিহাস বর্ণনা করুন এবং এর সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ উল্লেখ করুন।

(খ) 'চেক বুক সাংবাদিকতা সম্পূর্ণরূপে অনৈতিক নয়' — যুক্তিসহ আপনার মতামত লিখুন।

(গ) 'পেইড নিউজ এক ওপেন সিক্রেট' — সাম্প্রতিক ধারা বর্ণনা করুন এবং এ ব্যাপারে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

(ঘ) 'কোভিড-১৯ এর সময় এক বৈশিষ্ট্য হল ইনফোডেমিক' — এই ইনফোডোমিক প্রসঙ্গে 'ফেক নিউজ-এর ভূমিকা বর্ণনা করুন।

২। টীকা লিখুন :

(ক) জোসেফ পুলিতজার
(খ) উইলিয়াম র‍্যাণ্ডলফ হার্স্ট
(গ) পীত সাংবাদিকতা
(ঘ) ট্যাবলয়েড
(ঙ) চেক-বুক সাংবাদিকতা
(চ) পেইড নিউজ
(ছ) ফেক নিউজ
(জ) ইনফোডেমিক
(ঝ) প্লেজিয়ারিজম
(ঞ) স্বার্থের সংঘাত

১.৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. *Ethics in Journalism* — Ron F Smith (Black well)

২. *Media and Ethics* — S. K. Aggarwal (Shipra)

৩. *সংবাদ প্রতিবেদন* — বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৪. *সংবিধান ও প্রেস আইন* : ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক ৪ ❑ গণমাধ্যমের মালিকানা ও নৈতিক প্রসঙ্গ-ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রদত্ত নীতিমালা

গঠন

১.৪.১ উদ্দেশ্য
১.৪.২ প্রস্তাবনা
১.৪.৩ গণমাধ্যমের মালিকানা ও নৈতিক প্রসঙ্গ
১.৪.৪ **Ombudsman**
১.৪.৫ ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রদত্ত নীতিমালা
১.৪.৬ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার আচার সংহিতা
১.৪.৭ ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত নীতিমালা
১.৪.৮ সারাংশ
১.৪.৯ অনুশীলনী
১.৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১.৪.১ উদ্দেশ্য

ইতিপূর্বে আমরা বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেছি গণমাধ্যমের নীতিগত দিক নিয়ে। এই এককে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। গণমাধ্যমের মালিকানা কার; কত প্রকারের এবং কীভাবে তার ধারা পরিবর্তন হচ্ছে। মালিকানার সাথে নীতি-র বিষয়টি কীভাবে যুক্ত এবং তা কীভাবে সাংবাদিকতার পেশাগত, সিদ্ধান্তগত এবং ব্যবহারিক দিক-কে প্রভাবিত করছে তা সম্যক বোঝা এই এককের উদ্দেশ্য। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থা, যেমন, ভারতের প্রেস কাউন্সিল, এডিটরস গিল্ড, সোসাইটি ফর প্রফেশনাল জার্নালিস্টস ইত্যাদি সাংবাদিকদের জন্য নীতিমালা বা 'কোড অফ এথিক্স' প্রণয়ন করেছেন। সেগুলো জানা দরকার সাংবাদিকতা শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে। ভারতের নির্বাচন কমিশনও নির্বাচনে সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশিকা জারি করেছেন। বর্তমান এককের উদ্দেশ্য সাংবাদিকতার ছাত্রছাত্রীদের পেশাদারি আচার-আচরণ এবং নীতিগত বিষয়গুলি বিষয়ে সম্যক অবহিত করা।

১.৪.২ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল ব্যক্তি-সম্পাদকের হাত ধরে। যারা মূলত একটি সংবাদপত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, উপার্জনের তাগিদেই হোক বা সমাজ সংস্কারের জন্য। প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'-এর সম্পাদক জেমস্ হিকি মূলত পেশাগত ভাবেই কাগজ শুরু করেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের মতো মানুষের লক্ষ্য ছিল অন্য — তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে সমাজে তাঁর মতামত এবং আলোচনার উদ্দেশ্যেই সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সমাজসংস্কারেই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীকালে আমরা দেখছি, অনেকেই ভারতকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র প্রকাশ করছেন। যেমন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' অথবা বাল গঙ্গাধর তিলক-এর 'মারাঠা' ও 'কেসরি'। মহাত্মা গান্ধী যখন 'Young India' বা 'হরিজন' প্রকাশ করেন তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বার্থ জনমানসে তুলে ধরা, ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে এবং সত্যাগ্রহের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলা। সমাজ সংস্কার সর্বদাই প্রাক-স্বাধীনতা যুগে সংবাদপত্রের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এবং তার সাথে স্বাভাবিক

ভাবেই, এসেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুষঙ্গ। নেহরু, সুভাষচন্দ্র, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলানা আজাদ, অ্যানি বেসান্ত — ভারতের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সংবাদপত্রকে নিজের সংযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

অর্থাৎ, যতদিন সংবাদপত্রে ব্যক্তি মালিকানা ছিল, বিশেষত প্রাক-স্বাধীনতা যুগে, তার এক ‘‘মিশনারি’’ বা সেবামূলক, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ছিল উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতার সাথে সমাজে সংবাদপত্রের প্রভাব বাড়তে শুরু করল। আমরা পেলাম বৃহৎ সংবাদপত্র — অমৃতবাজার, বসুমতী, আনন্দবাজার, দ্য স্টেটসম্যান, দ্য টাইমস্ অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে সংবাদপত্র বৃহৎ শিল্পে পরিণত হল — শুধুমাত্র ব্যক্তির পক্ষে আর এই বৃহৎ সংস্থা চালানো সম্ভবপর ছিল না। তাই যে কোনও ব্যবসায়িক সংস্থার মতই পার্টনারশিপ, জয়েন্ট স্টক এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ধাঁচে আত্মপ্রকাশ করল বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা। ভারত সরকার আগেই অল ইন্ডিয়া রেডিও অধিগ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে তারা চালু করে দূরদর্শন। সরকারি মালিকানায় গণমাধ্যম নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়।

এরপর বড় পরিবর্তন আসে ’৯০-এর দশকের গোড়ায় বিশ্বায়নের মাধ্যমে। মুক্ত অর্থনীতির আবহে ‘স্টার টিভি’-র মতো বিদেশি কোম্পানি এবং ‘জিটিভি’-র মতো শত শত দেশি কোম্পানি বা নেটওয়ার্ক মিডিয়া বাজারে ঢুকল। বর্তমানে গণমাধ্যমে ‘ক্রস মিডিয়া’ মালিকানা বা ‘কর্পোরেট মালিকানা’-য় ভরে গেছে। একটি বিশেষ কোম্পানি/ গ্রুপ-এর ছত্রছায়ায় আছে সব রকমের গণমাধ্যম — সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, রেডিও, পোর্টাল ইত্যাদি। যেমন, এবিপি গ্রুপ-এর অধীনে আনন্দবাজার পত্রিকা, এবিপি আনন্দ, এবিপি নিউজ, সানন্দা, আনন্দলোক ইত্যাদি। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য নাম ইন্ডিয়া টুডে গ্রুপ, সান গ্রুপ, জি গ্রুপ, সোনি গ্রুপ ইত্যাদি।

বদলে যাওয়া মালিকানা, অভিমুখ-এর ফল যে সাংবাদিকতার নীতির জন্য খুব সুখকর হয়নি তা বলাই বাহুল্য। মুনাফাই যেখানে মূল উদ্দেশ্য সেখানে নীতি বারংবার বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। উল্টো দিক থেকে অবশ্য কিছু প্রয়াস হয়েছে ব্যক্তি সাংবাদিক বা সরকারের পক্ষ থেকে। পরবর্তী অংশে আমরা মালিকানার ধরণগুলি এবং নীতির বিষয়গুলি একটু বিশদে ব্যাখ্যা করব।

গণমাধ্যম মালিকানার সাম্প্রতিক ধারা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে ব্যক্তিগত মালিকানা সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম সংস্থার ক্ষেত্রে সবচাইতে প্রসঙ্গত। ভারতের প্রথম কাগজ থেকেই ব্যক্তি মালিকানার চল, এখনো চলে আসছে। তবে তার ধরণ পাল্টেছে, সাংগঠনিক কাঠামো পাল্টেছে, পরিচালন পদ্ধতি পাল্টেছে এবং পরিচালনায় অনেক পেশাদারিত্ব এবং কর্পোরেট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে যেহেতু সংবাদমাধ্যমের ‘রাজস্ব’ বা ‘রেভেনিউ’-এর ‘মডেল’ বা ‘পদ্ধতি’-এর বিরাট দর্শনগত পরিবর্তন ঘটে গেছে যার জন্য এই পরিচালন পদ্ধতি বা মালিকানার চরিত্র পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

গান্ধীজি সর্বদাই চেয়েছেন সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনের সাহায্য ছাড়া চলুক। তিনি চাইতেন সংবাদপত্র শুধুমাত্র পাঠক আনুকূল্যে অর্থাৎ সার্কুলেশনের জোরে বেঁচে থাকবে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে গণমাধ্যমের মালিকানার সাবেকি রূপ সংবাদপত্রের বিকাশের সাথে যে মালিকানার রূপগুলি প্রচলিত এবং সেগুলি হল—

(১) **ব্যক্তিগত মালিকানা :** একজন ব্যক্তি যখন সম্পূর্ণ মালিক; আজকাল অনেক ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক নেতাও সংবাদপত্রের মালিক।

(২) **অংশীদারী মালিকানা :** দুই বা তার অধিক ব্যক্তি চুক্তির ভিত্তিতে সংবাদপত্র চালানো। অংশীদারী মালিকানার সীমানা নির্ধারিত থাকে, সিদ্ধান্তে মতপার্থক্য থাকে, লাভ-ক্ষতির পরিমাণ সবাই ভাগ করে।

(৩) **কর্পোরেশন :** বিনিয়োগকারীদেরও শেয়ারের ক্রয়ের টাকা পুঁজি করে ব্যবসায়িক কাঠামোয় চলে। যে কোনও সময়ে সম্প্রসারণ করা যায় মূলধন বাড়িয়ে এবং বাজারে শেয়ার ছাড়া যায়। তবে সরকারি নিয়মকানুনের

নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হয়।

(৪) **গোষ্ঠি (Group) মালিকানা :** একটি মালিকের অধীনে যখন অনেকগুলি সংবাদপত্র থাকে তখন তাকে গ্রুপ বা গোষ্ঠি মালিকানা বলা হয়। যেমন, বেনেট এন্ড কোলম্যান গ্রুপের অধীনে আছে দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, নবভারত টাইম্‌স, ইকনমিক টাইমস প্রভৃতি। এতে প্রযোজনা ব্যয় অনেকটাই কমিয়ে আনা যায়।

(৫) **কর্মচারি (employee) মালিকানা :** এই ব্যবস্থায় কর্মচারিরা সংস্থার শেয়ার কিনে মালিকানায় অংশগ্রহণ করেন। কখনও শেয়ার অধিগ্রহণ করে কর্মচারিরা ব্যবসায় অংশগ্রহণ করেন নির্দিষ্ট শর্তে। তবে এর নিদর্শন বিরল।

সংবাদপত্রের সাথে বিজ্ঞাপন শিল্পের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে এবং সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন বৃহৎ ব্যবসায়িক স্বার্থে একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেরাও শিল্পে পরিণত হল। কালে কালে বিজ্ঞাপনই সংবাদ মাধ্যমে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট গৌণ। যার যত বেশি পাঠক বা দর্শক সংখ্যা তার তত বেশি বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ এখানে এক অদ্ভুত ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে গণমাধ্যম, উপভোক্তা এবং বিজ্ঞাপনদাতার মধ্যে যা আজকের নতুন রেভেনিউ মডেলের কাঠামো এবং কর্পোরেট মালিকানা ও পরিচালন ব্যবস্থার কাজই হচ্ছে এই কাঠামোকে পুষ্ট করা এবং তার মাধ্যমে যত বেশি মুনাফা আয় করা যায় তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

১.৪.৩ গণমাধ্যমের মালিকানা ও নৈতিক প্রসঙ্গ

এইখানে আমরা গণমাধ্যমের বিভিন্ন মালিকানা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব—

১। **চেন মালিকানা :** এই ব্যবস্থায় একটি কোম্পানি অনেকগুলি একই ধরনের গণসাধ্যমের মালিকানা হাতে রাখে অর্থাৎ একাধিক/অনেকগুলি সংবাদপত্র, রেডিও স্টেশন, টেলিভিশন স্টেশন অথবা প্রকাশনী। সাধারণত সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেই এটা ভারতে বেশি পাওয়া যায়। টাইমস অব ইন্ডিয়া, আনন্দবাজার, হিন্দু ইত্যাদি সংস্থার হাতে একাধিক প্রকাশনী আছে। দূরদর্শন ও আকাশবাণীর কাছেও প্রচুর স্টেশন আছে যদিও এগুলি সরকারের অধীন।

২। **ক্রস মিডিয়া মালিকানা (ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন) :** যদি কোনও কোম্পানি নিজের অধীনে নানা রকমের গণমাধ্যম রাখে অর্থাৎ সংবাদপত্র, ম্যাগাজিনের পাশাপাশি প্রকাশনী, সঙ্গীত লেবেল ইত্যাদি। এছাড়াও এর মধ্যে দেখা যায় বিষয়বস্তু, বাহক এবং পরিবেশক একই থাকছে একটি নির্দিষ্ট গণমাধ্যম বাজারে — যেমন টিভি বা রেডিও, বাজারের ভাগও একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে সেই গণমাধ্যমের জন্য। এই ব্যবস্থার পোষাকি নাম 'ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন'।

গণমাধ্যম পরিচালনা গ্রন্থে আমরা জানতে পারছি যে এই ধরনের মালিকানায় অনেক সুবিধা কারণ মালিক তার অধীনস্থ নানা সম্পদ ও সুবিধা অর্থাৎ resources-কে ব্যবহার করে উৎপাদনের খরচ কমাতে পারেন এবং মুনাফা বাড়াতে পারেন। কিন্তু এর প্রতিবন্ধকতাও আছে যথা—

"এই ধরনের মালিকানার সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হল, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র পরিচালন ব্যবস্থা করার জন্য সাধারণ মালিকানার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে সংবাদপত্র পরিচালনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। সংবাদপত্রের উন্নতি ও অগ্রগতিতে এই বিশেষ মনোযোগ কিন্তু খুবই জরুরি। দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্রের মূলধন প্রয়োজনে মালিকানার অধীন যে-কোন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ হতে পারে। যেমন সংবাদপত্র ব্যবসার

মূলধন নিয়ে বিজ্ঞাপন ব্যবসায় লাগানো যেতে পারে। এতে সংবাদপত্রের অগ্রগতি ও অস্তিত্ব দুইই সংকটের মধ্যে পড়তে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'শিকাগো ট্রিবিউন' পত্রিকা এই উল্লম্ব মালিকানার পর্যায়ভুক্ত। এই পত্রিকার প্রায় পঁচিশটি সহযোগী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে রয়েছে।"

৩। **কংগ্লোমোরেট মালিকানা :** একটি পরিবার/সংস্থা বা ব্যক্তি যদি বহু ব্যবসার মালিক হন এবং তার মধ্যে একটি গণমাধ্যম — অর্থাৎ, একটি সিমেন্ট কোম্পানির রাবার, প্লাস্টিক, রাসায়নিকের সাথে প্রকাশনী সংস্থা সংবাদপত্র, পত্রিকাও আছে, একেই বলা হচ্ছে কংগ্লোমোরেট। বর্তমান বহু গণমাধ্যম সংস্থার মালিক হচ্ছেন অন্য ব্যবসার মালিকেরা। তাঁর মূল ব্যবসা খুব বড় বা বৃহৎশিল্পের কিন্তু মূলতঃ সামাজিক প্রতিপত্তি, প্রভাব ও ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার জন্য তিনি মিডিয়ার ব্যবসায় যুক্ত হয়েছেন। মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি জনমত এবং সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। দেশে এই ধরনের কংগ্লোমোরেট এখন অনেকগুলি আছে। তবে একথা সত্যি যে এই ব্যবস্থায় পক্ষপাতদোষমুক্ত থাকা একেবারেই সম্ভব হয় না এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ বারবার বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মালিকানা ও নীতির ওপর প্রভাব—

গণমাধ্যমের বিভিন্ন রকমের মালিকানা বিশেষত তার সাম্প্রতিকতম ধারাগুলি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে মালিকানার পরিবর্তনের সাথে তা পরিচালনা, মাধ্যমের কর্মপদ্ধতির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। স্বাভাবিক ভাবেই, সাংবাদিকদের কর্মপদ্ধতি, উদ্দেশ্য এবং নীতির ওপর প্রভাব পড়তে বাধ্য।

পর্যবেক্ষণে যে সব বিষয়গুলি উঠে আসছে তা হল—

(ক) বিরাট গণমাধ্যম বাজারের দখল মুষ্টিমেয় কিছু সংস্থার হাতে আছে। অর্থনীতির ভাষায় যাকে ওলিগোপলি বলা হয়।

(খ) ক্রস মিডিয়া মালিকানা অথবা কংগ্লোমোরেটদের ব্যাপারে আইনি যে ব্যবস্থা তার অসঙ্গতির কারণে এদের হাতে বাজার চলে যাচ্ছে। ভার্টিকাল এবং হোরাইজন্টাল এই দুরকমেরই বাজারে এঁরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

(গ) রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কর্তৃত্ব বাড়ছে গণমাধ্যমের মালিকানা ও পরিচালনায়।

(ঘ) এক ব্যবসার লাভ বা ক্ষতির প্রভাব অন্য ব্যবসায় পড়ে। এক ব্যবসার প্রচার-প্রসারেও গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়।

(ঙ) কর্পোরেট/ব্যবসায়িক সংস্থার স্বার্থে চালিত হচ্ছে গণমাধ্যমের যাত্রাপথ।

১.৪.৪ ওমবুডসম্যান (Ombudsman)

বিখ্যাত দার্শনিক-লেখক-সাংবাদিক জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'অন লিবার্টি' গ্রন্থে সংবাদ মাধ্যমের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার হয়ে জোরালো সওয়াল করেছিলেন যেখান থেকে 'ফ্রি প্রেস' তত্ত্বের উদ্ভব। পরবর্তীকালে সংবাদপত্রের বিকাশ, বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রশক্তির সাথে সংবাদ মাধ্যমের রসায়ন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে প্রগতিশীলতা ও গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হিসেবে উঠে আসে মুক্ত ও স্বাধীন সংবাদমাধ্যম। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশের পর্যায়ে তার মুখোমুখি ছিল ইয়োরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন। স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয় এবং এখান থেকেই স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন ইয়োরোপীয় শাসন অবসান হল, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল এবং সংবাদমাধ্যম কিছুটা

স্বাধীনতা পেয়ে বাণিজ্যিক শিল্পের দিকে এগোল, তখন এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। প্রশ্ন উঠল গণমাধ্যমেরই কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ডের প্রেক্ষিতে, যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কি অবাধ? গণমাধ্যমের অনৈতিকতার বিষয়টি কে দেখবে? এইখান থেকেই উঠে এল গণমাধ্যমের স্বনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব।

যদিও অনেক দেশে সরকার স্বনিয়ন্ত্রণের অবকাশ দেয়নি, আইন প্রণয়ন করেছে, ভারতের মতো কিছু দেশে Self Regulatory Mechanism বা স্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার জন্য সংস্থা তৈরি হয়েছে। এই সংস্থার মাথায় থাকেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কিন্তু সদস্যরা অধিকাংশই গণমাধ্যমের প্রতিনিধি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সীমিত ক্ষমতার জন্য প্রেস কাউন্সিল খুব একটা কার্যকরী হতে পারেনি। এর মূল কারণ কাউন্সিল সমস্যাকে স্বীকৃতি দিতে পারে, সতর্ক করতে পারে, ভর্ৎসনা করতে পারে কিন্তু শাস্তি দিতে পারে না। ইতিপূর্বে 'পেইড নিউজ' প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী এককে আলোচনা করেছি কিভাবে প্রেস কাউন্সিল তার নিজস্ব তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতে অপারগ। এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে খোদ বড় গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা যারা কাউন্সিলকে প্রভাবিত করছেন।

(এক্ষেত্রে স্ব-নিয়ন্ত্রণের আরও বুনিয়াদি পর্যায়ে গিয়ে প্রতিটি গণমাধ্যমের নিজস্ব স্বনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া যা তার একান্ত অভ্যন্তরীণ, সেই 'ওমবুডসম্যান' (Ombudsman) তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।) বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম অর্থাৎ চ্যানেলগুলি 'নিউজ ব্রডকাস্টিং স্ট্যান্ডার্স অথরিটি' (NBSA) গঠনের মাধ্যমে নিজেদের স্বনিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে এসেছে। প্রেস কাউন্সিলের আওতায় তারা আসে না। প্রেস কাউন্সিলের পরিধি কেবলমাত্র মুদ্রিত গণমাধ্যম পর্যন্ত সীমিত।

ওমবুডসম্যান-এর তত্ত্ব সুইডেন থেকে উৎপত্তি হলেও সর্বপ্রথম ১৯৬৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'কুরিয়ার জার্নাল' এবং 'লুই ভিল টাইমস্'-এ ওমবুডসম্যান নিয়োগ হয়।

এই উপলব্ধি থেকেই বিশ্বের তাবড় সংবাদপত্রে 'পাবলিক এডিটর' বা 'রিডার্স এডিটর' পদটি সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদটি এক ধরনের অভ্যন্তরীন ওমবুডসম্যান। সংবাদপত্রে যত লেখা ছাপা হবে, তা খুঁটিয়ে পড়া এবং ভুল-ত্রুটির খতিয়ান তৈরি করা এই রিডার্স এডিটর-এর কাজ। প্রয়োজনে তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে সংবাদপত্র ত্রুটি স্বীকার করবে, দুঃখপ্রকাশ করবে এবং সংশোধন করবে। এছাড়াও পাঠক প্রতিক্রিয়া, পাঠকদের চিঠি যত্ন সহকারে পড়ে সংবাদপত্রের কাছে তাদের প্রত্যাশার দলিল তৈরি করাও ওমবুডসম্যান-এর এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একটি বিভাগ বা কলাম, পাঠকের কেমন লাগছে, এই প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করেই সংবাদপত্র তার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে। প্রতিযোগিতার বাজারে জনপ্রিয়তা অটুট রাখতে পাঠকের মতামতকে গুরুত্ব দিতেই হয়। তাছাড়া ভুল স্বীকার ও সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে নিজের দায়িত্ববোধের পরিচয়ও দেওয়া যায় যা সুদূর ভবিষ্যৎ-এ সংবাদপত্রকে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে সাহায্য করে। তাছাড়া, ওমবুডসম্যান-এর মারফৎ অনেক বিপদ বা বিপর্যয়ের আগাম আভাস পাওয়া যায় এবং সংশোধনের মাধ্যমে সেই বিপর্যয় এড়ানো যায়। দেখা গেছে যে সকল সংবাদপত্র ওমবুডসম্যানকে গুরুত্ব দেয়, তারা দীর্ঘদিন বাজারে টিকে থাকে।

সম্পাদকীয় নীতির সাথে ওমবুডসম্যান-এর সম্পর্ক নিবিড়। যে কাগজের সম্পাদকীয় নীতি নমনীয় এবং ওমবুডসম্যানকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত সংশোধনী করে, তারাই নীতিনিষ্ঠ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে ওমবুডসম্যান-এর স্বাধীনতাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ওমবুডসম্যান-এর বিচার ও কণ্ঠস্বর হবে নির্ভিক এবং মুক্তকণ্ঠে সে সম্পাদকীয় নীতিকে সমালোচনা করতে পারবে, তবেই তা সার্থক হবে। এবং পাঠকের সাথে ওমবুডসম্যান-এর সম্পর্ক স্থাপন করার এক প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট থাকবে। Appeal System-এর মাধ্যমে পাঠক তার প্রতিক্রিয়া জানাবে। এবং ওমবুডসম্যান, পাঠক ও সংবাদপত্র — এই ত্রিভুজের সম্পর্ক হবে স্বচ্ছ। খোলা মনে সংবাদপত্র ভুল স্বীকার করে সংশোধন করবে। এতেই ওমবুডসম্যান-এর সার্থকতা।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যাক যে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে জনস্বার্থ রক্ষা করার জন্য বহু দেশেই সংসদ-নিরপেক্ষ, প্রশাসন-নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র সংস্থা থাকে সরকারের কাজের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য। সুইডেন-এ ১৮০৯ সালে প্রথম এই জাতীয় ওমবুডসম্যান নিয়োগ হয়। ভারতে ১৯৬৬ সালে Administrative Reforms Commission বা প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন হয় এবং এর সুপারিশ ছিল দ্বি-স্তরীয় ওমবুডসম্যান নিয়োগ করা — কেন্দ্রে 'লোকপাল' এবং রাজ্যে রাজ্যে 'লোকায়ুত'। দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যগুলিতে একে একে এই প্রস্তাব কার্যকর হয়েছে। কেন্দ্রে Central Vigilance Commissioner এই দায়িত্ব নির্বাহ করেন।

ভারতে সাংবাদিক ও সম্পাদকদের অনেকগুলি সংস্থা আছে যেমন Editor's Guild, Society for Professional Journalists, Public Relations Society of India ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকেরই পেশাগত আচার সংহিতা আছে। কিন্তু সেই আচার সংহিতা সংবাদপত্র যথাযথ পালন করছে কিনা তা দেখার জন্য খুব কম কাগজই অভ্যন্তরীণ ওমবুডসম্যান নিয়োগ করেছে। Times of India ওমবুডসম্যান নিয়োগ করেছে। এবং 'দ্য হিন্দু' অবশ্য তৈরি করেছে 'Reader's Editor' পদ।

১.৪.৫ ভারতের প্রেস কাউন্সিল প্রদত্ত নীতিমালা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংবাদপত্রের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ইংরেজ শাসকের অন্যায়ের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সংবাদপত্র। কত সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সাংবাদিক, লেখক ও সম্পাদকদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তবু সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করা যায়নি। তিলক থেকে গান্ধী, প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য সংবাদপত্রকে ব্যবহার করেছিলেন। স্বভাবতই, স্বাধীনতার পর পর প্রধানমন্ত্রী নেহরু সাংবাদিকতার প্রসারে উদ্যোগী হন। মূলত তাঁর উদ্যোগে ১৯৫২ সালে ১ম প্রেস কমিশন গঠিত হয় বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উপদেষ্টা শ্রী এম. চলপতি রাও-এর নেতৃত্বে। এই কমিশন সাংবাদিকতা, সংবাদপত্রের সমস্যাগুলি, রাষ্ট্রের সাথে সংবাদপত্রের সম্পর্ক, ব্যবসায়িক বিষয় ইত্যাদি বিশদে খতিয়ে দেখে বেশ কিছু মূল্যবান সুপারিশ করে যার মধ্যে বেশিরভাগই রূপায়িত হয় এবং সেই রূপায়ণের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের আজকের গণমাধ্যমের ব্যবস্থা। প্রথম প্রেস কমিশনেরই অন্যতম সুপারিশ ছিল সংবাদপত্রের পেশা ও পেশাগত নীতি ঠিকমতো পালন হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য এক নিয়ন্ত্রক সংস্থা নির্মাণ যেখানে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাই নীতি নির্ধারণ করবেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বিল সংসদে পেশ হয়। বহু টালবাহানার পরে ১৯৬৫ সালে এটি গৃহীত হয় এবং ১৪ই জুলাই ১৯৬৬ ভারতের প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ায় প্রেস কাউন্সিল বাতিল হয়ে যায়। ১৯৭৮-এ আবার নতুন করে প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয় এক নতুন আইন-এর মাধ্যমে। প্রেস কাউন্সিলের গঠন নিম্নরূপ :

চেয়ারম্যান : রাজ্যসভার অধ্যক্ষ, লোকসভার অধ্যক্ষ এবং কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ মনোনীত ব্যক্তি নিয়ে গঠিত কমিটি মনোনয়ন করবে।

সদস্য : মোট ২৮ জন। ১৩ জন কর্মরত সাংবাদিক, এর মধ্যে ৬ জন সম্পাদক। সংবাদপত্রের মালিক ও পরিচালন গোষ্ঠির থেকে ৬ জন, সংবাদ সংস্থা (এজেন্সি) থেকে ১ জন, শিক্ষা/বিজ্ঞাপন/আইন/সাহিত্য/সংস্কৃতি জগৎ থেকে ৩ জন (ইউ.জি.সি, বার কাউন্সিল ও সাহিত্য আকাদেমী মনোনীত ১ জন করে। লোকসভার অধ্যক্ষ মনোনীত ৩ জন সাংসদ রাজ্যসভার মনোনীত ২ জন সাংসদ।

মূলতঃ প্রেস কাউন্সিলের দায়িত্ব হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা, আচার সংহিতা নির্মাণ, সাংবাদিকদের পেশাগত কর্তব্যবোধকে বিকশিত করা, জনস্বার্থমূলক সংবাদের প্রচার-প্রসার করা, বিদেশের টাকা ও সাংবাদিকতার উৎস ও প্রভাব যথাক্রমে পর্যালোচনা করা এবং সামুহিকভাবে সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন ঘটানো। প্রেস কাউন্সিলের অধিকার আছে যে কোনও ব্যক্তিকে সমন জারি করে হাজির হতে বলা, সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা এবং নীতিভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে ভর্ৎসনা করা। কিন্তু শাস্তি দেওয়ার কোনও বিধান প্রেস কাউন্সিলের নেই। তাই একে বলা হয়েছে ‘Watch Dog’ অর্থাৎ নজরদার কুকুর যে চিৎকার করে শোরগোল করতে পারবে কিন্তু কামড়াতে পারবে না। অর্থাৎ, ভারতে প্রেস কাউন্সিলের ভূমিকা ‘Ombudsman’-এর।

নীতিমালা

সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারা অর্থাৎ বাক্ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে সাংবাদিকের তথা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা অন্তর্গত আছে। যেহেতু এই স্বাধীনতা এক নাগরিক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে তাই এক পেশাদার সাংবাদিকই এই অধিকার ভোগ করবেন। তবে কোনও অধিকারই অবাধ নয়। তাই সংবিধানের ১৯(২)-তেই যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ বলা আছে। এই দর্শনের ভিত্তিতেই প্রেস কাউন্সিলের আচার সংহিতা বা Code of Ethics রচিত হয়েছে।

প্রেস কাউন্সিলের নীতিমালার অন্তর্গত বিষয়গুলি হল :

(এই অংশটি ‘সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রদত্ত প্রেস কাউন্সিলের আচরণবিধির ভিত্তিতে (পৃ. ২১৬-২২৭) রচিত)

১। **যথার্থ্য ও সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ :** যা সত্য নয় তা ছাপা উচিত নয়। ঘটনার যথার্থ রূপ তুলে ধরতে হবে।

২। **প্রাক-মুদ্রণ সত্যতা যাচাই :** কোনও বিষয় ছাপার আগে তার সত্যতা নির্ভরযোগ্য সূত্র ও সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তির সাথে কথা বলে যাচাই করে নিতে হবে।

৩। **মানহানি সতর্কতা :** কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্মানহানি হয় এমন কোনও কিছু ছাপার আগে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা উচিত, এবং তা জনস্বার্থে করা উচিত। নচেৎ নয়। এ ব্যাপারে ভাষার সংযম থাকা উচিত। সরকারি কর্মচারিদের ক্ষেত্রেও এই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

৪। **গোপনীয়তা :** জনস্বার্থে না হলে, কোনও ভাবেই কোনও ব্যক্তির গোপনীয়তা লংঘন করা উচিৎ নয়। কোনও ব্যক্তির বিষয়ে কিছু লিখতে হলে বা তার ছবি কণ্ঠস্বর বা ভিডিও রেকর্ড করার আগে অনুমতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধুমাত্র সন্দেহ বা গুজবের ভিত্তিতে তার ব্যক্তিগত তথ্য জনসমক্ষে আনা যাবে না। কোনও সাক্ষাৎকারও তার অনুমতি না নিয়ে রেকর্ড বা প্রকাশ করা উচিত নয়।

৫। **মহিলা ও শিশু :** মহিলা ও শিশুদের ওপরে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে নানাবিধ অত্যাচার প্রতিদিন হয়ে চলেছে। ধর্ষণ, লাঞ্ছনা, চোরাপাচার ইত্যাদির শিকার যে নারী ও শিশু, তাদের পরিচয় গোপন রাখা বাঞ্ছনীয়। তাদের আসল নাম ও ছবি কখনোই যেন প্রকাশ্যে না আসে।

৬। **সংশোধনী/উত্তরদান/সম্পাদকের চিঠি :** অনেক সময় অনবধানতাবশতঃ সংবাদপত্র ভুল ছাপে। সেক্ষেত্রে সংশোধনী প্রকাশ করে দুঃখপ্রকাশ করা উচিত। সংবাদপত্রে যদি কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কোনও খবর বেরোয়, তার প্রত্যুত্তরে কোনও বক্তব্য আসলে সংবাদপত্রের উচিত সেটা প্রকাশ করা। এছাড়াও কোনও পাঠক যদি সম্পাদককে কোনও চিঠি লেখেন, সেটা প্রকাশ করা উচিত। তবে প্রত্যুত্তরের পালা কোথায় থামবে তা সম্পাদক ঠিক করতে পারেন।

৭। **সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রতিবেদন :** সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার যে আদর্শ ও দর্শন, তা সাংবাদিকতায় বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। এমন কোনও কথা লেখা উচিত নয় যা কোনও বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে নেতিবাচক ভঙ্গীতে পরিবেশন করে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা বেড়ে যেতে পারে, এমন কোনও উস্কানিমূলক বা প্ররোচনামূলক ভাষা ও বক্তব্য প্রকাশ করা উচিত নয়। জাতপাতের ক্ষেত্রেও একই রকম সংযম ও ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত। হিংসাকে বড় করে দেখানো উচিত নয়।

৮। **প্রাকৃতিক বিপর্যয়/যুদ্ধ/আপৎকালীন পরিস্থিতি :** প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সংবাদমাধ্যমের দায়িত্বপূর্ণ আচরণ বাঞ্ছনীয়। এই সময় তথ্য ও পরিসংখ্যান যেমন হতাহতের/আক্রান্তের সংখ্যা, গুরুত্বপূর্ণ সময় ও স্থান, সরকারি পদক্ষেপের বর্ণনা — এগুলি নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন যাতে কোনভাবেই মানুষ বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত না হন। দেশে যুদ্ধ লাগলেও নির্ভুল তথ্যের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। কোভিড-১৯-এর মতো অতিমারি ও মহামারি বা ফণি বা আমফান-এর মতো জাতীয় বিপর্যয়ে মানুষের সমস্যা, দুঃখ-দুর্দশার কথা বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে হবে। যাতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারে ও ত্রাণ পৌঁছে দিতে পারে।

৯। **কূটনৈতিক ছাড় :** সংবাদপত্র কখনোই কূটনৈতিক ছাড়ের অপব্যবহার করবে না এবং প্রতিবেশী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও বোঝাপড়া গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

১০। **বিচারবিভাগীয় কাজের প্রতিবেদন :** যে বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন, তার বিষয়ে কোনও স্বাধীন, স্বতন্ত্র মতামত প্রকাশ করা অনুচিত। আদালতের কার্যবিবরণী কোনও মন্তব্য ছাড়া বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবৃতি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ব্যাখ্যায় বিবদমান কোনও পক্ষ বাড়তি সুবিধা পাক তা একেবারেই কাম্য নয়। বিচারবিভাগের স্বাধীন কার্যপ্রণালীতে তা বাধা দেওয়ার সমতুল্য বিবেচ্য হয়।

১১। **ভাষা/শিরোনাম :** ভাষার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। ভাষা যেন শালীনতা ও সীমারেখা মেনে চলে। শিরোনাম যেন বিভ্রান্তিমূলক না হয়। শিরোনামের সাথে সংবাদের বিষয়বস্তুর সাযুজ্য থাকা চাই।

১২। **বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী (বিজ্ঞাপন) :** বাণিজ্যিক সংস্থার স্বার্থে বা কাগজের জনপ্রিয়তার স্বার্থে নীতির সাথে আপোষ বাঞ্ছনীয় নয়। বিজ্ঞাপন প্রকাশ হবে কিন্তু সমর্থিত হবে না। আইনানুগ বিজ্ঞাপন ছাপা যাবে।

১৩। **প্লেজিয়ারিজম/অননুমোদিত প্রকাশ :** সূত্রকে স্বীকৃতি না দিয়ে, অন্যের লেখা বা চিন্তা, নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অনুচিত। এই কাজ সাংবাদিকতার নীতিবিরুদ্ধ এক অপরাধ। একইভাবে অন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর/লেখা তুলে ছেপে দেওয়ায় গর্হিত। এর জন্য সাংবাদিকের চাকরি চলে যাওয়া উচিত। কোনও কপিরাইট করা লেখা বিনা অনুমতিতে ছাপা যাবে না।

১৪। **বিজ্ঞাপন :** বিজ্ঞাপন আজকের সংবাদপত্রের আয়-এর মূল সূত্র। কিন্তু সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপন আর বিষয়বস্তু/ সংবাদ-এর মধ্যে পার্থক্য পাঠকদের কাছে পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে হবে। কোনও পাঠক যেন বিজ্ঞাপনের সাথে সংবাদকে গুলিয়ে না ফেলেন। এমন কোনও বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে ছাপা উচিত নয় যা মিথ্যা দাবি করে, মানুষকে বিভ্রান্ত করে, সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক, রুচির পরিপন্থী বা কোনও বিশেষ ধর্মীয় আবেগে আঘাত হানে। বিজ্ঞাপন ছাপা হলে তার দায়িত্বও কিন্তু সম্পাদকের উপরেই নৈতিক ভাবে বর্তায়।

২০১০ সালে প্রেস কাউন্সিল প্রকাশিত নীতিমালায় বেশ কয়েকটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়—

১৫। **পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বীতা :** কোনও সংবাদপত্রেরই উচিত নয় নিজেদের পৃষ্ঠার অন্য সংবাদপত্রের কার্য-কলাপের নিন্দা বা সমালাচনা করা।

১৬। **গণমাধ্যমের বিচার (Trial by Media) :** বেশ কিছু ঘটনায় দেখা গেছে বিচার ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে গণমাধ্যম দোষী কে তা ঠিক করে দিচ্ছে। তদন্ত চলাকালীন তাকে সমালোচনা করছে। এই প্রবণতা থেকে দূরে থাকা উচিত যাতে পুলিশ-প্রশাসন ও আদালত তাদের কাজ করতে পারে। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কাউকে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়।

১৭। **চিত্র :** ফটো পাঠকদের খুবই প্রভাবিত করে তাই ফটো ছাপার ব্যাপারে সাবধানতা, যথার্থতা, দায়িত্ববোধ ও শালীনতাবোধ বজায় রাখা উচিত। ছবির প্রেক্ষাপট ঠিক রাখা উচিত এবং কোনও অবস্থাতেই এমনভাবে ছবিকে সম্পাদনা করা যাবে না যাতে তার আসল রূপ পাল্টে যায়। ছবির ক্যাপসানের ভাষার ব্যাপারেও ছবির সাথে সাযুজ্য রাখতে হবে।

এছাড়াও পেইড নিউজ, ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাক্ট রূপায়ণ করার ব্যাপারে কাউন্সিল সদর্থক নির্দেশিকা জারি করেছেন। তবে এ ব্যাপারে বেসরকারি এবং বাজারি গণমাধ্যম-এর থেকে ইতিবাচক সাড়া মেলেনি।

১.৪.৬ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার আচার সংহিতা

ইন্টারন্যাশনাল ফেডেরেশন অব জার্নালিস্টস আই.এফ.জে গ্লোবাল চার্টার ফর জার্নালিস্টস ১২ জুন ২০১৯ টুনিসে ৩০তম আই.এফ.জে বিশ্ব কংগ্রেস-এ গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালে আই.এফ.জে নীতি প্রথম ঘোষিত হয় যাকে 'বর্দো (Bourdeaux) ডিক্লারেশন' বলা হয়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত :

১। ভূমিকা বা Preamble-এ রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সনদের ৯ নং ধারা উল্লেখ করে তথ্যের প্রতি সবার সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সাংবাদিকদের পাঠক ও সংবাদমাধ্যমের প্রতি দায়িত্বের কথা স্মরণ করানো হয়েছে।

২। সাংবাদিকদের প্রাথমিক দায়িত্ব জনগণের সত্য জানার অধিকারকে সুরক্ষিত করা।

৩। সাংবাদিক তথ্যনিষ্ঠভাবে সংবাদপরিবেশন করবেন, কোনও তথ্য না লুকিয়ে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য/বক্তব্য সাবধানে পরিবেশন করবেন।

৪। জনস্বার্থ জড়িত না থাকলে সাংবাদিক কখনোই গোপন রেকর্ডিং-এর সাহায্য নেবেন না।

৫। যতই জরুরি হোক না কেন একটি সংবাদ, তা যেন কখনোই যাচাই না করে প্রকাশ না করা হয়।

৬। প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভুল থাকলে সাংবাদিক তা সংশোধন করবেন একেবারে স্বচ্ছতার সাথে নিজের সেরাটুকু দিয়ে।

৭। গোপনে পাওয়া তথ্যসূত্রের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।

৮। গোপনীয়তার অধিকারকে শ্রদ্ধা করতে হবে। যার সাক্ষাৎকার প্রকাশ হবে তাকে দেখিয়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদন/অনুমতি নিতে হবে।

৯। তথ্য/মত প্রকাশ যেন ঘৃণা, হিংসা না ছড়ায়, কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কে নেতিবাচক ভঙ্গীতে না দেখায় এবং জাত, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বাছবিচার না করে।

১০। অন্যের লেখা চুরি, তথ্য বিকৃতি, প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ এবং তদ্দজনীত মানহানি ঘটালে তা অপেশাদারি ও অনৈতিক আচরণ হিসেবে গণ্য হবে।

১১। পুলিশ বা সুরক্ষা সংস্থার হয়ে সাংবাদিক কাজ করবেন না।

১২। সাংবাদিক তাঁর সহকর্মীকে পূর্ণ সমর্থন জোগাবেন এবং তার তদন্ত, মত প্রকাশের অধিকারকে শ্রদ্ধা করবেন।

১৩। সাংবাদিক তাঁর স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে কোনও অনৈতিক উপার্জন বা সুবিধা নেবেন না। স্বার্থের সংঘাত-এ জড়াবেন না, যে কোনও রকম অন্ধ প্রচার বা বাজারী ব্যাপারে যুক্ত হবেন না।

১৪। সাংবাদিক তাঁর স্বাধীনতাকে বিপন্ন করবেন না এবং 'অফ দ্য রেকর্ড'-এ পাওয়া তথ্যকে শ্রদ্ধা করবেন যদি তার সততা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে হয়।

ইউনেস্কো

ইউনেস্কো, রাষ্ট্রপুঞ্জের এক শাখা সংগঠন, বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্তিকা, নথি প্রকাশ করেছে সাংবাদিকদের পেশাগত আচরণ সংক্রান্ত।

১। যেমন— Dunja Mijatovic রচিত 'দ্য মিডিয়া সেল্ফ রেগুলেশন গাইড বুক' (২০০৮)।

২। UNESCO — Communication & Information শীর্ষক ওয়েবপেজ যেখানে পেশাদারি সাংবাদিকতার মান এবং নীতিমালা নিয়ে আলোচনা আছে। এটি UNESCO-র অংশ।

৩। Ethical Guidelines for Journalists—UNCG, আফগানিস্তান দ্বারা ২০১৬-য় প্রকাশিত।

এই গ্রন্থ/নথি গুলিতে যে সব বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল—

- তথ্যের সমানাধিকার সবার জন্য
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা
- সত্য, যথার্থ ও পক্ষপাতহীন সংবাদ পরিবেশন
- সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা
- জনস্বার্থ ও পাঠকের স্বার্থ রক্ষা

সোসাইটি অব প্রফেশনাল জার্নালিস্টস (এস.পি.জে)

এস.পি.জে দ্বারা প্রদত্ত নীতিমালা চারটি ভাগে বিন্যস্ত—

১। **সত্য অন্বেষণ :** এই ভাগে সাংবাদিকদের সত্য অন্বেষণে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তথ্য যাচাই, যথার্থতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ, পরিবেশনে দায়িত্ববোধ বজায় রাখতে বলা হয়েছে।

২। **ক্ষতি হ্রাস :** সংবাদসূত্র, সহকর্মী সহ জনগণকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তথ্যের চাহিদা বা প্রয়োজন এবং তদ্দজনীত ক্ষতি বা অস্বস্তির মধ্যে ভারসাম্য আসতে হবে। পুরো প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত মানুষদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।

৩। **স্বাধীন ক্রিয়া :** সাংবাদিকতা আদতে জনসেবা। কোনওভাবেই সাংবাদিক কোনও সুবিধা, উৎকোচ, অর্থ গ্রহণ করবেন না বা কোনও অনৈতিক প্রলোভনে পা দেবেন না।

৪। **দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা :** নিজের কার্যপ্রণালী, সংবাদ সংগ্রহের প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সাথে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে হবে, কোথাও কোনও ভুল হলে দ্বীধাহীনভাবে সংশোধন করে দুঃখপ্রকাশ করতে হবে, যে কোনও

পদ্ধতিগত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং কখনোই নীতিভ্রষ্টতার সাথে আপোষ করা যাবে না।

এডিটর্স গিল্ড অব ইন্ডিয়া

সম্পাদকদের সংগঠন 'এডিটর্স গিল্ড অব ইন্ডিয়া' 'Code of Practice for Journalists' শীর্ষক এক নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন যার বৈশিষ্টগুলি নিম্নরূপ:

১। আচার সংহিতার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদিও আচার সংহিতা মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী তবু এর উপস্থিতি অতীত ভুল-ভ্রান্তিকে সংশোধন করতে সাহায্য করবে। তাই এই আচার সংহিতা অত্যন্ত উদার এবং 'Britain's Society of Editors' -এর আচার সংহিতার ভিত্তিতে প্রণীত।

২। এখানে সংস্থার পরিচালক, সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের কার্যপরিধি (domain) আলাদা করে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মালিক/পরিচালককে ব্যবসায়িক বা বাহ্যিক বিষয়গুলির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সম্পাদককে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে বলা হয়েছে। সম্পাদককেই সংস্থার ভাবমূর্তি এবং ব্যক্তিত্বের সৃজক ও রক্ষক বলে অভিহিত করা হয়েছে। সংবাদপত্রের নৈতিক ও মানরক্ষার দায়িত্ব সম্পাদকের ওপরেই বর্তাবে। বিশ্বাসযোগ্যতা, যথার্থতা, রক্ষাও তাঁরই দায়িত্ব।

৩। সম্পাদকের কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে কর্মচারি ও সাংবাদিকেরা বিশেষত পদস্থ যাঁরা যেমন বার্তা সম্পাদক, মুখ্য সংবাদদাতা মুখ্য অবর সম্পাদক ইত্যাদি তাঁদের ডেস্ক ও রিপোর্টিং বিভাগের সহকর্মীদের সাহায্যে দেখবেন যেন সাংবাদিকতার পেশাগত নৈতিকতা বজায় থাকে — তথ্য যাচাই, সত্য তথ্য পরিবেশন, জনস্বার্থ রক্ষা, গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা, অহেতুক মানহানি, প্রত্যুত্তরের অধিকার, ভুল সংশোধন, অতিরঞ্জন, তথ্য বিকৃতি, ব্যক্তিগত সততা ইত্যাদি বিষয়গুলির ক্ষেত্রে উচ্চ মানের নৈতিক মানদণ্ড স্থাপন করতে হবে।

১.৪.৭ ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত নীতিমালা

নির্বাচন যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় প্রক্রিয়া। অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনেই গণতন্ত্রের সার্থকতা। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ভারতের নির্বাচন কমিশন নানারকম পদক্ষেপ করেছে। নির্বাচনের আগে আচরণবিধি লাগু হয় এবং সবাইকে মেনে চলতে হয়। গণমাধ্যম এখন নির্বাচন প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গণমাধ্যম জনমত প্রভাবিত করে এবং যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলির সর্বদাই লক্ষ্য থাকে গণমাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি ও বক্তব্য বাড়িয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করা। ইদানিংকালে দেখা গেছে যে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার খরচের বাজেটের বড় অংশ জুড়ে থাকছে গণমাধ্যমে দেওয়া বিজ্ঞাপন। কখনো কখনো বিজ্ঞাপনের বদলে তাঁরা সাংবাদিকদের দিয়ে প্রয়োজনমত প্রতিবেদন লিখিয়ে নিচ্ছেন এবং তার বিনিময়ে অর্থ দিচ্ছেন। এই প্রক্রিয়াকে 'পেইড নিউজ' বলা হচ্ছে যার বিশ্বাসযোগ্যতা বিজ্ঞাপনের চেয়ে বেশি।

এই প্রবণতাগুলিকে ঠেকানোর জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময়ে, তার প্রচার পর্বে এবং ফলাফল প্রকাশের আগে গণমাধ্যমকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা দিয়েছেন। এই নির্দেশিকাগুলি বিশদে পাওয়া যায় নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত 'Handbook for Media' (2019) এবং 'Compendium of Instructions on Media Related Matters' (2020)। এর অন্তর্গত বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

১। **বিজ্ঞাপন শংসাপত্র :** যে কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতা যদি কোনও সংবাদপত্র/চ্যানেল/পোর্টালে কোনও

রকম রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন দিতে চান তাহলে তাঁকে আগে শংসাপত্র সংগ্রহ করতে হবে যাকে ‘Prior Certification’ বলা হয়েছে। সেই বিজ্ঞাপনে কে বিজ্ঞাপনটি দিচ্ছেন তা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রার্থীকে মনোনয়ন দাখিলের সময় বিজ্ঞাপন খাতে খরচও উল্লেখ করতে হবে। এই বিজ্ঞাপনগুলি সংশ্লিষ্ট আইন অর্থাৎ কেবল টিভি রেগুলেশন অ্যাক্ট এবং Advertising Standards অনুযায়ী নির্মাণ ও সম্প্রচার হবে।

২। **সোশ্যাল মিডিয়া :** সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া বিজ্ঞাপনের হিসাব প্রার্থীকে কমিশনের কাছে দাখিল করতে হবে। যদিও বার্তা, মন্তব্য, ফটো, ভিডিও, ব্লগ, নিজস্ব ওয়েবসাইট এগুলি বিজ্ঞাপন বলে বিবেচ্য হবে না। কমিশনের তরফে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটর থাকবেন যিনি বিজ্ঞাপনগুলির ওপরে এবং সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলির ওপরে নজরদারি করবেন।

এছাড়াও ‘Internet & Mobile Association of India’ (IAMAI) একটি ‘Voluntary Code of Ethics’ নামক আচার সংহিতার প্রণয়ন করেছেন যেখানে প্রতিটি সোশাল মিডিয়া নির্বাচনের সময় সঠিক ও পক্ষপাতহীন তথ্য পরিবেশন, মুক্ত ও নীতিনিষ্ঠ ব্যবহার এবং কমিশনের নিয়ম মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। কমিশনও এই আচার-সংহিতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

কমিশন সোশ্যাল মিডিয়ায় কী প্রকাশ করা যাবে ও কী প্রকাশ করা যাবে না সে বিষয়ে ‘মডেল কোড অব কন্ডাক্ট’ দিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে যে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু দেওয়া যাবে না:

ক। বিশেষ রাজনৈতিক দল/প্রার্থীর প্রতি পক্ষপাতমূলক পোস্ট।

খ। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কুরুচিকর ও ভিত্তিহীন অভিযোগ / কুৎসা।

গ। হিংসায় উস্কানি দেয়।

ঘ। কোনও বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ভাবাবেগকে আহত করে।

ঙ। ছবি/ভিডিও যেখানে তথ্য বিকৃতি আছে।

৩। **সাংবাদিকদের প্রদত্ত সুবিধা :** নির্বাচনের যথাযথ ও নিরপেক্ষ সম্প্রচারের জন্য নির্বাচন কমিশন সাংবাদিকদেরে সবরকম সহযোগিতা করবেন। দুর্গম ও উত্তেজনাপ্রবণ বুথে যাতে সাংবাদিকরা যেতে পারেন এবং সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন তার সুব্যবস্থা করবে কমিশন। সরকারি ছবি ও ভিডিও ফুটেজ সাংবাদিকরা চাইলে কমিশনের থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন এবং তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছ থেকে। কিন্তু কিছু নিয়মকানুন মেনে সাংবাদিকদের কাজ করতে হবে। যেমন—

- পোলিং বুথের ভেতরে বা গণনা কেন্দ্রের ভেতরে বিশেষ অনুমতি ছাড়া সাংবাদিক ঢুকতে পারবেন না।
- গণনার কভারেজের জন্য বিশেষ অনুমতিপত্র দরকার।
- কমিশনের তরফে সবরকম যোগাযোগ সুবিধাসম্পন্ন ‘মিডিয়া সেন্টার’ খোলা হবে সাংবাদিকদের সুবিধার্থে।

৪। **সম্প্রচার সময় বরাদ্দ :** অবাধ ও পক্ষপাতহীন নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন সরকারি গণমাধ্যম অর্থাৎ দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বিগত নির্বাচনে তাদের ফলাফলের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করবে যেখানে তাদের নেতা/নেত্রী তাদের আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মসূচী জনগণের উদ্দেশ্যে তুলে ধরতে পারবেন।

এই সুবিধা পাবে সব জাতীয় রাজনৈতিক দল এবং স্বীকৃত রাজ্য স্তরীয় আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল। এই প্রচারে নিম্নোক্ত

বিষয়গুলি অনুমোদিত নয়—

- প্রতিপক্ষের সমালোচনা
- অন্য দেশের সমালোচনা
- কোনও ধর্ম বা গোষ্ঠিকে আক্রমণ
- অশ্লীল ও মানহানিকর বক্তব্য
- হিংসায় প্ররোচনা
- আদালত অবমাননা
- রাষ্ট্রপতি ও বিচারব্যবস্থার অবমাননা
- ভারতের একতা, সার্বভৌমত্ব এবং সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করে এমন কোনও বক্তব্য
- কোনও ব্যক্তির নাম করে সমালোচনা

এছাড়াও দূরদর্শন ও আকাশবাণী সর্বাধিক দুটি আলোচনাচক্র (Panel Discussion) আয়োজন করে সম্প্রচার করতে পারেন যেখানে স্বীকৃত রাজনৈতিক দল তাদের মনোনীত প্রতিনিধিকে অংশগ্রহণ করতে পাঠাতে পারেন।

৫। **নির্বাচন পরিচালন সংক্রান্ত সংবাদের পর্যবেক্ষণ :** নির্বাচন কমিশন একটি ‘কন্ট্রোল রুম’ (Electronic Media Monitoring Centre) তৈরি করে গণমাধ্যমে সম্প্রচারিত নির্বাচন পরিচালন সংক্রান্ত সংবাদ পর্যবেক্ষণ বা ‘Monitoring’ করবেন এবং যদি কোনও সংবাদ নিয়ম ও নীতির পরিপন্থী হয় তাকে উল্লেখ করে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন অর্থাৎ বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমকে সেই সংবাদ প্রত্যাহার করতে হবে।

৬। **নির্বাচন চলাকালীন গণমাধ্যমের জন্য কমিশনের নির্দেশিকা :** নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচন শেষ হওয়ার আধঘণ্টা পরে পর্যন্ত কোনও বুথ ফেরৎ সমীক্ষা প্রকাশ করা যাবে না, একইভাবে কমিশন বারংবার প্রতিটি গণমাধ্যমকে নিরপেক্ষ থাকতে বলছে যাতে তাদের সম্প্রচারের দ্বারা কোনও দল বা প্রার্থী যেন সুবিধা না পান।

কোনও অভিনেতা/অভিনেত্রী যিনি নির্বাচনে প্রার্থী, তাঁর চলচ্চিত্র/সিরিয়াল সম্প্রচার করা যাবে না।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা থেকে বিরত থাকুক গণমাধ্যম এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সীমা ‘People’s Representation Act’-এর ১২৬নং ধারায় বর্ণিত আছে যা গণমাধ্যম মানতে বাধ্য।

এছাড়াও নির্বাচন কমিশন বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগুলিকে NBSA-র আচার সংহিতা, এবং মুদ্রণ মাধ্যমকে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের আচার সংহিতা মেনে চলতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

এছাড়াও নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যস্তরে এবং জেলাস্তরে নির্দিষ্ট করে প্রকাশিত সংবাদ ও বিজ্ঞাপন নীতিমালা লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা তা দেখে।

১.৪.৮ সারাংশ

ভারতে নীতিনিষ্ঠতা সর্বক্ষেত্রেই তলানিতে এসে ঠেকেছে। বৃহৎ জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, সামাজিক অবক্ষয় এবং দুর্নীতি এর মূল কারণ। গণমাধ্যম সমাজের বাইরে নয় তাই এর গায়েও এই নীতিহীনতার আঁচ বেশ ভালোরকমই লেগেছে। একথা মনে রাখতে হবে যে বর্তমানে বহু মানুষের রুটি-রুজি এই শিল্পের সাথে যুক্ত। গণমাধ্যম সংস্থার লক্ষ্য এখন আর নীতিনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, সৎ সাংবাদিকতা নয় বরং উত্তেজক, অতিরঞ্জিত, ভ্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে সস্তা

জনপ্রিয়তা লাভ করা এবং সেই সস্তা জনপ্রিতয়াকে কাজে লাগিয়ে সরকার এবং কর্পোরেট জগতের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন রাজস্ব আদায়। এই বিজ্ঞাপন পেতে গিয়ে তারা বারবার নৈতিক আপোষ করছে সরকার ও কর্পোরেট সংস্থাগুলির সাথে। ফলে, জনস্বার্থ রক্ষা করতে তারা ব্যর্থ হচ্ছে, মানুষের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তথাপি, সাংবাদিকতার ছাত্র-ছাত্রীদের নীতিশাস্ত্র পড়ানো হচ্ছে এই আশায় যে তারা পেশাদারি ক্ষেত্রে নীতিনিষ্ঠ থাকবেন, পরিচালক ও সম্পাদককে নীতির মহত্ত্ব বোঝাবেন। দেখা গেছে ঐতিহাসিকভাবে, যে সংবাদমাধ্যম নীতিনিষ্ঠ থেকেছে তার বিশ্বাসযোগ্যতায় চিড় ধরেনি এবং দীর্ঘদিন ধরে মানুষের হৃদয়ে তার জায়গা দৃঢ় হয়েছে। অপরদিকে, বহু জনপ্রিয় কাগজ/চ্যানেল নীতিহীনতায় ভুগে উঠে গেছে বাজার থেকে। আগামীদিনে এই নানারকম গণমাধ্যমের ভিড়ে মানুষ কিন্তু তার মাধ্যম বেছে নেবেন। সেই মাধ্যমকেই বাছবেন যে সত্য পরিবেশন করবে, যে নির্ভরযোগ্য। তাই সাংবাদিকতার নীতি সর্বদাই প্রাসঙ্গিক।

১.৪.৯ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন।

(ক) গণমাধ্যমের সাবেকি মালিকানার ধররগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(খ) গণমাধ্যমের মালিকানার সাম্প্রতিক ধারা বর্ণনা করুন।

(গ) কীভাবে গণমাধ্যমে মালিকানা নৈতিকতাকে প্রভাবিত করছে উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) আচার সংহিতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করুন।

(ঙ) নির্বাচন কমিশন গণমাধ্যম সংক্রান্ত যে আচরণবিধি প্রণয়ন করেছেন তার বর্ণনা করুন।

২। টীকা লিখুন :

(ক) ব্যক্তিগত মালিকানা

(খ) পার্টনারশিপ মালিকানা

(গ) কর্পোরেশন

(ঘ) গ্রুপ মালিকানা

(ঙ) ক্রস মিডিয়া মালিকানা

(চ) চেন মালিকানা

(ছ) কংগ্লোমোরেট

(জ) ওমবুডসম্যান

(ঝ) ভারতের প্রেস কাউন্সিল

(ঞ) নীতিমালা

১.৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. *Ethics in Journalism* — Ron F Smith

২. *সংবাদ প্রতিবেদন* — ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৩. *সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত* — ড. নন্দলাল ভট্টাচার্য
৪. *Norms of Journalistic Conduct* (2010) — Press Council of India
৫. *ইউনেস্কো ওয়েবসাইট*
৬. SPJ ওয়েবসাইট
৭. এডিটর্স গিল্ড অব ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট
৮. ভারতের নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট
৯. *গণমাধ্যম পরিচালন ব্যবস্থা* — ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

মডিউল - ২ : ভারতের প্রেস / মিডিয়া আইনগুলির ইতিহাস

একক ১ ❐ ভারতীয় সংবিধানের প্রাথমিক ধারণা

গঠন

২.১.১ উদ্দেশ্য
২.১.২ প্রস্তাবনা
২.১.৩ ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
২.১.৪ মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্য
২.১.৫ বাক্ স্বাধীনতার অধিকার
২.১.৬ তথ্যের অধিকার
২.১.৭ জরুরি অবস্থা ও গণমাধ্যমের ওপর তার প্রভাব
২.১.৮ সারাংশ
২.১.৯ অনুশীলনী
২.১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- ভারতের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য
- মৌলিক অধিকারের পরিধি
- বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্র
- তথ্যের অধিকার-এর পরিসীমা
- জরুরি অবস্থা এবং তার প্রভাব

২.১.২ প্রস্তাবনা

গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর উপর ভিত্তি করে রচিত সংবিধান ভারতের শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্তা। ভারতের নাগরিক জীবন প্রেসের কার্যক্ষেত্রও নিয়ন্ত্রণ করে এই সংবিধান। এমনকি বাক্-স্বাধীনতার অধিকার, তথ্যের অধিকার এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ধারণার উৎস হ'ল সংবিধানে বর্ণিত আইন। গণমাধ্যম এর দায়িত্ব এবং অধিকারের ধারণাগুলিও সংবিধান থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে। এই কারণেই গণমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংবিধান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা আবশ্যক।

২.১.৩ ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি এই সংবিধান ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ শুরু করে। তবে এই সংবিধানের কিছু বৈশিষ্ট্য অন্যান্য দেশের

সংবিধানের তুলনায় একে অনন্য করে তুলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৯ সালে সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭১ বার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে এবং তার ফলে মূল সংবিধানের থেকে বর্তমান সংবিধান বহু বিষয়েই পৃথক। সংক্ষেপে ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **বৃহত্তম সংবিধান :** ভারতের সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম এবং সর্বাপেক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যাকারী সংবিধান হিসেবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে ও বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে সংবিধান এর আকার বেড়ে গেছে। শুধুমাত্র দেশ শাসনের মৌলিক নীতি নয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থাও এই সংবিধানে উল্লেখিত হয়েছে। বহু ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন জাতিবিশিষ্ট দেশ হওয়ায় বিশেষ সমস্যাগুলি নিয়েও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২। **যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ব্যাখ্যা :** ভারতীয় সংবিধান কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যগুলির সম্পর্ক এবং রাজ্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় ও বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩। **নমনীয়তা বেশি :** ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাঁর নমনীয়তা। সংবিধানের কয়েকটি উপধারা সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভাগুলির অর্ধেকের সমর্থন যথেষ্ট। অন্যান্য ক্ষেত্রে সংসদে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে সংবিধান পরিবর্তন সম্ভব। শুধুমাত্র সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নয়। কোন ধারায় কোনও অভাব অনুভূত হলে তা পূরণ করার ক্ষমতা ভারতীয় সংবিধানে প্রদান করা হয়েছে।

৪। **সংবিধানের লিখিত ও সংসদীয় সার্বভৌমত্ব সমন্বয় সাধন :** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মূল কথা, 'মৌলিক বিধি' এবং ইংল্যান্ডের অলিখিত সংবিধানের মূলকথা 'সংসদীয় সার্বভৌমত্বের' সিদ্ধান্তের মিলন ঘটেছে ভারতীয় সংবিধানে।

৫। **সংবিধানে প্রচলিত প্রথার ভূমিকা :** যেসব বিষয়ে সংবিধানের পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়নি অথবা সংবিধানে ঘোষিত নীতির বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোনও অভাব অনুভূত হয়, তবে সেক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রশাসন করা যেতে পারে।

৬। **মৌলিক অধিকার ও সাংবিধানিক প্রতিকার :** ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের ছটি মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এগুলি হল :

ক. সাম্যের অধিকার
খ. বিশেষ স্বাধীনতার অধিকার
গ. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার
ঘ. ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার
চ. সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অধিকার
ছ. সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার

আদালত এর সাহায্যে সংবিধানিক প্রতিকারের মাধ্যমেই অধিকারগুলি বলবৎ করা যেতে পারে।

৭. **বিচার পর্যালোচনা ও সংসদীয় সর্বোচ্চতার মধ্যে আপোষ :** ভারতীয় সংবিধানে বিচার ব্যবস্থা পর্যালোচনায় ক্ষমতাবান এবং স্বাধীন বিচারকবর্গকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে সংসদীয় সার্বভৌমত্ব এবং বিচার পর্যালোচনা সমন্বয় সাধিত হয়েছে। পরিষদীয় মণ্ডল এর ক্ষমতা বহির্ভূত কোনো বিধিকে আদালত যেমন অসাংবিধানিক

বলে বর্ণনা করতে পারে, ঠিক তেমনি যদি দেখা যায় যে বিচারক-বর্গ অবাঞ্ছিতভাবে অত্যাধিক হস্তক্ষেপ করছে তবে কেন্দ্রীয় সংসদ যাতে সংবিধানের বেশিরভাগ অংশবিশেষ সংখ্যাধিক্যে সংবিধান সংশোধন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে দুটি সর্বোচ্চ ক্ষমতার মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে।

৮. **মৌলিক অধিকার পরিষদীয় মণ্ডল এর ন্যায় সম্মত নিয়ন্ত্রণের অধীন :** ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হলেও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও রাষ্ট্রের কল্যাণের স্বার্থে এই অধিকার প্রত্যাহার করা হতে পারে। আবার কতগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আদালতের সংরক্ষণের আশা না করে মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানের শর্ত অনুযায়ী বিধানমণ্ডলের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

৯. **সংবিধানে সামাজিক সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে :** শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয় ভারতীয় সংবিধানের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক স্বীকৃতি স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম-বর্ণ-জাতি লিঙ্গ ও জন্মস্থান এর ভিত্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় কোনো নাগরিককে চাকরি থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না এবং সর্বজনীন স্থানে প্রবেশ করা বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

১০. **মৌলিক কর্তব্য দ্বারা মৌলিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ :** মূল সংবিধানে উল্লেখিত না হলেও ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে মৌলিক অধিকারগুলিকে সীমিত করার জন্য মৌলিক কর্তব্য যোগ করা হয়েছে। তবে এই কর্তব্যগুলি আদালতের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না।

১১. **সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া সার্বজনীন ভোটাধিকার :** ভারতীয় উপমহাদেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনের সময় প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক তার ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম।

১২. **সংসদীয় শাসন পদ্ধতির সঙ্গে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি :** ভারতীয় শাসনতন্ত্র মূলত প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভার সাহায্যে পরিচালিত হলেও নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। তবে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে তিনি কাজ করেন এবং একমাত্র ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে তাকে পদ থেকে অপসারিত করা যায়।

১৩. **যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি :** ভারতীয় শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বেশী ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় রাজ্যগুলির ক্ষমতা গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিকে একক শক্তি বা শাসক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষমতা ভারতীয় সংবিধানে প্রদান করা হয়েছে।

১৪. **দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তি :** ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রায় ৫৫২ টি দেশীয় রাজ্যকে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করে ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ডরূপ দান করা হয়। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে এই শাসন ব্যবস্থা প্রযোজ্য হয়।

ভারতবর্ষের সংবিধান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানের সেরা নির্যাস নিয়ে তৈরি হলেও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে এই সংবিধান মূলত ব্রিটেন, আমেরিকা ও আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বেশি দেখতে পাওয়া যায়। তবে সংবিধানের রচয়িতাদের গুণে এই সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম ও অন্যতম সেরা সংবিধানে পরিণত হয়েছে।

২.১.৪ মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্য

প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডক্টর দুর্গাদাস বসু বলেছেন রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার হল মৌলিক অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ আছে। এই অধিকার

মূলত ছয় প্রকার।

- সাম্যের অধিকার
- স্বাধীনতার অধিকার
- শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার
- ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার
- সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার
- সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

পূর্বে সম্পত্তির অধিকারের ও মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ছিল। ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের পর তা মৌলিক অধিকার রূপে গণ্য হয় না। সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি ভারতের বহুত্ববাদী সমাজ ও গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভরূপে পরিগণিত হয়। মৌলিক অধিকারগুলি নিরঙ্কুশ নয়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে মৌলিক অধিকারসমূহের উপর বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে।

- রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা
- বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীমূলক সম্পর্ক
- শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ
- আদালত অবমাননা
- মানহানি
- অপরাধ বা অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা দেওয়া
- অশালীনতা ও অসদাচার

এছাড়াও জরুরী অবস্থা, সামরিক শাসন জারি থাকলেও মৌলিক অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রিত বা খর্বিত হতে পারে।

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য:

অধিকার এবং কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক। মূল সংবিধানে মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন উল্লেখিত হলেও নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য বিষয়ে কোনো আলোচনা ছিল না। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীতে সংবিধানের চতুর্থ অংশে নাগরিকদের দশটি মৌলিক কর্তব্য সংযুক্ত হয়েছে। সেগুলি হল:

- সংবিধানকে মান্য করা এবং সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন,
- স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আদর্শকে সংরক্ষণ ও অনুসরণ,
- ভারতের সার্বভৌমত্ব ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ,
- দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ,
- ধর্মীয়, ভাষাগত, আঞ্চলিক ও জাতিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের

বিকাশ ঘটানো এবং নারীর পক্ষে অমর্যাদাকর প্রথাসমূহ বর্জন,

- ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে সম্মান প্রদান ও সংরক্ষণ,
- বনভূমি, হ্রদ, নদনদী বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জীবিত প্রাণীদের প্রতি মমত্ব প্রদর্শন,
- বিজ্ঞানসম্মত মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারসূচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার সাধন,
- সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন,
- সমস্ত রকম ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মোদ্যোগকে উন্নত মান প্রদান করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যকলাপের উৎকর্ষ সাধন।

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির সমূহের সঙ্গে সংযুক্ত। ফলে এগুলি পালন করার কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই, তাই এইগুলি অমান্য করলে আদালতে প্রতিকারও সম্ভব নয়। কারণ নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা যায় না, এগুলি কেবল নাগরিকদের উন্নত জীবনের প্রকাশ বলে চিহ্নিত করা যায়।

২.১.৫ বাক্ স্বাধীনতার অধিকার

সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে স্বাধীনতার অধিকার আছে তা আমরা আগেই দেখেছি। সংবিধানের ১৯-২২ নম্বর ধারায় এই অধিকার উল্লেখিত। ১৯(১)-ক ধারায় বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে এটি একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই অধিকার অনুসারে ভারতের প্রতিটি নাগরিক নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, আদর্শ অনুযায়ী মতামত প্রকাশ করতে পারেন। এই মতামত লিখিত বা মৌখিক উভয় প্রকারই হতে পারে। চিঠিপত্র, পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা, সংবাদপত্র বা অন্যান্য গণমাধ্যম, সভা-সমিতি, বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সরকারি বিভিন্ন কাজকে বা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মানুষের কাছে তুলে ধরা সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমগুলির প্রয়োজনীয় কাজ। মতামত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতের সংবিধানে প্রেসের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞের মতে এটি বাক্-স্বাধীনতার অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯৫০ সালে দুটি মামলার রায় সুপ্রিম কোর্ট একই মত ব্যক্ত করে।

ভারতীয় সংবিধানে ১৯(২) ধারায় বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকারের ওপর কতগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এগুলি হল :

- ভারতে সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় সংহতি রক্ষা,
- রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা,
- বৈদেশিক রাষ্ট্রের মৈত্রীমূলক সম্পর্ক রক্ষা,
- দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা,
- আদালত-অবমাননা না করা,
- মানহানি না করা,
- অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা না দেওয়া।

এছাড়া পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে জরুরি অবস্থা ও সামরিক শাসন জারি থাকলে মৌলিক অধিকার খর্বিত হয়।

২.১.৬ তথ্যের অধিকার

তথ্যের অধিকার বলতে তথ্য চাওয়া, পাওয়া এবং প্রদান করার অধিকারকেই বোঝানো হয়। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘে মানবাধিকার সম্পর্কিত সনদের নির্দেশাবলী তে বলা হয় সকল মানুষের মতামত গ্রহণ এবং তা প্রদান করার অধিকার রয়েছে। এরই অন্তর্ভুক্ত হল কোনও মধ্যস্থতা বা প্রভাব ব্যতীত মতামত গ্রহণের পরিবেশ এবং তথ্য চাওয়া, পাওয়া এবং প্রদান করার অধিকার।

আমাদের দেশে তথ্যের অধিকার সংবিধানসম্মত। কিন্তু প্রেস স্বাধীনতার মতোই এটিও সরাসরি উল্লিখিত নেই। কিন্তু সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এটিও বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন মামলার শুনানিতে আদালতও এই বক্তব্য প্রকাশ করেছে। এর যুক্তিও সহজবোধ্য। যথাযথ তথ্যের যোগান ব্যতীত কোনও মানুষের পক্ষে নির্ভুল মত প্রকাশ সম্ভব নয়। মতপ্রকাশের অধিকারের সঙ্গে প্রেসের স্বাধীনতা সম্পর্কিত। তথ্যের অধিকার এবং প্রেসের স্বাধীনতা একদিক থেকে পরস্পর সম্পর্কিত। অপরপক্ষে এই দুই অধিকার গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর অপরিহার্য উপাদান।

তথ্যের অধিকারএ দুটি স্তর আছে। একটি তথ্য জানানোর অধিকার এবং অপরটি তথ্য জানার অধিকার। তথ্য প্রকৃতপক্ষে মানুষকে শক্তিশালী ও শিক্ষিত করার সম্পদ। এতে গণতন্ত্রও বিকাশ লাভ করে। মতামত প্রকাশের স্বচ্ছতা গণতান্ত্রিক সমাজের সামনে প্রাথমিক শর্ত। তথ্যের সমান ধারা ব্যতীত তা বাস্তবিকভাবেই সম্ভব নয়। তথ্যের একমুখী ধারা কখনোই গণতন্ত্রকে পুষ্ট করে না। তথ্যের দ্বিমুখী ধারা মানুষের জানার পরিধি ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে। সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ হলে তবেই বাক্-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার যথাযথভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। আমাদের দেশের মতো গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোতে দেশের নাগরিকরাই তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য জানা না থাকলে নির্বাচনে জনগণের রায় গণতন্ত্রকে সঠিক অর্থে সমৃদ্ধ করবে না। সরকারের পক্ষ থেকেও যদি তথ্যের স্বচ্ছ প্রবাহ চালু না রাখা হয় তবে গণতন্ত্র চরিত্রকেও খর্ব করবে। দ্বিতীয় প্রেস কমিশন এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সরকারি গোপনীয়তা আইন ১৯২৩-এ কিছু পরিমার্জন সুপারিশ করেছিল। এক্ষেত্রে কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার কে আরোও মর্যাদা দেওয়া।

১৯৯৬ সালে ভারতের প্রেস কাউন্সিল তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত একটি খসড়া বিল প্রস্তাব করে দেশব্যাপী বিতর্ক আহ্বান করে। এর মাধ্যমে কাউন্সিল সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। ১৯৯৭ সালে তথ্যের অধিকার বিল (রাইট টু ইনফরমেশন বিল, ১৯৯৭) যৌথভাবে প্রস্তুত করে প্রেস কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ রুরাল ডেভলপমেন্ট (NIRD)। এই বিলে প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে রাষ্ট্রীয় সংস্থা তাদের কার্যাবলীর সমস্ত তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে। কোনও ব্যক্তি লিখিতভাবে কোনও তথ্য চাইলে রাষ্ট্র ও সংস্থার কর্তৃপক্ষকে তার উত্তর লিখিতভাবে দিতে হবে। এমনকি কোনো কারণে উত্তর দিতে না চাইলে তাও লিখিতভাবে জানাতে হবে। তথ্যের অধিকার সুরক্ষিত হচ্ছে কিনা তা নজরদারি করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ফ্রিডম অফ ইনফর্মেশন গঠন করার প্রস্তাব বিলে আছে। রাজ্য সরকারগুলিকে প্রয়োজনবোধে রাজ্য স্তরে স্টেট কাউন্সিল ফর ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন গঠন

করার ক্ষমতা দেওয়ার কথাও এই বিলে উল্লেখিত হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, তথ্যের অধিকার যেমন দ্বিমুখী তেমনই তার শিকর প্রোথিত আছে সরকার ও জনগণ দুপক্ষের চেতনার ওপর। সঠিক তথ্য জ্ঞাপন যেমন সরকার তথা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, তেমনি সঠিক তথ্য পাওয়া নাগরিকের স্বীকৃত অধিকার। গণমাধ্যমের বস্তুনিরপেক্ষ চরিত্র এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এসবের সমন্বয়েই তথ্যের অধিকার এক সঠিক আঙ্গিক লাভ করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্র সরকার তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন জারি করেছে ২০০৫ সালে। এর ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সাধারণ নাগরিককে তথ্য সংগ্রহের বিধিবদ্ধ অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যদিও বাক্-স্বাধীনতা প্রয়োগের মত তথ্যের অধিকার ও কিছু নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ। তাছাড়া, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকেও নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের অধিকার এই আইন দেয়নি।

২.১.৭ জরুরি অবস্থা এবং গণমাধ্যমের ওপর তার প্রভাব

'জরুরি অবস্থা' বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যেখানে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের কারণে দেশের সমগ্র অথবা কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়েছে। সংবিধান অনুসারে এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির মনে এ সম্বন্ধে স্থির ধারণা হলে অথবা সেরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এই ধারণা হলেও তিনি জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির কাছে এ বিষয়ে লিখিত সুপারিশ করলে তবেই তিনি জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি সাধারণত তিন প্রকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন :

১) জাতীয় জরুরি অবস্থা অর্থাৎ যুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে;

২) রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন অর্থাৎ রাজ্যে সাংবিধানিক বিধি—ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে এবং

৩) অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা।

সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুযায়ী জাতীয় জরুরি অবস্থা প্রথম জারি হয়েছিল ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময়। ১৯৭১ বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থা দ্বিতীয়বার কার্যকর হয়। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সুপারিশক্রমে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ক্ষেত্রে গভীর বিপদের কারণে ৩৫২ ধারা বলে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রথম জারি হয় ১৯৫৯ সালে। তারপর থেকে সত্তর বারের বেশি এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। তবে আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার নজির এখনো নেই।

জরুরী অবস্থা জারী থাকাকালীন রাষ্ট্র অনুচ্ছেদ ১৯ কর্তৃক আরোপিত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ এই অবস্থায় ১৯ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ৬টি স্বাধীনতা-বাক্-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সম্মিলনের স্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতা, অধিবাস বা স্থায়ীভাবে বসবাসের স্বাধীনতা এবং বৃত্তি, পেশা, বাণিজ্য ও ব্যবসার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হয়। খুব সহজেই বোধগম্য হয় যে এই অবস্থায় প্রেসের স্বাধীনতাও খর্ব হতে বাধ্য।

১৯৭৫ সালে জারি হওয়া জরুরি অবস্থায় প্রেসের বিরুদ্ধে নানান রকম দমনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য নিয়ে সংবাদপত্রগুলি বাড়াবাড়ি করছে এই অভিযোগ করা হয়। এই অবস্থায় কোনও সংবাদ প্রকাশের পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় আধিকারিকের সম্মতি জোগাড় করতে হতো, তদানীন্তন সমস্ত সংবাদপত্র দেখলে দেখা যাবে বহু না—ছাপা অংশ। এগুলি আসলে কেন্দ্রীয় আধিকারিকের অনুমোদিত। এই সময়ে, 'প্রেস কাউন্সিল আইন' ও বাতিল করা হয়েছিল। এমনকি ভারতের তৎকালীন চারটি সংবাদসংস্থা পিটিআই, ইউএনআই,

হিন্দুস্থান সমাচার এবং সমাচার ভারতীর সংযুক্তি ঘটিয়ে একটি সংবাদ সংস্থা 'সমাচার' তৈরি হয়। এই সময়ে বহু ক্ষেত্রে সংসদ এবং বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার কার্যাবলীও সংবাদপত্রের প্রকাশে বাধা ছিল। ৫১ জন সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকের অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দেয়। ৭ জন বিদেশী সাংবাদিককে ভারত থেকে বিতাড়ন করা হয়।

২.১.৮ সারাংশ

এই এককে আমরা সংক্ষেপে ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনার মূল পরিপ্রেক্ষিত হল গণমাধ্যমের সঙ্গে সংবিধানের সম্পর্ক। সংবিধান প্রদত্ত যে নাগরিক অধিকারগুলি সরাসরি বিধিবদ্ধ সেগুলিই প্রকৃতপক্ষে বাক্-স্বাধীনতা ও তথ্যের অধিকার এর মত গুরুত্বপূর্ণ ধারণার ভিত্তি। নাগরিক অধিকারের সঙ্গে নাগরিক দায়িত্বের সম্পর্ক যে পরস্পরের পরিপূরক তা আলোচিত হয়েছে। গণমাধ্যমের ওপর স্বৈরতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ এবং তার বাস্তব চিত্রও এই এককে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১.৯ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন।

ক. ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

খ. মৌলিক অধিকার কাকে বলে? মৌলিক অধিকার বলতে কোন কোন অধিকার বোঝায়? এই অধিকার কি নিরঙ্কুশ?

গ. তথ্যের অধিকার বলতে কী বোঝায়? এটা কি সংবিধানসম্মত? এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

ঘ. জরুরি অবস্থা বলতে কী বোঝায়? ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমের উপর তার প্রভাব আলোচনা করুন।

২। টীকা লিখুন :

(ক) মৌলিক অধিকার

(খ) মৌলিক কর্তব্য

(গ) বাক্-স্বাধীনতার অধিকার

২.১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. *Introduction to the Constitution of India*—D. D. Basu

২. *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি* - সত্যসাধন চক্রবর্তী

৩. *ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা*- নিতাই প্রামাণিক

একক ২ ❐ সংবাদপত্র এবং পুস্তকের নিবন্ধীকরণ আইন, ১৮৬৭, সরকারি গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩, রচনা স্বত্ব আইন, ১৯৫৭

গঠন

২.২.১ উদ্দেশ্য

২.২.২ প্রস্তাবনা

২.২.৩ সংবাদপত্র এবং পুস্তকের নিবন্ধীকরণ আইন, ১৮৬৭

২.২.৪ সরকারি গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩

২.২.৫ রচনা স্বত্ব আইন, ১৯৫৭

২.২.৬ সারাংশ

২.২.৭ অনুশীলনী

২.২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল-

- উল্লেখযোগ্য আইন গুলি সম্পর্কে বিশদ ধারণা
- সংবাদপত্র এবং পুস্তকের নিবন্ধীকরণ আইন, ১৮৬৭
- সরকারি গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩
- রচনা স্বত্ব আইন, ১৯৫৭

২.২.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি ভারতের প্রেস আইন সম্পর্কিত। প্রেস আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আমাদের আগের মডিউলে এর আলোচনায় পাওয়া গেছে। এই এককটি ভারতবর্ষে প্রেস আইনের বিবর্তন এবং উল্লেখযোগ্য প্রেস আইনগুলির বিষয় সম্পর্কিত।

২.২.৩ সংবাদপত্র এবং পুস্তকের নিবন্ধীকরণ আইন, ১৮৬৭

সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনগুলির মধ্যে প্রাচীনতম আইনটি এখনো প্রয়োগ করা হয়, এবং তা হল সংবাদপত্র ও পুস্তক নিবন্ধীকরণ আইন। ১৮৬৭ সালে এই আইন প্রণীত হয়। সংবাদপত্র প্রকাশনার এবং ছাপাখানা পরিচালনার নিয়মের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক আইন হিসেবে এটি স্বীকৃত। যদিও কোনও সংবাদপত্র শুরু করা বা চালু রাখার জন্য কোনও লাইসেন্স বা অনুমতির প্রয়োজন হয় না, তবুও এই আইনের নির্দেশ না মেনে কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করা যায়

না। সংবাদপত্র প্রকাশের আগে নির্দিষ্ট প্রথায় জেলাশাসক, প্রেসিডেন্সি অথবা সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঘোষণা করতে হয়। অনুরূপভাবে ছাপাখানা শুরু করার আগেও সংশ্লিষ্ট ঘোষণা করতে হয়।

এই আইনের ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতের মধ্যে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মুদ্রকের নাম, মুদ্রণের স্থান, প্রকাশকের নাম প্রকাশ করতে হবে। কোনও সংবাদপত্র বা পুস্তক মুদ্রণের জন্য ছাপাখানা স্থাপন করতে হলে স্থানের বর্ণনা দিয়ে জেলাশাসক, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে একটি ঘোষণা করতে হবে। ছাপাখানার স্থান পরিবর্তিত হলে প্রত্যেকবারই ঘোষণা করা জরুরি। কিন্তু যদি একই ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে পরবর্তীতে নতুন স্থানটি অবস্থিত হয়, সেক্ষেত্রে ছাপাখানার মালিক যদি একই হন এবং পরিবর্তন মেয়াদের ৬০ দিনের কম হয়, তবে নতুন কোনো ঘোষণা দরকার পড়ে না। সেক্ষেত্রে, স্থান পরিবর্তনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে জানানোই যথেষ্ট।

একটি সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য দুটি শর্ত পূরণ করা জরুরি। প্রথমত, সংবাদপত্রের প্রতিটি কপিতে পরিষ্কারভাবে সম্পাদকের নাম উল্লেখ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ যে জেলাশাসক, প্রেসিডেন্সি বা সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ অঞ্চলে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হবে, তার কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করে একটি ঘোষণা করতে হবে:

ক) মুদ্রক এবং প্রকাশকের নাম

খ) মুদ্রণ ও প্রকাশনার স্থান

গ) সংবাদপত্রের নাম, ভাষা এবং প্রকাশকাল। মুদ্রক এবং প্রকাশক নিজে অথবা কোন অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে এই ঘোষণা করবেন। যদি মুদ্রক বা প্রকাশক সংবাদপত্রের মালিক না হন, সেক্ষেত্রে ঘোষণাটিতে মালিকের নাম উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ঘোষণা করলেই সংবাদপত্র প্রকাশের কাজ শুরু করা যায় না। উক্ত বা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সম্মতি দেওয়ার পরই প্রকাশনা শুরু করা সম্ভব। নাম, ভাষা অথবা প্রকাশকাল যতবার পরিবর্তিত হবে ততবার নতুন ঘোষণা করতে হবে। অনুরূপভাবে, সংবাদপত্রের মালিকানা বা প্রকাশনা ও মুদ্রণের স্থান বদল হলে নতুন ঘোষণা করতে হয়। যদি স্থানের পরিবর্তন ৩০ দিনের কম সময়ের জন্য হয়, তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি বিবৃতি দেওয়াই যথেষ্ট। যদি মুদ্রক বা প্রকাশক ৯০ দিনের বেশি সময়ের জন্য দেশের বাইরে যান অথবা অন্য কোনও কারণে ৯০ দিনের বেশি সময়ের জন্য তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তবে নতুন করে ঘোষণা করতে হয়।

দেশের স্বাভাবিক নাগরিক নন অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক এমন কারোর পক্ষে কোনও ঘোষণা করা অথবা সংবাদপত্র সম্পাদনা করা সম্ভব নয়। যদি আইন অনুযায়ী ঘোষণা করা হয় এবং একই রাজ্যে একই নামে বা একই ভাষায় কোনও পত্রিকা না থাকে তবে জেলাশাসক ঘোষণাটি কে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন। তবে প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার আগে সংবাদপত্রের রেজিস্টার অফ নিউজপেপার ফর ইন্ডিয়ার কাছ থেকে অন্য কোন পত্রিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুসন্ধান করতে হয়। এই অনুমতি প্রদান কোন বিচারবিভাগীয় কাজ নয়, এটি একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং কোনরকম স্বেচ্ছাচারিতা ব্যতীত ম্যাজিস্ট্রেট এই দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকেন।

অনুমতি পাওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংবাদপত্র বা পত্রিকা অবশ্যই শুরু করতে হয়। যে সংবাদপত্র সপ্তাহে বা তার বেশি বার প্রকাশিত হবে বলে ঘোষিত হয়েছে, তাদের ৬ সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশনা শুরু করতে হবে। অন্যান্য সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা তিন মাস। অর্থাৎ দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অতি অবশ্যই ৬ সপ্তাহের

মধ্যে প্রকাশনা শুরু করতে হবে এবং পাক্ষিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা ৩ মাসের মধ্যে প্রকাশনা শুরু করতে পারে।

অনিয়মিত প্রকাশনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণা বাতিল করতে পারেন। এবং প্রকাশনা বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারেন। যদি কোনও সংবাদপত্র ঘোষণা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যারও কম প্রকাশে সক্ষম হয়, তবে তার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিন মাসের মধ্যে কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক সংবাদপত্র যদি নির্দিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারে, তবে সে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবে। আবার শুরু করার আগে নতুন করে ঘোষণা করতে হবে।

এই আইন অনুযায়ী সংবাদপত্রের প্রতিটি সংস্করণের দুটি কপি এবং প্রতিটি বইয়ের তিনটি কপি নির্দিষ্ট প্রথায় সরকারের কাছে বিনামূল্যে পাঠাতে হবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কারণ দেখানোর সুযোগ দেওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সন্তুষ্ট হলে ঘোষণাটি বাতিল করতে পারেন। বিষয়গুলি হল :

ক) এই আইন বা নিয়ম না মেনে সংবাদপত্রটির প্রকাশিত হচ্ছে, অথবা

খ) একই ভাষা বা একই রাজ্যে অস্তিত্বশীল কোন সংবাদপত্রের একই নাম বা এক ধরনের নামে কোনও সংবাদপত্র আছে, অথবা

গ) প্রকাশক অথবা মুদ্রকের মৃত্যু হয়েছে, অথবা

ঘ) কোনও তথ্য গোপন করে ঘোষণাটি করা হয়েছে,

প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাপেলেট বোর্ডের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানো যেতে পারে। এই বোর্ডে একজন চেয়ারম্যান এবং ভারতীয় প্রেস কাউন্সিলের মনোনীত একজন সদস্য থাকেন।

শাস্তি

যদি কোনও সংবাদপত্র অথবা পুস্তকে মুদ্রক এবং প্রকাশকের নাম পরিষ্কার এবং পাঠযোগ্য ভাবে ছাপা যদি না হয় এবং মুদ্রক অথবা প্রকাশনার স্থান যদি পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত না হয়, তবে মুদ্রক অথবা প্রকাশকের ২০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে, পাশাপাশি ৬ মাসের জেল হতে পারে আবার দুটি শাস্তিই হতে পারে। ঘোষণা ছাড়া কোন ছাপাখানা চালু রাখা হলে অথবা নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে সম্পাদনা, মুদ্রণ এবং প্রকাশনার কাজ হলে একই শাস্তি হতে পারে। উপরন্তু, শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদপত্রের ঘোষণা বাতিল করে দিতে পারেন। সংবাদপত্রের কপি সরবরাহ এর নীতি লঙ্ঘিত হলে প্রত্যেক বারের জন্য ৩০ টাকা জরিমানা হবে। কোন পুস্তক এর ক্ষেত্রে এই অপরাধের জন্য বইয়ের কপির মূল্যের সমান জরিমানা করা হতে পারে।

২.২.৪ সরকারি গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩

সরকারি গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সৃষ্ট আইনগুলি সুদৃঢ় ও সংশোধন করার জন্য সরকারি গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩ সালে প্রচলিত হয়। আইনটি প্রবর্তনের সময়কাল থেকেই স্পষ্ট যে এই আইন প্রকৃতপক্ষে প্রেসের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতবর্ষ এই আইন বলবৎ রাখা বিতর্কের উর্ধ্বে ছিল না। দ্বিতীয় প্রেস কমিশনেও এই আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখিত হয়েছে। এই আইন গোটা ভারতবর্ষে প্রযোজ্য এবং সরকারি কর্মচারী ও ভারতের বাইরের বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য সমানভাবে কার্যকর। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার কারণেই এই বিশেষ আইনের উদ্ভব।

গুপ্তচরবৃত্তি দণ্ড

৩ নম্বর ধারা—যদি কোনও ব্যক্তির রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থবিঘ্নকর কোনও উদ্দেশ্যে কোনও সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করে অথবা প্রবেশ করার চেষ্টা করে অথবা কোনও নকশা, পরিকল্পনা, মডেল বা ছাঁচ, মন্তব্য বা টিকা তৈরি করে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের শত্রুদের কাছে প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয়; অথবা এই ধরনের পরিকল্পনা, টিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করে অথবা প্রকাশ করে অথবা কোন ব্যক্তির কাছে গোপন সরকারি সংকেত বা সাংকেতিক চিহ্ন জ্ঞাপন করে অথবা দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি পক্ষে ক্ষতিকারক, এমনকি অন্যান্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পক্ষে ক্ষতিকর কোনও তথ্য শত্রুর হাতে তুলে দেয়, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। যদি এই অপরাধ ভারতীয় স্থল বাহিনী নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী সংক্রান্ত হয় বা খনি, খনিজ ক্ষেত্র, কারখানা, বন্দর, শিবির, জাহাজ, স্টেশন অথবা রাষ্ট্র সংক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রে ১৪ বছরের জেল হবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের মেয়াদ হবে তিন বছর।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অপরাধ :

৪ নম্বর ধারা

১) যদি কোনও ব্যক্তি কোন বিদেশী প্রতিনিধির সঙ্গে ভারত অথবা ভারতের বাইরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এবং শত্রুপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হানিকর কোনও তথ্য তাদের হাতে তুলে দেয়, তবে তার অপরাধ তিন নম্বর ধারায় স্বীকৃত হবে।

২) কোনও পূর্বনির্ধারিত উপায় ও ধারণা ছাড়াই এই অপরাধ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে প্রমাণিত হতে পারে—

ক) কোনও বিদেশী প্রতিনিধির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি যদি

১) ভারত বা ভারতের বাইরে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বা সেখানে যাতায়াত করে;

২) ভারত বা ভারতের বাইরে, তার নাম অথবা ঠিকানার অথবা অন্য কোনও ধরনের তথ্য যদি বিদেশি প্রতিনিধির অধিকারে থাকে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পাওয়া যায়;

খ) বিদেশি প্রতিনিধি গুপ্তচর বলতে বিদেশী কোনও ব্যক্তি দ্বারা নিযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে বোঝানো, যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নিরাপত্তায় আঘাত হানতে উদ্যোগী অথবা বিদেশি রাষ্ট্রের স্বার্থে ভারতবর্ষের ভেতরে বা বাইরে এই ধরনের ক্ষতিকর কাজ সম্পাদন করেছে;

গ) ভারত অথবা ভারতের বাইরে যে কোন ঠিকানায় বিদেশী প্রতিনিধির বসবাসের যোগাযোগ রক্ষা করার এবং ব্যবসা চালানোর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই ঠিকানায় যোগাযোগ করার অর্থ সরকারি গোপনীয়তা আইন লংঘন করা।

তথ্যের ভুল জ্ঞাপন ইত্যাদি!

৫ নম্বর ধারা—যদি কোনও ব্যক্তির অধিকার এ কোনও সরকারি গোপন নথিপত্র, নকশা, পরিকল্পনা, তথ্য ইত্যাদি থাকে, যেগুলি সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা সংক্রান্ত অথবা যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বের পক্ষে ক্ষতিকর এবং শত্রুর হাতে অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে, অথবা বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, তা এই আইনের আওতাভুক্ত হবে।। সরকারের অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে এই তথ্য জ্ঞাপন করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধী বলে গণ্য হবে। এই ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হলে তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা এবং উভয় শাস্তিই প্রযোজ্য হতে পারে।

সরকারি উর্দির অনধিকার ব্যবহার, মিথ্যা, নথি পেশা জালিয়াতি, মিথ্যা বর্ণনামূলক রিপোর্ট ইত্যাদি :

৬ নম্বর ধারা—কোনও সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করা অথবা কোনও ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে সাহায্য করার জন্য কোনও ব্যক্তি যদি

ক) সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ অথবা অন্যান্য সরকারি পদ ব্যবহার করে অথবা নিজেকে এই সকল ক্ষেত্রের প্রতিনিধি বলে দাবি করে; অথবা

খ) মৌখিক বা লিখিতভাবে কোনও মিথ্যা নির্দেশ বা আবেদন অথবা তথ্যের স্বাক্ষর করে; অথবা

গ) পাসপোর্ট অথবা ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিনটি বিভাগের বা পুলিশের অনুমতিপত্র, প্রশংসাপত্র অথবা অন্যান্য প্রমাণপত্র পরিবর্তন বা জালিয়াতি করে; অথবা

ঘ) নিজেকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিরূপে দাবি করে অথবা গোপন সরকারি সংকেতের অপব্যবহার করে; অথবা

চ) সরকারি বিভাগে স্ট্যাম্প, সীলমোহর ইত্যাদি জনগণকে প্রবঞ্চনা করার জন্য ব্যবহার করে, তবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধী বলে স্বীকৃত হবে। সে ক্ষেত্রে তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা দুটি শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে।

পুলিশ অথবা সেনাবাহিনীর কার্যকলাপে অনধিকার চর্চা :

৭ নম্বর ধারা : (১) কোনও নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত এলাকার কাছে জ্ঞাতসারে কোনও পুলিশ, প্রহরী, পাহারাদার বা অনুরূপ কোনও ব্যক্তিকে বাধাদান বা তাকে ভুল পথে পরিচালিত করলে তা হবে ওই ধারার উলংঘন।

(২) এই ধারা লঙ্ঘন করলে অভিযুক্ত ব্যক্তির তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে, অথবা তার আর্থিক জরিমানা হতে পারে অথবা দুটি শাস্তি একত্রে হতে পারে।

কৃত অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য জ্ঞাপন কর্তব্য:

৮ নম্বর ধারা : (১) পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যেমন সুপারিনটেনডেন্ট বা অন্যান্য আধিকারীকগণ যারা নগরপাল অথবা ইন্সপেক্টর জেনারেলের দ্বারা ক্ষমতাপ্রদত্ত, অথবা তাদের পক্ষে অথবা সেনাবাহিনীর কোন সদস্য, বা প্রহরী,

পাহারাদার প্রমুখ যদি কোনও অপরাধ বা সন্দেহজনক অপরাধ সম্পর্কে কোনও তথ্য দাবি করলে, তবে তা নিজস্ব খরচে সুবিধামতো স্থানে বা সুবিধামত সময়ে পৌঁছে দেওয়া প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য।

(২) কোনও ব্যক্তি এই তথ্য দিতে ব্যর্থ হলে, তার ৩ বছরের কারাদণ্ড বা আর্থিক জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই হতে পারে।

অপরাধের প্রচেষ্টা বা অপরাধীর অপরাধে প্ররোচনা দেওয়া :

৯ নম্বর ধারা : কোনও ব্যক্তি যদি অপরাধ সম্পাদনের চেষ্টা করে অথবা দুষ্কর্মে সাহায্য করে অথবা তা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে এই ধারায় অপরাধী বলে গণ্য হবে। কৃত অপরাধের জন্য যে শাস্তি প্রাপ্য, সেই একই শাস্তি তার হবে।

গুপ্তচরকে আশ্রয় দেওয়া :

১০ নম্বর ধারা : যদি কোনও ব্যক্তি জ্ঞাতসারে কোনও অপরাধী বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় অথবা তার অধিকারে থাকা কোন বাড়িতে এই ধরনের ব্যক্তিদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ দেয়, তবে তা এই ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ, বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রেও তিন বছরের কারাদণ্ড বা আর্থিক জরিমানা অথবা দুটিই প্রযোজ্য হতে পারে। এই সকল মামলা শুনানির ক্ষেত্রে আদালত জনসাধারণের উপস্থিতি বিশেষ ক্ষমতাবলে নিষিদ্ধ করতে পারে, কিন্তু দণ্ডাদেশ ঘোষণা জনসমক্ষে করার বিধান আছে।

২.২.৫ কপিরাইট বা রচনা স্বত্ব আইন, ১৯৫৭

সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত হলো বৌদ্ধিক সম্পদ। এগুলোকে যথেচ্ছভাবে পুনর্মুদ্রণ বা তার থেকে সাহিত্যিক চৌর্য প্রতিরোধ করতেই ১৯৫৭ সালে কপিরাইট আইনের প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত, মূল রচনাটিকে সংরক্ষণ করা এবং তার তথ্য, রচনার যথাযোগ্য মূল্য নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, রচনাটির সম্প্রসারণের প্রয়োজনে আইনে অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ বর্জন করা হয়েছে। কপিরাইট এমন এক অধিকার যা যে কোনও ব্যক্তি বৌদ্ধিক পরিশ্রমের ফলে অর্জন করেন। তাই কপিরাইট আইনের প্রথম লক্ষ্য হল যাতে অন্য কোনও ব্যক্তির সেই পরিশ্রমের সুফল অনভিপ্রেতভাবে ভোগ না করে। এই আইন অনুসারে কপিরাইটের অধিকারীর নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে এককভাবে অধিকার থাকবে :

ক. যে কোনও ক্ষেত্রে রচনা বা সৃষ্টির পুনঃপ্রকাশ;

খ. রচনাটির পুনর্মুদ্রণ;

গ. সৃষ্টিটিকে জনসমক্ষে প্রদর্শন;

ঘ. সৃষ্টি বা রচনা প্রযোজনা, প্রকাশ এবং অনুবাদ।

আন্তর্জাতিক কপিরাইট অনুসারে কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর ৫০ বছর কপিরাইট বলবৎ থাকে। ভারতে এটা ৬০ বছর। শুধুমাত্র প্রকাশিত রচনার ক্ষেত্রেই নয় অপ্রকাশিত রচনার ক্ষেত্রও কপিরাইট আইনে যুক্ত হতে পারে। ১৯১১ সালে ইংল্যান্ড এই আইন চালু হয়। আইনের ধারা ১৩(১) (ক) অনুযায়ী কোন সাহিত্য-শিল্প নাটক বা সঙ্গীতধর্মী কোন

মৌলিক সৃষ্টির অপ্রকাশিত হলেও তা কপিরাইটের আওতায় পড়বে। ১৯৮৪ সালের কপিরাইট আইনের সংশোধনীর পর থেকে অপ্রকাশিত রচনা, অনুবাদ এবং সৃষ্টির পুন-প্রকাশের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রথার প্রচলন করা হয়েছে। কপিরাইট আইন ভঙ্গকারীকে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা আর্থিক জরিমানা, বা উভয় শাস্তি হিসেবে ধার্য করা হতে পারে।

২.২.৬ সারাংশ

এই একক এর পাঠ শেষে উল্লেখযোগ্য আইনগুলির পরিধি সম্পর্কে ধারণা সাংবাদিকতার কাজকে অনেকাংশেই সম্পূর্ণ করবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।

২.২.৭ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন।

ক) সংবাদপত্র এবং পুস্তকের নিবন্ধীকরণ আইনটি আলোচনা করুন। এই আইন লঙ্ঘনের শাস্তি কী?

খ) সরকারি গোপনীয়তা আইন এর বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।

২। টীকা লিখুন :

ক) রচনা স্বত্ব আইন

খ) সরকারি গোপনীয়তা আইন

২.২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. *Laws of Press*– Dr. D.D. Basu.

২. *History of Press– Press Laws and Communication* - B. N. Ahuja

৩. *ভারতের প্রেস আইন* – বংশী মান্না (পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ)

৪. *প্রেস আইন* – কমল ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫. *বিষয় সাংবাদিকতা* – ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় (লিপিকা)

৬. *সংবিধান ও প্রেস আইন*– ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক ৩ ❑ আইনসভা প্রতিবেদনের বিধান; সংসদীয় সুযোগসুবিধা - সংসদ অবমাননা এবং সাংবাদিকতা সুরক্ষা

গঠন

২.৩.১ উদ্দেশ্য

২.৩.২ প্রস্তাবনা

২.৩.৩ আইনসভা প্রতিবেদনের বিধান

২.৩.৪ সংসদীয় সুযোগসুবিধা - সংসদ অবমাননা এবং সাংবাদিকতা সুরক্ষা

২.৩.৫ সারাংশ

২.৩.৬ অনুশীলনী

২.৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল-

- পার্লামেন্ট এবং রাষ্ট্রীয় আইনীকরণের বেসিক স্ট্রাকচার
- আইনসভা প্রতিবেদনের বিধান
- সংসদীয় সুযোগসুবিধা - সংসদ অবমাননা এবং সাংবাদিকতা সুরক্ষা

২.৩.২ প্রস্তাবনা

এই ইউনিটে আপনাকে পার্লামেন্ট বা প্রধানত সংসদে এবং রাজ্য বিধানসভায় মিডিয়া রিপোর্টিংয়ের প্রভাব এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বোঝানো হবে।

সংসদ এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের পদ্ধতি ও কাঠামো

সংসদ ভারতের সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনবিভাগ। নয়াদিল্লির সংসদ মার্গের সংসদ ভবনে এটি অবস্থিত। কোনও বিল আইনে পরিণত করতে সংসদের উভয় কক্ষে তা পাস হয়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। ভবনের সেন্ট্রাল হলটি সংসদের যৌথ অধিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। লোকসভা নামক নিম্নকক্ষ ও রাজ্যসভা নামক উচ্চকক্ষ নিয়ে ভারতের সংসদ গঠিত।

লোকসভা [Lower House]

ভারতীয় আইনসভা দুটি কক্ষে বিভক্ত—লোকসভা ও রাজ্যসভা। লোকসভায় সর্বাধিক ৫৫২ [৫৩০+২০+২] জন সদস্য হতে পারেন। ৫৩০ জনসদস্য ২৮ টি রাজ্যের জনগণের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ২০ জন নির্বাচিত হন এবং ২ জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ানকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতি পাঁচ বছরের মেয়াদে লোকসভা গঠিত হয়। মেয়াদ পূর্তির আগে সরকারের পতন হলে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। বর্তমান লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫৪৫। লোকসভা দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন স্পিকার বা অধ্যক্ষ। লোকসভায় নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হলে বা কোরাম [Quorum] না হলে স্পিকার সাময়িক কালের জন্য লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করতে পারেন। দলমত নির্বিশেষে স্পিকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

লোকসভার গঠন

(১) লোকসভার সদস্যগণ ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সের প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

(২) বর্তমানে লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪৫ জন। এর মধ্যে ৫৩০ জন সদস্য ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে এবং ১৩ জন সদস্য ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি থেকে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরাসরি ভাবে নির্বাচিত হন। কেবলমাত্র ২ জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন।

(৩) ২৫ বছর বয়সি যেকোনও ভারতীয় নাগরিক লোকসভার সদস্য হতে পারেন।

(৪) সাধারণ নির্বাচনের পর নতুন লোকসভার প্রথম অধিবেশনে সদস্যরা একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করেন এবং এই সভার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত তাঁরা সভার কাজ পরিচালনা করেন। লোকসভার সদস্যরা ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে (যেমন- লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে) রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে ৫ বছরের আগেই লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন।

লোকসভার কার্যাবলী

(১) যেকোনও বিল বা আইন-ঘটিত প্রস্তাব লোকসভায় ও রাজ্যসভায় অনুমোদন করাতে হয়।

(২) অর্থসংক্রান্ত বিল কেবলমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপন ও পাশ করাতে হয়।

(৩) সংসদে গৃহীত বিল আইনে পরিণত করতে হলে রাষ্ট্রপতির লিখিত সম্মতির প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিল পুনর্বিবেচনার জন্য আবার সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন, কিন্তু অর্থবিল একবার লোকসভায় পাশ হলে রাষ্ট্রপতি তা পুনর্বিবেচনার জন্য আর সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন না।

রাজ্যসভা

রাজ্যসভা ভারতীয় আইন সভার উচ্চ কক্ষ। এটি একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। নির্দিষ্ট সময় অন্তর লোকসভার অবলুপ্তি ও পুনর্নির্বাচন ঘটে। কিন্তু রাজ্যসভা ভেঙে দেওয়া যায় না। এর সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন। এঁদের মধ্যে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজসেবার ক্ষেত্র থেকে ১২ জন জ্ঞানীগুনী সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। এঁরা মনোনীত সদস্য

নামে পরিচিত। রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ছয় বছর হলেও প্রতি দু-বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করা হয়। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণের ভোটে রাজ্যসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হন। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান সভার দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করেন। ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজ্যসভার সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হন। বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৪৫। সরবরাহ-সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে রাজ্যসভা লোকসভার সমান মর্যাদা ভোগ করে। সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে লোকসভার ক্ষমতা রাজ্যসভার চেয়ে বেশি। কোনও বিষয় নিয়ে দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনের মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়। তবে লোকসভার আকার রাজ্যসভার প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায়, যৌথ অধিবেশনে লোকসভারই শক্তি বেশি থাকে। আজ পর্যন্ত সংসদে মাত্র তিনটি যৌথ অধিবেশন বসেছে। ২০০২ সালে সন্ত্রাস-বিরোধী আইন পোটা পাস করানোর জন্য শেষ যৌথ অধিবেশনটি বসেছিল।

২.৩.৩ আইনসভা প্রতিবেদনের বিধান

সংসদীয় প্রতিবেদকের সংসদের প্রতিটি অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিবেদন করা প্রয়োজন। তার কাজ সংসদে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয় খেয়াল রাখা। এর জন্য গভীর মনোযোগ এবং লেখার গতি দরকার। সংসদীয় সাংবাদিককে সংবিধানের নতুন আইন ও সংশোধনী এবং সভার কার্যবিধি সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার।

প্রতিবেদককে তার পর্যবেক্ষণের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে এবং কোনও হেরফের না করে বা সংবাদকে বাঁক না দিয়ে সাধারণ জনগণের কাছে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। একজন সাংবাদিককে অবশ্যই সাংবাদিকতার নীতিশাস্ত্রে আঁকড়ে থাকতে হবে।

সংসদে মূলত তিনটি অধিবেশন থাকে :

১. বাজেট
২. বাদল বা মনসুন
৩. শীতকালীন

জাতীয় স্বার্থের বিষয়গুলি সংসদে আলোচিত হয় এবং সংসদে কী আলোচনা হচ্ছে তা জানার অধিকার সকল নাগরিকের রয়েছে। নতুন বিলটি নিয়ে তাৎক্ষণিক সংশোধনীগুলি পাস হচ্ছে, এগুলি সব সংসদীয় প্রতিবেদক রেকর্ড করে।

যুদ্ধ, বিপর্যয়, বন্যার মতো বিভিন্ন দুর্যোগের জন্য নতুন বাজেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান প্রয়োজন। এই অর্থ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল বা অন্যান্য কোষাগার থেকে আসে। অর্থ সরবরাহের বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কে সাংবাদিককে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। বাজেট থেকে যে অর্থ ব্যয় করা হয়নি এমন অর্থ কোথায় যাচ্ছে তার প্রতি প্রতিবেদককে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। এমন অনেকগুলি ঘটনা এবং দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে ব্যয়টি ব্যক্তিগত ব্যবহারে ব্যয় করা হয়েছিল।

যে কোনও সংসদীয় প্রতিবেদকের মূল এজেন্ডা হল জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং সংসদের মধ্যে কী ঘটছে সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করা।

২.৩.৪ সংসদীয় সুযোগসুবিধা - সংসদ অবমাননা এবং সাংবাদিকতা সুরক্ষা

সংসদীয় সংবাদ পরিবেশন প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় আইন মেনে সংসদ তথা রাজ্য বিধানসভার কার্য্যবিবরণী পাঠকের কাছে তুলে ধরা। সংসদের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সম্পর্ক আসলে গণতন্ত্রের জন্য মানুষের আগ্রহ কারণ সংসদে মুক্ত আলোচনার পরিবেশ মতপ্রকাশের অধিকাররেই ক্ষেত্র এবং স্বভাবতই তার সঙ্গে প্রেসের স্বাধীনতাও সম্পর্কিত।

সংসদীয় কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করার জন্য প্রেসের কোন আইনগত বা সংসদীয় ক্ষমতা নেই। প্রেস এই সংবাদ প্রকাশ করতে পারে বিশেষ সুবিধা হিসেবে। সংসদ বা বিধানসভা চাইলেই সংবাদ প্রতিবেদকের সভা চলাকালীন প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সংসদ আলোচনার যে অংশ স্পিকার কার্য্যবিবরণী থেকে বাদ দেন সেই অংশটিও সংবাদে প্রকাশ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, সংবাদ মাধ্যমে সংসদীয় কার্য্যবিবরণীর খবর প্রকাশিত হলেও তার যাবতীয় দায়ভার সংবাদ মাধ্যমের মালিক, সম্পাদক, মুদ্রক বা প্রকাশকের উপরেই বর্তায়। এক্ষেত্রে কোন ভুল সংবাদ ছাপার ফলে এই ব্যক্তিরা মানহানির মত আইনভঙ্গের আওতায়ও পড়তে পারেন।

১৯৫৬ সালে ব্রিটেনের আইনের আদলে পার্লামেন্টারি প্রসিডিংস (প্রটেকশন অফ পাবলিকেশন) অ্যাক্ট চালু হয়। এতে বলা হয়ে প্রকাশিত সংবাদ (ক) সত্য হতে হবে, (খ) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে হবে, (গ) বিদ্বেষমূলক হবে না। কিন্তু জরুরি অবস্থা চলাকালীন এই আইন বাতিল করা হয়। স্পষ্টতই এর দ্বারা সংবাদ মাধ্যমের সংসদীয় খবর প্রচারের অধিকার সংকুচিত হয়। পরবর্তীকালে মোরারজি দেশাই-এর নেতৃত্বাধীন জনতা দল সরকার ১৯৭৭ সালে আইনটি আবার চালু করেন। এটিই বর্তমানে চালু আছে।

কোনও সাংবাদিক বা সম্পাদক সংসদীয় সংবাদ পরিবেশনের এই নীতিগুলি অতিক্রম করলে তার শাস্তিবিধান করা হয়ে। এক্ষেত্রে কারাদণ্ড, সতর্কীকরণ, ভর্ৎসনা করা বা তিরস্কার করা হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শাস্তিস্বরূপ অভিযুক্ত সাংবাদিকের সংসদীয় খবর ‘কভার’ করার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হতে পারে। তাঁকে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করতেও নির্দেশ দেয়া হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কোন আর্থিক জরিমানা করার প্রতিবিধান নেই।

সংসদ-সাংবাদিকদের সুরক্ষা বা নিরাপত্তা

সংসদ-সাংবাদিকদের সে অর্থে কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকে না। অন্য সাংবাদিকদের মতোই তাঁদেরও বিবেচিত করা হয়। তবে সরকারের ঘনিষ্ঠ কোনও সাংবাদিক অনেক সময় নিরাপত্তা পেতে পারেন। তবে সংসদ-সাংবাদিকদের মনে রাখা প্রয়োজন, যে অংশ সংসদের কোনও সভার কাব্যবিবরণী থেকে বাদ যায়, তা সাংবাদিকরা প্রকাশ-প্রচার করতে পারেন না। প্রয়োজনে সাংবাদিক জানাতে পারেন যে, সংসদের অধ্যক্ষ বা চেয়ারম্যান কারও মন্তব্য বা উক্তি সভার কার্য্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন।

২.৩.৫ সারাংশ

সংসদীয় প্রতিবেদকের সংসদের প্রতিটি অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিবেদন করা প্রয়োজন। তার কাজ সংসদে উল্লিখিত প্রতিটি পয়েন্ট রেকর্ড করা। এর জন্য প্রচুর পর্যবেক্ষণ এবং লেখার গতি দরকার। সংসদীয় সাংবাদিককে সংবিধানের নতুন আইন ও সংশোধনী সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার।সংসদীয় সুযোগ-সুবিধা বলতে সংসদ এবং সংসদ সদস্যদের স্বতন্ত্র সামর্থ্য হিসাবে সংসদ কর্তৃক উপভোগ করা অধিকার বোঝায়, এগুলি ছাড়া তারা সংবিধানের অর্পিত দায়িত্ব হিসাবে তাদের কাজ সম্পাদন করতে পারে না।

২.৩.৬ অনুশীলনী

১. মিডিয়া রিপোর্টিংয়ে ভারতের সংবিধানের আওতাধীন সংসদীয় ও আইনসভাভিত্তিক সুবিধাগুলির প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

২. টীকা লিখুন : (ক) সংসদ (খ) সাংবাদিক সুরক্ষা

২.৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. *The Constitution of India* — An Analytical Approach –H. K. Saharay

২. *Constitutional Law of India*–Dr. J. N. Pandey

৩. *The Law and the Newspapers*–Aurobindo Mozumdar

৪. *সংবিধান ও প্রেস আইন*—ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য

একক ৪ ❑ মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণাপত্র - ইউনেস্কোর প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ

গঠন

২.৪.১ উদ্দেশ্য
২.৪.২ প্রস্তাবনা
২.৪.৩ মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণাপত্র
২.৪.৪ ইউনেস্কোর প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ
২.৪.৫ সারাংশ
২.৪.৬ অনুশীলনী
২.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল :

- মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণাপত্র
- ইউনেস্কোর প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ

২.৪.২ প্রস্তাবনা

সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। শান্তিতে জীবনধারণের সকল অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করাই মানবাধিকারের উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক স্তরে এই অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। ১৯৪৮ সালে ঘোষিত হয় মানবাধিকরে সনদ।

২.৪.৩ মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণাপত্র

মানবাধিকার সনদ (Universal Declaration of Human Rights) হলো একটি ঘোষণাপত্র যা প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে প্যারিসে ঘোষিত হয়।

জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের উপর সার্বজনীন ঘোষণার খসড়া সিদ্ধান্তটি অনুমোদিত হয়।

মুখবন্ধ

যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহ এবং সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বে শান্তি, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তি;

যেহেতু মানব অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঘৃণার ফলে মানুষের বিবেক লাঞ্ছিত বোধ করে এমন সব বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং যেহেতু এমন একটি পৃথিবীর উদ্ভবকে সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আকাঙ্খা রূপে ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে সকল মানুষ ধর্ম এবং বাক স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং অভাব ও শংকামুক্ত জীবন যাপন করবে;

যেহেতু মানুষ যাতে অত্যাচার ও উৎপীড়নের মুখে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিদ্রোহ করতে বাধ্য না হয় সেজন্য আইনের শাসন দ্বারা মানবাধিকার সংরক্ষণ করা অতি প্রয়োজনীয়;

যেহেতু জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক;

যেহেতু সদস্য জাতিসমূহ জাতিপুঞ্জের সনদে মৌলিক মানবাধিকার, মানব দেহের মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী পুরুষের সমান অধিকারের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং বৃহত্তর স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে সামাজিক উন্নতি এবং জীবনযাত্রার উন্নততর মান অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন;

যেহেতু সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সহযোগিতায় মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সমূহের প্রতি সার্বজনীন সম্মান বৃদ্ধি এবং এদের যথাযথ পালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ;

যেহেতু এ স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহের একটি সাধারণ উপলব্ধি এ অঙ্গীকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এজন্য এখন সাধারণ পরিষদ এই মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র জারি করছে।

এ ঘোষণা সকল জাতি এবং রাষ্ট্রের সাফল্যের সাধারণ মানদন্ড হিসেবে সেই লক্ষ্যে নিবেদিত হবে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতিটি অঙ্গ এ ঘোষণাকে সবসময় মনে রেখে পাঠদান ও শিক্ষার মাধ্যমে এই স্বাধীনতা ও অধিকার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে সচেষ্ট হবে এবং সকল সদস্য রাষ্ট্র ও তাদের অধীনস্থ ভূখণ্ডের জাতিসমূহ উত্তরোত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়াসের মাধ্যমে এই অধিকার এবং স্বাধীনতাসমূহের সার্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি আদায় এবং যথাযথ পালন নিশ্চিত করবে।

ধারা ১

সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত।

ধারা ২

এ ঘোষণায় উল্লেখিত স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহে গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকবে।

কোন দেশ বা ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে তার কোন অধিবাসীর প্রতি কোনরূপ বৈষম্য করা হবেনা; সে দেশ বা ভূখণ্ড স্বাধীনই হোক, হোক অছিভূক্ত, অস্বায়ত্বশাসিত কিংবা সার্বভৌমত্বের অন্য কোন সীমাবদ্ধতায় বিরাজমান।

ধারা ৩

জীবন, স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তায় প্রত্যেকের অধিকার আছে।

ধারা ৪

কাউকে অধীনতা বা দাসত্বে আবদ্ধ করা যাবে না। সকল প্রকার ক্রীতদাস প্রথা এবং দাসব্যবসা নিষিদ্ধ করা হবে।

ধারা ৫

কাউকে নির্যাতন করা যাবে না; কিংবা কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না অথবা কাউকে এহেন শাস্তি দেওয়া যাবে না।

ধারা ৬

আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে।

ধারা ৭

আইনের চোখে সবাই সমান এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলেই আইনের আশ্রয় সমানভাবে ভোগ করবে। এই ঘোষণা লঙ্ঘন করে এমন কোন বৈষম্য বা বৈষম্য সৃষ্টির প্ররোচনার মুখে সমান ভাবে আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা ৮

শাসনতন্ত্রে বা আইনে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের কাছ থেকে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা ৯

কাউকেই খেয়ালখুশীমত গ্রেপ্তার বা অন্তরীণ করা কিংবা নির্বাসন দেওয়া যাবে না।

ধারা ১০

নিজের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং নিজের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি অভিযোগ নিরূপণের জন্য প্রত্যেকেরই পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে প্রকাশ্য শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা ১১

১. দন্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চিত অধিকারসম্বলিত একটি প্রকাশ্য আদালতে আইনানুসারে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ গণ্য হওয়ার অধিকার থাকবে।

২. কাউকেই এমন কোন কাজ বা ক্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যে কাজ বা ক্রুটি সংঘটনের সময় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল না। দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনের সময় যে শাস্তি প্রযোজ্য ছিল, তার চেয়ে গুরুতর শাস্তিও দেওয়া চলবে না।

ধারা ১২

কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কিংবা তাঁর গৃহ, পরিবার ও চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়ালখুশীমত হস্তক্ষেপ কিংবা তাঁর সুনাম ও সম্মানের উপর আঘাত করা চলবে না। এ ধরনের হস্তক্ষেপ বা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা ১৩

১. নিজ রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং বসবাস করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. প্রত্যেকেরই নিজ দেশ সহ যে কোন দেশ পরিত্যাগ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

ধারা ১৪

১. নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভিন্নদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করবার এবং সে দেশের আশ্রয়ে থাকবার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. অরাজনৈতিক অপরাধ এবং জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য এবং মূলনীতির পরিপন্থী কাজ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভূত অভিযোগের ক্ষেত্রে এ অধিকার প্রার্থনা নাও করা যেতে পারে।

ধারা ১৫

১. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

২. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, কিংবা কারো জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অগ্রাহ্য করা যাবে না।

ধারা ১৬

১. ধর্ম, গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে সকল পূর্ণ বয়স্ক নরনারীর বিয়ে করা এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে। বিয়ে, দাম্পত্যজীবন এবং বিবাহবিচ্ছেদে তাঁদের সমান অধিকার থাকবে।

২. বিয়েতে ইচ্ছুক নরনারীর স্বাধীন এবং পূর্ণ সম্মতিতেই কেবল বিয়ে সম্পন্ন হবে।

৩. পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক এবং মৌলিক গোষ্ঠী-একক, সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার পরিবারের রয়েছে।

ধারা ১৭

১. প্রত্যেকেরই একা অথবা অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে।

২. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা ১৮

প্রত্যেকেরই ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের সঙ্গে ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার এবং এই সঙ্গে, প্রকাশ্যে বা একান্তে, একা বা অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে, শিক্ষাদান, অনুশীলন, উপাসনা বা আচারব্রত পালনের মাধ্যমে ধর্ম বা বিশ্বাস ব্যক্ত করার অধিকারও অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

ধারা ১৯

প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। অবাধে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমের মারফত ভাব এবং তথ্য জ্ঞাপন, গ্রহণ ও সন্ধানের স্বাধীনতাও এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

ধারা ২০

১. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে।

২. কাউকে কোন সংঘভূক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা ২১

১. প্রত্যক্ষভাবে বা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. নিজ দেশের সরকারী চাকুরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

৩. জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের শাসন ক্ষমতার ভিত্তি; এই ইচ্ছা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত প্রকৃত

নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট কিংবা সমপর্যায়ের কোন অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা ২২

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেকেরই আপন মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের জন্য অপরিহার্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায়ের অধিকার রয়েছে।

ধারা ২৩

১. প্রত্যেকেরই কাজ করার, স্বাধীনভাবে চাকুরী বেছে নেবার, কাজের ন্যায্য এবং অনুকূল পরিবেশ লাভ করার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে।

২. কোনরূপ বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

৩. কাজ করেন এমন প্রত্যেকেরই নিজের এবং পরিবারের মানবিক মর্যাদার সমতুল্য অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক লাভের অধিকার রয়েছে; প্রয়োজনবোধে একে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি দ্বারা পরিবর্ধিত করা যেতে পারে।

৪. নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকেরই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং তাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

ধারা ২৪

প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার রয়েছে; নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বেতনসহ ছুটি এবং পেশাগত কাজের যুক্তিসঙ্গত সীমাও এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা ২৫

১. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সমাজ কল্যাণমূলক কার্যাদির সুযোগ এবং এ সঙ্গে পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা জীবনযাপনে অনিবার্যকারণে সংঘটিত অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং বেকার হলে নিরাপত্তার অধিকার সহ নিজের এবং নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. মাতৃত্ব এবং শৈশবাবস্থায় প্রতিটি নারী এবং শিশুর বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য লাভের অধিকার আছে। বিবাহবন্ধন-বহির্ভূত কিংবা বিবাহবন্ধনজাত সকল শিশু অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

ধারা ২৬

১. প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

২. ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা-সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। শিক্ষা সকল জাতি, গোত্র এবং ধর্মের মধ্যে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস পাবে এবং শান্তিরক্ষার স্বার্থে জাতিপুঞ্জের কার্যাবলীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৩. কোন ধরনের শিক্ষা সন্তানকে দেওয়া হবে, তা বেছে নেবার পূর্বাধিকার পিতামাতার থাকবে।

ধারা ২৭

১. প্রত্যেকেরই সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করা, শিল্পকলা উপভোগ করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফল সমূহে অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলা ভিত্তিক কোন কর্মের রচয়িতা হিসেবে নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার প্রত্যেকেরই থাকবে।

ধারা ২৮

এ ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের বাস্তবায়ন সম্ভব এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অংশীদারীত্বের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা ২৯

১. প্রত্যেকেরই সে সমাজের প্রতি পালনীয় কর্তব্য রয়েছে, যে সমাজেই কেবল তাঁর আপন ব্যক্তিত্বের স্বাধীন এবং পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

২. আপন স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহ ভোগ করার সময় প্রত্যেকেই কেবলমাত্র ঐ ধরনের সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন যা অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নিশ্চিত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নৈতিকতা, গণশৃংখলা ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায়ানুগ প্রয়োজন মেটাবার জন্য আইন দ্বারা নির্ণীত হবে।

৩. জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পরিপন্থী কোন উপায়ে এ অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ ভোগ করা যাবে না।

ধারা ৩০

কোন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এ ঘোষণাপত্রের কোন কিছুকেই এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, যার ফলে তারা এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নস্যাৎ করতে পারে এমন কোন কাজে লিপ্ত হতে পারেন কিংবা সে ধরনের কোন কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

সৌজন্যে - www.nhrc.nic.in

২.৪.৪ ইউনেস্কোর প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ

আইপিডিসির আন্তঃসরকারী কাউন্সিল হল একটি মান-নির্ধারণ এবং নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা। এই ভূমিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কাউন্সিল সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিভিন্ন উদ্যোগ শুরু করেছে যা মিডিয়া উন্নয়নে ও তার পদ্ধতিকে শক্তিশালী করেছে।

আইপিডিসি কাউন্সিল ২০০৮ সালে মিডিয়া ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস (এমডিআই), ২০১৩ সালে সাংবাদিকদের সুরক্ষা সূচক Journalist's Safety Indicators (জেএসআই) এবং সম্প্রতি ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি ইনডিকেটরেটস (আইইউআই) হিসাবে ২০১৮ সালে বেশ কয়েকটি মিডিয়া এবং ইন্টারনেট-সম্পর্কিত সূচককে সমর্থন করেছে। এই সূচকগুলির লক্ষ্য প্রমাণ-ভিত্তিক সুপারিশগুলির মাধ্যমে শূন্যস্থান চিহ্নিত করা ও সমাধান করা। এমডিআইগুলি কোন দেশে মিডিয়া বিকাশের সামগ্রিক পরিবেশের মূল্যায়ন করে, জেএসআইগুলি মূল্যায়ন করে যে কীভাবে প্রাসঙ্গিক অভিনেতারা আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়াই সাংবাদিকদের কাজ করতে সক্ষম করে চলেছে।

সৌজন্যে - https-//en.unesco.org/programme/ipdc/initiatives

সাংবাদিকতা শিক্ষা

গণতন্ত্র, সংলাপ ও উন্নয়নের প্রচারের জন্য মিডিয়া সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা আনা জরুরি "এই উপলব্ধি সহ" কাউন্সিল ২০০৭ সাল থেকে আইপিডিসির বিশেষ উদ্যোগে 'সাংবাদিকতা শিক্ষা' অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই উদ্যোগটি "সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্য মডেল পাঠ্যক্রম" এবং "সাংবাদিকতার মান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড এবং সূচক" প্রকাশনা সম্পর্কিত কাজকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল। মডেল কারিকুলাম সিঙ্গাপুরে প্রথম বিশ্ব সাংবাদিকতা শিক্ষা কংগ্রেসে (ডব্লুজেইসি -১) সদস্য দেশগুলির অনুরোধে ২০০৭ সালে প্রবর্তিত একটি প্রকাশনা।

ইউনেস্কো ২০০৭ সালে সাংবাদিকতার জন্য একটি মডেল কারিকুলাম প্রকাশ করেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল মূলত সাংবাদিকতার দিকে মনোনিবেশ করা, জ্ঞাপনের দিকে নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমটি একটি টেমপ্লেট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ইগনু) তার পাঠ্যক্রমগুলিতে মডেল কারিকুলামের অনেকগুলি সুপারিশকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মডেল পাঠ্যক্রমের ভূমিকাতেই এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে সাধারণভাবে সাংবাদিকের মূল লক্ষ্য হলো জনসাধারণকে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে সমাজসেবা করা। মডেল কারিকুলামে এটিও বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজে সাংবাদিকতার অধ্যয়নকে পেশাদার প্রশিক্ষণের বুনিয়াদ হিসাবে দেখা উচিত। ২০০০ সালের মার্চ মাসে ইউনেস্কো সমর্থিত একটি আলোচনাসভায় দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকতাবিদরা এই মডেল কারিকুলাম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরাও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে উন্নয়নশীল দেশে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমে ইউনেস্কোর সুপারিশগুলো যতটা সম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত। ২০১৭-২০১৮-এ, বিশ্বব্যাপী ১৮ টি প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকতা শিক্ষা সম্পর্কিত ইউনেস্কোর মডেল পাঠ্যক্রম এবং সম্পর্কিত সিলেবাস ভিত্তিক তাদের পাঠ্যক্রমটি আপগ্রেড করেছে।

Media Sector Development

আইপিডিসি এমন প্রকল্পগুলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠকে প্রশস্ত করে এবং মিডিয়া বিকাশের প্রচার করে। আইপিডিসির দ্রুত প্রতিক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ মিডিয়া বিকাশের প্রয়োজনের প্রতিও সাড়া দেয়, যেমন প্রদর্শিত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, ইবোলা সংকট চলাকালীন, ভারতের কেরালায় বন্যা এবং মায়ানমারে রোহিঙ্গা শরণার্থী সঙ্কট।

সৌজন্যে - https://en.unesco.org./programme/ipdc/initiatives

২.৪.৫ সারাংশ

মানবাধিকার রক্ষায় ইউনেস্‌কোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ১৯৪৮ সালে জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে ঘোষিত হয় মানবাধিকার সনদ। বিশ্বে কোন মানুষের উপরই হিংসা, অত্যাচার নামিয়ে আনা যাবে না। গণহত্যা, নিষ্ঠুরতা যদি জীবনযাপনকে ব্যাহত করে তবে বুঝতে হবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিনিয়ত এই রকম ঘটনা ঘটে চলেছে। জাতিপুঞ্জ এরই অবসান চায়।

২.৪.৬ অনুশীলনী

১. মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার বিধানগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

২. মিডিয়ার জন্য ইউনেস্কোর প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ ব্যাখ্যা করুন?

২.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি :

১. *গণজ্ঞাপন*—ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
২. *Many Voices One World*—Sean MacBride
৩. *nhrc.nic.in*

মডিউল - ৩ : প্রেস এবং মিডিয়া আইন

একক ১ ❐ মানহানি ও সাংবাদিকতার সুরক্ষা - আদালত অবমাননা এবং সাংবাদিকতা সুরক্ষা - রাষ্ট্রদ্রোহের বিষয়সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ

গঠন

৩.১.১ উদ্দেশ্য
৩.১.২ প্রস্তাবনা
৩.১.৩ মানহানি আইন ও সাংবাদিকতা সুরক্ষা
৩.১.৪ আদালত অবমাননা আইন ১৯৭১ এবং সাংবাদিকতা সুরক্ষা
৩.১.৫ রাষ্ট্রদ্রোহ আইন (Sedition Act)
৩.১.৬ সারাংশ
৩.১.৭ অনুশীলনী
৩.১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল-

- মানহানি আইন :
- আদালত অবমাননা আইন ১৯৭১
- রাষ্ট্রদ্রোহ আইন

৩.১.২ প্রস্তাবনা

যা ইচ্ছে তাই লিখে, দেখিয়ে কারো সম্মানহানি করা যায় না। ব্যক্তিগত সম্মানকে সুরক্ষিত করার জন্য আইন আছে। আদালত অবমাননাও দণ্ডনীয় অপরাধ। এসব নিয়ে আলোচনা আছে এই এককে।

৩.১.৩ মানহানি আইন ও সাংবাদিকতা সুরক্ষা

মানহানি আইন :

ভারতীয় দণ্ডবিধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয় মানহানি আইন। যখন কোনও সংবাদ মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা কোনও সংস্থার বিরুদ্ধে মানহানিকর কোনও মন্তব্য বা বক্তব্য প্রকাশ বা প্রচার করা হয়, তখন যদি সেই ব্যক্তি, বা গোষ্ঠী কিংবা সংস্থা আদালতের শরণাপন্ন হন, তবে তা মানহানি আইন এর বিচারাধীন বলে গণ্য হবে। ভারতীয় সংবিধানে বাক্ স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এই অধিকার হিসেবে গ্রাহ্য কোনও ব্যক্তি বা বিষয়কে প্রকাশ অথবা প্রচার করতে পারে। কিন্তু নীতিগত বা আইনগত দিক থেকে এই সংবাদগুলো কে সত্য বলে প্রমাণ করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের। যদি কোনও সংবাদমাধ্যম এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়

তাহলে এই সংবাদমাধ্যমটি মানহানির মামলায় বিচারাধীন বলে গণ্য হবে। ভারতীয় আইনে মানহানির মামলার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, কোনও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত কোন মন্তব্য যখন বেশিরভাগ মানুষের কাছে মানহানিকর বলে গণ্য হয়, তখনই তা মানহানি মামলার আওতায় আসে।। তবে ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে মর্যাদাহানিকর শব্দ বা মন্তব্য কোন্‌গুলি তা নির্দিষ্ট করে না দেওয়ায় মানহানি মামলা অনেক সময় জটিল হয়ে পড়ে। এই জটিলতা কাটাতে ভারতীয় ফৌজদারি আইনের ৪৯৯ ধারায় কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে :

১) কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করলে তা মানহানি আইনের আওতাভুক্ত হতে পারে,
২) যে ব্যক্তি জনসমক্ষে আসতে চান না তাকে প্রচারমাধ্যমে জোর করে তুলে ধরলে তাও মানহানি মামলার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, এবং
৩) সংশ্লিষ্ট সংবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত নন অথচ তাকে সংবাদের অন্যতম চরিত্র হিসেবে প্রকাশ করা বা প্রচার করা হয়েছে, এক্ষেত্রে মানহানির মামলা হতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের মানহানি :

মানহানি দুই প্রকারের, (১) কথিত মানহানি এবং (২) লিখিত মানহানি। লিখিত মানহানিকে 'লাইবেল' বলা হয় আর কথিত মানহানি 'স্ল্যান্ডার' হিসেবে বিবেচিত হয়। দুধরণের মানহানিই ভারতীয় দণ্ডবিধির একই ধারার অন্তর্ভূক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মানহানি দেওয়ানী এবং ফৌজদারী—দু-ধরনেরই হতে পারে। আমাদের দেশে দেওয়ানী মানহানি নির্দিষ্টভাবে লেখা নেই। মানহানির ফৌজদারী আইন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ থেকে ৫০২ ধারার অন্তর্ভূক্ত এবং দীর্ঘ ও বিস্তারিত। যদি কথিত শব্দ মানহানি হয়, তবে তার বিরুদ্ধে দেওয়ানী ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। তবে সংবাদমাধ্যম মুদ্রিত ও লিখিত বলে একমাত্র 'লাইবেল' ঘটতে পারে। তবে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মানহানির মধ্যে মূল পার্থক্য ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে। দেওয়ানী মানহানির মূল উদ্দেশ্য যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সে ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইনের মূল শাস্তি অপরাধীকে জরিমানা অথবা কারাদণ্ড অথবা দুটি শাস্তির মাধ্যমে দণ্ড দেওয়া। দেওয়ানী মানহানির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের সত্যতাই মানহানির দেওয়ানী মামলায় আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে মুখ্য।

ফৌজদারি আইনের উদ্দেশ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনে সরল বিশ্বাস আত্মরক্ষার অন্যতম উপায়। তবে সত্য এখানে রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। তবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় এর ব্যাতিক্রম রয়েছে। জনস্বার্থে মানহানিকর রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা প্রমাণ করাও জরুরি।

এই দুই ধরনের প্রতিবিধান একে অপরের বিকল্প নয়, বরং পরিপূরক। প্রভাবিত ব্যক্তি একই সঙ্গে দেওয়ানি অভিযোগ আনতে ও ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। এমনকি ৪৯৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তি ফৌজদারি আদালতে দণ্ডিত হলেও দেওয়ানী মামলায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। মানহানি আইন এর চারটি ব্যাখ্যা ও দশটি ব্যতিক্রম আছে।

ব্যাখ্যা ১ : যদি কোনও মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কোনও অভিযোগ বা অপমানকর মন্তব্য করা হয় এবং তার ক্ষতিকর প্রভাব সেই ব্যক্তির পরিবার বা নিকটাত্মীয়দের ওপর পড়ে, তবে তা মানহানি হবে।

ব্যাখ্যা ২ : যদি কোনও বিশেষ কোম্পানি সংস্থা বা গোষ্ঠী অথবা একটি বিশেষ শ্রেণীর সম্পর্কে অভিযোগ বা অপমানকর মন্তব্য করা হয় তবে তা মানহানি হবে।

ব্যাখ্যা ৩ : যদি কোনও বিদ্রূপাত্মক তির্যক বা অভিব্যক্তি কারোর মর্যাদাহানি করে তবে তা মানহানি হবে।

ব্যাখা ৪ : যদি কোনও অভিযোগের ফলে কোনও ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং তা তার জাতীয় অথবা পোশাকে প্রভাবিত করে এবং তার কৃতিত্বকে খাটো করে এবং তার অবস্থান সমাজের চোখে বিরাগভাজন ও মর্যাদা হানিকর করে তোলে তবে তা মানহানি হবে।

তবে মানহানি আইন এর ক্ষেত্রে দশটি ব্যতিক্রম আছে এবং মানহানি মামলার প্রতিরোধে ১০ টি ব্যাতিক্রম প্রযোজ্য।

১) যদি কোনও সংবাদ সত্য হয় এবং জনস্বার্থে প্রকাশিত হয়; যদিও জনস্বার্থ শব্দটি প্রশ্নাতীত নয়।

২) কোনও সরকারি কর্মচারীর কাজকর্ম নিয়ে সরল বিশ্বাসে যদি কোনও মতামত প্রকাশ করা হয়।

৩) জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রশ্ন বা বিতর্কিত বিষয়ে যদি কোনও মতামত সরল বিশ্বাসে কোনও ব্যক্তিকে আঘাত করে।

৪) আদালতে বিচারাধীন কোনও মামলার প্রতিবেদনে যদি পুরোপুরি সত্য প্রকাশিত হয়।

৫) কোনও মামলার রায় সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে দেওয়া কোনও মতামত প্রকাশ বা প্রচার করা হলে।

৬) জনগণের দরকারে প্রেরিত কোনও বিষয় সম্পর্কে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনও মতামত।

৭) কোনও ব্যক্তির সম্পর্কে অন্য কোনও ব্যক্তির দেওয়া মতামত প্রচার বা প্রকাশিত হলে।

৮) জনস্বার্থে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিস্বার্থে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনও মন্তব্য।

৯) আইনের চোখে অপরাধী হিসেবে গণ্য এমন কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে কোনও মতামত প্রদান করা হলে, এবং

১০) জনস্বার্থে কোনও সতর্কীকরণ মন্তব্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হলে তা মানহানি আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

মানহানির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হলে চারটি বিষয়ের ওপর প্রমাণ হাজির করতে হবে সেগুলি হল-

১) প্রকাশিত সংবাদটি প্রকৃতই মর্যাদাহানিকর কি না;

২) সংবাদটি অভিযোগকারীর বিরুদ্ধেই প্রচারিত বা প্রকাশিত কি না;

৩) মর্যাদাহানিকর সংবাদটি প্রকৃতই (প্রকাশিত) কি না;

৪) প্রকাশিত সংবাদটি মিথ্যা কি না।

মানহানির মামলায় বিচারক যদি অভিযোগকারীর অভিযোগ গুলি সত্য এবং আইনত সিদ্ধ বলে মনে করেন তাহলে তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জরিমানা করতে পারেন। এই জরিমানা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে তবে। এক্ষেত্রে অভিযোগকারী সমাজের কোন্ স্তর বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত এবং সমাজে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিচার্য।

৩.১.৪ আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১ এবং সাংবাদিকতার সুরক্ষা

আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১

সরকারের তিনটি বাহুর মধ্যে অন্যতম প্রধান শাখা হলো বিচার বিভাগ। তারা আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে থাকে। এর নিরপেক্ষতার ওপর সকলের যাতে বিশ্বাস থাকে, এবং দেশ ও সমাজের স্বার্থে উন্নতজাতের বিচার ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হয়, তার জন্য এই বিভাগের স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজন। তাদের কাছে হস্তক্ষেপ করা বা প্রভাবান্বিত করা

শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। মুখ্যত, এই কারণেই আদালত অবমাননা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের দুই নম্বর ধারা অনুযায়ী দুই ধরনের অবমাননা আছে :

১) দেওয়ানী অবমাননা—কোনও আদালতের বিচার, রায়, আদেশ-নির্দেশ ইত্যাদির বা আদালতকে দেওয়া কোনও মুচলেকার স্বেচ্ছালঙ্ঘনকে দেওয়ানী অবমাননা বলা হয়।

২) ফৌজদারি অবমাননা — কোনও আদালত কে অপমান করা, কোনও আইনগত কার্যবিবরণী (Proceedings) বা বিচার প্রয়োগের পথে বাধা দেওয়া অথবা হস্তক্ষেপ করা অথবা প্রভাবিত করার চেষ্টা এবং তা প্রকাশ ও প্রচার করাকে ফৌজদারি অবমাননা বলা হয়। এই আইনটি সারা ভারতে প্রযোজ্য।

আদালত অবমাননা আইনের সংজ্ঞা :

এই আইন অনুযায়ী

১) 'আদালত অবমাননা' বলতে দেওয়ানি বা ফৌজদারি অবমাননা বোঝানো হবে।

২) দেওয়ানী অবমাননা বলতে কোনও বিচার, রায়, নির্দেশ, আদেশ বা কোনও আদালতের অন্য কোনও কাজকে স্বেচ্ছায় অপমান করা বা আদালতকে দেওয়া কোনও প্রতিশ্রুতি স্বেচ্ছায় লংঘন করাকে বোঝানো হবে।

৩) ফৌজদারী অবমাননা বললে বোঝানো হবে লিখিত বা কথ্যরূপ, এর সংকেত বা দৃশ্য প্রতিরূপএর সাহায্যে কোনও বিষয় প্রকাশ করা বা অন্য কোনও কাজ করা, যা

ক) কোনও আদালতের কলঙ্ক রটনাকারী বা রটনাপ্রবণ অথবা অধিকার খর্ব করা বা অধিকার খর্ব করতে পারে; অথবা

খ) কোনও বিধিসম্মত কার্যনির্বাহের যথাযথ ধারার ক্ষতি করে বা ধারায় হস্তক্ষেপ করে বা হস্তক্ষেপ করতে পারে বা

গ) অন্য কোনও পদ্ধতিতে ন্যায়বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করে বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

৪) (হাইকোর্ট) বলতে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হাইকোর্টকে বোঝাবে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এর কোনও বিচারবিষয়ক অধ্যক্ষের আদালতকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

আদালত অবমাননার ব্যতিক্রম :

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোর কার্যকলাপ আদালত অবমাননা বলে গণ্য হবে না-

১) কোনও বিষয়ে নিরপরাধ প্রকাশ ও পরিবেশন;

২) বিচার সংক্রান্ত কার্যবিবরণীর পক্ষপাতহীন ও যথাযথ প্রতিবেদন;

৩) বিচার সংক্রান্ত আইনের নিরপেক্ষ সমালোচনা করা;

৪) নিম্নতর আদালতের অগ্রাধিকারের বিরুদ্ধে সরল বিশ্বাসে কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা;

৫) বিচারকের ঘরে বা প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত কোনও কার্যবিবরণীর সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করলে তা কিছু ক্ষেত্রে আদালত অবমাননা বলে পরিগণিত হয় না।

আদালত অবমাননার শাস্তি :

কোনও আদালতের অবমাননা করলে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা দুই হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুটি শাস্তি একসঙ্গে হতে পারে। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করলে আদালত যদি সন্তুষ্ট হয়, তবে তিনি অব্যাহতি পেতে পারেন বা শাস্তি মকুবও হতে পারে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আদালত অবমাননার শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়:

সমসাময়িক কালে প্রচলিত কোনও উল্লেখ থাকলেও আদালতে যদি মনে করে যে ন্যায়বিচারের যথাযথ ধারায় এটি হস্তক্ষেপ করছে না, তবে কোনও আদালত এই আইন অনুযায়ী আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি প্রয়োগ করবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে তারিখে আদালত অবমাননা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় তার এক বছরের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১.৫ রাষ্ট্রদ্রোহ আইন (Sedition Act)

রাষ্ট্রদ্রোহ নিয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি)-র ১২৪এ ধারাটি ব্রিটিশ জমানার। তৈরি হয়েছিল ১৮৬০ সালে। স্বাধীন ভারতে, বিশেষ করে বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটির পর্যালোচনার দাবি দীর্ঘদিনের।

রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত বা তেমন কোনও ষড়যন্ত্রে প্ররোচনাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ যে কোনও রাষ্ট্রের কাছেই তা গভীর উদ্বেগের বিষয়।

১২৪এ ধারা একটি ঔপনিবেশিক আইন, যা আধুনিক গণতন্ত্রে সম্পূর্ণ অচল। দুর্ভাগ্যবশত প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সরকারে আসীন থাকাকালীন এই আইনের অপব্যাখ্যার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সরকারবিরোধী কণ্ঠরোধের কাজে তার ব্যবহার করে থাকে।

৩.১.৬ সারাংশ

এই একক এর পাঠ শেষে উল্লেখযোগ্য আইনগুলির পরিধি সম্পর্কে ধারণা সাংবাদিকতার কাজকে অনেকাংশেই সম্পূর্ণ করবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।

৩.১.৭ অনুশীলনী

১. **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন**

(ক) আদালত অবমাননা আইনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করুন, এই আইনের উল্লঙ্ঘনের শাস্তি কি?

(খ) মানহানি আইনের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করুন।

২. **টীকা লিখুন**

(ক) রাষ্ট্রদ্রোহ আইন

(খ) বিভিন্ন প্রকারের মানহানি

৩.১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. *Laws of Press* — Dr. D.D. Basu.

২. *History of Press,* Press Laws and Communication — B.N. Ahuja

৩. *ভারতের প্রেস আইন* - বংশী মান্না

৪. *প্রেস আইন* - কমল ভট্টাচার্য

৫. *বিষয় সাংবাদিকতা* - ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একক ২ ❒ কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মচারীদের বা কর্মীদের চাকরির শর্ত এবং বিধি বিধান আইন, ১৯৫৫—মহিলাদের অশোভন প্রকাশ নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮৬

গঠন

৩.২.১ উদ্দেশ্য
৩.২.২ প্রস্তাবনা
৩.২.৩ কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মচারীদের বা কর্মীদের চাকরির শর্ত এবং বিধি বিধান আইন ১৯৫৫
৩.২.৪ মহিলাদের অশোভন প্রকাশ নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮৬
৩.২.৫ সারাংশ
৩.২.৬ অনুশীলনী
৩.২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল:

- কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মচারীদের বা কর্মীদের চাকরির শর্ত এবং বিধি বিধান আইন ১৯৫৫
- মহিলাদের অশোভন প্রকাশ নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮৬

৩.২.২ প্রস্তাবনা

সাংবাদিকরা চাকরি করেন। চাকরির জন্য প্রয়োজন নিরাপত্তা। আইনের মাধ্যমে এই নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায়। মহিলাদের নিরাপত্তাও দেওয়া যায়।

৩.২.৩ কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মচারীদের বা কর্মীদের চাকরির শর্ত এবং বিধি বিধান আইন ১৯৫৫

সারা ভারতে কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত অন্যান্য কর্মীদের চাকরির কোন কোন শর্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইন ১৯৫৫ সালে রচিত হয়। এই আইন অনুযায়ী—'সংবাদপত্র' বলতে প্রকাশ্য সংবাদ বা প্রকাশ্য সংবাদের উপর মন্তব্য সম্বলিত কোন ছাপা সাময়িকপত্র কে বোঝানো হবে এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হতে পারে এমন মুদ্রিত সাময়িক পত্রের কোন শ্রেণীকেও বোঝানো হবে। 'সংবাদপত্র কর্মচারী' বলতে কোনও কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কাজ করার জন্য নিযুক্ত অন্য কোনও ব্যক্তিকে বোঝানো হবে। 'সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান'র অর্থ এক বা একাধিক সংবাদপত্র উৎপাদন বা প্রকাশ করার জন্য বা কোনও সংবাদ সংস্থা চালানোর জন্য কোনও ব্যক্তির বা একাধিক ব্যক্তির তথ্যর অ-নিগমবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান।

'অ-সাংবাদিক সংবাদপত্র কর্মচারী' বলতে যে সকল ব্যক্তিকে বোঝানো হবে, তারা নিম্নলিখিত পর্যায়গুলির অন্তর্ভুক্ত নন :

১) একজন কর্মরত সাংবাদিক, বা

২) প্রধানত পরিচালনা সংক্রান্ত বা প্রশাসনিক পদে কর্মরত ব্যক্তি, বা

৩) তত্ত্বাবধানকারী পদে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তি যিনি তার কর্তব্যের খাতিরে ব্যস্ত ক্ষমতার ফলে মূলত পরিচালনা সংক্রান্ত কোনও ধরনের কাজকর্ম নির্বাহ করেন।

'কর্মরত সাংবাদিক' বলতে এমন কোনও ব্যক্তি কে বোঝাবে যিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রধানত একজন সাংবাদিক এবং সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিযুক্ত এবং এর দ্বারা কোন সম্পাদক বা প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখক, বার্তা সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, প্রতিবেদক, সংবাদদাতা, ব্যঙ্গচিত্রীসংবাদ, আলোকচিত্রী ও প্রুফরিডার কে বোঝাবে।

আনুতোষিক (Gratuity) প্রদান :

১) যে ক্ষেত্রে-

ক) এই আইন প্রচলনের আগে বা পরে কোনও কর্মরত সাংবাদিক, যিনি কমপক্ষে ৩ বছর কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান একটানা কাজ করছেন এবং

১) নিয়মানুবর্তিতা ব্যতীত অন্য কোনও কারণে যদি নিয়োগকর্তা কর্তিক এই চাকরির ছেদ ঘটানো হয়ে থাকে, বা

২) অবসর গ্রহণের বয়স হওয়ার ফলে তিনি যদি অবসর গ্রহণ করে থাকেন, বা

খ) এই আইন প্রচলনের আগে বা পরে যদি কোনও কর্মরত সাংবাদিক কমপক্ষে একটানা ১০ বছর কোনও সংবাদ প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকেন এবং যদি তিনি বিবেকের নির্দেশ ছাড়া অন্য কোনও কারণে এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি থেকে ১৯৬১ সালের পয়লা জুলাই বা তারপরে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করে থাকেন বা

গ) এই আইন প্রচলনের আগে বা পরে যদি কোনও কর্মরত সাংবাদিক কমপক্ষে একটানা তিন বছর কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে থাকেন এবং যদি তিনি এই প্রতিষ্ঠানের চাকরি থেকে ১৯৬১ সালের পয়লা জুলাই বা তারপরে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করে থাকেন বা

ঘ) কোনও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত অবস্থায় কোনও কর্মরত সাংবাদিক মারা যান,

তবে কর্মরত সাংবাদিকরা তার মৃত্যু হয়ে থাকলে তার মনোনীত ব্যক্তি ব্যক্তিগণ বা যদি কর্মরত সাংবাদিকের মৃত্যুকালে তার কোনও মনোনয়ন না থাকে, তাহলে বিশেষ ক্ষেত্রে তার পরিবারকে শিল্প বিরোধ আইন ১৯৪৭ অনুযায়ী উদ্ভূত কোন সুবিধা বা অধিকারের ক্ষতি না করে, এই চাকরির ছেদ, অবসরগ্রহণ, পদত্যাগ বা মৃত্যুতে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তার নিয়োগকর্তা কর্তৃক আনুতোষিক দেওয়া হবে। প্রত্যেক সম্পূর্ণ কর্ম বর্ষের জন্য বা ছয় মাসের বেশি বা তার কোনও অংশের জন্য ১৫ দিনের গড় বেতনের সমান হারে তার হিসাব হবে। তবে ১০ বছর ধরে কর্মরত সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে তাকে দেওয়া অনুতোষিকরে মোট পরিমাণ সাড়ে ১২ মাসের গড় বেতনের বেশী হবেনা।

কাজের সময় :

১) এই আইন অনুযায়ী রচিত নিয়মাবলী সাপেক্ষে কোনও কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান প্রতি চার সপ্তাহের ভেতর খাবার সময় বাদে মোট ১৪৪ ঘন্টার বেশি কাজ করতে বলা হবে না বা করতে দেওয়া হবে না।

২) প্রত্যেক কর্মরত সাংবাদিক কে পরপর সাতদিন কাজের পর কমপক্ষে একটানা ২৪ ঘন্টার বিশ্রাম দেওয়া হবে এবং রাত ১০ টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত সময়ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই ধারায় বর্ণিত সপ্তাহ বলতে বোঝানো হবে শনিবারের মাঝরাত থেকে শুরু হয়ে সাতদিন সময়।

ছুটি :

নির্দিষ্ট বা নৈমিত্তিক বা অন্য কোনও ধরনের ছুটির ক্ষতি না করে প্রত্যেক কর্মরত সাংবাদিক

১) কর্তব্যরত দিনগুলির জন্য কমপক্ষে ১/১১ ভাগ দিনের পূর্ণ বেতন অর্জিত ছুটি পেতে পারেন।

২) চাকরির সময় চিকিৎসকের শংসাপত্রের উপর ভিত্তি করে কমপক্ষে ১/১৮ ভাগ দিনের জন্য অর্ধ-বেতন ছুটি পেতে পারেন।

বেতন হার স্থির বা সংশোধন করা :

১) নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার

ক) কর্মরত সাংবাদিকদের সম্পর্কের বেতনের হার স্থির করবে,

খ) যথাসময়ে বা নির্দিষ্ট বিরতির পরে এই ধারা অনুযায়ী বা কর্মরত সাংবাদিকদের (বেতন হার স্থির করার) আইন, ১৯৫৮ ছ নম্বর ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে বেতন হার সংশোধন করতে পারবে।

২) কর্মরত সাংবাদিকদের সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী কাজ করা বা চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বেতনের হার সংশোধন করতে পারে।

বেতনের হার স্থির বা সংশোধন করার পদ্ধতি :

এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনমত একটি বেতন পর্ষদ গঠন করবে যাতে—

(ক) সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকদের প্রতিনিধিত্ব করার মতো দুজন ব্যক্তি থাকবেন।

(খ) কর্মরত সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব করার মতো দুজন ব্যক্তি থাকবেন,

(গ) তিনজন নির্দলীয় ব্যক্তি থাকবেন এদের মধ্যে একজন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি হবেন এবং উক্ত পর্ষদের সভাপতি হিসেবে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক ব্যক্তি থাকবেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মনে করলে পর্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের সাহায্যে কর্মরত সাংবাদিকদের অন্তর্বর্তী বেতন স্থির করতে পারে।

৩.২.৪ মহিলাদের অশোভন প্রকাশ নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮৬

এই আইনে বিজ্ঞাপন বা অন্য প্রকাশনায় এমন কি কোন পণ্যের মোড়কেও মহিলাদের অশোভন উপস্থাপনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহিলাদের অশোভন প্রকাশ বলতে বোঝায় যে কোনও প্রক্রিয়ায় নারী শরীরের বা শরীরের কোনও বিশেষ অংশের এমন উপস্থাপনা যা অশোভন, মহিলাদের পক্ষে অবমাননাকর অথবা ক্ষতিকর।

এই আইনের ৩ নম্বর ধারায় উল্লেখিত আছে যেকোনও ভাবে মহিলাদের অশোভন প্রতিনিধিত্ব হয় এমন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। এই আইনের ৪ নম্বর ধারায় যে কোনোভাবে মহিলাদের অশোভন প্রতিনিধিত্ব হয় এমন বই বা কাগজ বা প্রকাশনা অথবা ডাকযোগে তা পাঠানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনের ৬ নম্বর ধারায় উল্লেখিত আছে এই আইনের অবমাননার প্রথম অপরাধের শাস্তি দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা। পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের মেয়াদ ছয় মাস থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে অথবা আর্থিক জরিমানার পরিমাণ ১০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে পারে। এই দুটি আইন ছাড়াও ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ২৯২ এবং ২৯৩ অশ্লীলতা প্রচার করা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকবিধি ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। ধারা ২৯২ এবং ২৯৩-এ অশ্লীলতার প্রচার করা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বিধিব্যবস্থা উল্লেখ আছে। ধারা ২৯২ অশ্লীল পত্র-পত্রিকা বই ইত্যাদি বিক্রি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং ধাড়া ২৯৩ অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েদের কাছে অশ্লীল দ্রব্যাদি বিক্রি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযোজ্য।

৩.২.৫ সারাংশ

এই একক এর পাঠ শেষে উল্লেখযোগ্য আইনগুলির পরিধি সম্পর্কে ধারণা সাংবাদিকতার কাজকে অনেকাংশেই সম্পূর্ণ করবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।

৩.২.৬ অনুশীলনী

১. কর্মরত সাংবাদিক আইনের বিভিন্ন নির্দেশাবলী আলোচনা করুন।

২. অশ্লীলতা প্রতিরোধক আইনগুলি আলোচনা করুন।

৩.২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. *Laws of Press* — Dr. D.D. Basu.
২. *History of Press, Press Laws and Communication* — B.N. Ahuja
৩. *ভারতের প্রেস আইন* - বংশী মান্না
৪. *প্রেস আইন* - কমল ভট্টাচার্য
৫. *বিষয় সাংবাদিকতা*—ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
৬. *সংবিধান ও প্রেস আইন*—ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য

একক ৩ ❒ ডাব্লুটিও চুক্তি এবং বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকার আইন, কপিরাইট আইন, ট্রেডমার্কস অ্যাক্ট এবং পেটেন্ট আইন—তথ্য অধিকার আইন ২০০৫- হুইস্‌েল্‌ ব্লোয়ার প্রোটেকশন অ্যাক্ট (২০১১)

গঠন

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

৩.৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩.৩ ডাব্লুটিও চুক্তি এবং বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকার আইন

৩.৩.৪ কপিরাইট আইন

৩.৩.৫ ট্রেডমার্কস অ্যাক্ট এবং পেটেন্ট আইন

৩.৩.৬ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫

৩.৩.৭ হুইস্‌েল্‌ ব্লোয়ার প্রোটেকশন অ্যাক্ট (২০১১)

৩.৩.৮ সারাংশ

৩.৩.৯ অনুশীলনী

৩.৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল:

- ডাব্লুটিও চুক্তি এবং বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকার আইন
- কপিরাইট আইন
- ট্রেডমার্কস অ্যাক্ট এবং পেটেন্ট আইন
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫
- হুইসেল ব্লোয়ার প্রোটেকশন অ্যাক্ট (২০১১)

৩.৩.২ প্রস্তাবনা

কোনও আইনই অবাধ নয়। জাতীয়, সামাজিক এবং ব্যক্তি স্বার্থের রক্ষায় নিন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। তাই প্রণীত হয় কিছু আইন যা যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এরকম আইন নিয়েই এই এককে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৩.৩ ডাব্লুটিও (WTO) চুক্তি এবং বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকার আইন

WTO-এর Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) চুক্তি, প্রথমবারের মতো

বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় মেধা সম্পদের নিয়ম চালু করা হয়ে ১৯৮৬-৯৪-এর উরুগুয়ে রাউন্ডের সময়।

এটি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউটিও) সব সদস্য দেশের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক আইনি চুক্তি। জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা বিভিন্ন ধরনের জাতীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানের জন্য সর্বনিম্ন মান নির্ধারণ করে, যেমনটি বিশ্বব্যাপী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলির নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৯৯৪ সালে জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড (জিএটিটি) -এর উরুগুয়ে রাউন্ডের শেষে ট্রিপসগুলি নিয়ে আলোচনা হয় এবং ডব্লিউটিও কর্তৃক পরিচালিত হয়।

WTO-এর TRIPS চুক্তি হল এই অধিকারগুলিকে সারা বিশ্বে সুরক্ষিত ও প্রয়োগ করা এবং ফাঁকগুলোকে সংকুচিত করা এবং সাধারণ আন্তর্জাতিক নিয়মের আওতায় আনার একটি প্রচেষ্টা। এটি সুরক্ষা এবং প্রয়োগের ন্যূনতম মানগুলি স্থাপন করে যা প্রতিটি সরকারকে সহকর্মী ডব্লিউটিও সদস্য নাগরিকদের কাছে থাকা মেধা সম্পত্তিকে দিতে হয়।

TRIPS চুক্তি পাঁচটি বিস্তৃত ক্ষেত্রকে কভার করে—এগুলি হল :

১. বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সাধারণ বিধান এবং মৌলিক নীতিগুলি আন্তর্জাতিক মেধা সম্পত্তিতে কীভাবে প্রযোজ্য

২. মেধা সম্পদ অধিকারের জন্য সুরক্ষার ন্যূনতম মানগুলি কী যা সদস্যদের প্রদান করা উচিত

৩. কোনও পদ্ধতি সদস্যদের তাদের নিজস্ব অঞ্চলে সেই অধিকারগুলি প্রয়োগের জন্য প্রদান করা উচিত

৪. কিভাবে WTO সদস্যদের মধ্যে বৌদ্ধিক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়

৫. ‘TRIPS’ বিধান বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ ক্রান্তিকালীন ব্যবস্থা।

মূলত ডাব্লুটিও-তে ভারতের প্রবেশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আইপি-র সব ধরনের সম্পর্কিত বিধিগুলি সংশোধন বা পুনরায় চালু করা হয়েছে। ভারতে আইপি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই কয়েকটি উন্নয়ন হয়েছে।

পেটেন্টস-কোনও কিছু উদ্ভাবনের জন্য অনুমোদন করা হয়। উদ্ধাবনটি একটি পণ্য বা একটি প্রক্রিয়া বা কোনও বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত নতুন আবিষ্কার বা কোনও বিদ্যমান প্রযুক্তিতে কোনও সংযোজন। এটি উদ্ভাবক এবং সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি।

ট্রেডমার্ক-ট্রেডমার্ক হতে পারে এক বা একাধিক শব্দ, বর্ণ ও সংখ্যা। স্বাতন্ত্রমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে এখানে থাকতে পারে ড্রয়িং, শ্রবণযোগ্য চিহ্ন যেমন সংগীত বা শব্দ, ঘ্রান, বা রং, কোনও প্রতীক।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন—হচ্ছে এমন বিষয়ে যা পণ্য কে আকর্ষণীয় ও আবেদনময় করে তোলে। যেমন কোন কোনও পণ্য।

কপিরাইট—হচ্ছে কোনও সাহিত্য, নাটক, বাদ্যযন্ত্র, শৈল্পিক কাজ, সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্মের রেকর্ড এবং সম্প্রচারের অনুলিপি এবং ব্যবহারের অধিকার।

ভৌগোলিক পরিচিতি বা জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন—হচ্ছে কোনও একটি চিহ্ন বা প্রতীক, যে প্রতীকের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক উৎস রয়েছে। একটি ভৌগোলিক পরিচিতিতে পণ্যের উৎপাদন স্থানের নাম থাকে, যেমন দার্জিলিঙের চা, কাঞ্চিপুরামের শাড়ি ইত্যাদি।

বৌদ্ধিক সম্পদ কী ?

বৌদ্ধিক সম্পদ (আই পি) অন্য যে কোনও সম্পদ অধিকারের মতো—এই অধিকার ট্রেডমার্ক, পেটেণ্ট বা কপিরাইট স্বত্বাধিকারীকে তার কাজ বা বিনিয়োগ দেখে লাভবান হওয়ার সুবিধা প্রদান করে। এই অধিকার মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে।

৩.৩.৪ কপিরাইট আইন

কপিরাইট বা রচনা স্বত্ব আইন ১৯৫৭

সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র বা সঙ্গীত বৌদ্ধিক সম্পদ। এগুলোকে যথেচ্ছভাবে পুনর্মুদ্রণ বা তার থেকে সাহিত্যিক চৌর্য প্রতিরোধ করতেই ১৯৫৭ সালে কপিরাইট আইনের প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত, মূল রচনাটিকে সংরক্ষণ করা তথ্য রচনা যথাযোগ্য মূল্য নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, রচনাটির সমপ্রসারণের প্রয়োজনে আইনে অনাবশ্যক কাঠিন্য বর্জন করা হয়েছে। কপিরাইট এমন এক অধিকার যা যে কোনও ব্যক্তি বা বৌদ্ধিক পরিশ্রমের ফলে অর্জন করেন। তাই কপিরাইট আইনের প্রথম লক্ষ্য হলো যাতে অন্য কোনও ব্যক্তি সেই পরিশ্রমের সুফল অনভিপ্রেতভাবে ভোগ না করে। এই আইন অনুসারে কপিরাইটের অধিকারীর নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে এককভাবে অধিকার থাকবে :

ক. যেকোনও ক্ষেত্রে রচনা বা সৃষ্টির পুনর্প্রকাশ;

খ. রচনাটির পুনর্মুদ্রণ;

গ. সৃষ্টিটিকে জনসমক্ষে প্রদর্শন;

ঘ. সৃষ্টি বা রচনা প্রযোজনা প্রকাশ এবং অনুবাদ।

আন্তর্জাতিক কপিরাইট অনুসারে কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর ৫০ বছর কপিরাইট বলবৎ থাকে। শুধুমাত্র প্রকাশিত রচনা ক্ষেত্রেই নয়, অপ্রকাশিত রচনা ক্ষেত্র ও কপিরাইট আইন যুক্ত হতে পারে। ১৯১১ সালে ইংল্যান্ড এই আইন চালু হয়। ভারতীয় ধারা ১৩(১) অনুযায়ী কোনও সাহিত্য, শিল্প, নাটক বা সঙ্গীতধর্মী কোনও মৌলিক সৃষ্টির অপ্রকাশিত হলেও তা কপিরাইটের আওতায় পড়বে। ১৯৮৪ সালের কপিরাইট আইনের সংশোধনীর পর থেকে অপ্রকাশিত রচনা, অনুবাদ এবং সৃষ্টির প্রকাশের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রথার প্রচলন করা হয়েছে। কপিরাইট আইন ভঙ্গকারীকে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা আর্থিক জরিমানা, বা উভয় শাস্তি হিসেবে ধার্য করা হতে পারে।

৩.৩.৫ ট্রেড মার্কস অ্যাক্ট এবং পেটেন্ট আইন

স্বাধীনতার আগে প্রথম বিধিবদ্ধ সুরক্ষা ভারতকে ট্রেডমার্ক আইন, ১৯৪০-এর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। এই আইনটি ইংল্যান্ডের ট্রেডমার্ক অ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর উপর ভিত্তি করে ছিল। ১৯৪০ সাল থেকে ব্যবসায়ের এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল। স্বাধীনতার পরে, জাস্টিস এ.এন. রাজগোপাল আয়ঙ্গার, বাণিজ্য ও মার্চেন্ডাইজ মার্কস অ্যাক্ট ১৯৫৮ সালে পাস করেন।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিনিয়োগ প্রবাহ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে, একটি বিস্তৃত আইনের দরকার ছিল, সুতরাং ১৯৯৯ সালে ট্রেডমার্কস আইনটি পাস হয়েছিল, যা কার্যকর হয়েছিল ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ থেকে। এই আইনটি বাণিজ্য ও মার্চেন্ডাইজ মার্কস অ্যাক্ট ১৯৫৮ কে বাতিল করে।

ট্রেডমার্ক অ্যাক্ট, ১৯৯৯ এর ধারা ২ (খ) এ ট্র্যাড মার্ককে সংজ্ঞায়িত করেছে, গ্রাফিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম এমন একটি চিহ্ন এবং যা অন্যের থেকে একজন ব্যক্তির পণ্য বা পরিষেবাকে পৃথক করতে সক্ষম।

ট্রেডমার্কের মেয়াদ

বাণিজ্য চিহ্নের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এর চিরজীবন। যদিও প্রথমদিকে ট্রেডমার্কটি ১০ বছরের জন্য নিবন্ধিত হয়, তবে এটি পর্যায়ক্রমে পুনর্নবীকরণ করা যেতে পারে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি না এটি নিবন্ধ থেকে সরিয়ে না দেওয়া হয় বা আদালতের আদেশে নিষিদ্ধ করা হয়।

ভারতের ট্রেডমার্ক আইনগুলি ১৯৯৯ ট্রেড মার্কস অ্যাক্ট এবং ২০০২ এবং ২০১৭ এর ট্রেডমার্কস বিধি দ্বারা গঠিত।

ওয়ারেন্ট ছাড়াই নকল বলে সন্দেহ করা জিনিসপত্র আটক করার ক্ষমতা এবং বাণিজ্য জালিয়াতি আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে পুলিশকে এখন আরও শক্তিশালী ক্ষমতা রয়েছে। তবে এই পদক্ষেপগুলি নেওয়ার আগে এই চিহ্নটি নিবন্ধের বিষয়ে পুলিশকে ট্রেড মার্ক রেজিস্ট্রারের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার দ্বারা প্ররোচিত করেছে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অধিকারের মালিকদের ট্রেড চিহ্ন হিসাবে ভারতে তাদের ডোমেনের নামগুলি নিবন্ধভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিবন্ধকরণে দুই বছর সময় লাগে।

ভারতে একটি ট্রেডমার্ক দশ বছরের জন্য বৈধ এবং এটি আরও দশ বছরের জন্য পুনবীকরণ করা যেতে পারে।

পেটেন্ট

১৯৭০ সালের ভারতের পেটেন্টস অ্যাক্ট, ২০০৩ পেটেন্ট বিধি এবং ২০১৬ সালের পেটেন্ট সংশোধনী বিধিগুলি পেটেন্ট সম্পর্কিত আইন নির্ধারণ করে। পেটেন্টগুলির নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হল পেটেন্টস, ডিজাইনস এবং ট্রেড মার্কস নিয়ন্ত্রক অফিসারের অধীনে পেটেন্ট রেজিস্ট্রার, যা ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অংশ। পেটেন্টগুলি বার্ষিক পুনর্নবীকরণ ফি সাপেক্ষে আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে ২০ বছরের জন্য বৈধ। ভারতের পেটেন্ট আইন ‘প্রথমে ফাইল করা’ নীতির অধীনে কাজ করে—অর্থাৎ, যদি দু’জন লোক কোনও অভিন্ন আবিষ্কারের জন্য পেটেন্টের জন্য আবেদন করে, তবে আবেদন করার জন্য প্রথমজন পেটেন্ট পাবে।

ডিজাইন

আইন পরিচালনার আইনগুলি হ’ল ডিজাইন আইন, ২০০০ এবং ডিজাইনস বিধি, ২০০১। ডিজাইনগুলি সর্বোচ্চ দশ বছরের জন্য বৈধ, আরও পাঁচ বছরের জন্য পুনরায় নবীকরণযোগ্য।

৩.৩.৬ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫

সংসদের দ্বারা গৃহীত এটি একটি আইন, যাতে নাগরিকগণ লোক-কর্তৃপক্ষের (Public Authority) নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকা তথ্য যাতে সহজে লাভ করতে পারে তার জন্য এটা প্রবর্তন করা হয়েছে। এই আইনটি জম্মু এবং কাশ্মীর বাদে ভারতের সব রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে প্রযোজ্য। এই আইনের অধীনে নাগরিকগণ লোক-কর্তৃপক্ষর (সহজ অর্থে, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহ, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান, সরকারি পুঁজি লাভ করা বেসরকারি সংস্থাদির) নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকা তথ্য নির্দিষ্ট মাসুলের বিনিময়ে জানতে পারবে। এই আইনটি ২০০৫ সালের ১৫ জুন সংসদে গৃহীত হয়েছিল এবং সেই বছরে ১৩ অক্টোবর থেকে কার্যকরী হয়েছিল।

তথ্য জানার অধিকার আইন কেন?

ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদ দেশের প্রত্যেকটি *নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকারকে সুনিশ্চিত করে।* তথ্য জানার অধিকারও এই ধারার মধ্যে পড়ে বলে সুপ্রিম কোর্ট মনে করে। একে বাস্তবে প্রয়োগ করতে তৈরি হয় তথ্যের অধিকার আইন (আরটিআই) ২০০৫। এই অধিকার দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে নাগরিকদের হাত শক্ত করে। বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণের ক্ষমতা তৈরি করে দেয়। সমস্ত সরকারি তথ্যকে যাচাই করে তাঁরা জানতে পারেন, যাদের ভোট দিয়ে সরকারে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা ঠিকমতো কাজ করছেন কিনা। আরটিআইকে হাতিয়ার করে দেশের এক জন নাগরিক দর্শক থেকে প্রশাসন প্রক্রিয়ায় এক জন সংক্রিয় অংশগ্রহণকারী হতে পারেন। এই আইন বলে এক জন নাগরিক দেশের সমস্ত সরকারি দফতরের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। শুধু জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া সারা দেশেই এই আইন প্রযোজ্য।

তথ্য কীভাবে যাচাই করা যায়?

তথ্য জানার অধিকার আইন, ২০০৫এর অধীনে প্রত্যেকটি সরকারি কার্যালয়ে, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক এবং বীমা প্রতিষ্ঠানে একজন 'লোক তথ্য কর্মী' নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। তথ্য প্রদানের কাজ-কর্ম এই বিষয়ক কর্মী দেখাশুনা করেন। নাগরিকের যেকোনো তথ্য যাচাইয়ের জন্য "লোক তথ্য কর্মী"র কাছে আবেদন করতে হয়। আবেদন নিষ্পত্তিকরণের সময়সীমা ৩০দিন। অবশ্য আবেদনের বিষয় যদি কোনও ব্যক্তির জীবন বা স্বত্ব সম্পর্কীত হয়, তবে তথ্য ৪৮ঘণ্টার ভিতর যোগান দিতে হয়।

যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতর 'লোক তথ্য কর্মী' আবেদনকারীর অনুরোধ রক্ষা না করে বা 'লোক তথ্য কর্মী' ভুল তথ্য দিয়ে বা তথ্য যোগান বাবদ হওয়া খরচের হিসাবের ক্ষেত্রে আবেদনকারী সন্তুষ্ট না হয়, তবে এর বিরুদ্ধে আপিল করতে পারে।

তথ্য সংগ্রহের সুযোগ :

তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫-এর সেকশন ২(জে)-এ তথ্যের অধিকার মানে সমস্ত কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারি কর্তৃপক্ষের (পাবলিক অথরিটি) তথ্য জানার অধিকার। এর মধ্যে পড়ছে :

- কাজ, তথ্য এবং রেকর্ডস দেখার অধিকার। (তথ্য কী ? -রেকর্ড, নথি, মেমো, ই-মেল, মতামত,পরামর্শ,প্রেস রিলিজ, বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশ, লগবুক, চুক্তি, রিপোর্ট, দলিল-দস্তাবেজ, নমুনা, মডেল,তথ্য যেগুলি ইলেকট্রনিক মোডে ধরা আছে, আপাত বলবৎ কোনও আইনে পাবলিক অথরিটির নেওয়া কোনও বেসরকারি সংস্থার তথ্য)
- প্রত্যয়িত নমুনা গ্রহণ
- ফ্লপি, টেপ, ভিডিও ক্যাসেট বা অন্য কোনও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অথবা প্রিন্ট আউট করে কমপিউটারে রাখা তথ্য সংগ্রহণ করা যাবে।

কোন তথ্য প্রকাশযোগ্য নয়?

এক জন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি দেওয়া হবে না যদি তিনি তথ্য আধিকারিককে বোঝাতে সক্ষম না হন যে, প্রকাশিত তথ্য জনস্বার্থে কাজে লাগবে (এ ক্ষেত্রে আংশিক তথ্য দেওয়া যেতে পারে যার মধ্যে অপ্রকাশযোগ্য কোনও তথ্য থাকবে না)

- দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বিঘ্নিত হয় এমন তথ্য, যে তথ্য প্রকাশ করলে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে

সম্পর্কে ব্যাঘাত ঘটে, অপরাধের উস্কানিতে সাহায্য করে, দেশের অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, সেই ধরনের কোনও তথ্য

- আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা কোনও তথ্য বা এমন তথ্য যা প্রকাশ করলে আদালতের অবমাননা হবে
- সংসদ বা রাজ্য বিধানসভার অধিকার ভঙ্গ হতে পারে এমন কোনও তথ্য
- বাণিজ্যিক গোপন বিষয়, ব্যবসায়িক গোপন কৌশল বা বুদ্ধিগত সম্পত্তি যার প্রকাশ তৃতীয় পক্ষের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের ক্ষতি করবে, যদি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বৃহত্তর জনস্বার্থে এই তথ্যের প্রকাশ প্রয়োজন
- কোনও ব্যক্তির আস্থাভাজন সম্পর্ক সূত্রে পাওয়া তথ্য, যদি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বৃহত্তর জনস্বার্থে এই তথ্যের প্রকাশ প্রয়োজন
- বিদেশি সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গোপন তথ্য
- এমন কোনও তথ্য যা প্রকাশ করলে কোনও ব্যক্তির শারীরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা নিরাপত্তা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে দেওয়া কোনও সূত্র বা তথ্য
- যে তথ্য প্রকাশের ফলে অপরাধীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান, গ্রেফতারি বা মামলা রুজু করা বিঘ্নিত হবে
- মন্ত্রিপরিষদ, সচিব ও অন্য আধিকারিকদের আলোচনার নথিসহ মন্ত্রিসভার কাগজপত্র
- ব্যক্তিগত তথ্য, যার সঙ্গে জনসাধারণের কার্যকলাপ বা আগ্রহের কোনও সম্পর্ক নেই বা ব্যক্তির গোপনীয়তায় অনধিকার হস্তক্ষেপ করা হবে, যদি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বৃহত্তর জনস্বার্থে এই তথ্যের প্রকাশ প্রয়োজন।

কী ভাবে এই আইন প্রয়োগ করবো?

যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিক তথ্যের অধিকার আইনে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

তথ্যের জন্য আবেদন :-

আপনি হাতে লিখে বা টাইপ করে যে কোনও পাবলিক অথরিটির (সরকারি প্রতিষ্ঠান বা অনুদান প্রাপ্ত) কাছে তথ্য অধিকার আইন ২০০৫-এর অধীনে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সাইট থেকেও ডাউনলোড করতে পারেন।

হিন্দি, ইংরিজি অথবা স্থানীয় ভাষায় আবেদন করতে পারেন।

আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকবে :

১. অ্যাসিট্যান্ট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার (সংক্ষেপে এপিআইও)/পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার (পিআইও)-র নাম ও ঠিকানা

২. বিষয়: তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫-এ ৬(১) ধারা অনুসারে আবেদন

৩. কোন বিষয়ে তথ্য চাইছেন

৪. আবদেনকারীর নাম

৫. বাবা/স্বামীর নাম

৬. এসসি/এসটি/ওবিসি
৭. আবেদনপত্রের ফি
৮. বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবার-হ্যাঁ/না
৯. ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেল (ই-মেল এবং মোবাইল নম্বর দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়)
১০. স্থান এবং তারিখ
১১. আবেদনকারীর স্বাক্ষর
১২. আবেদনের সঙ্গে অন্য যে কাগজ দেওয়া হয়েছে তার তালিকা

৩.৩.৭ হুইস্‌ল্ ব্লোয়ার প্রটেকশন অ্যাক্ট (২০১১)

২০০১ সালে ভারতের আইন কমিশন সুপারিশ করেছিল যে, দুর্নীতি দূর করার জন্য, হুইস্‌ল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষার জন্য একটি আইন প্রয়োজন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এটি একটি বিলের খসড়াও তৈরি করেছিল।

সরকার, প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ২০০৪ সালে পাস করে 'পাবলিক ইন্টারেস্ট ডিসক্লোজার এন্ড প্রটেকশন অফ ইনফর্মার্স রেজোলুশন' (PIDPIR)।

এই রেজোলিউশনটি সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনকে (সিভিসি) হুইস্‌ল্ ব্লোয়ারদের অভিযোগের উপর কাজ করার ক্ষমতা দেয়।

এই ধরনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য, ২০১১ সালে হুইসেল ব্লোয়ারস সুরক্ষা বিল প্রস্তাব করা হয়েছিল যা অবশেষে ২০১৪ সালে একটি আইনে পরিণত হয়েছিল।

বিলের হাইলাইটস

- এই আইনটি কোনও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের প্রকাশ সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়ার জন্য এবং এই ধরনের প্রকাশের বিষয়ে অনুসন্ধান বা তদন্ত করার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।
- বিল হুইস্‌ল্ ব্লোয়ারদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছে।
- প্রতিটি অভিযোগে অভিযোগকারীর পরিচয় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।
- বিলে অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশকারী যে কোনও ব্যক্তিকে শাস্তির বিধান আছে।

বিলটিতে জেনেশুনে মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য জরিমানার বিধান আছে।

২০১৫ সালে, একটি সংশোধনী বিল উত্থাপন করা হয়েছিল যাতে প্রস্তাব করা হয়, হুইস্‌ল্ ব্লোয়ারদের ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ কোন নথি প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না যদিও উদ্দেশ্য দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার বা অপরাধমূলক কার্য্যকলাপ প্রকাশ করার হয়। এটি ২০১৪ আইনের অস্তিত্বকে দুর্বল করে দেয়।

৩.৩.৮ সারাংশ

জাতীয় অধিকারগুলি আইপি-র স্রষ্টাদের দেওয়া সুরক্ষা এবং এতে ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, পেটেন্টস্, শিল্প নকশা এবং কিছু এখতিয়ারে বাণিজ্য গোপনীয়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংগীত এবং সাহিত্য এবং নকশা ইত্যাদি সহ শৈল্পিক কাজগুলি সমস্ত বৌদ্ধিক সম্পদ হিসাবে সুরক্ষিত হতে পারে। তথ্য জানার অধিকার আইন, ২০০৫ ২০০৫ সালের ১৫ জুন সংসদে গৃহীত হয়েছিল এবং সেই বছরে ১৩ অক্টোবর থেকে পূর্ণ কার্যকরী হয়েছিল। হুইস্‌ল্ ব্লোয়ার বিল হিসাবে সাধারণত পরিচিত, এটি কোনও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির বা ইচ্ছাকৃত ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের অভিযোগে অভিযোগগুলি নথিভুক্ত করার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

৩.৩.৯ অনুশীলনী

১. **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন**
   (ক) বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকার দ্বারা আপনি কী বোঝেন?
   (খ) কপিরাইট আইন সংজ্ঞায়িত করুন।
   (গ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫ বিস্তৃতভাবে লিখুন।

২. **টীকা লিখুন**
   (ক) ট্রেডমার্কস অ্যাক্ট।
   (খ) হুইস্‌ল্ ব্লোয়ার বিল।

৩.৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. *ভারতের প্রেস আইন*–বংশী মান্না
২. *সংবিধান ও প্রেস আইন*–ড. নন্দলাল ভট্টাচার্য : লিপিকা
৩. *Media Laws and Indian Constitution*–S. Kundra
৪. *Media, Ethics and Laws*–Jan R. Hakemulder, Fay A.C. de Jonge, P. P. Singh
৫. *Law of the Press*–Durga Das Basu

একক ৪ ❒ সিনেমাটোগ্রাফ আইন, ১৯৫২ : প্রসার ভারতী আইন, বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলির বিধি, কেবল্ টিভি রেগুলেশন আইন, ভারতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের নীতিমালা গাইডলাইন কমিউনিটি রেডিও লাইসেন্স পদ্ধতি - কমিউনিটি রেডিও বিধি, আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এর সম্প্রচার কোড, বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলির স্ব-নিয়ন্ত্রণ

গঠন

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

৩.৪.৩ সিনেমাটোগ্রাফ আইন, ১৯৫২

৩.৪.৪ প্রসার ভারতী আইন -

৩.৪.৫ কেবল্ টিভি রেগুলেশন আইন, ১৯৯০

৩.৪.৬ ভারতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের নীতিমালা গাইডলাইন -

৩.৪.৬.১ কমিউনিটি রেডিও লাইসেন্স পদ্ধতি

৩.৪.৬.২ ভারতে কমিউনিটি রেডিও বিধি

৩.৪.৭ আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এর সম্প্রচার কোড

৩.৪.৮ বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলির স্ব-নিয়ন্ত্রণ

৩.৪.৯ সারাংশ

৩.৪.১০ অনুশীলনী

৩.৪.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল-

- সিনেমাটোগ্রাফ আইন, ১৯৫২
- প্রসার ভারতী আইন -
- কেবল্ টিভি রেগুলেশন আইন
- ভারতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের নীতিমালা গাইডলাইন-কমিউনিটি রেডিও লাইসেন্স পদ্ধতি-ভারতে কমিউনিটি রেডিও বিধি-

- আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এর সম্প্রচার কোড
- বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলির স্ব-নিয়ন্ত্রণ

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

এই সংকলনটি বিদ্যমান আইনি কাঠামো যা ভারতে বর্তমানে ব্যবহৃত বিভিন্ন সম্প্রচার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা পরীক্ষা করার চেষ্টা করবে। অষ্টম ভারতের সংবিধানের তফসিলটি কেন্দ্রীয় সরকারকে বৈদ্যুতিন মিডিয়াতে আইন করার ক্ষমতা দেয়। আসুন আমরা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন জানি।

৩.৪.৩ সিনেমাটোগ্রাফ আইন, ১৯৫২

সিনেমাটোগ্রাফের মাধ্যমে সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্মের শংসাপত্রের জন্য এবং সিনেমাটোগ্রাফের মাধ্যমে প্রদর্শনী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার জন্য এই আইনটি কার্যকর করা হয়েছিল। এই আইনের পরিধি সমগ্র ভারত জুড়ে I, II এবং IV অংশগুলি বিস্তৃত হয়েছে এবং সমগ্র তৃতীয় খণ্ড কেবলমাত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রসারিত। এই বিশেষ আইনে কিছু শর্তাবলী নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে-

—"প্রাপ্তবয়স্ক" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি তার আঠারো বছর পূর্ণ করেছেন

—"বোর্ড" অর্থ ধারা ৩ এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত ফিল্ম সার্টিফিকেশন বোর্ড

—"শংসাপত্র" অর্থ বোর্ডের অধীনে প্রদত্ত শংসাপত্র

"সিনেমাটোগ্রাফ" মুভিং ছবি বা সিরিজের ছবির উপস্থাপনের জন্য কোনও যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত করে;

"জেলা ম্যাজিস্ট্রেট", প্রদেশ—নগরের সাথে সম্পর্কিত, অর্থ পুলিশ কমিশনার;

—"ফিল্ম" অর্থ একটি সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্ম

—"স্থান" এর মধ্যে একটি বাড়ি, বিল্ডিং, তাঁবু এবং পরিবহনের যে কোনও বর্ণনা সমুদ্র, স্থল বা বায়ু দ্বারা অন্তর্ভুক্ত;

—"নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত; (ছ)

—"আঞ্চলিক কর্মকর্তা" অর্থ ধারা ৫ এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি আঞ্চলিক কর্মকর্তা এবং এতে একটি অতিরিক্ত আঞ্চলিক কর্মকর্তা এবং একজন সহকারী আঞ্চলিক কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে;—"

ট্রাইব্যুনাল "অর্থ ধারা 5D এর অধীন গঠিত আপিল ট্রাইব্যুনাল]

আইনটি ফিল্ম শংসাপত্রের কেন্দ্রীয় বোর্ড নামে পরিচিত একটি বোর্ড গঠনের বিধান রাখে। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্য ৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ করবে। বোর্ডের কাছ থেকে শংসাপত্র গ্রহণের জন্য, যে কোনও ব্যক্তি তার / তার চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য দেখাতে চান তাকে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কাছে নির্ধারিত ফরমাটে আবেদন করতে হবে।

বোর্ড যথাযথভাবে ফিল্মটি পরীক্ষা করার পরে—(i) অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ্য প্রদর্শনীর জন্য ফিল্মকে অনুমোদন দেবে (ii) প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রকাশ্য প্রদর্শনীর জন্য ফিল্মটি প্রদর্শন; (iii) আবেদনকারীকে ফিল্মে প্রকাশ্য প্রদর্শনের জন্য চলচ্চিত্র অনুমোদনের আগে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে যেমন ফিল্মে এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা পরিবর্তনগুলি পরিচালনা করতে নির্দেশ দান, বা (iv) পাবলিক প্রদর্শনীর জন্য ছবিটি অনুমোদন করতে অস্বীকার করা।

সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনটির নয়টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে যার একটি করে মুম্বাই (সদর দফতর), কলকাতা, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালুরু, তিরুবনন্তপুরম, হায়দরাবাদ, নয়াদিল্লি, কটক এবং গুয়াহাটিতে রয়েছে। আঞ্চলিক অফিসগুলি উপদেষ্টা প্যানেল দ্বারা চলচ্চিত্র পরীক্ষাতে সহায়তা করে। প্যানেলগুলির সদস্যরা ২ বছর মেয়াদে বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত করে। ফিল্মগুলি সাধারণত ৪ টি বিভাগের আওতায় অনুমোদিত হয়। প্রাথমিকভাবে, শংসাপত্রের মাত্র দুটি বিভাগ ছিল - "ইউ" (সীমাবদ্ধ পাবলিক প্রদর্শনী) এবং "এ" (প্রাপ্ত বয়স্ক দর্শকদের কাছে সীমাবদ্ধ)। ১৯৮৩ সালের জুনে আরও দুটি বিভাগ যুক্ত করা হয়েছিল - "ইউ / এ" (বারো বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য পিতামাতার দিক নির্দেশনার অধীনে সীমিতভাবে প্রকাশ্য প্রদর্শনী) এবং "এস" (বিশেষজ্ঞ শ্রোতাদের যেমন চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ)। বিভাগের ৫ সি এর অধীন বোর্ডের যে কোনও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করবেন। ট্রাইব্যুনালের প্রধান কার্যালয় নয়াদিল্লিতে থাকবে এবং এতে চেয়ারম্যান থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য চার সদস্যের বেশি নয়।

৩.৪.৪ প্রসার ভারতী আইন

১৯৯০ সালের প্রসার ভারতী (ব্রডকাস্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া) আইনের দু'টি উদ্দেশ্য আইনের ধারা ১২ তে উল্লিখিত। ধারা ১২ (৩) (ক) আদেশ দিয়েছে যে প্রসার ভারতী নিশ্চিত করে যে "সম্প্রচারটি জনসেবা হিসাবে পরিচালিত হয়।" আবার, ধারা ১২ (৩) (খ) আরও জোর দেয় যে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য প্রচার নয়, সংবাদ সংগ্রহ করা। এই আইনটি স্বাধীনতা-পরবর্তী সংগ্রামের কয়েক দশক পরে সরকারের হস্তক্ষেপের থেকে মুক্ত সম্প্রচারের জন্য অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল। আইনটির আইনি উদ্দেশ্য সুপ্রিম কোর্টের ১৯৯৫ সালের রায়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক বনাম বাংলার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিধ্বনি খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে বলা হয়েছিল যে "সম্প্রচারের স্বাধীনতার প্রথম দিকটি রাষ্ট্র বা সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি, বিশেষত সরকার কর্তৃক সেন্সরশিপ থেকে ... পাবলিক সম্প্রচারকে রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারের সমান করা যায় না"। প্রসার ভারতী কর্পোরেশনের মূল লক্ষ্য দূরদর্শন এবং আকাশবাণীকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া—"যাতে তারা জনসাধারণকে শিক্ষিত ও বিনোদন দিতে পারেন।"।

The twin objectives of the Prasar Bharati (Broadcast Corporation of India) Act of 1990 are crystallized in Section 12 of the law. Section 12 (3)(a) mandates that Prasar Bharati ensure that "broadcasting is conducted as a public service." Again, Section 12 (3)(b) reinforces that the purpose of establishing the corporation is to gather news, not propaganda. The Act came into existence after decades of post-independence struggle to free broadcasting from the stranglehold

of the government. The legislative intent of the Act finds an echo in the Supreme Court's 1995 judgment in The Secretary, Ministry of Information and Broadcasting versus the Cricket Association of Bengal, which said the ''first facet of the broadcasting freedom is freedom from state or governmental control, in particular from the censorship by the government... Public broadcasting is not to be equated with state broadcasting. Both are distinct.'' The Prasar Bharati Corporation's main objective is to provide autonomy to Doordarshan and Akashvani in order to ''educate and entertain the public.''

৩.৪.৫ কেবল্ টিভি নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৫

১৯৮০র দশকের মাঝামাঝি থেকে ভারতবর্ষে কেবল্ টিভির আবির্ভাব। প্রথমদিকে ভারতীয় কেবল্ মূলত ভিডিও ভিত্তিক থাকলেও নয়ের দশকের গোড়া থেকে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গুণগতভাবে উন্নত হয়। সেই সময় থেকেই এই সম্প্রচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারি চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত। স্পষ্টত বোঝা যায় কেবল টিভির মাধ্যমে বিদেশের স্যাটেলাইট সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান দেশীয় আইনের পরিধি সামাজিক—রাজনৈতিক—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাই ছিল এই সময়ের আলোচনার মূল সূত্র। পরবর্তী ক্ষেত্রে কেবল্ টিভির উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ এই বিষয়টিকে আইনের আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তা আরো বাড়িয়ে তোলে। ১৯৯৩ সালের তেসরা আগস্ট কেবল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক রেগুলেশন বিল ১৯৯৩ রাজ্যসভায় পেশ করা হয়। কিন্তু বিলটি পাস করানো যায়নি। ১৯৯৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার কেবল্ টি ভি নেটওয়ার্ক (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স জারি করে পরে তা সংসদে পেশ করিয়ে নেওয়া হয় ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে।

এই আইনের ফলে সমস্ত কেবল অপারেটরকে তাদের নাম, অনুষ্ঠান কোড, বিজ্ঞাপন কোড নথিভুক্ত করতে হয়। তাদের এ সংক্রান্ত একটি রেজিস্টারও ব্যবহার করতে হয়। বিদেশি চ্যানেলগুলি সম্প্রচারের পাশাপাশি দূরদর্শন এর দুটি চ্যানেল প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়। এছাড়াও কেবল্ টিভি ব্যবসায় ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত শেয়ার বিদেশি মালিকানায় রাখার সুযোগ এই আইনে দেওয়া হয়েছে। অতিসম্প্রতি ২০০২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কেবল্ টিভি আইনের নতুন সংশোধনী এনেছে। এর ফলে গ্রাহকদের পছন্দমত চ্যানেল দেখার ব্যবস্থা করা কেবল্ অপারেটরের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে বর্তমানে এই আইনটির বিশেষ প্রাসঙ্গিতা নেই।

৩.৪.৬ ভারতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের নীতিমালা গাইডলাইন

ভারতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের নীতি নির্দেশিকা

ভূমিকা

২০০২ সালের ডিসেম্বরে, ভারত সরকার আইআইটি / আইআইএম সহ সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রদানের নীতি অনুমোদন করে।

বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে এবং উন্নয়ন ও সামাজিক সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে নাগরিক সমাজের বৃহত্তর অংশগ্রহণের জন্য সরকার এখন "অলাভজনক" সংস্থা যেমন সুশীল সমাজ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহকে তার আওতায় আনার মাধ্যমে নীতি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিস্তারিত নীতি নির্দেশিকা এই বিষয়ে নীচে দেওয়া হল:

মৌলিক নীতি

একটি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন (সিআরএস) পরিচালনা করতে ইচ্ছুক একটি সংস্থা

নিম্নলিখিত নীতিগুলি সন্তুষ্ট করতে এবং মেনে চলতে সক্ষম হতে হবে:

ক) এটি স্পষ্টভাবে একটি "অলাভজনক" সংস্থা হিসাবে গঠন করা উচিত এবং হওয়া উচিত। স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে কমপক্ষে তিন বছরের পরিষেবা দেওয়ার প্রমাণিত রেকর্ড রয়েছে।

খ) এটি দ্বারা পরিচালিত সিআরএস নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য ডিজাইন করা উচিত।

গ) এটির একটি মালিকানা এবং পরিচালনা কাঠামো থাকা উচিত যা সিআরএস পরিবেশন করতে চায় এমন কমিউনিটির প্রতিচ্ছবি।

ঘ) কমিউনিটির জন্য প্রোগ্রামগুলি শিক্ষার সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত, সম্প্রদায়ের উন্নয়নমূলক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজন।

ঙ) এটির অবশ্যই একটি আইনী সত্তা হতে হবে অর্থাৎ এটি নিবন্ধিত হওয়া উচিত।

৩.৪.৬.১ কমিউনিটি রেডিও লাইসেন্স পদ্ধতি

নিম্নলিখিত ধরণের সংস্থাগুলি কমিউনিটি রেডিও লাইসেন্সর জন্য আবেদনের যোগ্য হবে:

ক) সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থাগুলি, যা অনুচ্ছেদ ১ এ তালিকাভুক্ত মৌলিক নীতিগুলি পূরণ করে উপরে। এর মধ্যে নাগরিক সমাজ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, রাজ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (এসএইউ), আইসিএআর প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নিবন্ধিত সমিতি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং পাবলিক ট্রাস্টস সোসাইটিস আইনের অধীনে নিবন্ধিত বা এই জাতীয় অন্য কোনও আইন যা এই কাজের জন্য প্রাসঙ্গিক। আবেদনের সময় নিবন্ধন কমপক্ষে তিন বছরের হতে হবে।

খ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

নিম্নলিখিতগুলি কোনও সিআরএস চালানোর জন্য যোগ্য হবে না:

ক) ব্যক্তি;

খ) রাজনৈতিক দল এবং তাদের অনুমোদিত সংগঠনগুলি; [ছাত্র, মহিলা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং এই দলগুলির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অন্যান্য শাখাগুলি।]

গ) মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংস্থা;

ঘ) কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ সংগঠনগুলি।

অ্যাপ্লিকেশনগুলির বাছাই প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ

(ক) কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের জন্য জাতীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতি বছর একবার আই ও বি মন্ত্রক দ্বারা আবেদন করা হবে।তবে যোগ্য সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটি বিজ্ঞাপনের মধ্যে মধ্যবর্তী সময়কালে আবেদন করতে পারে। আবেদনকারীদের নির্ধারিত আবেদন ফর্মে আবেদন করতে হবে আর প্রসেসিং ফি যাবত ২৫,০০০ টাকা দিতে হবে এবং আবেদনগুলি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিবেচনা করা হবে :

i. বিশ্ববিদ্যালয়, ডিমড বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের জন্য সচিব (আইএন্ডবি) এর সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সামনে আবেদনগুলি পেশ করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি একক উইন্ডো ছাড়পত্র পাবে। এমএইচএ এবং এমএইচআরডি থেকে পৃথক ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না।

ii. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সকল আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এলওআই স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা ও এইচআরডি (বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ এবং যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের ডব্লিউপিসি শাখার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ সাপেক্ষে জারি করা হবে।

বিধি মতো ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য সময়সূচী নির্ধারিত হবে :

i. নির্ধারিত ফরমে আবেদন প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে, আই অ্যান্ড বি মন্ত্রণালয় আবেদনটি বিবেচনা করবে এবং আবেদনকারীর ঘাটতিগুলি, যদি হয়, তা জানিয়ে দেয়া হবে আবেদনকারীদের। অনুচ্ছেদ ৩ a (i) এবং ৩ a (ii) এর বিধি অনুসারে ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের অনুলিপি অন্যান্য মন্ত্রনালয়ে পাঠাবে।

ii. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলি আবেদন পাওয়ার পরে তিন মাসের মধ্যে তাদের ছাড়পত্রের কথা জানাবে। তবে, তিন মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাড়পত্র দিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আবেদন এলওআইয়ের ইস্যু সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সচিবের (আইএন্ডবি) সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির কাছে প্রেরণ করা হবে।

iii. কোনও স্থানে একক ফ্রিকোয়েন্সি জন্য একাধিক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে, সফল আবেদনকারীকে সম্প্রদায় তাদের অবস্থান, প্রতিশ্রুতি পালন, উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলি এবং আবেদনকারী সংস্থার দ্বারা সংগঠিত হতে পারে এমন সংগঠনের পাশাপাশি এর প্রমাণপত্র এবং সংস্থার দ্বারা প্রদত্ত সম্প্রদায় পরিষেবার বছরের সংখ্যার ভিত্তিতে সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি দ্বারা আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে এলওআই জারির জন্য নির্বাচিত করা হবে।

iv. (এলওআই) ইস্যু হওয়ার এক মাসের মধ্যে যোগ্য : আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফরম্যাটে এবং প্রয়োজনীয় ফি দিয়ে, ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ ও স্যাকফাএ ছাড়পত্রের জন্য যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সঞ্চারভবন, নয়াদিল্লির ডব্লিউপিসি শাখায় আবেদন করতে হবে।

v. আবেদনের তারিখ থেকে ছয় মাসের সময়সীমা সাকফা ছাড়পত্র জারির জন্য নির্ধারিত হয়। ছয় মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে এ জাতীয় ছাড়পত্র না পাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন সিদ্ধান্তের জন্য সচিবের (আইএন্ডবি) সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিতে প্রেরণ করা হবে।

vi. স্যাকফা ছাড়পত্র পাওয়ার পরে (যার একটি অনুলিপি আবেদনকারীর মাধ্যমে জমা দেওয়া হবে), এলওআইয়ের ধারক নির্ধারিত ফরমেটে ২৫,০০০ টাকার বিনিময়ে একটি ব্যাংক গ্যারান্টি সরবরাহ করবেন। এরপরে, এলওআইয়ের ধারককে আই ও বি মন্ত্রণালয়ের একটি অনুদান চুক্তির (জিওপিএ) স্বাক্ষরের জন্য আমন্ত্রণ

জানানো হবে, যা তাকে যোগাযোগ ও তথ্য মন্ত্রকের ডব্লিউপিসি উইং থেকে ওয়্যারলেস অপারেটিং লাইসেন্স (ডাব্লুএল) সন্ধান করতে সক্ষম করবে। যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে ডাব্লুএলএল প্রাপ্তির পরেই কমিউনিটি রেডিও স্টেশনটি চালু করা যেতে পারে।

vii. সমস্ত ছাড়পত্র প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে অর্থাৎ জিওপিএ-তে স্বাক্ষর করার পরে অনুমতিধারীরা কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপন করবেন এবং আই ও বি মন্ত্রণালয়ে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন চালু করার তারিখটি ঘোষণা করবেন।

viii. উপরে উল্লিখিত সময়সূচী মেনে চলতে ব্যর্থ হলে এলওআই / জিওপিএ (Grant of Permission Agreement) ধারক এর এলওআই / জিওপিএ বাতিল করার জন্য এবং ব্যাংক গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত করার জন্য দায়বদ্ধ।

৩.৪.৬.২ ভারতে কমিউনিটি রেডিও বিধি

অনুমতি চুক্তির শর্তাদি মঞ্জুরি

i. অনুমতি অনুদান চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্য হবে।

ii. অনুমতি চুক্তির অনুদান এবং অনুমতিপত্রটি হস্তান্তরযোগ্য নয়।

iii. অনুমতিধারীর উপর কোনও অনুমতি ফি নেওয়া হবে না। তবে অনুমতিধারককে ডাব্লুপিসিকে স্পেকট্রাম ব্যবহারের জন্য ফি প্রদান করতে হবে, যা যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের শাখা।

iv. যদি অনুমতিধারক সমস্ত ছাড়পত্র প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে তার সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু না করে বা অপারেশন শুরুর পরে তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে সম্প্রচার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়, তবে তার অনুমতি বাতিল হতে বাধ্য এবং পরবর্তী যোগ্য প্রার্থীদের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ করা হবে।

v. একজন আবেদনকারী / সংস্থাকে এক বা একাধিক জায়গায় সিআরএস অপেরেশনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

vi. এলওআইয়ের ধারক কেবল অনুমতি চুক্তির সময়মত কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে কেবল ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা) এর জন্য একটি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি সরবরাহ করবেন।

vii. অনুমতিধারক যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিষেবাদিতে ব্যর্থ হন তবে সরকার ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন এবং সরকার প্রদত্ত অনুমতি বাতিল করতে পারবে।

বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ এবং নিরীক্ষণ

i) প্রোগ্রামগুলি স্থানীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত। যেমন উন্নয়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষামূলক, পরিবেশগত, সামাজিক কল্যাণ, সম্প্রদায় উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম।

ii) স্থানীয়দের অংশগ্রহণে কমপক্ষে ৫০% বিষয়বস্তু তৈরি করা হবে। সম্প্রদায় স্বার্থ হবে মুখ্য বিষয়, যার জন্য স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

iii) প্রোগ্রামগুলি স্থানীয় ভাষা এবং উপভাষায় হওয়া উচিত।

iv) অনুমতিধারককে অল ইন্ডিয়া রেডিওর জন্য নির্ধারিত প্রোগ্রাম এবং বিজ্ঞাপন কোড বিধানাবলী মেনে চলতে হবে।

v) অনুমতিধারক সিআরএস দ্বারা প্রচারিত সমস্ত প্রোগ্রাম সম্প্রচারের তারিখ থেকে তিন মাস সংরক্ষণ করবে।

vi) অনুমতিধারক এমন কোনও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবেন না, যা সংবাদ এবং বর্তমান বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত এবং অন্যথায় রাজনৈতিক প্রকৃতির।

vii) অনুমতিধারক অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে এতে এমন কোনও কিছুই অন্তর্ভুক্ত নেই যা সামাজিক সুস্থিতি বিপন্ন করে।

প্রোগ্রামে সম্প্রচারিত হবে না যা:

ক। ভাল স্বাদ বা শালীনতার বিরুদ্ধে আপত্তি;

খ। বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলির সমালোচনা রয়েছে;

গ। ধর্ম বা সম্প্রদায় বা ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির অবমাননাকর শব্দগুলির উপর আক্রমণ রয়েছে বা যা সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ বা অশোভন প্রচার করে;

ঘ। অশ্লীল, মানহানি, ইচ্ছাকৃত, মিথ্যা এবং পরামর্শমূলক সহজাত এবং অর্ধেক সত্য থাকে;

ঙ। হিংসা উৎসাহিত বা উদ্দীপ্ত হতে পারে বা এর বিরুদ্ধে কিছু রয়েছে যা আইন শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা সৃষ্টি বা যা দেশবিরোধী মনোভাব প্রচার করে;

চ। আদালত অবমাননা বা জাতির অখণ্ডতা প্রভাবিত করে এমন কিছু রয়েছে;

ছ। রাষ্ট্রপতি / ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বিচার বিভাগের মর্যাদার বিরুদ্ধে উল্লেখ রয়েছে;

জ। ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী, দেশের সামাজিক, পাবলিক এবং নৈতিক জীবনের বিভাগগুলিতে যে কোনও ব্যক্তিকে সমালোচনা, অপব্যবহার বা অপবাদ দেয়; কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাসকে উৎসাহ দেয়;

ঞ। মহিলাদের অবমাননা;

ট। বাচ্চাদের অবমাননা করে

ঠ। অ্যালকোহল, মাদক ও তামাক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহারকে উপস্থাপিত / চিত্রিত / পরামর্শ দিতে পারে বা জাতি, জাতীয়তা, বর্ণ, লিঙ্গ, যৌনতার ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা বা উদ্দীপনা বা জালিয়াতি বা চিরকালের বিদ্বেষ বা ঘৃণা করতে পারে বা পছন্দ, ধর্ম, বয়স বা শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার প্রতি বিদ্বেষ ছড়ায়।

viii) অনুমতিধারক অবশ্যই ধর্মীয় কর্মসূচির প্রতি যথাযথ যত্ন নেবেন।

সৌজন্যে - mib.gov.in

৩.৪.৭ আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এর সম্প্রচার কোড

অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শন তে সম্প্রচারের সময় নিশ্চিত করতে হবে যে এতে কোন কিছুই অন্তর্ভুক্ত নেই—

১। বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলির সমালোচনা;

২। ধর্ম বা সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ;

৩। অশ্লীল বা মানহানিকর কিছু;

৪। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের বিরুদ্ধে বা হিংসা বা যে কোনও কিছুতে উস্কানি

৫। আদালত অবমাননার সম্ভাবনা;

৬। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল এবং বিচারপতিদের বিরুদ্ধে কুৎসা করা যাবে না।

৭। নামে রাজনৈতিক দলকে আক্রমণ;

৮। যে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রের বিরূপ সমালোচনা;

৯। সংবিধানকে অপামান করা এবং হিংসার মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তনে যে-কোনও ধরনের প্রয়াসে আকাশবাণী বা দুরদর্শন মদত দেবে না। তবে, সংবিধান মোতাবেক কোন পরিবর্তন (যেমন, নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠন) সম্পর্কে বলা যাবে।

১০। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল ছাড়া অন্য কোনও তহবিলের জন্য আবেদন জানাতে বেতার বা সংবাদ মাধ্যমকে ব্যবহার করা যাবে না। এবং প্রধানমন্ত্রীর এই ত্রাণ তহবিল প্রাকৃতিক বিপর্যস্ত (বন্যা, ভূমিকম্প বা ভয়াবহ খরার) ক্ষেত্রেই খোলা হতে পারে। এছাড়া, বৈদেশিক আক্রমণের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার আবেদন প্রচার করা যাবে।

১১। কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন সম্পর্কে এমন কিছু প্রচার করা যাবে না যা ব্যক্তি বা সংগঠনের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির সহায়ক হবে।

১২। কোনও বানিজ্যিক বা ব্যবসায়িক সংগঠনের উৎপাদিত বস্তুর নাম এমনভাবে প্রচার করা যাবে না যা বিজ্ঞাপন হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

৩.৪.৮ বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলির স্ব-নিয়ন্ত্রণ

বর্তমানে নিউজ চ্যানেলগুলি স্ব-নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনই একটি প্রক্রিয়া তৈরি করেছে নিউজ ব্রডকাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। এনবিএ টেলিভিশনের বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিমালার একটি কোড তৈরি করেছে। এনবিএর নিউজ ব্রডকাস্টিং স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি (এনবিএসএ) কে সতর্ক করার, উপদেশ, সেন্সর, অস্বীকৃতি প্রকাশ এবং ব্রডকাস্টারকে ১০,০০০ টাকা অবধি জরিমানা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোড লঙ্ঘনের জন্য ১ লাখ টাকা। এরকম আরও একটি সংস্থা হল ব্রডকাস্ট এডিটরস অ্যাসোসিয়েশন। বিজ্ঞাপনের স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে গাইডলাইন তৈরি করেছে। এই গোষ্ঠীগুলি চুক্তির মাধ্যমে পরিচালনা করে এবং কোনও বিধিবদ্ধ ক্ষমতা রাখে না।

৩.৪.৯ সারাংশ

এই একক এর পাঠ শেষে উল্লেখযোগ্য সম্প্রচার কোড গুলির পরিধি সম্পর্কে ধারণা সাংবাদিকতার কাজকে অনেকাংশেই সম্পূর্ণ করবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।

৩.৪.১০ অনুশীলনী

১. **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন**
   (ক) সিনেমাটোগ্রাফ আইনটি আলোচনা করুন।
   (খ) আকাশবাণী এবং দূরদর্শন এর সম্প্রচার কোড ব্যাখ্যা করুন।

২. **টীকা লিখুন**
   (ক) প্রসার ভারতী আইন।
   (খ) ভারতে কমিউনিটি রেডিওর বিধি।

৩.৪.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. *Media Laws and Indian Constitution*–S. Kundra

২. *Media, Ethics and Laws*–Jan R. Hakemulder, Fay A.C. de Jonge, P. P. Singh

৩. *Law of the Press*–Durga Das Basu

৪. *Law of Electronic Media, New Delhi*–Sama, Dr. Umar (2007) : Deep & Deep Publications Pvt. Ltd.

একক ৫ ❐ বিজ্ঞাপন এবং জনসংযোগের জন্য নীতিমালা

গঠন

৩.৫.১ উদ্দেশ্য

৩.৫.২ প্রস্তাবনা

৩.৫.৩ বিজ্ঞাপনে নৈতিকতার ধারণা

৩.৫.৪ বিজ্ঞাপন ও নীতিমালা

৩.৫.৫ এএসসিআই এবং এর ভূমিকা

৩.৫.৬ জনসংযোগে নীতিমালা

৩.৫.৭ সারাংশ

৩.৫.৮ অনুশীলনী

৩.৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল :

- বিজ্ঞাপনে নৈতিকতার ধারণা
- বিজ্ঞাপনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব
- এএসসিআই এবং এর ভূমিকা
- জনসংযোগে নীতিমালা

৩.৫.২ প্রস্তাবনা

এই একক বিজ্ঞাপনে নৈতিকতার ধারণাটি প্রবর্তন করবে। বিজ্ঞাপনে নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে লোকের মতামতগুলি বিভিন্ন। এটি বিজ্ঞাপনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এএসসিআই এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের পরিচিত করে তুলবে। এককটি জনসংযোগে নৈতিকতার প্রয়োজনীয় প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের পরিচিত করে তুলবে।

৩.৫.৩ বিজ্ঞাপনে নৈতিকতার ধারণা

✓ বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের সর্বাধিক দৃশ্যমান ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে একটি এবং এটি কোনও শূন্যস্থানে কাজ করে না।

✓ বিজ্ঞাপন সম্পর্কে মানুষের মতামত বিভক্ত, কেউ কেউ এর প্রশংসা করেন আবার কেউ কেউ এর ভূমিকার সমালোচনা করে।

✓ আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিগুলির সভাপতি হিসাবে জন ও 'টোল(John O' Toole) বিজ্ঞাপনটিকে অন্য কিছু বলে বর্ণনা করেছেন।

✓ এটি পড়াশোনার সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে এটি শিক্ষিত করে। এটি সংবাদ নয়, কিন্তু সমস্ত তথ্য দেয়। এবং এটি একটি বিনোদনমূলক ডিভাইস নয় বরং সকলকে বিনোদন দেয়।

✓ "বিজ্ঞাপনে নীতিশাস্ত্র" শব্দটি একটি বিতর্কযোগ্য বিষয়। বিষয়টি একটি বিজ্ঞাপনের সামগ্রীর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

✓ সত্যনিষ্ঠ বিষয় প্রদর্শিত হবে।

✓ অতিরঞ্জিতকরণ, বিভ্রান্তিকর তথ্য সন্দেহের দিকে নিয়ে যায়।

৩.৫.৪ বিজ্ঞাপন ও নীতিমালা

আমেরিকান বিজ্ঞাপন ফেডারেশনের বিজ্ঞাপন নীতিমালা-

➢ **সত্য**- তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করুন।

➢ **জমা দেওয়া** - প্রমাণ সহ দাবী সমর্থন করা (উদাঃ আইএসও শংসাপত্র ইত্যাদি)

➢ **তুলনা**- মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর দাবি, প্রতিযোগীর পণ্য ইত্যাদি থেকে বিরত থাকুন

➢ আমেরিকান বিজ্ঞাপন ফেডারেশনের বিজ্ঞাপন নীতিমালা-

➢ **গ্যারান্টি এবং ওয়্যারেন্টি**- উল্লেখযোগ্য তথ্যের সাথে স্পষ্ট।

➢ **মূল্য দাবি**- মিথ্যা / বিভ্রান্তিকর দামের দাবি বা সঞ্চয় দাবিগুলি এড়িয়ে চলুন যা সম্ভাব্য সঞ্চয় দেয় না।

➢ **স্বাদ ও বিবেচনা** - বিবৃতি, চিত্র বা প্রভাবগুলি থেকে মুক্ত যা ভাল স্বাদ বা পাবলিক ভদ্রতার জন্য আপত্তিজনক।

৩.৫.৫ এএসসিআই এবং এর ভূমিকা

➢ ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত অ্যাডভারটাইজিং স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) ক্রেতাদের স্বার্থ, সুরক্ষা নিশ্চিত করে, বিজ্ঞাপনে স্ব-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

➢ বিজ্ঞাপনের সাথে যুক্ত সমস্ত সেক্টরের সমর্থন নিয়ে এএসসিআই গঠিত হয়েছিল, যেমন বিজ্ঞাপনদাতা, বিজ্ঞাপন এজেন্সিগুলি, মিডিয়া (ব্রডকাস্টারস এবং প্রেস সহ) এবং পি.আর এজেন্সিগুলি, বাজার গবেষণা সংস্থাগুলি ইত্যাদির মতো অন্যান্য।

➢ এর মূল উদ্দেশ্যটি বিজ্ঞাপনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বাড়াতে দায়বদ্ধ বিজ্ঞাপন প্রচার করা।

এএসসিআই লক্ষ্যসমূহ :

- বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে করা প্রতিনিধিত্ব ও দাবির সত্যতা নিশ্চিত করাএবং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করা।
- সমাজের জন্য বিপজ্জনক বা ক্ষতিকারক হিসাবে বিবেচিত এমন পণ্য প্রচারে বিজ্ঞাপনের নির্বিচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে রক্ষা করা।
- বিজ্ঞাপনগুলি সাধারণভাবে শালীনতার মান হিসাবে আপত্তিজনক নয় তা নিশ্চিত করা।
- বিজ্ঞাপনগুলি প্রতিযোগিতায় ন্যায্যতা পর্যবেক্ষণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য যাতে বাজারের পছন্দগুলি সম্পর্কে গ্রাহককে অবহিত করা উচিত।
- সাধারণ জনগণ এবং একজন বিজ্ঞাপনদাতার ,প্রতিযোগী উভয়েরই বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সুষ্ঠু, স্বচ্ছলতা ও সংজ্ঞামূলকভাবে উপস্থাপনের আশা করার সমান অধিকার রয়েছে।
- কোডটি বিজ্ঞাপনদাতা, বিজ্ঞাপন সংস্থা এবং মিডিয়াতে প্রযোজ্য।
- বিজ্ঞাপনে স্ব-নিয়ন্ত্রণের জন্য এই কোডটি পালন করার দায়িত্ব দায়িত্বে থাকা, কমিশন তৈরি, স্থাপন বা প্রকাশ বা যে কোনও বিজ্ঞাপন তৈরি বা প্রকাশে সহায়তা করা সকলেরই দায়বদ্ধ দায়িত্ব।

৩.৫.৬ জনসংযোগে নীতিমালা

একেবারে সাধারণভাবে দেখলেও মানুষের সব কাজেরই দু'টি দিক বা ফল আছে। একটি ভালো ফল এবং অবশ্যই, অপরটি মন্দ ফল। আবার এই সব ভালো-মন্দ ফলের মধ্যেও জটিলতা আছে। কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে বা কোনো সংস্থার পক্ষে যে কাজ সুবিধাজনক, অর্থাৎ ভালো, অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, অথবা সমাজের পক্ষে সেই কাজটিই অসুবিধাজনক, ক্ষতিকারক বা মন্দ হতে পারে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সুবিধা-অসুবিধা, ভালো-মন্দ বিবেচনা ক'রে, ভারসাম্য বজায় রেখে যে মূল্যবোধের মাত্রা নির্ধারিত হয় সেইটিই নীতি হিসাবে চিহ্নিত হয়।

জন-সংযোগ এমন একটি পেশা যা জনমত প্রভাবিত করে। সমাজকে প্রভাবিত করে। মানুষের আচরণ, প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠা করে। জন-সংযোগের কাজে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো বিশেষ কাজ সুবিধাজনক হতে পারে। কিন্তু ঐ একই কাজ তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুবিধাজনক না-ও হতে পারে। আবার, এমনও হতে পারে, যে বিশেষ কাজটি তিনি করলেন, তার ফলে তাঁর সংস্থা লাভবান হলো কিন্তু সমাজের বহু মানুষের পক্ষে সেটি ক্ষতিকর হলো। বেশির ভাগ কাজেই এই ধরণের ভারসাম্য বা মূল্যবোধ জড়িয়ে থাকে। ভারসাম্য বজায় রেখে মূল্যবোধ রক্ষা করাই ''নীতি''। এই নীতি পালনের জন্য দেশে-বিদেশে নানা নির্দেশাবলী রচিত হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকায় জন-সংযোগ পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠন নীতিনির্দেশ নির্ধারণ করেন। আবার সেই সব নীতিনির্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও নজরদারী করেন। জনসংযোগ পেশায় নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা কোনো সংস্থা নির্ধারিত নীতি নির্দেশ লঙ্ঘন করলে এই সব প্রতিনিধিমূলক সংগঠনের কাছে অভিযোগ দায়ের করা যায়। সংগঠনের বিশেষজ্ঞ কমিটি অভিযোগের বিচার-বিবেচনা করেন।

ভারতে এখনও ঠিক এই ধরণের ব্যবস্থা চালু হয়নি। ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক রিলেশনস্ আমেরিকা (Institute

of Public Relations, America) একটি বিস্তারিত নীতি-নির্দেশাবলী রচনা করেছেন। এই নীতি-নির্দেশাবলী প্রত্যেক সদস্যের পক্ষে মেনে চলা বাধ্যতামূলক। প্রতি বছর অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং-এ এই নির্দেশাবলী প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়।

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক রিলেশনস অ্যাসোসিয়েশন (International Public Relations Associations) যে নীতি নির্দেশ রচনা করেছেন, সাধারণত সেই নির্দেশগুলিই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হয়। তবে, প্রতিটি দেশের পরিস্থিতি এবং পরিবেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে, এই সব নীতি নির্দেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক রিলেশনস অ্যাসোসিয়েশন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কুড়িটি ভাষায় যে নীতি নির্দেশাবলী প্রকাশ করেছেন, সেইটিই বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত এবং বিভিন্ন দেশে অনুসৃত জন-সংযোগের নীতি নিয়মাবলী।

রাষ্ট্র সংঘের মানবিক অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা অনুযায়ী নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে জন-সংযোগের কাজ করার জন্য ‘‘আন্তর্জাতিক নীতি নির্দেশাবলী’’ (International Code of Ethics) রচিত হয়। এই নিয়মাবলীই ‘‘এথেন্সের নিয়মাবলী’’ নামে পরিচিত। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক রিলেশনস অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সভায় এই নীতি নির্দেশাবলী প্রথম গৃহীত হয়। এই অধিবেশন গ্রীসের এথেন্স শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই কারণেই এই নির্দেশাবলী ‘‘এথেন্স-এর নির্দেশাবলী’’ নামে পরিচিত। পরে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইরানের তেহরান শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই নির্দেশাবলীর কিছু সংশোধন হয়। সেই সংশোধিত নীতি নির্দেশাবলীই বর্তমানে সারা বিশ্বে এথেন্স-এর নির্দেশাবলী নামে পরিচিত এবং অনুসৃত। ফ্রান্স-এর লুসিয়েন মাতরাত (Lucien Matrat) এই নির্দেশাবলীর রচয়িতা।

এথেন্স-এর নির্দেশাবলী

- রাষ্টসংঘের (United Nations Organisation) সকল সদস্য দেশই রাষ্ট্রসংঘের সনদ মেনে চলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এই সনদ ‘‘মৌলিক মানবিক অধিকার’’, মানুষের সম্মান (dignity) এবং মানুষের যথার্থ মূল্যায়ন (worth)-এর উপর বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে। জন-সংযোগ পেশার বিশেষ প্রকৃতির কতা বিবেচনা করে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশগুলির জনসংযোগ বিশেষজ্ঞরা রাষ্ট্রসংঘের সনদের মূল নির্দেশাবলী প্রতিষ্ঠার এবং অনুসরণের জন্য সচেষ্ট হবেন।
- কেবল ‘‘অধিকার’’ই নয়, সকল মানুষেরই শারীরিক এবং বিভিন্ন পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞান-বুদ্ধি, নৈতিক এবং বিভিন্ন সামাজিক আকাঙ্ক্ষাও আছে। এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি অপরিহার্যভাবে পূরণ হলে তবেই তাঁরা মানুষের ‘‘অধিকার’’-এর যথার্থ সুবিধা লাভ করবেন।
- জন-সংযোগ পেশায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা তাঁদের পেশাগত কর্তব্য পালনের সূত্রে এবং কর্তব্যপালনের বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা এই সব জ্ঞান-বুদ্ধি, নৈতিক এবং সামাজিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে পর্যাপ্ত সহায়তা করতে সক্ষম।
- এবং সর্বশেষে, যেহেতু জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রয়োগে নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সমর্থ যেহেতু জন-সংযোগ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের এই ক্ষমতা কঠোর নীতি নির্দেশাবলীর দ্বারা সংযত করা প্রয়োজন।

এই সকল কারণে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক রিলেশনস অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য এই ‘‘আন্তর্জাতিক নীতি নির্দেশাবলী’’ পালন করতে একমত পোষণ করেন। দাখিল করা সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা যদি প্রতিপন্ন হয়—কোনো সদস্য তাঁর পেশাগত কর্তব্য পালনের সময় এই নির্দেশমালা লঙ্ঘন করেছেন, সেই সদস্যকে গুরুতর অন্যায় (serious misconduct) কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হবে এবং উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা হবে।

এই মূল নীতি অনুসারে প্রত্যেক সদস্য অবশ্যই সচেষ্ট হবেন—

১. নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করতে সহায়তা করবেন। যাতে মানুষ তার পূর্ণ গুরুত্ব (status) অর্জন করতে সমর্থ হয়, এবং রাষ্ট্রসংঘের ‘‘আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ঘোষণা’’র (Universal Declaration of Human Rights) বলে প্রাপ্ত অপরাজেয় অধিকার ভোগ করতে (enjoy) পারে।

২. জ্ঞাপন পদ্ধতি এবং প্রণালী স্থাপনের দ্বাররা আবশ্যিক তথ্যের অবাধ প্রবাহ (flow) এবং বিনিময় যাতে সকল সদস্যকে অবহিত রাখতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক সদস্যই তাঁর ব্যক্তিগত সংস্রব (involvement) এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একাত্মবোধ বিষয়েও সজাগ হবেন।

৩. সর্বদা এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে, সকল কাজে এমন ব্যবহার করবেন যাতে তাঁরা সংস্পর্শে যাঁরাই আসবেন তাঁদের বিশ্বাস অর্জনের উপযুক্ত হবেন এবং তাঁদের নিশ্চিত করার পথও সুগম হবে।

৪. স্মরণ রাখতে হবে যে তাঁর পেশা এবং জনসাধারণের মধ্যে যে সম্পর্ক তার জন্য তাঁর ব্যবহার ও আচরণ, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনের আচরণও, এই পেশায় নিযুক্ত সকল ব্যক্তির মূল্যায়ন (appraisal) প্রভাবিত করবে।

দায়িত্ব গ্রহণ করবেন—

৫. দৈনন্দিন পেশাগত কাজে নৈতিক মান রক্ষা করবেন এবং ‘‘আন্তর্জাতিক মানব অধিকার ঘোষণা’’র নির্দেশাবলী মেনে চলবেন।

৬. মানুষের মর্যাদার যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং সমর্থন করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগের অধিকার স্বীকার করবেন।

৭. যথার্থ আলোচনা এবং মত বিনিময়ের উপযুক্ত নৈতিক, মানসিক এবং জ্ঞানবুদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। অংশগ্রহণকারী সকলেরই নিজের বক্তব্য পেশ করার এবং মতামত জানানোর অধিকার স্বীকার করবেন।

৮. সকল রকম পরিস্থিতিতেই এমনভাবে কাজ করবেন যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থই সংরক্ষিত হয়। তিনি যে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সেই সংস্থার এবং জনসাধারণের, সকলের স্বার্থই যেন সংরক্ষিত হয়।

৯. নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য এবং সংকল্প রক্ষার জন্য যা কিছু রচনা করবেন তার রচনাশৈলী এবং শব্দপ্রয়োগ এমন ভাবে করতে হবে যেন কারো মনে কোনো ভাবে আঘাত না করে। সকল রকম পরিস্থিতিতেই আনুগত্য এবং সাধুতা যেন প্রমাণিত হয়, যাতে নিয়োগকর্তার তাঁর উপরে আস্থা বজায় থাকে। এই আস্থা, অতীত নিয়োগকর্তা ও বর্তমান নিয়োগকর্তা এবং তাঁর কাজ যে জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছে, তাঁদের সকলের আস্থা।

অবশ্যই করবেন না

১০. অন্যান্য প্রয়োজনে সত্যের অবদমন করবেন না।

১১. প্রতিষ্ঠিত এবং পরীক্ষিত কোনো বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি না থাকলে কোনো তথ্য প্রচার করবেন না।

১২. এমন কোনো উদ্যোগ বা কাজে অংশগ্রহণ করবেন না, যা অনৈতিক, অসাধু এবং মানুষের মর্যাদার এবং সাধুতার পক্ষে ক্ষতিকর।

১৩. পদ্ধতি এবং কৌশলে এমন কোনো কারসাজি করবেন না, যার ফলে মানুষের অবচেতন মনে এমন কোনো সঞ্চালক শক্তি জাগ্রত হয় যা তাঁর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় এবং এই প্রভাবে গৃহীত কর্মের জন্য তাঁকে দায়ী করা সম্ভব না হয়।

৩.৫.৭ সারাংশ

বিজ্ঞাপন যেহেতু জনসাধারণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, সেই কারণে বিজ্ঞাপনের মান, রুচি, শালীনতা, স্বচ্ছতা বজায় রাখার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞাপন যাতে বিভ্রান্ত না করে তার জন্য বিশেষ নিময়াবলী এবং নীতিমালা রচনা হয়েছে। এইসব নীতি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, সেই বিষয়ে নজরদারীর জন্য এ. এস. সি. আই. সংস্থা গঠিত হয়েছে।
জনসংযোগের ক্ষেত্রে ইপরা (আই. পি. আর. এ) নীতিমালা গঠিত করেছে।

৩.৫.৮ অনুশীলনী

(১) বিজ্ঞাপনের মান বজায় রাখা এবং রক্ষার বিষয়ে এ. এস. সি. আই.-এর ভূমিকা কী?

(২) জনসংযোগের ক্ষেত্রে আই. পি. আর.এ-র ভূমিকা কী?

৩.৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. *INS Handbook*

২. *Reports of Audit Bureau of circulations.*

৩. *বিজ্ঞাপন বিদ্যা* : প্রভাতকুমার গোস্বামী ও অনিল রায়চৌধুরী—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৪. *বিজ্ঞাপন ও বিপণন* : ড. নন্দলাল ভট্টাচার্য—লিপিকা

মডিউল - ৪ : সাইবার আইন

একক ১ ❐ ডিজিটাল সময়ে প্রেসের স্বাধীনতা

গঠন

৪.১.১ উদ্দেশ্য

৪.১.২ প্রস্তাবনা

৪.১.৩ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ভারতীয় সংবিধান

৪.১.৪ প্রেসের স্বাধীনতা ও ডিজিটাল মাধ্যম

৪.১.৪.১ ডিজিটাল বিপ্লব

৪.১.৪.২ ডিজিটাল মাধ্যম

৪.১.৪.৩ ডিজিটাল গণমাধ্যম

৪.১.৪.৪ ডিজিটাল মাধ্যম ও বাক স্বাধীনতা

৪.১.৫ সারাংশ

৪.১.৬ অনুশীলনী

৪.১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১.১ উদ্দেশ্য

'ডিজিটাইজেশন' এবং 'ডিজিটালাইজেশন' দুটি শব্দ প্রায়শই ব্যবহৃত হয় এবং এমন শব্দ গুলি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি। তবে শব্দদুটির অর্থ ও ব্যবহার একই নয়।। ডিজিটাইজেশন বলতে বোঝায় "অ্যানালগ ডেটার (লেখা, চিত্র, ভিডিও এবং পাঠ্য) ডিজিটাল রূপান্তর।" বিপরীতে, ডিজিটালাইজেশন বলতে বোঝায় ডিজিটাল বা কম্পিউটার প্রযুক্তি গ্রহণ করে বা তার ব্যবহার বৃদ্ধি করে শিল্প সংস্থা, সমাজ ও দেশের কাজে প্রয়োগ করা। সংবাদমাধ্যমও এই ডিজিটালাইজেশনের আওয়তার বাইরে নয়। তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে গণমাধ্যম আজ দেশ, কাল, গন্ডীর সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। এই এককে সেই কারণে, সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ডিজিটাল মাধ্যমের বিভিন্ন স্তরের ধারণা লাভ করা যাবে।

৪.১.২ প্রস্তাবনা

তথ্য ও প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব ক্রমাগত কতগুলি ডিজিটে পরিণত হচ্ছে। তাঁর পরিচয়, যোগাযোগ নম্বর, ব্যাঙ্ক আকাউন্ট সবকটি বিষয়ের পরিচয় কেবলমাত্র কিছু নম্বর। কম্পিউটার চালিত সভ্যতায় বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি যেমন পরিচালিত হয় কতগুলি বাইনারি ডিজিটের প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে, তেমনই বর্তমান সমাজ

ডিজিটাল প্রযুক্তি চালিত হতে পেরেছে। এই এককে সমাজ, গণমাধ্যম এবং ডিজিটাল পরিবর্তন নিয়েই আলোচনা করা হবে।

৪.১.৩ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ভারতীয় সংবিধান

ভারতে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে সংবিধানের ১৯ (১) (ক) ধারায়। ধারা ১৯ (১) (ক) তে বলা হয়েছে যে সকল নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার আছে। কিন্তু এই অধিকার, ধারা ১৯ (২) এর অধীনে আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষ। অর্থাৎ নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা অবাধ নয়।

যাই হোক, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পরম নয়, যেমনটা মত প্রকাশের স্বাধীনতাও নয়। সংবিধানের ১৯ (১)(২) ধারায় জনস্বার্থকে যা প্রভাবিত করে সেই বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা যুক্তিসংগত সীমাবদ্ধতার দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে:

ক। সার্বভৌম এবং রাষ্ট্রের অখণ্ডতা

খ। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা

গ। বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

ঘ। জনগণের আদেশ

ঙ। শালীনতা ও নৈতিকতা

চ। আদালত অবমাননা

ছ। মানহানি

জ। কোন অপরাধে উস্কানি

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও তার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্র বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বিবৃত করেছে:

"আজকের সংবাদপত্র মুক্ত বিশ্বের স্বাধীনতা। সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিবিধি-এর হৃদয়। প্রেস এখন মুক্ত, বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে, যেখানে টেলিভিশন এবং আধুনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এখন সমাজের সব স্তরের জন্য উপলব্ধ, সেই কারণে সংবাদ একটি বড় মাত্রার জনগণের কাছে শিক্ষাব্রতী ভূমিকা বলে গৃহীত হয়েছে। সংবাদপত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য তথ্য ও মতামত তৈরির মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচকমণ্ডলী তৈরি করা।"

সুপ্রিম কোর্টের উপরের বিবৃতি বলে যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যথাযথ ক্রিয়াশীল থাকার জন্য অপরিহার্য। কারণ গণতন্ত্রে, সরকার জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য। এটা সুস্পষ্ট যে প্রতি নাগরিকের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য সংবাদ মাধ্যমের সংগে এক সুন্দর যোগাযোগ থাকা আবশ্যক। পাঠক কেবোলমাত্র সংবাদ গ্রহণ করবেন না বরং সেই সংবাদ প্রসঙ্গে অবাধ মত পোষণ করতে পারবেন। সেই কারণে সংবাদপত্রে সাধারণ জনগণের বিষয়ে আলোচনা একেবারে অপরিহার্য।

৪.১.৪ প্রেসের স্বাধীনতা ও ডিজিটাল মাধ্যম

যতদিন মুদ্রণ মাধ্যম বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমই গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজার দখল করে রেখেছিল ততদিন সাংবাদিকতা অনেকটাই একমুখি ছিল বলা যেতে পারে। অর্থাৎ খবর বা বার্তা সংবাদ মাধ্যম থেকে পাঠক বা দর্শক — শ্রোতার কাছে পৌছাচ্ছে কিন্তু বিপরীত দিক থেকে প্রতিবার্তা পাবার জায়গাটা খুবই কম ছিল বলা যায়। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সম্পাদকের কাছে চিঠি বা দূরদর্শনের ক্ষেত্রে "দর্শকের দরবারে" এর মত অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু তথ্য ও জ্ঞাপন প্রযুক্তি (Information & Communication Technology – ICT) নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর এখন সাংবাদিকগনই কেবলমাত্র সংবাদ তৈরি করেন না বরং উল্টো দিকে থাকা বার্তা গ্রাহকগণও সংবাদ তৈরি করেন। যে কারণে বর্তমানে নাগরিক সাংবাদিকতাকেও (Citizen Journalism) প্রথামাফিক সাংবাদিকতায় স্থান দেওয়া হচ্ছে। নাগরিক সাংবাদিকতায় একজন সাধারণ পাঠক সংবাদ তৈরি করে পাঠাতে পারেন। আবার অনেক প্রথা মাফিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও পাঠক বা দর্শক — শ্রোতা সরাসরি মতামত জানাতে পারছেন। যেমন ধরা যাক দৈনিকের ই- সংস্করণ রয়েছে। কম্পিউটার বা মোবাইল আপের মাধ্যমে পাঠক সংবাদ পড়তে পারেন। শুধু তাই নয় যে কোন সংবাদের নিচে পাঠক নিজের মতামত দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে পাঠকের পরিচয় স্বরূপ ই-মেইল এর পরিচয় দিতে হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে সংবাদ উৎপাদন প্রক্রিয়া এখন কেবল মাত্র একমুখী নয় বরং উভমুখী। এছাড়াও তথ্য ও জ্ঞাপন প্রযুক্তির উন্নতির ফলে জনগণ সামাজিক মাধ্যমে (social media), বিশেষ করে ফেসবুক, টুইটার বা নিজস্ব ব্লগে (blog) অনবরত খবর তৈরির চেষ্টা করে চলেছে। এই চেষ্টা খুব সচেতন তা বলা যাবে না। কিন্তু কিছু খবর তো সচেতন ভাবেই করা হয়। এছাড়াও ইউটিউবেও কিছু মানুষ নিজের চ্যানেল চালিয়ে থাকেন বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্রিক। সুতরাং বলা যায় নতুন ডিজিটাল মাধ্যম জনগণের মতপ্রকাশের পরিধিকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।

৪.১.৪.১ ডিজিটাল বিপ্লব

১৯৫০ - ১৯৭০ এর দশকে পৃথিবী জুড়ে বৈদ্যুতিন জগতে অ্যানালগ প্রযুক্তির পরিবর্তে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। কৃষি বিপ্লব বা শিল্প বিপ্লবের মতন এই ডিজিটাল বিপ্লবের কেন্দ্রীয় বিষয় হল - ব্যাপক হারে ডিজিটাল লজিক, মস ট্রানজিস্টর (MOSFETs), এবং সমন্বিত বর্তনী (আইসি) চিপ, এবং তাদের উদ্ভূত প্রযুক্তির কম্পিউটার, মাইক্রোপ্রসেসর, ডিজিটাল সেলুলার ফোন, ইন্টারনেটের গণউৎপাদন ও ব্যবহার। এইসব প্রযুক্তিগত প্রবর্তিত ঐতিহ্যগত উৎপাদনও ডিজিটাল বিপ্লবে ব্যবসা - কৌশলে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯২০ সালের পর থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রায় সমগ্র ধারণাটাই কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই ডিজিটাল প্রযুক্তির একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে তথ্যের আদান প্রদান বা যোগাযোগ বিষয়টি। অর্থাৎ এই ডিজিটাল সময়ে সমাজে গণ উৎপাদন বলতে আর বিভিন্ন রকম বস্তুকে বোঝায় না। বরং অনেক বেশী বোঝায় কম্পিউটার নির্ভর তথ্য উৎপাদনকে। বিশ শতকের শুরু থেকেই উৎপাদনব্যবস্থা ঐতিহ্যগত শিল্প থেকে দ্রুত স্থানান্তরিত হতে শুরু করেছিল এবং যে শিল্প বিপ্লব একটি অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল সেই প্রথামাফিক শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় তথ্য প্রযুক্তি। ডিজিটাল মাধ্যমে খুব সহজেই কোন বার্তাকে কোডএ রূপান্তরিত করা যায় অর্থাৎ পাঠযোগ্য ফরম্যাটের ডিজিটাল মিডিয়া সৃষ্টি করা যেতে পারে, দেখা এবং সহজেই তার বিতরণ, পরিবর্তন এবং সংরক্ষিত করা যেতে পারে কোনও ডিজিটাল বৈদ্যুতিন যন্ত্রে। এই বার্তা বা তথ্য ডিজিটাল ইমেজ, ডিজিটাল ভিডিও, ভিডিও গেমস,ওয়েব পেজ এবং ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যম, ডিজিটাল তথ্য এবং ডাটাবেস, ডিজিটাল অডিও যেমন MP3 এবং ইলেকট্রনিক

বই প্রভৃতি সব কিছুর মাধ্যমে প্রবাহিত হতে পারে। ডিজিটাল যুগ (Digital Age) বা তথ্য যুগের (Information Age) সূত্রপাত ও উন্নয়নের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির ট্র্যান্সিস্টর প্রযুক্তি, বিশেষ করে MOSFET (মেটাল-অক্সাইড-অর্ধপরিবাহীক্ষেত্র-প্রভাব ট্রানজিস্টার), যা বৈপ্লবিক এবং মৌলিক বিল্ডিং ব্লক হয়ে ওঠে ডিজিটাল বৈদ্যুতিন তথ্য যুগে। এই ডিজিটাল বিপ্লব মুলত কম্পিউটার নির্ভর।

বৃহত্তর সমাজের মধ্যে কম্পিউটিং প্রযুক্তির এই ব্যবহার, আধুনিকীকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রক্রিয়া সামাজিক বিবর্তনের চালিকা শক্তি হয়ে উঠছে।

৪.১.৪.২ ডিজিটাল মাধ্যম

ডিজিটাল মাধ্যম, সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রশস্ত এবং জটিল প্রভাব ফেলেছে। সেই সঙ্গে ইন্টারনেট এবং ব্যক্তিগত কম্পিউটিং উভয়ে মিলে ডিজিটাল মাধ্যমে ঘটিয়েছে নতুনত্বের প্রকাশ। এই নতুন প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে সাংবাদিকতা, জনসংযোগ, বিনোদন, শিক্ষা, বাণিজ্য ও রাজনীতিতেও। এছাড়াও ডিজিটাল মিডিয়া নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে কপিরাইট এবং মেধা সম্পত্তি আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে, কখনও কখনও এমনও মনে হচ্ছে যে একজন কোনও বিষয়বস্তু লিখলেন কিন্তু তা সেই বিষয়বস্তু সৃষ্টিকারীদের স্বেচ্ছায় তাদের কাজ করার জন্য কিছু আইনি অধিকার ছেড়ে দিতে হবে। ডিজিটাল মিডিয়া এবং সমাজের উপর তার সর্বব্যাপি প্রভাব শিল্প ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই যুগ তথ্যের যুগ। এই যুগ সমাজ কে কাগজহীন একটি পরিমন্ডলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে বেশীরভাগ সামাজিক লেন দেন কোনও ডিজিটাল মাধ্যম দ্বারা উৎপাদিত এবং কম্পিউটারের দ্বারা পরিচালিত। ভারতের ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল বিষয়টি অন্য মাত্রা নিয়েছে। কারণ ভারত সরকারের একটি প্রধান কর্মসূচি হল "ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম" যা ভারতকে ডিজিটালি ক্ষমতায়িত সমাজ ও জ্ঞানের অর্থনীতিতে রূপান্তর করার চেষ্টা করে। নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবাদির উপর জোর দিয়ে বৃহত্তর বিভাগীয় প্রয়োগগুলির ক্ষেত্রে ভারতে ই-গভর্ন্যান্স উদ্যোগের যাত্রা বৃহত্তর মাত্রা নিয়েছিল ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। পরে, অনেক রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বিভিন্ন ই-গভর্নেন্স প্রকল্প শুরু করে। যদিও এই ই-গভর্নেন্স প্রকল্পগুলি নাগরিককেন্দ্রিক ছিল, তারা কাঙ্ক্ষিত প্রভাবের চেয়ে কম করতে পারে। ভারত সরকার ২০০৬ সালে জাতীয় ই-গভর্নেন্স পরিকল্পনা (এনইজিপি) চালু করেছিল। বিভিন্ন ডোমেনের আওতাধীন ৩১ টি মিশন মোড প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। যদিও দেশজুড়ে অনেকগুলি ই-গভর্নেন্স প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে ই-গভর্নেন্স পছন্দসই প্রভাব ফেলতে এবং তার সমস্ত লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। এটি অনুভূত হয়েছে যে দেশে ই-গভর্নেন্স ইলেক্ট্রনিক সেবা, পণ্য, ডিভাইস এবং চাকরির সুযোগগুলি অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির প্রচারকে নিশ্চিত করার জন্য আরও অনেক বেশি জোর প্রয়োজন। তদুপরি, দেশে বৈদ্যুতিন উৎপাদন আরও জোরদার করা প্রয়োজন। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণের পরিষেবাগুলির পুরো ব্যবহারিক জীবনে রূপান্তর করতে, ভারত সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রোগ্রামটি চালু করেছে ভারতকে ডিজিটাল ক্ষমতায়িত সমাজ ও জ্ঞান অর্থনীতিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল আজকের সমাজে মূল ভিত্তি হল জ্ঞান। জ্ঞান আহরণ করতে প্রয়োজন তথ্য এবং কম্পিউটারের দৌলতে তা এখন একটা ক্লিকের ওপর নির্ভর করে। ই-গভর্নেন্সকে আরও জোরদার করে তুলতে ২০১৫ সালের ১ জুলাই "ডিজিটাল ইন্ডিয়া" এ প্রোগ্রামটি চালু করে ভারত সরকার। ঘরে বসে ব্যাংকিং পরিষেবা, বিভিন্ন বিল মেটানো, স্কুল- কলেজ — বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন, কেনাকাটা সবই চলছে ইন্টারনেট পরিষেবার মাধ্যমে।

যদিও ভারতে ডিজিটাল মাধ্যমকে ব্যবহারকারির সংখ্যা কত তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে গেলে ন্যূনতম শিক্ষা, আর্থিক সামর্থ্য ও বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।

৪.১.৪.৩ ডিজিটাল গণমাধ্যম

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছে। ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র রয়েছে এবং দেশে গণমাধ্যমের একটি শক্তিশালী উপস্থিতিও রয়েছে। গণমাধ্যম আজ সত্যই তার পরিধি বিস্তার করেছে। কেবল মাত্র ব্যক্তির বিনোদনে সীমাবদ্ধ না থেকে এটি সামাজিক অংশগ্রহণের একটি মাধ্যম হয়ে উঠতে অনেকটাই এগিয়েছে। গণতন্ত্রকে সাধারণভাবে বোঝা যায় যে এটি একধরনের সরকার যা জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের সাপেক্ষে। এটি মূলত লোকেদের দ্বারা একটি ব্যবস্থা যা রাজতন্ত্র বা অভিজাতদের বিপরীতে অবস্থান করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ গৌরবগুলির মধ্যে একটি হল মত প্রকাশের স্বাধীনতা। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার সর্বোচ্চ সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে পারে যখন সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে বিস্তৃত অংশগ্রহণ থাকে। নির্ভরযোগ্য তথ্য সংস্থান যে কোনও গণতান্ত্রিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এখানেই গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে জনগণের প্রতি, গণমাধ্যম তার বিভিন্ন রূপে বর্তমান শতাব্দীতে মানবজীবনকে প্রভাবিত করেছে। তারা প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন দেশ জুড়ে তথ্য এবং বিনোদন সরবরাহ করেছে। মুদ্রণ মাধ্যম, উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য শীর্ষস্থানএ থেকেছে। ভারতে ৮০ এর দশক থেকে টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে, যা সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলির অনেকগুলি পুনঃনির্মাণ করে। সংবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ ব্যতীত রেডিওও বিনোদনের ক্ষেত্রে একটি উদ্দীপনা তৈরি করেছে, যার ফলে প্রচুর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।

যদিও চতুর্থ স্তম্ভ (Fouth Estate) দীর্ঘ সময়ের জন্য সুশৃঙ্খল ছিল, তবে মনে হয় যে এটি নতুন সহস্রাব্দে তার প্রকৃত সম্ভাবনা এবং উদ্দেশ্যটি কেবল গণতন্ত্রের সত্য চেতনায় উপলব্ধি করেছে। যেমন আব্রাহাম লিংকনের দ্বারা জনগণের একটি প্রতিষ্ঠান হওয়ার কল্পনা করা হয়েছিল, জনগণ এবং জনগণের পক্ষে। মতপ্রকাশের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সামাজিক মাধ্যম আবির্ভাবের ফলে সহজতর হয়েছে। ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতা এবং দারোয়ানদের অস্তিত্বের অনুপস্থিতির কারণে, সামাজিক মাধ্যম তথ্যের একটি মঞ্চ সরবরাহ করতে চায় — যা সমস্ত অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির সঙ্গে ভাগ করে নেবে জ্ঞান, তথ্য, বিনোদন। এটি উল্লেখযোগ্য কারণ তথ্য এবং সামাজিক সচেতনতা হল মানব ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে মনে করা হয়। মাধ্যম সর্বদা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাগুলির প্রতিবেদন করা ছাড়াও এটি জনমত তৈরি করে। এটি গণতন্ত্রকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে রাখে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উত্থানের সাথে সাথে মাধ্যম ধারণাটি অনেক বদলে গেছে। এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা সমাজের ধরন প্রতিফলিত করে। এমনকি প্রচলিত গণমাধ্যম চ্যানেলগুলি চলমান সামাজিক মাধ্যমের প্রবণতা গুলিতে নজর রাখে। সাম্প্রতিক সময়ে, এমন অনেকগুলি শীর্ষস্থানীয় সংবাদ আছে যা সামাজিক মাধ্যম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরার পাশাপাশি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিও সরকার এবং জনগণের মধ্যে সংযোগ উন্মোচিত করেছে। জনগণ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে আরও সচেতন। রাজনৈতিক ইস্যু এবং এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা ব্যাপক এবং তাৎক্ষণিক। সামাজিক মাধ্যমকে আমরা জন-মাধ্যম হিসেবে মনে করতে পারি। এই মাধ্যমে প্রতি মাধ্যমব্যবহারকারীর সক্ষমতা আছে যাতে তারা এক সাথে অনেক মানুষকে নিজের তৈরি করা বার্তা পাঠাতে পারে।

২০০৮ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পেইনে বারাক ওবামার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রশংসিত এবং আলোচিত হয়েছে। পি আর এডেলম্যানের একটি সমীক্ষা ওবামার 'ভূমিকম্পের বিজয়' প্রধানত তার

সামাজিক যোগাযোগের সফল ব্যবহারের জন্য দায়ী করেছে (লুটজ, ২০০৯)। একইসাথে ওবামার আমেরিকান যুবাদের একত্রিত করার ক্ষমতা কেবল তার প্রচারকেই জোরদার করে তোলে নি, শেষ পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী ভোটদান দলে পরিণত হয়েছিল। যুব ভোটাররা বারাক ওবামার সাথে একটি অপ্রচলিত ভোটার-রাজনীতিবিদদের সম্পর্ক তৈরি করতে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেছিলেন, কীভাবে প্রচারের সময় রাজনৈতিক অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল এবং রাজনীতিবিদ ও ভোটারদের মধ্যে এই নতুন মধ্যস্থতা রাজনীতির ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করেছিল। দিল্লিতে নির্বাচনের কাজ চলাকালীন, ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে আম আদমি পার্টির (এএপি) প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২০০৮ সালের বারাক ওবামার সামাজিক মিডিয়া কৌশল থেকে শিখতে চেয়েছিলেন। অনেকে বিশ্বাস করেন যে সামাজিক মাধ্যম ওবামাকে হোয়াইট হাউস জিততে সহায়তা করেছিল। সাত হাজার উৎসর্গীকৃত স্বেচ্ছাসেবক যারা ছাত্র, কর্মী এবং বিভিন্ন পেশার ব্যক্তি এবং এমনকি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে এএপি দিল্লীতে ক্ষমতায় আসেন এবং এর পিছনে যে সামাজিক মাধ্যমের এক বড় ভূমিকা ছিল তা কেজরিওয়াল স্বীকার করেন।

তবে সোশ্যাল মিডিয়া আসলে কী এবং কীভাবে এটি সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলি (এসএনএস) থেকে আলাদা? সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতে ফেসবুক, টুইটার, মাইস্পেস, ব্লগস এবং ইউটিউব অন্তর্ভুক্ত।

কাপলান অ্যান্ড হেনলাইন (Kaplan and Heinlein) (২০১০) এর মতে, সামাজিক মিডিয়ায় এমন প্রযুক্তি রয়েছে যা ব্যবহারকারীর সহযোগিতার পাশাপাশি ব্যবহারকারী দ্বারা প্রস্তুত বিষয়, যা ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ এবং interaction-এর ওপর আলোকপাত করে। কাপলান এবং হেনলাইন (২০১০) এর মতে, সামাজিক মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: ব্লগ, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলি (যেমন ফেসবুক এবং টুইটার), বিষয়বস্তু সম্প্রদায় (যেমন ইউটিউব), এবং সহযোগী প্রকল্প (যেমন উইকিপিডিয়া)।

ভারতীয় সামাজিক ও পেশাগত কর্মজীবনের বিষয়গুলি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। গত দু-তিন বছর ধরে সমস্ত লক্ষণ ছিল যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত জনপ্রিয়তা এই বিষয়গুলিকে দ্রুত রূপান্তরিত করছে। টুইটার এবং ফেসবুক তরুণ ভারতীয়দের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনায় সক্রিয়ভাবে জড়িত হওয়ার দুর্দান্ত সরঞ্জাম হয়ে উঠেছে। মূলত মূলধারার গণমাধ্যমগুলি বেশ কয়েকটি কারণে আলোচনা বা প্রদর্শন করবে না এমন বিভিন্ন বিষয়ে কেবল আলোচনা নয় বরং সমালোচনা ও মতামত প্রচারের জন্য শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলিতে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলগুলি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং যুবকদের ক্রমবর্ধমান তরঙ্গকে গুরুত্বের সাথে নেয়নি এবং এটিকে একটি উন্নত পর্যায় হিসাবে উপেক্ষা করেছে যা ভোটদানের পদ্ধতি বা নির্বাচনের ফলাফলের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। তবুও কিছু রাজনৈতিক নেতা এটিকে ভারতের শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে সংযোগ স্থাপনের দুর্দান্ত হাতিয়ার হিসাবে পেয়েছেন যারা ভোটের পরিবর্তে, উপভোগ করার জন্য ভোটের দিনটিকে অপ্রত্যাশিত ছুটির দিন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাফল্যের কারণে কিছু রাজনৈতিক দল ব্যাপকভাবে লাভ করেছে কারণ, ভারতের বেশিরভাগ যুবসমাজ, বিজ্ঞাপন সংস্থা, গবেষণা সংস্থা, আইটি সংস্থাগুলি, বিপিও এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ কর্মী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। পরিষেবা বা উৎপাদন সেক্টর টেলিভিশন দেখার সুযোগ পায় না বা বরং সর্বব্যাপী টেলিভিশন সেট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, তবে তাদের ল্যাপটপ, ওয়ার্কস্টেশন এবং স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে ভার্চুয়াল বিশ্বে আরও অনেক কিছু ঘটিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আলোচনার একমাত্র ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে যা

শুরু হয়েছিল তা তথ্য প্রচার, এডভোকেসি, ভোটার নিবন্ধকরণ ড্রাইভ এবং ভোটারদের একত্রিত করার এক আশ্চর্য হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই যে প্রথমবারের মত ভোটার এবং বিপুল সংখ্যক সেই যুবক যারা অতীতে কখনও ভোট দেয়নি তারা ২০১৫ বিধানসভা নির্বাচনে খুব উৎসাহের সাথে ভোট দিয়েছিল। যে সমস্ত রাজ্য জরিপ করতে গিয়েছিল তারা দেখেছে প্রত্যেকেই ভোটের শতাংশে ব্যাপক উৎসাহ দেখায় যা পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ডকে ভেঙে দেয়। অতীতে ভোট দেয়নি এমন বিপুল সংখ্যক ভোটারের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এটি সম্ভব হত না। সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিশেষত টুইটার এবং ফেসবুক ব্যবহারের ক্ষেত্রে, বিজেপি এবং বিশেষত তার প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর একটি সূচনা হয়েছিল এবং তাদের জনপ্রিয়তার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পৌঁছানো অন্য কোনও দলের চেয়ে অনেক বেশি।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটি অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ গঠনে সহায়তা করে। গণমাধ্যম আউটলেটগুলি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরের আন্তঃক্রিয়াশীলতা এবং নমনীয়তার মাধ্যমেও ব্যবহারকারীদের বৃহত্তর ক্ষমতায়ন হয়েছে। মাধ্যমের ব্যবহারকারী-নির্মিত সামগ্রী সরবরাহ করার মাধ্যমে আরও ব্যক্তিগতকৃত হওয়ার দক্ষতা রয়েছে। তবুও, বিজ্ঞাপনের আয়গুলি ডিজিটাল মাধ্যম আউটপুটগুলিকে প্রভাবিত করার ঝুঁকিও রয়েছে। যাঁরা যথেষ্ট সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের কাছে গণমাধ্যমের সহায়তায় জনগণের মতামতকে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। টুজি কেলেঙ্কারী মামলায় রাডিয়া টেপস সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং শিল্প সংগঠন নেক্সাসকে কেন্দ্র করে বিতর্ক নিয়ে আসে। এই জাতীয় উন্নয়ন গণতন্ত্রের জন্য হুমকি এবং গণমাধ্যমের সৌভ্রাতৃত্বকে ক্ষুন্ন করে।

৪.১.৪.৪ ডিজিটাল মাধ্যম ও বাক্ স্বাধীনতা

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন তারা বিভিন্নভাবে নয়া মাধ্যমের সুবিধা নেন। আজ যেন তাঁরা প্রত্যেকেই সাইবার জগতে এক একটি প্রেস। ব্লগ স্পট এবং সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলির মাধ্যমে নিজের গণ্ডী বা তাঁর বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

ভারতের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিশ্বের কাছেও গুরুত্বপুর্ণ। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে প্রতি ৬ জনের মধ্যে অন্তত ১ জন করে ভারতীয় ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সম্পূর্ন ইন্টারনেট প্রয়োগকারীদের যদি এক বিশ্ব হিসেবে ভাবা যায় তাহলে তাঁর সংখ্যা বিপুল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা - তথ্য সরবরাহের স্বাধীনতা এবং তথ্য অনুসন্ধান এবং গ্রহণের স্বাধীনতা সহ - একটি নতুন যুগ রূপান্তরিত হচ্ছে যেখানে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তি সুযোগ পান : ক) অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারেন এবং খ) সমস্ত সংযুক্ত নেটওয়ার্ক থেকে তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারেন। ইন্টারনেট মার্শাল ম্যাক্লুহানের "গ্লোবাল ভিলেজ" বা "বিশ্বগ্রাম" শব্দবন্ধকে নতুন আকারে সত্যি প্রমাণ করছে যা ভৌগলিক সীমানা পেরিয়ে প্রচুর তথ্য পাওয়া সহজ করেছে।

ডিজিটাল যুগে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কেবল তার অভিগমনের মাত্রা প্রসারিত করে তাই নয়, তথ্য সংগ্রহ করার এবং ছড়িয়ে দেওয়ার অভিনব উপায়গুলির দরজা খুলে দেয়। তথ্য এবং মতামতের অনলাইন প্রচারে স্থান বা ভৌগলিক সীমানা সম্পর্কে, কোনও সীমাবদ্ধতা নেই এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা চিহ্নিত অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্র বিস্তৃত করে।

একাধিক অনলাইন যোগাযোগের সরঞ্জাম এবং চ্যানেলগুলি অনলাইন সমাবেশ এবং সমিতি কার্যক্রমগুলিকে সাহায্য করছে, ইন্টারনেট প্রয়োগকারীদের যে কেউ সাইবারস্পেসে অন্যের সাথে সংযুক্ত বা একত্রিত হতে পারেন, প্রায়শই শারীরিকভাবে উপস্থিতির চেয়ে অনেক বেশি সহজেই। এই কার্যকারিতাটি অনলাইনে ভিডিও চ্যাট, অনলাইন সভা এবং সামাজিক মাধ্যম-ভিত্তিক সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সহ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক রূপান্তর ও অস্থিরতার সময়ে যেমন দেখা গেছে, অনলাইন সম্মেলনে মত প্রকাশের অধিকারের সুযোগকে ব্যবহার করে কিভাবে "মুক্ত সমাবেশ এবং সমিতি" সংগঠিত হয়েছিল এবং এই অধিকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াতে।

২০১৪ সালে ব্রাজিলের সাও পাওলোতে ইন্টারনেট গভর্নেন্সের ভবিষ্যতের বিষয়ে একটি সভায় ইন্টারনেট প্রশাসনের অন্যতম নীতি হিসাবে এই অধিকারকে জোর দেওয়া হয়েছে : "সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনলাইনে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং সমিতির অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।" তবুও, ইন্টারনেট দ্বারা বর্ধিত এই মঞ্চ মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিলেও , ধারণাটি নতুন ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েছে। প্রথাগত সামাজিক-আইনি গণ্ডির অস্পষ্টতা, গোপনীয়তা সম্পর্কিত বিষয় ও অন্যান্য মানবাধিকার, এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা উভয়কেই চ্যালেঞ্জের দিকে নিয়ে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, অনলাইন যোগাযোগে মত প্রকাশের অধিকারের অপব্যবহার অন্যান্য ব্যক্তির অধিকার যেমন গোপনীয়তা, খ্যাতি এবং মর্যাদাবোধ এবং অন্যান্য জনস্বার্থ যেমন জননিরাপত্তা এবং গণশৃঙ্খলা রক্ষায় যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। সন্ত্রাসী ও ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলি মতাদর্শের পক্ষে, নতুন বিশ্বস্ত নিয়োগপদ্ধতি এবং প্রচুর ক্ষতি সাধনকারী কর্মকাণ্ডকে সংগঠিত করার জন্য ফেসবুক এবং টুইটারের মতো সামাজিক মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করছে। একইভাবে, সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে ছড়ানো ঘৃণাত্মক বক্তব্য, লিঙ্গ এবং বর্ণ বৈষম্যমূলক বক্তব্য এবং অভিব্যক্তি ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মূল্যবোধকে ঘৃণা করতে পারে এবং হিংসা, বৈষম্য এবং বৈরিতাকে উৎসাহ যোগাতে পারে। তেমনি, অনলাইনে বাকস্বাধীনতার অপব্যবহারও করা যেতে পারে।

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ও তার আইন এবং সংবিধানে বাক্ স্বাধীনতা রক্ষা করে। তা সত্ত্বেও, ইন্টারনেট বিশ্বে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার কিছু যুক্তিসংগত কারণে বিতর্ক তৈরি করেছে। যেমন মানহানি, জাতীয় নিরাপত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে কোন তথ্য এবং ধারনার অবাধ প্রবাহ প্রায়শই ভারতে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। ভারতে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক আইন ও প্রযুক্তিগত উপায়ে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার বহুল প্রচেষ্টা বর্তমান। ২০০৮ সালে মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার সময় থেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপের কারণে সামাজিক মাধ্যমে বাকরূদ্ধ করার একটা চেষ্টা চলছে। কিন্তু সুশীল সমাজে তার প্রতিরোধ শুরু করে।

ডিজিটাল স্বাধীনতার উপর সীমাবদ্ধতাসমূহ অনেক বিতর্কও ভারতে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। যেমন ইউটিউব, ইয়াহু এবং ফেসবুক, এর মতো বড় ওয়েব হোস্ট কোম্পানি, কিছু ক্ষেত্রে 'আপত্তিকর' বিষয়বস্তু সরাতে ব্যর্থ হয়েছে। সাইবার আইনগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইন হল ২০০০ সালে প্রণীত তথ্য প্রযুক্তি অ্যাক্ট (আইটি আইন)।

২০১১ সালে প্রবর্তিত নতুন বিধিগুলি কোনও ব্যক্তি, সংস্থা বা সরকারি সংস্থা কর্তৃক তৈরি করা, বা মামলা মোকদ্দমার মুখোমুখি হওয়া, অভিযোগের ৩৬ ঘন্টার মধ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারীদের কন্টেন্ট সরিয়ে নিতে বাধ্য করে। এটি বিভিন্নভাবে ত্রুটি যুক্ত : কারণ এটি ব্যবহারকারীদের এমন বিষয়বস্তুর জন্য দায়বদ্ধ করে

তোলে যা তারা ওয়েবসাইট এবং প্ল্যাটফর্মে লেখেননি, যা তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না এবং অনলাইনে আগেই সেন্সর করাতে উৎসাহিত করে, যা অতিরিক্ত সেন্সরশিপকে সমর্থন করে।

এদিকে, 'মারাত্মক ক্ষতিকারক', 'হয়রানি করা' বা 'নিন্দাবাদী' হিসাবে লিখিত বিষয়বস্তু পোস্ট করা নাগরিকদের গ্রেপ্তার এবং বিচারের পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে। অনলাইন বক্তৃতা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারকে অপরাধীকরণের মাধ্যমে সেন্সরশিপ বিরক্তিকর, বিশেষত যখন এটি বৈধ রাজনৈতিক মন্তব্যকে প্রভাবিত করে।

ডিজিটাল স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের একটি হ'ল বিশৃঙ্খলা রোধ করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে নেটওয়ার্কের শাটডাউন ভারতের অব্যাহত রয়েছে। ডিজিটাল বিশ্বে অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা একটি জাতীয় চ্যালেঞ্জ। অনলাইনে আজ ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ, ভবিষ্যতে অনলাইনে এক বিলিয়ন নতুন ভারতীয় নেটিজেন থাকতে পারে। ভারত কীভাবে এটি ঘটাতে সক্ষম হবে তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যদিও বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারত ক্রমবর্ধমান প্রভাবশালী খেলোয়াড়, এখন তার ঘরোয়া নিয়মকানুন এবং নীতি বিশ্লেষণের জন্য এখন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় কারণ এই পথটি কেবল ভারতের জনগণের জন্যই নয়, আঞ্চলিক প্রতিবেশী এবং উদীয়মান গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষেও ভাল।

২০০৩ সাল থেকে ইন্টারনেট সেন্সরশিপ এবং ফিল্টারিংয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (আইসিইআরটি) কাজ করছে, এটি যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের একটি বিভাগ যা একটি মনোনীত পুলের অনুরোধগুলি গ্রহণ ও পর্যালোচনা করার জন্য নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করে। সরকারি কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস ব্লক করতে পারেন।

" 'অশ্লীলতা' এবং 'উস্কানিমূলক' বিষয়গুলির আসলে কী বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়া উচিত তার কোনও সংজ্ঞা নেই। একদিকে আইনটির অস্পষ্টতা এবং অন্যদিকে আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে ক্ষেত্রটি ব্যাখ্যা এবং ধারণা তৈরির জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে," —বলেছেন রাজসভার সদস্য রাজীব চন্দ্রশেখর।

৪.১.৫ সারাংশ

মুদ্রণ মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে মত প্রকাশের অধিকারকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে ফেলা গেলেও ডিজিটাল মাধ্যমে মত প্রকাশের বিষয়টিকে কোনও নির্দিষ্ট কাঠামোতে ফেলা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। যখন আমরা একটা ধারণা তৈরি করছি, সেই সময়ের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যম অন্যরূপে আবির্ভাব হচ্ছে। 'টিকটক' নামক সামাজিক মাধ্যমের বারবাড়ন্ত ২০১৮ সালেও তেমন ছিল না, কিন্তু ২০২০ সালের মধ্যেই বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে মতপ্রকাশের জন্য সাধারণ মানুষ এই মাধ্যমকেও বেছে নিয়েছে। সব থেকে ভয়ংকর বিষয় হল, প্রথামাফিক গণমাধ্যম গুলিতে কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করা হত, যাতে প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কে বা কোনও গোষ্ঠী সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়ানো না হয়, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্তু সেই বিধিনিষেধকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সামাজিক মাধ্যম ব্যাবহারকারিরা অনেকেই নিজেদের গোপন হিংসা চরিতার্থ করছেন। আবার উল্টো দিকে আরব দুনিয়ার গণঅভ্যুত্থান বা বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলন যা দেশ, কাল, সীমানার উর্ধ্বে, তাও সম্ভব হয়েছে এই মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মাধ্যমেই। সুতরাং বলা যেতে পারে, এই ডিজিটাল মাধ্যমের মেটামরফসিস দশা চলছে, এখন শুধু পরিস্থিতি নজরে রেখে উপযুক্ত ব্যাবস্থা নেওয়াই কাজ।

৪.১.৬ অনুশীলনী

১। ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ভিত্তি কী? উপযুক্ত সূত্রসহ ব্যাখা করুন।

২। ডিজিটাল মাধ্যম কি তথ্যের প্রবাহে স্বাধীনতা দিয়েছে? যুক্তিসহ উত্তর দিন।

৩। ইন্টারনেট সেন্সরশীপ বিষয়টি ব্যাখা করুন।

৪। সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে কি জনমত তৈরি করা যায়? যুক্তিসহ উত্তর দিন।

৫। "সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যম স্বাধীনতা ও ব্যাপ্তি দিলেও ঝুকির প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে।" — মন্তব্যটির ব্যাখা দিন।

৪.১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. International Journal on Emerging Technologies : Special Issue NCETST-2017-8(1)- 298-303(2017)

২. Reuters Institute India Digital News Report

৩. https://www*f*indexoncensorship*f*org/wp-content/uploads/2013/11

৪. https://digitalcommons.law.yale/edu/fss_papers.

একক-২ ❐ ডিজিটাল মাধ্যম ও আইন

গঠন

৪.২.১ উদ্দেশ্য

৪.২.২ প্রস্তাবনা

৪.২.৩ গোপনীয়তার অধিকার এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সরকারের এক্তিয়ার

৪.২.৩.১ ডিজিটাল মাধ্যম ও গোপনীয়তা

৪.২.৩.২ গোপনীয়তার অধিকার ও ভারতের অবস্থান

৪.২.৪ ডিজিটাল মাধ্যম ও নজরদারী

৪.২.৫ সাইবার অপরাধ

৪.২.৫.১ সাইবার আইনের গুরুত্ব

৪.২.৫.২ তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০

৪.২.৫.৩ তথ্য প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন,২০০৮

৪.২.৬ সারাংশ

৪.২.৭ অনুশীলনী

৪.২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪.২.১ উদ্দেশ্য

ইন্টারনেটের দ্রুত প্রসারের ফলে যোগাযোগ ব্যাবস্থায় যে পরিবর্তন এসেছে, তা অকল্পনীয়। সারা বিশ্ব প্রকৃতই এখন হাতের মুঠোয়, মুহূর্তে কোলকাতা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাওয়া যাচ্ছে এক ভিডিও কলের সাহায্যে। বন্ধু হয়ে যাচ্ছে শয়ে শয়ে মানুষ। দেদার কেনাকেটা চলে অনলাইনে। অ্যাপে গাড়ি বুক করেই চলে যাওয়া যায় গন্তব্যে। কিন্তু এই সব সুবিধার মাঝেও ছোবল পড়ে অন্ধকারের, অপরাধের। এখন অপরাধীরাও সাইবার বিশেষজ্ঞ। মূহুর্তে ফাঁকা হয়ে যায় জমানো টাকা। অনলাইন গেমের অমোঘ আকর্ষণে প্রাণ যায় শিশুদের। ক্রমাগত সাইবার অপরাধীর সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে তাদের অপরাধের মাত্রা। তাই প্রয়োজন হয়ে পরে নির্দিষ্ট আইনের। তৈরি হয় সাইবার আইন।

৪.২.২ প্রস্তাবনা

এই অধ্যায়ে সাইবার আইন কি, তার প্রয়োজনীয়তা সহ বর্তমান পরিস্তিতি নিয়ে আলোচনা করব।

৪.২.৩ গোপনীয়তার অধিকার এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সরকারের এক্তিয়ার

গোপনীয়তার অধিকার হ’ল এমনই একটি অধিকার যা সংবিধানের ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে। গোপনীয়তার অধিকার

ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণিত হয় না। যাইহোক, ২১ নং ধারা এবং সংবিধানের রাষ্ট্রের নির্দেশিকার আরও কয়েকটি মূল নীতি থেকে সুপ্রিম কোর্ট এই জাতীয় অধিকার উল্লেখ করেছে।

গোপনীয়তার শব্দের অর্থ কী তা প্রথমে আমাদের একটু জানা প্রয়োজন। ব্ল্যাকের আইন অভিধান অনুসারে "একাকী থাকার অধিকার; কোনও ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত প্রচার থেকে মুক্ত হওয়ার অধিকার; যে বিষয়গুলির সাথে জনসাধারণ স্বার্থ জড়িত নয় অগত্যা সে বিষয়ে জনগণের দ্বারা অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ ব্যতীত বেঁচে থাকার অধিকার।"

ভারতের সংবিধানের ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে 'আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ব্যতীত কোনও ব্যক্তি তার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে না'। ২১ নং ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে "জীবন" শব্দটিতে জীবনের সমস্ত দিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা একজন মানুষের জীবনকে অর্থবোধক, পরিপূর্ণ ও মূল্যবান জীবনযাত্রায় পরিণত করে।

২১ নং ধারায় অন্তর্ভুক্ত জীবনের অধিকারকে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে নিছক বেঁচে থাকা এবং নিছক অস্তিত্ব বা প্রাণীর অস্তিত্বের চেয়ে বেশি কিছু বোঝাতে পারে। সুতরাং এটি জীবনের সেই সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজন মানুষের জীবনকে আরও অর্থবহ, পূর্ণ এবং মূল্যবান জীবনযাপন এবং গোপনীয়তার অধিকার হিসাবে গ্রহণ করে। এই বিষয়টি প্রথমবার উত্থাপিত হয়েছিল খারাক সিংহ বনাম ইউপি রাজ্যের ক্ষেত্রে যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল উত্তর প্রদেশ পুলিশী নিয়ন্ত্রণের ২৩৬ নং বিধিবিধানটি অসাংবিধানিক কারণ তা সংবিধানের ২১ নং ধারার বিরুদ্ধ মত পোষণ করে। আদালত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে গোপনীয়তার অধিকার জীবন রক্ষার অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটি অংশ এখানে, আদালত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সাথে গোপনীয়তার সমতুল্য ছিল।

গোবিন্দ বনাম মধ্য প্রদেশে রাজ্যের, মামলায় বিচারক ম্যাথিউ, জে ১৯ (ক), (ঘ) এবং ২১ নং ধারা থেকে উদ্ধৃত করে গোপনীয়তার অধিকারকে গ্রহণ করেছিলেন। তবে গোপনীয়তার অধিকার চূড়ান্ত অধিকার নয়। "ধরে নিই যে কোনও নাগরিকের স্পষ্টভাবে নিশ্চিত কয়েকটি মৌলিক অধিকার রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে গোপনীয়তার অধিকার নিজেই একটি মৌলিক অধিকার, তবে বাধ্যতামূলক ও জনস্বার্থের ভিত্তিতে মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে'। আঞ্চলিক পরিদর্শনের মাধ্যমে সর্বদা নজরদারি করা হয় এমন বস্তু এবং সীমাবদ্ধতার অধীনে থাকা ব্যক্তির চরিত্র এবং পূর্বসূরীদের কারণে কোনও ব্যক্তির গোপনীয়তার উপর অযৌক্তিকভাবে নজরদারি বা খবরদারি চালানো ঠিক নয়। গোপনীয়তার অধিকার ' কোন স্থানের নয় বরং ব্যক্তির' বিষয় নিয়ে কাজ করে।

শ্রীমতি মানেকা গান্ধী বনাম ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া মামলায় (১৯৭৮) এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ৭ জনের এক ডিভিশন বেঞ্চ বলেছেন, ২১ অনুচ্ছেদে "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা" বিভিন্ন ধরণের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং কিছুকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং ১৯ নং অনুচ্ছেদের অতিরিক্ত সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী কোনও আইনের ট্রিপল টেস্ট প্রয়োজন :

(১) এটি অবশ্যই একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করে; (২) প্রক্রিয়াটি অবশ্যই ১৯ নং ধারায় প্রদত্ত এক বা একের অধিক মৌলিক অধিকারের পরীক্ষা প্রতিরোধ করতে হবে যা বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হতে পারে এবং (৩) এটিকে অনুচ্ছেদ ১৪ এর পরীক্ষা প্রতিরোধ করতে হবে। ব্যক্তিগত বিষয়ে অনুমোদিত স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তার অধিকার অবশ্যই সঠিক এবং ন্যায্য হতে হবে এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ আইন ও পদ্ধতি স্বেচ্ছাচারিতা, কল্পিত বা নিপীড়ক হলে চলবে না।

গোপনীয়তার অধিকার - অনুমতিযোগ্য বিধিনিষেধ

নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার গোপনীয়তায় আদালতের মাধ্যমে হস্থক্ষেপ করা যায়।

১। আইনি বিধান : গোপনীয়তায় আইনি অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে কষ্টিপাথর হিসাবে সংবিধান দ্বারা সঠিক যুক্তির উপস্থাপন করতে হবে এবং যে উদ্দেশ্যে আইনের অনুপ্রবেশের চাওয়া তার বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা করা আবশ্যক।

২। প্রশাসনিক / কার্যনির্বাহী আদেশ : প্রশাসনিক বা কার্যনির্বাহী পদক্ষেপের বিষয়ে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে আদেশকে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে।

৩। বিচার সংক্রান্ত আদেশ বা পরোয়ানা : এই পরোয়ানার, আদালতের কাছে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হতে পর্যাপ্ত কারণ থাকতে হবে যে ঠিক কি কারণে কোনো ব্যক্তির বা সংস্থার গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

গোপনীয়তা বিল, ২০১১

এই বিল বলে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার গোপনীয়তার অধিকার থাকবে—যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষা করা, বা, তার দ্বারা—তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, টেলিফোন কথোপকথন, টেলিগ্রাফ বার্তা, ডাক, ইলেকট্রনিক মেইল ও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম সহ; তার ব্যক্তিগত বা তার পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তা; তাঁর প্রতি সম্মান এবং সুনামের রক্ষার ক্ষেত্রে; কোনও ব্যক্তি তাঁর বৈধ যোগাযোগ বা লেনদেনের ক্ষত্রে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির বা সংস্থার দ্বারা কৃত অনুসন্ধান নজরদারি থেকে গোপনীয়তা নীতি মেনে চলতে পারেন। ব্যক্তি তার ব্যাংকিং ও আর্থিক লেনদেন, ঔষধ এবং আইনি তথ্য এবং স্বতন্ত্র তথ্য সুরক্ষা গোপন করার আধিকার রাখেন।'

- বিল নাগরিক পরিচয় হরণ, অপরাধমূলক পরিচয় প্রতারণা (যখন একটি অপরাধের জন্য আটক অন্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় গোপন) সহ, আর্থিক চিহ্নিত চুরি, ইত্যাদি (অন্য ক্রেডিট, পণ্য ও সেবা প্রাপ্ত পরিচয় এর ব্যবহার করে) থেকে সুরক্ষা দেয়।
- বিল সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতীত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যোগাযোগের বাধাগুলি নিষিদ্ধ করে।
- বিল অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি যিনি ভারতে ব্যবসার কারণে অবস্থান করছেন কিন্তু ভারতে অবস্থিত সরঞ্জাম ব্যবহার, ডেটা সংগ্রহ করবেন বা প্রসেসর ব্যবহার করবেন—এই ধরনের কোনও ব্যক্তিকে না জানিয়েই সরকার তাঁর গোপন কোনো তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে পারেন।
- এই বিল ভারতের একটি "ডাটা প্রটেকশন অথরিটি", ডাটা প্রক্রিয়াকরণ এবং কম্পিউটার প্রযুক্তিতে উন্নয়ন নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত; আইন পরীক্ষা করা এবং ডেটা সুরক্ষা উপর তার প্রভাব মূল্যায়নের ও সুপারিশ দিতে এবং কোন বিষয় বা ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত ডেটা সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য বা সুপারিশ উপস্থাপনা করার দায় ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের।

৪.২.৩.১ ডিজিটাল মাধ্যম ও গোপনীয়তা

ইন্টারনেট একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী যোগাযোগ মাধ্যম এবং একটি বিস্তৃত তবে স্বতন্ত্র ভার্চুয়াল ক্ষেত্র যা মানব ক্রিয়াকলাপকে বিস্তৃত করে তাদের উভয়ই সরবরাহ করে মানব জীবন ও মানব সমাজকে নতুন আকার দিয়েছে।

তবুও, কীভাবে ইন্টারনেট এবং তথ্যপ্রযুক্তি (Information & Communication Technology-ICT) মত প্রকাশের স্বাধীনতার মানবাধিকারের উপলব্ধি ও গোপনীয়তা এবং স্বচ্ছতার সামাজিক মূল্যকে প্রভাবিত করছে তা এখনও বিচারাধীন রয়েছে।

তবে, এই বিকশিত ইন্টারনেট ই-সিস্টেমের একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য হল ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির কারণে মানব জীবনে ঐতিহাসিকভাবে আবদ্ধ সীমানাগুলি ভেঙে যাওয়া। পূর্ববর্তী গোপনীয়তার সীমানার প্রকৃতি, নতুন গোপনীয়তা আক্রমণকারী প্রযুক্তিগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেমন বডি স্ক্যানার; বক্তৃতা শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া; রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) চিপস, যা মানব শরীরে প্রবেশ করানো হতে পারে; ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন (সিসিটিভি); স্মার্ট মিটার; ক্যানভাস আঙুলের মুদ্রণ; এবং ব্রাউজার কুকিজ, যা একাধিক অবস্থান থেকে ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ করতে সক্ষম। এমনকি আজকাল সর্বাধিক সুরক্ষিত বাড়িও গোপনীয়তায় বহিঃআক্রমণ থেকে রক্ষা পায় না।

একবিংশ শতাব্দীতে 'গোপনীয়তার মৃত্যুর' অনুমান ১৫ বছর আগে প্রযুক্তির বিকাশে দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যদিও দাবিটি কিছুটা অতিরঞ্জিত বলে মনে হচ্ছে, তবু তা সত্য। একইভাবে, বিগত দশকে স্বতন্ত্র গোপনীয়তার জন্য হুমকি মূলত ধীরে ধীরে অফলাইন বা পার্থিব বিশ্ব থেকে একটি অনলাইন, অপার্থিব বিশ্বে স্থানান্তরিত হয়েছে। তিনটি স্তরে বিষয়টিকে ব্যাখা করা যায় :

ক) ব্যক্তিগত পর্যায়ে :

সাধারণ ভ্রমণ এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত তথ্য, আমরা ভ্রমণ করি, কেনা, হাঁটছি, বসে আছি, ঘুমাচ্ছি, পড়ছি বা কথা বলছি, পরবর্তী অ্যাক্সেস এবং বিশ্লেষণের জন্য ডিজিটাল আকারে ক্রমশ ক্যাপচার এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা সিসিটিভি এবং ভিডিও ক্যামেরা, মাইক্রোফোনস, তাপীয় সেন্সর, নজরদারি উপগ্রহ, ড্রোনস সহ সরকারি এবং বেসরকারি উভয়ই মানুষের বাসস্থানগুলির নিয়মিত পর্যবেক্ষণে অবদান রাখে এমন সমস্ত সংবেদনশীল ডিভাইসগুলির সংখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর বৃদ্ধি লক্ষ্য করছি, স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার, স্মার্ট টিভি, পরিধানযোগ্য ডিভাইস এবং অন্তর্নির্মিত আরএফআইডি চিপস। একইভাবে, আমরা জেনেটিক সিকোয়েন্স ডেটা সংগ্রহ, স্টোরেজ এবং প্রসেসিং জড়িত এবং আঙুলের ছাপ-, ফেসিয়াল-, আইরিস-, স্পিচ- এবং মানুষের সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত ডেটা সহ বায়োমেট্রিক প্রযুক্তির প্রসারণ প্রত্যক্ষ করি।

ফলস্বরূপ, এই জাতীয় ডেটা প্রায়শই ইচ্ছাকৃত বা দুর্ঘটনাজনিত তথ্য সুরক্ষা লঙ্ঘনের মাধ্যমে যে কোনও প্রযুক্তি দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত হতে পারে এবং তার ব্যাখ্যা করে ভুল কাজে ব্যাবহৃত হতে পারে। তা আবার কখনোও কখনোও সাধারণ জনগণ সহ অন্যদের কাছেও সরবরাহ করা হয়। স্বয়ংক্রিয় এবং বড় ডেটা প্রক্রিয়াকরণ সক্ষম করে তুলনামূলকভাবে ডেটা প্রসেসিং প্রযুক্তিগুলিতে দ্রুত অগ্রগতির মাধ্যমে এ জাতীয় লঙ্ঘনের প্রভাবগুলি আরও বেড়ে যেতে পারে। —যেমন ব্যক্তিগত ডেটা হ্যাক করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা হরণ।

খ) রাষ্ট্র পর্যায়ে :

উল্লেখযোগ্য গোপনীয়তা আক্রমণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি (এলইএ) দ্বারা বা জাতীয় সুরক্ষা এবং গনশৃঙ্খলার নামে গোয়েন্দা পরিষেবাগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়। ডিজিটাল যুগে, বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষগুলি সর্বাধিক সাম্প্রতিক তথ্য প্রযুক্তির দ্বারা সজ্জিত হয়েছে, এই প্রযুক্তি সুচারু পদ্ধতিতে পৃথক নাগরিকদের উপর নজরদারি চালানোর ও

পরিচালনা করার জন্য সক্ষম করে তোলে। এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপগুলির অঙ্গ হিসাবে ধরা যেতে পারে বিভিন্ন প্রযুক্তির সংমিশ্রণ যেমন ডেটা ব্যবহারের সাথে জড়িত প্রোফাইলিং, সিসিটিভি সিস্টেম, ম্যালওয়্যার এবং ইনস্টল করা সেন্সর, বায়োমেট্রিক্স, ডেটা অটোমেটিক্স এবং বড় ডেটা বিশ্লেষণ। জাতীয় সুরক্ষার কারণে গোপনীয়তা বৈধভাবে সীমাবদ্ধ হতে পারে তবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) এর মানদণ্ড অনুসারে বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তার আনুপাতিকতার মানদণ্ডগুলি পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে, অনেক ক্ষেত্রে এই শর্তগুলি পূরণ হয় না।

তদ্ব্যতীত, ই-গভর্নেন্সের প্রযোগের কারণে রাষ্ট্র পরিচালকগণ বৃহৎ পরিমাণে ব্যক্তিগত ডেটা পরিচালনা করে। কিন্তু এমন এক বৃহত্তম ডেটা হোস্ট এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ডেটা সর্বদা আক্রমণের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সুরক্ষিত নাও হতে পারে। এছাড়াও বলা যায় , যে সমস্ত ধরণের ব্যক্তিগত ডেটা অ্যাক্সেস করার জন্য রাষ্ট্রগুলির অবিচ্ছিন্ন কর্তৃত্ব থাকে তা নাগরিকদেরকে খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রাখে যদি ,ডেটা প্রোফাইলের ক্ষেত্রে নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা প্রয়োগ না করা হয়।

কেস স্টাডি: আধার তথ্য ফাঁস

২০১৮ সালের জানুয়ারী মাসে 'দ্য ট্রিবিউন' নামক সংবাদপত্রের দ্বারা সংঘটিত স্টিং অপারেশনের একটি সংবাদকে ভারতের জনসমক্ষে নিয়ে আসে। সেখানে দেখা যায়, ভারতে "আধার" এর মতো দেশের এক বিরাট বায়োমেট্রিক ডাটাবেসে সুরক্ষাভেদ করা সম্ভব এবং এরফলে পরে শত লক্ষাধিকেরও বেশি ভারতীয় নাগরিকের পরিচয় চুরি এবং গোপনীয়তার অনুপ্রবেশের সংক্রান্ত ঝুঁকির শিকার হতে পারেন, এতে প্রায় প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য রয়েছে। দ্য ট্রিবিউন পত্রিকা বলেছে যে তার সাংবাদিকরা একজন ব্যক্তিকে প্রায় ৮ ডলার (ভারতীয় মূদ্রার ৫০০ — ৬০০ টাকা) প্রদানের পরে সরকারের ডাটাবেসে ১২-সংখ্যার অনন্য পরিচয় নম্বর লিখে টাইপ করে নাম, ইমেল ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং ডাক কোড সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন এই আধার নম্বরের সঙ্গে ভারতের নাগরিকের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট, প্যান নম্বর (PAN - Personal Account Number) সহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি যুক্ত থাকে।

গ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

ইন্টারনেটের উন্মুক্ততা এবং সংযোগের কারণে, আন্তঃদেশীয় অনলাইন গোপনীয়তা লঙ্ঘন এবং সাইবার অপরাধীদের দ্বারা পরিচালিত আক্রমণগুলি যেমন- আন্তঃসীমান্ত অনলাইন জালিয়াতি, ফিশিং, স্ট্যাকিং এবং হয়রানি থেকে নিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ক্ষেত্রে হুমকির উদ্ভব হয়, যার ফলে আর্থিক ক্ষতি এবং মানুষের জীবন ক্ষতি সহ বিস্তৃত পরিমাণ ক্ষতির সম্ভাবনা জড়িত।

জাতীয় স্বার্থ জড়িত থাকায় চিত্রটি আরও জটিল হয়ে ওঠে, সেগুলি সামরিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রকৃতির হতে পারে। ক্রমবর্ধমান তথ্য স্থানান্তর সম্পর্কিত আইন ও বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব ছাড়াও, রাষ্ট্রীয় গুপ্তচরবৃত্তির বিস্তৃত অনুশীলন এবং প্রযুক্তিগত সুবিধা ভোগ জাতীয় রাষ্ট্রগুলি দ্বারা পরিচালিত বৃহৎ আকারের ডেটা লঙ্ঘনগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জগুলি উদ্ভূত হয়েছে।

কেস স্টাডিঃ ভারত সরকার ও হোয়াটসঅ্যাপ

ইস্রায়েলি সফটওয়্যার "পেগাসাসের" মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের উপর চালানো স্পাইওয়্যার হামলার বিবরণ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ না করার জন্য ২০১৯ সালের ১লা নভেম্বর ভারত সরকার মার্কিন সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থা হোয়াটসঅ্যাপ এর সমালচনা করে, যদিও তার আগে কয়েক মাসে দু'পক্ষের মধ্যে কমপক্ষে দু'বার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। ঐদিন গভীর রাতে জারি করা একটি বিবৃতিতে হোয়াটসঅ্যাপ ভারত সরকারকে পাল্টা বলে যে, তারা মে মাসেই এই সুরক্ষার বিষয়টি দ্রুত সমাধান করেছে এবং ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সরকার কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছে। যদিও সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তারা যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে হোয়াটসঅ্যাপ সিইআরটি-ইন বা ভারতীয় কম্পিউটার জরুরী প্রতিক্রিয়া দলকে মে মাসে জানিয়েছিল যে অ্যাপ্লিকেশনটি বিশ্বব্যাপী হ্যাক হয়েছে এবং তারা বিষয়টি ঠিক করেছে, তারা নয়াদিল্লিকে কী বলতে ব্যর্থ হয়েছে বা কি লুকিয়েছে যে ভারতীয় নাগরিকরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল? ভারত সরকার আরও যোগ করে যে মে মাসে মার্কিন সংস্থাটির কাছ থেকে প্যাগাসাসের কথা বা গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ফলে যে ভারতীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সে সম্পর্কে উল্লেখ না করে বা 'প্রযুক্তিগত দুর্বলতার বিষয়ে' বলা হয়েছিল।

৪.২.৩.২ গোপনীয়তার অধিকার ও ভারতের অবস্থান

এপ্রিল ২০১৩ সালে, ভারত একটি ৭৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ সিস্টেম (Central Monitoring System - CMS) বাস্তবায়ন শুরু করে যা সরকারকে দেশের সমস্ত ডিজিটাল যোগাযোগ এবং টেলিযোগাযোগ অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেবে। (৩২ সিএমএসের সমস্ত অনলাইন কার্যক্রম, ফোন কল, পাঠ্য বার্তা এবং এমনকি সামাজিক মিডিয়া কথোপকথন।) ২০০৯ সাল থেকে এই কর্মসূচির ক্ষেত্র বিকাশের ক্ষেত্রে এখনও নির্ধারিত রয়েছে, তবে এর বাস্তবায়নে অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সুরক্ষার অভাবের বিষয়ে কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ইন্টারনেট এবং সোসাইটি সেন্টারের নীতি পরিচালক প্রণেশ প্রকাশ যুক্তি দেখিয়েছিলেন: 'ভারতে নজরদারি ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কথা বলতে গেলে আমাদের প্রচুর পরিমাণে স্বচ্ছতা এবং খুব কম জবাবদিহিতার প্রয়োজন হয়।'

ব্যবস্থার বিরোধী এবং মানবাধিকারের সমর্থকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে সরকার জাতীয় সুরক্ষাকে উন্নত করার পরিবর্তে রাজনৈতিক সমালোচকদের নজরদারি বা গ্রেপ্তার করার জন্য সিএমএসকে অপব্যবহার করবে। অবশ্যই, সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করতে পারে এবং 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' বিপন্ন করে। উদ্বেগগুলি রয়ে গেছে যে ভারতে বিস্তৃত গোপনীয়তা আইন ব্যতীত সিস্টেমটি যথেষ্ট পরিমাণে দায়বদ্ধ হবে না এবং মুক্ত মত প্রকাশের ক্ষেত্রে শীতল হতে পারে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সিনিয়র ইন্টারনেট গবেষক সিন্থিয়া ওয়াং বলেছেন: "রাষ্ট্রদ্রোহ ও ইন্টারনেট আইন ব্যবহারের বেপরোয়া ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ শীতল হচ্ছে। সমালোচক, সাংবাদিক এবং মানবাধিকারকর্মীদের চিহ্নিত করতে বিশ্বজুড়ে নতুন নজরদারি ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছে।"

এছাড়াও, এপ্রিল ২০১১ সালে পাস হওয়া নতুন আইনগুলি সাইবারক্যাফে ইন্টারনেট নজরদারি প্রসারিত করেছে, বেশিরভাগ ভারতীয় যারা ব্যক্তিগত কম্পিউটার বা স্মার্টফোন বহন করতে পারে না তাদের অ্যাক্সেসের প্রাথমিক পয়েন্ট হিসেবে সাইবারক্যাফের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি, ভারতীয়দের সিম কার্ড সক্রিয় করতে তাদের প্রকৃত নামগুলি নিবন্ধন করতে হবে এবং সরকারী কর্তৃপক্ষকে ব্যবহারকারীর ডেটা অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্য মোবাইল এবং

ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারী (আইএসপি) প্রয়োজন। অনলাইনে মুক্ত বক্তৃতাকে বিচারের জন্য এবং রাজনৈতিক সমালোচনা দমন করার জন্য ডেটা ব্যবহার করা হলে ব্যবহারকারীর ডেটা অনুরোধ করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

ভারত এখন বৈশ্বিক ইন্টারনেট পরিচালনার জন্য শীর্ষ-সরকার-নেতৃত্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বানকে প্রতিহত করতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইউ) এবং আমেরিকার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে দুবাইতে আন্তর্জাতিক টেলিযোগযোগ বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে, ইইউ সদস্য দেশসমূহ এবং আমেরিকার সাথে বর্তমান মাল্টিস্টেক হোল্ডারের স্থিতিশীলতা সমর্থন করার ক্ষেত্রে খুব অল্প সংখ্যক দেশগুলির মধ্যে ভারত ছিল অন্যতম।

২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার পরে ভারতের দ্বিধা আরও বেড়ে যায় যখন তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের সেক্রেটারি জায়েদার সিং ইন্টারনেটকে 'একটি বাহন এবং অপরাধী মনের লক্ষ্য উভয়ই' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। সুরক্ষা এবং স্প্যাম নিয়ে উদ্বেগ ভারতকে আরও জাতীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সমর্থন করেছিল। ইউনাইটেড নেশনস কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে ইন্টারনেট পরিচালনার উপরে, শুরুর দিকে নাইরোবিতে ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামের দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রাজিল সহ - ইন্টারনেট পরিচালনার বিতর্কে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র—একই ধরণের উদ্যোগের প্রস্তাব করেছিল।

কেস স্টাডিঃ রতন টাটা ও নীরা রাডিয়া বিতর্ক

ঘটনাটি ভারতের রাজনৈতিক ও কর্পোরেট লবিস্ট নীরা রাডিয়া, তদানীন্তন ভারতীয় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এ রাজা এবং প্রবীণ সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির মধ্যে টেলিফোনিক কথোপকথনের সাথে সম্পর্কিত, যা ২০০৮-২০০৯ সালে ভারতীয় আয়কর বিভাগ দ্বারা টেপ করা হয়েছিল। টেপগুলি সংবাদপত্রগুলিতে ফাঁস হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত কয়েকটি মিডিয়া আউটলেট দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলি দেখিয়েছিল। টেপগুলিতে প্রকাশিত সংবাদগুলি এই অনেক লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল। নীরা রাডিয়া বৈষ্ণবী কমিউনিকেশন' নামে একটি জনসংযোগ সংস্থা চালাতেন, যার ক্লায়েন্টদের মধ্যে ছিল রতন টাটার 'টাটা টেলিসার্ভিসেস' এবং মুকেশ আম্বানির 'রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ'। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমোদন পাওয়ার পরে, ভারতীয় আয়কর বিভাগ সম্ভাব্য অর্থ পাচার, সীমাবদ্ধ আর্থিক চর্চা এবং কর ফাঁকি দেওয়ার তদন্তের অংশ হিসাবে ২০০৮-২০০৯ সালে ৩০০ দিনের জন্য রাডিয়ার ফোন লাইনগুলি ট্যাপ করেছিল। ২০১০ সালের নভেম্বরে, একটি খবরে প্রবীণ সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং কর্পোরেট হাউসগুলির সাথে নীরা রাডিয়ার কয়েকটি টেলিফোন কথোপকথনের প্রতিলিপি প্রকাশ করেছিল, যাদের মধ্যে অনেকেই অভিযোগ অস্বীকার করে। কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো ঘোষণা করে যে তাদের কাছে রাডিয়ার ফোনের কথোপকথনের ৫,৮৫১ টি রেকর্ডিং রয়েছে, যার মধ্যে ২ জি স্পেকট্রাম বিক্রয় সম্পর্কিত ব্যবসায়ের রূপরেখা বোঝা যায়। টেপগুলি প্রকাশ করে যে কীভাবে রাডিয়া টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী হিসাবে এ রাজাকে নিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কিছু মিডিয়া ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।

ইতিমধ্যে রতন টাটা তাঁর কর্পোরেট সংযোগকারী হিসাবে নীরা রাডিয়ার সঙ্গে তার কথোপকথনের বিবৃতি প্রকাশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন। রতন টাটা তাঁর গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে তার পিটিশন জমা দেয়। কিন্তু রাডিয়া বিতর্ক এতদূর গড়িয়েছিল যে সেটি কেবলমাত্র রতন টাটার ব্যক্তিগত জীবনের আঙিনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। বৃহত্তর জনস্বার্থে তা প্রকাশ করার প্রাসঙ্গিকতা ছিল। সেক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক প্রশ্ন যা জিজ্ঞাস্য ছিল তা হল টাটার কথোপকথন তথ্যের অধিকার, ২০০৫ আইনের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে, বা তার কথোপকথনগুলি

ধারা ৮ (জে)-তে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত তথ্যের ছাড়ের আওতায় আসবে ! এই ছাড়ের কাঠামোটি লক্ষ করা আকর্ষণীয়। 'বা' এই শব্দের ব্যবহার দ্বারা আইনটি পরামর্শ দেয় যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার উপর অযৌক্তিক আক্রমণ ছাড় পেতে পারে, এমনকি তথ্যের জনসাধারণের কার্যকলাপ বা আগ্রহের সাথে সম্পর্ক থাকলেও। এবং সতর্কবাণী বলছে যে বৃহত্তর জনস্বার্থ এমনকি নিখুঁতভাবে ব্যক্তিগত তথ্যের প্রকাশকেও ন্যায়সঙ্গত করতে পারে।

তবে বিশেষজ্ঞ আইনি মতামত অনুসারে, রতন টাটা এবং নীরা রাডিয়ার মধ্যে কথোপকথনের বিবরণ প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য ভারতের সর্বোচ্চ আদালত তার এক্তিয়ারের মধ্যে রয়েছে।

৪.২.৪ ডিজিটাল মাধ্যম ও নজরদারী

আইনের অস্পষ্টতার কারণে মানুষকে নিরীহ পোস্ট ও টুইটের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তথ্য প্রযুক্তি আইন (আইটি আইন) এবং ২০০৮ এর সংশোধনীগুলি "কী আপত্তিকর" তা সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট আইনি সংজ্ঞা প্রদান করে না এবং অনলাইনে এবং অফলাইনে কী বলা যায় বা বলা যায় না সে সম্পর্কে সমাজে সাধারণ মতামত নেই, যা অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যায়। এটি 'আপত্তিকর' বলে মনে করা এবং এটিকে প্রত্যাহারের দাবি জানানোর প্রতিবেদন করার প্রবণতা বাড়ছে।

সামাজিক মাধ্যমের বিষয় অপসারণের অনুরোধ (Take Down Request):

তথ্য প্রযুক্তি আইনের ২০০৮ সংশোধনীতে, সরকার আইটি আইনের ৭৯ নং ধারার অধীনে মধ্যস্থতাকারীর দায়বদ্ধতা সীমাবদ্ধকরণ এবং নোটিশ এবং সরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিকে মান্যতা দেওয়া হয়। এটি আইনটির আপত্তি কমাতে এবং মধ্যস্থতাকারীদের সুরক্ষার জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। মানহানি এবং গণশৃঙ্খলা সম্পর্কিত অস্পষ্ট আইনগুলির কারণে ভারতে মধ্যস্থতাকারী দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি বিশেষত জটিল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে" বাক স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণকে প্রাধান্য দেয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুরক্ষাটিকে ২০১১ সালে তথ্যপ্রযুক্তি মধ্যস্থতাকারী নির্দেশিকা বিধিমালা জারি করার জন্য ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই পদক্ষেপের পিছনে একটি প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ২০১১ এর আইটি বিধি বলে অভিহিত - মধ্যস্থতাকারীদের যদি লঙ্ঘনকারীকে ৩৬ ঘন্টার মধ্যে বিষয়বস্তু প্রত্যাহার করতে হয় যদি বিষয়বস্তু আপত্তিজনক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

এই প্রবণতাটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি মানদণ্ড হ'ল গুগল স্বচ্ছতা প্রতিবেদন, যেখানে আদালতের আদেশ ছাড়াই জারি করা টেকডাউন অনুরোধের সংখ্যায় ভারতে সব থেকে বেশী। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আদালতের আদেশ ছাড়াই তাদের অনেকগুলি বিষয়বস্তু প্রত্যাহারের অনুরোধকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য জাতীয় সুরক্ষা উদ্বেগকে উদ্ধৃত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় কম্পিউটার জরুরী প্রতিক্রিয়া দল জনসাধারণের আদেশ হিসেবে এবং জাতিগত অপরাধ আইনকে সামনে রেখে 'একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নিরপরাধতা' সংক্রান্ত ভিডিও ক্লিপগুলি প্রত্যাহারের একটি অনুরোধ জারি করে। ভিডিও ক্লিপগুলি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল এবং গুগল স্থানীয়ভাবে ইউটিউব এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি ইউটিউব ভিডিও এবং মন্তব্য থেকে দেখে 'একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নিরপরাধতা' ভিডিও ক্লিপগুলিকে সীমাবদ্ধ করেছিল।

গুগল একমাত্র সংস্থা নয় যেগুলি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিষয় প্রত্যাহারের অনুরোধগুলির সাথে কাজ করে। ছোট ছোট স্টার্ট-আপগুলি এবং ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারীদের জন্য, বিপুল সংখ্যক বিষয় প্রত্যাহারের অনুরোধগুলি জরিমানার ভয়ে অতিরিক্ত মেনে চলে। আইটি অ্যাক্টের ফলাফল হল গুগল, ফেসবুক বা মাউথশট ডটকমের মতো বেসরকারি দলগুলিকে সেন্সর দেওয়া এবং নাগরিকদের মুক্ত বক্তব্য সীমাবদ্ধ করা।

পরিশুদ্ধতা ও অবরুদ্ধতা (Filtering & Blocking)

ভারতে ওয়েবসাইটগুলি ব্যাপক হারে অবরুদ্ধ এবং ফিল্টারিংয়ে জড়িত। ভারতীয় কম্পিউটার এবং জরুরী প্রতিক্রিয়া টিম ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারীদের ওয়েবসাইটগুলি ব্লক করার জন্য আদেশ দিতে সক্ষম। সেন্সর করা সাইটগুলির পরিসরটি বেশ বিস্তৃত এবং মানবাধিকার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে উগ্রপন্থা এবং অশ্লীলতার সম্পর্কিত বিষয় গুলি থাকে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ, ভারতীয় কম্পিউটার এবং জরুরী প্রতিক্রিয়া দল (Emergency Response Team-ICERT) এর সহায়তায় আদালতের নির্দেশনা ব্যতীত, ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারীদের চিহ্নিত করে কন্টেন্ট ফিল্টার করার আদেশ দিতে সক্ষম।

সীমাবদ্ধ সংখ্যক নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ICERT -তে তদন্তের জন্য সরকারি অভিযোগ এবং সুপারিশ করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ, সরকারি সংস্থা এবং “সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যে কোনও সংস্থা”। বিনিময়ে, ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা গুলিকে ICERT থেকে ব্লক করার আদেশ মেনে চলতে হবে। ২০০০ সাল থেকে, ব্লক করার অনুরোধগুলি ব্যক্তিগতভাবে আপত্তিকর বা অশ্লীল বলে বিবেচিত বিষয়বস্তু প্রতিবেদন করার ব্যক্তিদের থেকেও আসতে পারে। ফিল্টারিং নোটিশ জারির জন্য সরকার বা বিচার কর্তৃপক্ষের উপর চাপ তৈরি করার জন্য ব্যক্তিরা জনস্বার্থ মামলা মোকদ্দমার আবেদনটি পূরণ করে এটি করতে পারে। এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে।

নেটওয়ার্ক বিঘ্ন (Network disruptions)

নেটওয়ার্ক বিঘ্ন ভারতের একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে, একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বন্ধ ছিল। ভাবা হয়েছিল যে মোবাইল ফোনকে ব্যবহার করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হতে পারে জম্মু ও কাশ্মীরে। সরকার নেটওয়ার্ক পরিষেবা দ্রুত সরাসরি স্থগিত করে। মিডিয়ার ও স্থানীয় টেলিভিশন স্টেশনের সঙ্গে মত প্রকাশেও সরাসরি সেন্সরশিপ নিযুক্ত হয়। কয়েকটি ফেসবুক পৃষ্ঠা সরিয়ে নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে লিখিত বার্তা এবং স্থানীয় সংবাদপত্রেও নজরদারী চলে।

কেস স্টাডি : ‘ফেসবুক গ্রেপ্তার’

রবিবার ১৮ নভেম্বর ২০১২, শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ায় মুম্বাইয়ের এক ২১ বছর বয়সী মহিলা শাহীন ধদা শহর বন্ধের বিষয়ে ফেসবুকে তার মতামত জানিয়েছেন। তার বন্ধু রেনু শ্রীনিবাসন তার পোস্টটি ‘পছন্দ করেছে’। পরদিন সকাল ১০.৩০ টায় তারা দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং আদালত তাদের ১৪ দিনের জেল খাটানোর আদেশ দিয়েছিল। কয়েক ঘন্টা পরে, তাদের শেষ পর্যন্ত জামিনে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল দুই হাজার টাকার দুটি বন্ড প্রদানের পরে।

ধদা পোস্ট করেছিলেন, 'শ্রদ্ধা অর্জন করতে হয়, তবে কাউকে বাধ্য করে নয়। আজ মুম্বই ভয়ের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে, শ্রদ্ধার কারণে নয়'। স্থানীয় শিবসেনার এক নেতা তাদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে এবং ধাদা ও শ্রীনিবাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ধারা ২৯৫-এ এর আওতায় মামলা করা হল—ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য 'পরবর্তীকালে তাদের বিরুদ্ধে' শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা দুর্বলতা তৈরি বা প্রচার করার বক্তব্য দেওয়ার জন্য আইপিসির ৫০৫ (২) এর অধীনেও অভিযোগ আনা হয়েছিল, এবং পুলিশ পরে আইটি আইনের Section ৬৬ এ ধারাও যুক্ত করেছিল।

৪.২.৫ সাইবার অপরাধ

সংজ্ঞা :

সাইবার ক্রাইম বা সাইবার অপরাধ, এমন ধরণের অপরাধ যেখানে একটি কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট সংযুক্ত ডিভাইস অপরাধের সাধন হিসেবে ব্যবহার হয়।

সাইবার ক্রাইমকে কম্পিউটার ওরিয়েন্টেড ক্রাইম হিসেবেও বোঝা যায়। আজ সারা দেশে সাইবার ক্রাইম ভীতিজনক একটি শব্দ, প্রতি দিন লক্ষ লক্ষ লোক এর শিকার হচ্ছে।

ইন্টারনেট কম্প্যুটারে তৈরি বিশ্ব সাইবারস্পেস হিসাবে পরিচিত এবং এই এলাকা নিয়ন্ত্রক আইন সাইবার আইন নামে পরিচিত এবং এই স্থান ব্যবহারকারীর এই আইনের চৌহদ্দির অধীন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সাইবার আইন কম্পিউটার ও ইন্টারনেট যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রক আইন। কম্পিউটার বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক গ্যাজেট অপব্যবহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধের সঙ্গে তার আচরণ হল সাইবার অপরাধ। "তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০" এবং "তথ্য প্রযুক্তি সংশোধনী আইন", ২০০৮ সালে বিস্তারিত এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক অপরাধের সঙ্গে তার আচরণ আইন সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

সাইবার অপরাধের ধরণ :

কিছু সাধারণ সাইবার অপরাধ নিম্নরূপ :

- **হ্যাকিং**

হ্যাকার এমন একটি কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, যিনি কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস অর্জন করতে নিজের জ্ঞান ব্যবহার করেন।

- **ক্র্যাকিং**

ক্র্যাকিং শব্দের অর্থ হল তথ্য চুরি, দুর্নীতি বা অবৈধ্য ভাবে কিছু করার জন্য কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করার চেষ্টা করা।

● **ভাইরাস**

কম্পিউটার ভাইরাস এমন একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা ব্যবহারকারীর অনুমতি বা জ্ঞান ছাড়াই নিজেই অনুলিপি করতে পারে এবং একটি কম্পিউটারকে সংক্রামিত করতে পারে।

● **ডেটা ডিড্ডলিং**

ডেটা ডিডলিং হল কম্পিউটার জালিয়াতির এক প্রকার যা ডেটা এন্টিতে সংখ্যার ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচারের সাথে জড়িত। এটি প্রায়শই কর বা অন্যান্য আর্থিক নথি পূরণ করার সময় একটি কোম্পানি বা ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে উপকৃত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

● **ইমেল বোমা ফেলা**

ইমেল বোমাবাজি হল ইন্টারনেট অপব্যবহারের একটি রূপ যেখানে ইমেল পরিষেবাকে ব্যাহত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ইমেল ঠিকানায় বিপুল পরিমাণ অভিন্ন ইমেল পাঠানো হয়। অনেক সময় এত মেল আসতে থাকে যে ইনবক্স ওভারলোডেড হয়ে যায় এবং ভেঙে পড়ে। এটি সম্ভাব্যভাবে যথেষ্ট ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের পাশাপাশি প্রাপকদের মেসেজ স্টোরে স্টোরেজ স্পেস ব্যবহার করতে সক্ষম।

● **ফ্রেইক**

একটি ফ্রেইক হল এমন ব্যক্তি যিনি নিখরচায় দীর্ঘ দূরত্বের ফোন কল করতে বা ফোন লাইনগুলি ট্যাপ করার জন্য অবৈধভাবে টেলিফোন নেটওয়ার্কে প্রবেশ করেন। সাইবার অপরাধে ফ্রেইক হল যে কোনও ব্যক্তি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুরক্ষা ভঙ্গ করে বা ভাঙার চেষ্টা করে।

● **সাইবার সন্ত্রাসবাদ**

এটি কম্পিউটারের সিস্টেমগুলিতে হ্যাকিং, দুর্বল নেটওয়ার্কগুলিতে ভাইরাস প্রবর্তন, ওয়েব সাইটকে দুর্বল করা, পরিষেবা অস্বীকার-সংক্রান্ত আক্রমণ, ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী হুমকি, ই-গভর্নমেন্ট বেসকে ধ্বংস করা ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে।

● **স্প্যামিং**

স্প্যামিং হল যখন কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা অন্য ব্যক্তিকে অবাঞ্ছিত ইমেল পাঠায়। স্প্যাম হল এক ধরনের ইমেল যা বিভিন্ন ইমেল অ্যাকাউন্টে পাঠাতে ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণভাবে কোনও পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপন থাকে।। স্প্যাম ইমেলগুলি সাধারণত ব্যক্তিটিকে কিছু কেনার চেষ্টা করতে বা অন্য কিছু করার চেষ্টা করতে পাঠানো হয় যা প্রেরকের জন্য লাভের কারণ হবে।

● **স্পুফিং**

সাধারণভাবে, স্পুফিং হল এমন যেকোন ক্রিয়া যেখানে একজন স্ক্যামার আস্থা অর্জনের জন্য বা সাধারণ অ্যাক্সেসের নিয়মগুলি বাইপাস করার জন্য তাদের পরিচয় ছদ্মবেশ ধারণ করে।উচ্চতর স্তরের সুরক্ষার অভাব রয়েছে এমন যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্পুফিং সর্বাধিক প্রচলিত।

● **ফিশিং**

ফিশিং হল এক ধরনের হ্যাকিং মেথড যা মূলত প্রতারণামূলক কৌশল ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর ডাটা, যেমন, ডেবিট কার্ড নাম্বার ক্রেডিট কার্ড নাম্বার, লগইন তথ্য ইত্যাদি চুরি করতে ব্যবহৃত হয়। আক্রমণকারী একজন বিশ্বস্ত এবং পরিচিত (অনলাইন খুচরা বিক্রেতা, ব্যাঙ্ক, সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানি, ইত্যাদি) বলে একটি ইমেল পাঠায় এবং আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে একটি ম্যালওয়্যার যুক্ত লিংকে ক্লিক করতে প্ররোচিত করা হয় বা সম্ভবত একটি লিংক ডাউনলোড করতে বলে এবং ওই লিংকে ক্লিক করার পর ডিভাইসে ম্যালওয়্যার ডাউনলোড হয়ে যায়।

● **মহিলাদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ :**

● **ই-মেল এবং এসএমএসের মাধ্যমে হয়রানি**

কিছু সাইবার অপরাধ রয়েছে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের লক্ষ্য করে করা হয়। ই-মেল এবং এসএমএসের মাধ্যমে হয়রানি কোনও নতুন ব্যাপার নয়। এটি চিঠির মাধ্যমে হয়রানির সাথে খুব মিল। হয়রানির মধ্যে হুমকি দেওয়া, অশ্লীল ছবি ও বার্তা দিয়ে গালাগালি দেওয়া এবং এমনকি প্রতারণা করাও অন্তর্ভুক্ত।

● **সাইবার স্টকিং**

এর অর্থ হল ইন্টারনেটে কাউকে সমানে অনুসরণ করে যাওয়া, অনবরত ই-মেল পাঠিয়ে বিরক্ত করা, চ্যাটরুমে ঢুকে পড়ে কুপ্রস্তাব দেওয়া ইত্যাদি। সাইবার স্টকাররা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ,চ্যাটরুমে, ব্লগে এবং ইমেইলের মাধ্যমে শিকারদের টার্গেট করে এবং হয়রান করে।

● **সাইবার পর্নোগ্রাফি**

এর অর্থ হল পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীল বিষয়বস্তু তৈরি, প্রদর্শন, বিতরণ, বা প্রকাশ করতে সাইবারস্পেস ব্যবহার করার কাজ।

● **সাইবার মানহানি**

মানহানির দ্বারা নির্যাতন নারীদের বিরুদ্ধে আরেকটি সাধারণ সাইবার অপরাধ। এটি তখন ঘটে যখন কম্পিউটার এবং / অথবা ইন্টারনেটের সাহায্যে মানহানি ঘটে, যেমন। কেউ ওয়েবসাইটে কোনও ব্যক্তিকে মানহীন বিষয় প্রকাশ করে বা মানহানি যুক্ত ইমেলগুলি প্রেরণ করে।

● **মরফিং**

মূল ছবিটি সম্পাদনা করছে। এটি সনাক্ত করা হয়েছিল যে নারীদের ছবিগুলি ভুয়া ব্যবহারকারীরা ডাউনলোড করে এবং এডিট করার পরে ভুয়া প্রোফাইল তৈরি করে আবার ওয়েবসাইটগুলিতে পুনরায় পোস্ট / আপলোড করে। লঙ্ঘনকারীকে আইপিসির অধীনেও বুক করা যায়।

সাইবার অপরাধের ক্ষেত্র :

১। কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ।

২। সম্পত্তির সাপেক্ষে সাইবার অপরাধ।

৩। সরকারের বিরূদ্ধে সাইবার অপরাধ,

৪.২.৫.১ সাইবার আইনের গুরুত্ব :

ক। আমরা অত্যন্ত ডিজিটালাইসড বিশ্বে বসবাস করছি।

খ। সকল কোম্পানিগুলি তাদের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করে এবং বৈদ্যুতিন আকারে তাদের মূল্যবান তথ্য রাখে।

গ। আয়কর রিটার্ন, কোম্পানি আইন ফরম ইত্যাদি সহ সরকার গঠন এখন ইলেকট্রনিক ফর্মে পূরণ করা হয়।

ঘ। উপভোক্তাগণের ইন্টারনেটের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান।

ঙ। অধিকাংশ মানুষের জন্য ক্রেডিট কার্ড ইমেইল, সেল ফোন এবং ই-বার্তা ব্যবহার করছেন যোগাযোগের জন্য।

চ। অনলাইন ব্যাংকিং পরিষেবা।

ছ। এমনকি 'অ-সাইবার ক্রাইম' ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ কম্পিউটারে পাওয়া যায় / সেল ফোন ব্যবহৃত হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ, খুন, অপহরণ ক্ষেত্রে সংগঠিত অপরাধ, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম, জাল মুদ্রা ইত্যাদি।

জ। যেহেতু এটা লেনদেন এবং ক্রিয়াকলাপ সব দিক স্পর্শ করে এবং ইন্টারনেট বিষয়ে, ওয়ার্লডওয়াইড ওয়েব এবং সাইবারস্পেস তাই সাইবার আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪.২.৫.২ তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০

২০০০ সালের ১৭ অক্টোবর তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০, এর বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। ভারতে সাইবার অপরাধ ও ইলেকট্রনিক বাণিজ্য নিয়ে কাজ করে এই আইনটি।

তথ্য প্রযুক্তি প্রযুক্তি আইন, ২০০০; সাধারণভাবে 'বৈদ্যুতিন বাণিজ্য' অর্থাৎ বৈদ্যুতিন তথ্য বিনিময় এবং বৈদ্যুতিন যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমে পরিচালিত লেনদেনের জন্য আইনী স্বীকৃতি প্রদানের জন্য একটি আইন, যা কাগজ-ভিত্তিক বিকল্পগুলির(অন লাইন) ব্যবহারের সাথে জড়িত তথ্য এবং যোগাযোগের সংরক্ষণের পদ্ধতি, সরকারি সংস্থাগুলির কাছে নথিপত্র বৈদ্যুতিন ফাইলিংয়ের সুবিধার্থে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি, ভারতীয় প্রমাণ আইন, ১৮৭২, ব্যাংকার্স বই প্রমাণ আইন, ১৮৯১ এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আইন, সংশোধন করার জন্য ১৯৩৪ এবং এর সাথে যুক্ত বা ঘটনামূলক বিষয়গুলির জন্য প্রযোজ্য।

তথ্য প্রযুক্তি প্রেক্ষাপট :

১৯৯৬ সালে, জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন কমিশন (ইউনিসিট্রাল) বিভিন্ন দেশে আইনে অভিন্নতা আনতে

বৈদ্যুতিন বাণিজ্য (ই-বাণিজ্য) সম্পর্কিত মডেল আইন গ্রহণ করে।

অধিকন্তু, জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ সুপারিশ করেছিল যে সমস্ত দেশকে তাদের নিজস্ব আইনে পরিবর্তন করার আগে এই মডেল আইনটি বিবেচনা করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ পাস করার পরে সাইবার আইন সক্ষম করতে ভারত দ্বাদশ দেশে পরিণত হয়েছিল।

প্রথম খসড়াটি ভারত সরকার বাণিজ্য মন্ত্রক, ই-কমার্স আইন, ১৯৯৯ হিসাবে তৈরি করার সময়, এটি 'তথ্য প্রযুক্তি বিল, ১৯৯৯' হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল এবং ২০০০ সালের মে মাসে পাস হয়েছিল।

তথ্য প্রযুক্তি আইনের উদ্দেশ্যসমূহ :

তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ তথ্য এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমের যোগাযোগের বা বৈদ্যুতিন বাণিজ্য লেনদেনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে লেনদেনের আইনি স্বীকৃতি সরবরাহ করে।

এর মধ্যে সরকারি সংস্থাগুলির সাথে কাগজপত্রের বৈদ্যুতিন ফাইলিংয়ের সুবিধার্থে একটি কাগজ-ভিত্তিক যোগাযোগের তথ্য এবং তথ্য সংরক্ষণের বিকল্পের ব্যবহার জড়িত।

আইনের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

১। পূর্ববর্তী কাগজ-ভিত্তিক যোগাযোগের পদ্ধতির জায়গায় ডেটা বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যম বা ই-কমার্সের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পন্ন সমস্ত লেনদেনকে আইনগত স্বীকৃতি দান।

২। আইনি প্রমাণীকরণের প্রয়োজন হয় এমন কোনও তথ্য বা বিষয়গুলির প্রমাণীকরণের জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষরগুলিকে আইনি স্বীকৃতি দান।

৩। সরকারি সংস্থাগুলি এবং বিভাগগুলিতে ইলেক্ট্রনিক ফাইলগুলি নথিপত্র সরবরাহ করার সুবিধার্থে আইনি স্বীকৃতি দান।

৪। ডেটার বৈদ্যুতিন স্টোরেজ সুবিধার্থে,

৫। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তহবিলের বৈদ্যুতিন স্থানান্তরকে সহজতর করার আইনী অনুমোদন দান।

৬। ইলেক্ট্রনিক আকারে অ্যাকাউন্টের বই রাখার জন্য প্রমাণ আইন, ১৮৯১ এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আইন, ১৯৩৪ এর অধীনে ব্যাংকারদের আইনি স্বীকৃতি প্রদান।

তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

ক। সুরক্ষিত বৈদ্যুতিন চ্যানেলের মাধ্যমে করা সমস্ত বৈদ্যুতিন চুক্তি আইনত বৈধ।

খ। ডিজিটাল স্বাক্ষরগুলির জন্য আইনি স্বীকৃতি।

গ। বৈদ্যুতিন রেকর্ড এবং সুরক্ষার জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষরগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

ঘ। আইনের অধীনে তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগের একটি পদ্ধতি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ঙ। আইনের অধীনে সাইবার নিয়ন্ত্রক আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার বিধান। আর, এই ট্রাইব্যুনাল কন্ট্রোলার বা

অ্যাডজুডিশাইটিং অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে করা সমস্ত আপিল পরিচালনা করবে।

চ। সাইবার আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল কেবল হাইকোর্টে সম্ভব।

ছ। ডিজিটাল স্বাক্ষরগুলি একটি অসম্পূর্ণ ক্রিপ্টোসিস্টেম এবং হ্যাশ ফাংশন ব্যবহার করবে।

জ। প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষের কাজ লাইসেন্স ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্ট্রোলার অফ সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ) নিয়োগের বিধান। সমস্ত ডিজিটাল স্বাক্ষরের ভান্ডার হিসাবে কাজ করবে নিয়ন্ত্রক।

ঝ। আইনটি ভারতের বাইরে করা অপরাধ বা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ঞ। সিনিয়র পুলিশ অফিসার এবং অন্যান্য আধিকারিকরা যে কোনও সরকারি স্থানে প্রবেশ করতে পারেন এবং ওয়ারেন্ট ছাড়াই অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তার করতে পারেন।

ট। কেন্দ্রীয় সরকার ও নিয়ন্ত্রণকারীকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি সাইবার রেগুলেশনস উপদেষ্টা কমিটি গঠনের বিধানসমূহ।

প্রযোজ্যতা:

ধারা ১ (২) অনুসারে আইনটি পুরো দেশ পর্যন্ত প্রসারিত, যার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরও অন্তর্ভুক্ত। জম্মু ও কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইনটি সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ ব্যবহার করেছে। তদ্ব্যতীত, এটি নাগরিকত্বকে আমলে নেয় না এবং অতিরিক্ত-অঞ্চলীয় একতিয়ার সরবরাহ করে।

ধারা ১ (২) এর সাথে ধারা ৭৫ এর সাথে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই আইনটি ভারতের বাইরেও যে কোনও অপরাধ বা লঙ্ঘনের জন্য প্রযোজ্য। এই অপরাধটি সংঘটিত ব্যক্তিদের আচরণে যদি কোনও কম্পিউটার বা কম্পিউটারায়িত সিস্টেম বা ভারতে অবস্থিত নেটওয়ার্ক জড়িত থাকে, তবে তার জাতীয়তা নির্বিশেষে, ব্যক্তি আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অভাব এই বিধানের একমাত্র সীমাবদ্ধতা।

অ-প্রযোজ্যতা:

তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এর ধারা ১ (৪) অনুসারে এই আইনটি নিম্নলিখিত নথিগুলিতে প্রযোজ্য নয়:

১। চেক ব্যতীত আলোচনা সাপেক্ষে আইন প্রয়োগ, আইন ১৮৮১ এর অধীন আলোচনা সাপেক্ষে কার্যকরকরণ।

২। পাওয়ার অ্যাটর্নি আইন, ১৮৮২ এর অধীনে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি কার্যকর করা।

৩। ভারতীয় ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২ এর আওতায় ট্রাস্টের সৃষ্টি।

৪। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ এর অধীনে উইলের কার্য সম্পাদন।

৫। অস্থাবর সম্পত্তি বা এই জাতীয় সম্পত্তির কোনও বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন।

৬। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গেজেটে নোটিশ দেওয়া হতে পারে এমন কোন শ্রেণির দলিল বা লেনদেন।

তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এর অধীনে জরিমানা, ক্ষতিপূরণ এবং অ্যাডজুডিকেশন:

ধারা ৪৩: যেখানে মালিকের অনুমতি ব্যতীত বা অন্য কোনও দায়িত্বরত ব্যক্তি কম্পিউটার, বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করে, সেই দায়িত্বরত ব্যক্তির জন্য দণ্ড ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ধারা ৪৪: যেখানে কোনও ব্যক্তি কোনও নথি জমা দিতে, কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন জমা করতে বা কর্তৃপক্ষকে শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন, সেখানে ব্যর্থতার জন্য তিনি ১,১৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবেন। এছাড়াও যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও তথ্য, কোনও বই, বই বা অন্যান্য কাগজপত্র সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়, তারপরে তিনি প্রতিদিন ৫,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবেন। আরও বলা হয়েছে যে যেখানে কোনও ব্যক্তি অ্যাকাউন্টের বই বা অন্যান্য রেকর্ড সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়, তারপরে তিনি প্রতি দিন ১০,০০০ /- টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবেন।

তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এর অধীন অপরাধসমূহ:

ধারা ৬৫: যে কোনও ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কম্পিউটার পরিচালিত নথিটির নকল গোপন ধ্বংস বা পরিবর্তন করে, তবে তিনি ২,০০,০০০ / - টাকা, বা তিন বছরের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় দায়বদ্ধ থাকবেন।

ধারা ৬৬: যদি কোনও ব্যক্তি যদি বেআইনিভাবে, বা প্রতারণামূলকভাবে ধারা ৪৩ এ উল্লিখিত যে কোনও কাজ করে, তারপরে তিনি ৫,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ৩ বছর বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হতে পারেন।

বিভাগ ৬৬ খ: যদি কোনও ব্যক্তি অসাধুভাবে, বা প্রতারণামূলকভাবে কোনও চুরি হওয়া কম্পিউটার সংস্থান বা যোগাযোগ ডিভাইস গ্রহণ করেন বা সংগ্রহে রাখেন, তবে তিনি ১,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ৩ বছর বা উভয় দণ্ডে দায়বদ্ধ হতে পারেন।

ধারা ৬৬ গ: যদি কোনও ব্যক্তি অসৎভাবে, বা প্রতারণামূলকভাবে অন্য কোনও ব্যক্তির বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর, পাসওয়ার্ড বা অন্য কোনও অনন্য সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, তবে তিনি ১,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ৩ বছর অবধি কারাদণ্ড ভোগ করতে বাধ্য থাকবেন, অথবা উভয়ই প্রযোজ্য হবে।

ধারা ৬৬ ঘ: যদি কোনও ব্যক্তি বেআইনীভাবে বা কোনও যোগাযোগ ডিভাইস বা কম্পিউটার রিসোর্সের মাধ্যমে প্রতারণামূলকভাবে ব্যক্তিগতভাবে প্রতারণা করেন, তবে তিনি ১,০০,০০০ - টাকা পর্যন্ত জরিমানা, বা তিন বছরের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দায়বদ্ধ হতে পারেন।

ধারা ৬৬ ঙ : যদি কোনও ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা অনুমতিতে যে কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত মুহুর্তের চিত্র গ্রহণ করে, প্রকাশ করে বা ছড়িয়ে দেয়, তবে তিনি ২,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ৩ বছর বা উভয় দণ্ডে দায়বদ্ধ হবেন।

ধারা ৬৬ চ : যদি কোনও ব্যক্তি বৈদ্যুতিনভাবে বা কম্পিউটারের ব্যবহারের সাথে ঐক্য, অখণ্ডতা, সুরক্ষা বা ভারতের সার্বভৌমত্বকে হুমকির উদ্দেশ্যে কোনও কাজ করেন, তবে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

ধারা ৬৭ : যদি কোনও ব্যক্তি বৈদ্যুতিনভাবে এমন কোনও কিছু প্রকাশ করে বা প্রেরণ করে যা কারোর পক্ষে

অপমানকর বা ক্ষতি সাধন করার সম্ভাবনা থাকে, তবে তিনি ৫,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা, বা তিন বছর বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত দায়বদ্ধ থাকবেন এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ১০,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে দায়বদ্ধ থাকবেন , বা ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা উভয়ই।

ধারা ৬৭ক : যদি কোনও ব্যক্তি যৌন স্পর্শতামূলক আইন বা আচরণের উপাদান বৈদ্যুতিন আকারে প্রকাশ বা প্রেরণ করেন, তবে তিনি ১০,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা পাঁচ বছর বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারবেন এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, তিনি ১০,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ৭ বছর বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হতে পারেন

ধারা ৬৮: নিয়ামক, আদেশের মাধ্যমে কোনও শংসাপত্র কর্তৃপক্ষ বা এই জাতীয় কর্তৃপক্ষের যে কোনও কর্মীকে এই আইনের বিধানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় হলে আদেশে উল্লিখিত ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারে, কোন বিধি বা আইন যদি কোনও ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জেনেশুনে আদেশটি না মানেন তবে তিনি ১,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ২ বছর বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হতে পারেন।

ধারা ৬৯: যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা এর কোনও আধিকারিকের কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত, যদি মনে করেন, ভারতের সার্বভৌমত্ব বা অখণ্ডতার স্বার্থে, ভারতের প্রতিরক্ষা, রাষ্ট্রের সুরক্ষা, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলা বা কোনও অপরাধের তদন্তের জন্য উপরোক্ত সম্পর্কিত কোন জ্ঞানীয় অপরাধের কমিশনে উস্কানি দেওয়া রোধ করার জন্য, আদেশের মাধ্যমে, লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে উপযুক্ত সরকারের যে কোনও এজেন্সিকে কম্পিউটারের সংস্থায় উৎপন্ন, সঞ্চারিত, প্রাপ্ত বা সঞ্চিত যে কোনও তথ্য, বাধা বা পর্যবেক্ষণ বা ডিক্রিপ্ট করার জন্য উপযুক্ত সরকারের কোনও এজেন্সিকে নির্দেশিত বা ডিক্রিপ্ট করার নির্দেশ দিতে পারে। যে কোনও ব্যক্তি যিনি এই আদেশ মেনে চলতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি জরিমানার পাশাপাশি ৭ বছরের কারাদণ্ডে দায়ী থাকবেন (জরিমানার পরিমাণ আইনটিতে নির্দিষ্ট করা হয়নি)।

ধারা ৭০: সরকার, সরকারি গেজেটে নোটিশ দ্বারা, যে কোনও কম্পিউটার সংস্থান যা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সমালোচনামূলক তথ্য অবকাঠামোগত সুবিধাকে প্রভাবিত করে একটি সুরক্ষিত ব্যবস্থা হিসাবে ঘোষণা করতে পারে, কোনও ব্যক্তি যদি এই নেটিভার সাথে সম্মতি না জানায়। তবে সে অবশ্যই জরিমানার পাশাপাশি ১০ বছরের কারাদণ্ডে দায়বদ্ধ থাকবেন (এই আইনে জরিমানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি)।

ধারা ৭১: যদি কোনও ব্যক্তি লাইসেন্স বা বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর শংসাপত্র পাওয়ার জন্য নিয়ামক বা শংসাপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও বস্তুগত তথ্য দমন করে বা মিথ্যা বিবরণ দেয়, তবে তিনি ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে দায়বদ্ধ থাকবেন, বা ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

ধারা ৭২: যদি কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও বৈদ্যুতিন রেকর্ড, বই, নিবন্ধন, চিঠিপত্র, তথ্য, নথি বা অন্যান্য উপাদান অর্জন করে বা তথ্য প্রকাশ করে তবে তিনি ১,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ২ বছর বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হতে পারেন।

ধারা ৭৩: যদি কোনও ব্যক্তি একটি বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রকাশ করে বা অন্য যে কোনও ব্যক্তির কাছে জ্ঞান সহ এটি উপলব্ধ করে

- প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ এটি জারি করেনি, বা
- গ্রাহক এটি গ্রহণ করেননি, বা
- শংসাপত্র প্রত্যাহার বা স্থগিত করা হয়েছে

তবে তিনি ১,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ২ বছর বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হতে পারবেন।

ধারা ৭৪: যদি কোনও ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনও জালিয়াতি বা বেআইনি উদ্দেশ্যে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর শংসাপত্র তৈরি করে, প্রকাশ করে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে জোগাড় করে, তবে তিনি ১,০০,০০০ / - টাকা পর্যন্ত জরিমানা দেবেন, বা দুই বছর বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

ধারা ৭৫: যদি কোনও ব্যক্তি ভারতের বাইরে কোনও অপরাধ, আইন বা লঙ্ঘন করেছে, এবং যদি এই অপরাধ বা লঙ্ঘনকারী আইনটি পরিচালনাকারী ভারতে অবস্থিত একটি কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর সঙ্গে জড়িত থাকে, তবে এই আইনের বিধানগুলিও তার জাতীয়তার নির্বিশেষে প্রযোজ্য হবে।

ধারা ৭৬ : যে কোনও কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ, ড্রাইভ, বা এর সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনও আনুষাঙ্গিক, যার বিষয় এই আইনের কোনও বিধান, বিধি আদেশ বা প্রবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে বা করা হচ্ছে, বাজেয়াপ্ত করার জন্যে দায়ী থাকবে। তবে, যদি প্রমাণিত হয় যে এই জাতীয় সংস্থানগুলি প্রতারণা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি তবে কেবলমাত্র মূল ব্যক্তিই গ্রেপ্তার হবে।

৪.২.৫.৩ তথ্য প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৮

তথ্য প্রযুক্তি বিল, ২০০৮, উভয় সংসদ কক্ষে পাস করা হয়েছে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত হয় এবং অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বা সংশোধনী আইন হয়ে ওঠে।

এই তথ্য প্রযুক্তি সংশোধনী আইন ভারতে বিদ্যমান সাইবার আইন কাঠামোর মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর অর্থাৎ কোনো বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর কৌশল দ্বারা ইলেকট্রনিক রেকর্ডের প্রয়োজনীয় প্রমাণীকরণ নিগম তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এই তথ্য প্রযুক্তি আইনের আওতায় সাইবার অপরাধের আরও অনেক বিষয় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে এবং দ্রুতগামী বিধান সংযুক্তি সম্ভব হয়েছে। ডেটা সুরক্ষা সংক্রান্ত নতুন সংশোধনী বিভিন্ন বিধান এবং গোপনীয়তা পাশাপাশি ইলেকট্রনিক এবং সন্ত্রাসবাদ রোধ করার জন্য একটি বিধান আছে।

মূল আইন অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তি আইন,২০০০; ই-কমার্স এবং ই-লেনদেনের জন্য আইনি স্বীকৃতি প্রদান, ই-গভর্নেন্স সহজতর, কম্পিউটার ভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধ এবং তথ্য প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত সম্ভাব্য ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে সুরক্ষা অনুশীলন ও পদ্ধতি নিশ্চিত করার আইন প্রণয়ন করা হয়। সংশোধনী আইনটি (তথ্য প্রযুক্তি সংশোধনী আইন,

২০০৮) ‘মধ্যস্থতাকারী’ হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে যাতে আইনটির বিষয়ে স্পষ্টতা আনতে পারে। এখন, মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন কারণ প্রাপ্ত তথ্যের বেআইনী ডেটা বা বিষয়বস্তু অপসারণের প্রয়োজন হয়।

এছাড়াও “কমিউনিকেশন ডিভাইস” এবং “সাইবার ক্যাফে” এর সংজ্ঞা সংশোধনী আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেমের ইত্যাদি ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ সর্বোচ্চ সীমা এখন সরানো হয়েছে এবং বর্তমানে এই ক্ষতিপূরণ যে কোনও সীমা পর্যন্ত যেতে পারে।

৪৩ নং ধারা দুটি নতুন অপরাধকে যোগ করা হয়েছে। ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও কম্পিউটারের তথ্য উৎসের গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য তথ্য মুছে ফেলা বা তথ্য উৎস পরিবর্তন করা এবং ক্ষতির উদ্দেশ্যে তথ্য উৎস কোড চুরি করা বা ধ্বংস করা। বিধিবদ্ধ সংস্থার ডেটা সুরক্ষার দায়িত্ব ব্যাপকভাবে সন্নিবেশ করার মাধ্যেমে জোরদার করা হয়েছে।

সংশোধন আইনের ধারা ৪৩ এ এর অধীনে কম্পিউটার সংস্থায় সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য পরিচালিত কর্পোরেট সংস্থাগুলি তার গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুরক্ষা অনুশীলন এবং পদ্ধতি গ্রহণ নিশ্চিত করার একটি বাধ্যবাধকতা এই আইনের অধীনে রয়েছে। এই জাতীয় সংস্থা কর্তৃক এই ধরনের বাধ্যবাধকতা সম্পাদনে ব্যর্থতা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

সাইবার অপরাধ হিসাবে আরও ৮ টি অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ৬৬(ক) থেকে ৬৬ (চ) ধারাগুলিতে যুক্ত করা হয়েছে, যেমন - অপরাধের মধ্যে আপত্তিকর বৈদ্যুতিন বার্তা প্রেরণ, পরিচয় চুরি, কম্পিউটার সংস্থান ব্যবহার করে ছদ্মবেশে প্রতারণা, গোপনীয়তা লঙ্ঘন এবং সাইবার সন্ত্রাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৬৭ (ক) থেকে ৬৭ (গ) বিভাগের অন্তর্ভুক্তি অর্থাৎ যৌন প্রকাশ্য আইন সহ ইলেকট্রনিক আকারে উপাদান প্রকাশ করা বা প্রেরণ করা, শিশু পর্নোগ্রাফি এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তথ্যের সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য মধ্যস্থতাকারীর উপস্থিতি বাধ্যবাধক করা হয়েছে।

৬৯ ধারাটি সরকারি সংস্থাগুলি গ্রাহকগণ, মধ্যস্থতাকারী বা কম্পিউটার সংস্থার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সহায়তায় যেকোন বৈদ্যুতিন তথ্যকে বাধা, মনিটরিং বা ডিক্রিপ্ট করতে সক্ষম করে।

সংশোধিত অধ্যায় ৭৯ এ বলা হয়েছে, মধ্যস্থতাকারীরা তৃতীয় পক্ষের ডেটাগুলির জন্য দায়বদ্ধ নয় যদি তারা প্রমাণ করতে পারে যে তারা কেবলমাত্র ডেটাগুলি গ্রহণ করবে বা তা করার সুবিধা আছে কিন্তু সেই ডেটা নিয়ে তারা সঞ্চালন করবে বা কোনও অপব্যবহার করবে না, তাহলে তা সমস্যাজনক নয়।

‘প্রকৃত জ্ঞান’ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বেআইনি ভাবে অন্যের কাজ আহরণ করার ক্ষেত্রে বাধা আছে। আইনের ৮১ ধারায়, বলা হয়েছে কোন কিছুই, যা কপিরাইট আইন, ১৯৫৭ বা পেটেন্টস অ্যাক্ট, এর আওতাভুক্ত রয়েছে সেই বিষয়গুলির কোনও কিছুর অপব্যাবহার করা যাবে না বা নিজের নামে চালানো যাবে না। সুতরাং, পেটেন্টস আইন এবং কপিরাইট আইনের অধীন অধিকারগুলি এই ক্ষেত্রেও অনুশীলনযোগ্য।

৪.২.৬ সারাংশ

মানব সভ্যতা যত বেশী ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে পড়ছে তত বেশী অপরাধের ধরনও তার চরিত্র বদলাচ্ছে। প্রয়োজন পড়ছে সাইবার আইনের। ভারতে ২০০০ সালে প্রণীত তথ্যপ্রযুক্তি আইন বর্তমান। পরবর্তী সময়ে তার সংশোধন হয়েছে। কিন্তু দিন যত এগুচ্ছে সাইবার অপরাধ নতুন নতুন রূপে হাজির হচ্ছে। শুধু মূদ্রার লেনদেন নয়, মত প্রকাশের স্বাধীনতার নতুন মঞ্চ হিসেবে সামাজিক মাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিচ্ছে। এখন তথ্য গ্রহীতা শুধু আর গ্রহীতা নন বরং নতুন তথ্যের প্রকাশে গ্রহীতাও জোরদার ভূমিকা নিচ্ছে। স্মার্ট ফোনের যুগে মুহুর্তে ভাইরাল হচ্ছে ব্যক্তিগত পরিসর। তথ্য জানার অধিকার এবং গোপনীয়তার অধিকারের মাঝের সীমারেখা ক্রমাগতই ধূসর হচ্ছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হ্যাকিং কেও "Ethical" বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

নতুন পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ছে প্রতিনিয়ত এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সচেতনতা।

৪.২.৭ অনুশীলনী

১। সাইবার আইন কী? সাইবার অপরাধ কী?

২। তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। তথ্য প্রযুক্তি আইন সংশোধনীর কারণ কী ছিল?

৪। সাইবার স্টকিং কী?

৫। মরফিং কি?

৬। গোপনীয়তার অধিকার বলতে কী বোঝেন? ভারতে এই আধিকার কি চূড়ান্ত?

৭। "ডিজিটাল যুগে গোপনীয়তা ভংগের অভিযোগ বারে বারে এসেছে, আমজনতার বিরুদ্ধে এমনকি সরকারের বিরুদ্ধেও এসেছে।" মন্তব্যের সঙ্গে কি আপনি সহমত? যুক্তিসহ ব্যাখা দিন।

৮। "ডিজিটাল যুগে অদৃশ্য নজরদারীতে সাধারণ জনগণ রয়েছেন।" — মন্তব্যটি ব্যাখা করুন।

৪.২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. Indian Express Newspaper vs Union of India (1985)1SCC 641

২. Maneka Gandhi v. Union of India– (1978) 1 SCC 248

৩. Global Media Journal - Indian Edition– Summer Issue/June/2016/Vol. 7/No. 1

৪. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)–2015– Vol 2– No.7– 49- 54.

৫. Media Law and Ethics — N. Neelamar

৬. https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontgent.cgi?article=1407&context=btli

একক ৩ ❐ মুক্ত মাধ্যম ও আইন

গঠন

৪.৩.১ উদ্দেশ্য
৪.৩.২ প্রস্তাবনা
৪.৩.৩ উইকিলিক্স এবং কিছু প্রশ্ন
৪.৩.৪ সাইবার ট্রোলিং
৪.৩.৫ ইন্টারনেট স্বাধীনতা ও বর্তমান প্রবণতা
৪.৩.৬ জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি, ২০১৮
৪.৩.৭ সারাংশ
৪.৩.৮ অনুশীলনী
৪.৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

নয়া মাধ্যমের যুগে তথ্যের স্বাধীনতা, তথ্যের অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার, রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও তথ্য প্রবাহে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিষয়গুলির সীমা একে অন্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সমাজ প্রত্যেকদিন এক এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। উইকিলিকসের ঘটনা অনেক কারণেই চোখে পরার মতন। এটি দেখিয়ে দিয়েছে যে যখন কোনও বৃহৎ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ হয়, তখন সে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। কীভাবে বা কোন ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, তা মহান শক্তির পক্ষে কোনও বিবেচ্য বিষয় নয় কারণ বৃহৎ শক্তি স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেক দূর যেতে পারেন। এই ক্ষেত্রে, চ্যালেঞ্জটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিকবাহিনীকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়নি, তবে উইকিলিকস কর্তৃক ফাঁস হওয়া গোপনীয় তথ্যগুলি 'উচ্চ শ্রেণির তথ্য' হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

৪.৩.২ প্রস্তাবনা

সাইবার আইন চর্চার ক্ষেত্রে আমরা বারে বারেই বিভিন্ন সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেছি। এই এককে আমরা শুরুই করবো দুনিয়া কাঁপানো একটি ঘটনা নিয়ে। যে ঘটনা সমাজ ও প্রযুক্তিকে এক্কেবারে অনেকগুলি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

৪.৩.৩ উইকিলিকস এবং কিছু প্রশ্ন

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ও উইকিলিকস

অ্যাসাঞ্জ হলেন একজন অস্ট্রেলিয়ান, ১৯৭১ সালে জন্ম কুইন্সল্যান্ড প্রদেশে। তাঁর যাযাবর জীবনযাপনে, অ্যাসাঞ্জ ছিলেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষিত কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। ২২ বছর বয়সে, তার বিরুদ্ধে ৩১ টি কম্পিউটার হ্যাকিং

এবং সম্পর্কিত অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল, এবং অবশেষে দোষী সাব্যস্ত করে এবং একটি ন্যূনতম জরিমানাও করা হয়েছিল। তিনি পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, দর্শন এবং স্নায়ুবিজ্ঞানের মতো বিস্তৃত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষিত।

অ্যাসাঞ্জ, তথ্যের অবাধ গতিবিধিতে বিশ্বাসী এক ব্যক্তি। ১৯৯৯ সালে 'উইকিলিক্স.কম' ডোমেন নামটি নিবন্ধভুক্ত করেছিলেন। তবে তিনি ২০০৬ পর্যন্ত এই সাইটের ব্যবহার সক্রিয়ভাবে শুরু করেননি। সেই বছর, তিনি তথ্য ফাঁসকারীদের (হুইস্‌ল্-ব্লোয়ারদের) জন্য ওয়েবসাইটটিকে একটি ভীষণরূপে নির্ভরযোগ্য স্থানে পরিণত করেছিলেন, বিশেষত যারা গোপন নথিগুলি জনসাধারণকে প্রচার করতে চান, তাঁদের জন্য। যেমনটি তাঁর বৈশিষ্ট্য, অ্যাসাঞ্জ জানান, উইকিলিকস হ'ল 'অবৈধ কাজ জনিত দলিল ফাঁস এবং প্রকাশ্য বিশ্লেষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা।' ডিসেম্বর ২০০৬ সালে প্রথম তাঁর ওয়েবসাইটে প্রকাশ পায় সোমালির বিদ্রোহী নেতার দ্বারা সরকারি কর্মকর্তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল (যদিও তথ্য যাচাই করা হয়নি)। ২০০৭ সালে, অ্যাসাঞ্জ সাইটটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করার ঘোষণা করেন।

২০০৭ সালের শুরু থেকেই অ্যাসাঞ্জ 'দ্য গার্ডিয়ান" প্রত্রিকার সাথে একটি সম্পর্ক রাখতে শুরু করেছিলেন। ২০০৭ সালের প্রথম দিকে, সম্পাদক রসব্রিডগার স্মরণ করে বলেন তিনি উইকিলিক্সের 'সম্পাদক-ইন-চিফ' অ্যাসাঞ্জের নিয়মিত ইমেল পেয়েছিলেন, মাঝে মাঝে সেখানে লেখা থাকতো- "একটি ভাল খবর বলার আছে"।

২০০৭-এর ৩১ আগাস্ট, দুটি সংস্থা প্রথমবারের মতো কাজ করেছিল। কেনিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড্যানিয়েল আরাপ মোয়ের কথিত দুর্নীতির বিষয়ে বেসরকারি তদন্ত সংস্থা ক্রোলের একটি প্রতিবেদনটি উইকিলিকস পুরো প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে পোস্ট করেছিল এবং গার্ডিয়ান পত্রিকাও লিখেছিল। কেনিয়া সরকার এই প্রতিবেদনটি গোপন রাখতে চেয়েছিল। উইকিলিকস এর কিছু নথি ব্যবহার করার জন্য এই দ্য গার্ডিয়ানটি ছিল ব্রিটিশদের একমাত্র কাগজ।

২০০৮ এবং ২০০৯ সালে, উইকিলিক্স এবং দ্য গার্ডিয়ান আবার সীমা অতিক্রম করেছে। দুটি উপলক্ষে - প্রথমে বার্কলে ব্যাংকের কর এড়ানোর কৌশল সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি আইভরি কোস্টে পণ্য ব্যবসায়ী ট্রাফিগুরা দ্বারা বিষাক্ত বর্জ্য ফেলা। যুক্তরাজ্যের উচ্চ আদালত কাগজপত্রের জঘন্য নথি প্রকাশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

উইকিলিকস ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র

উইকিলিক্সের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটটিতে ঘোষিত আছে যে এটি যুদ্ধ, গুপ্তচরবৃত্তি এবং দুর্নীতির সাথে জড়িত বিধিনিষেধযুক্ত সরকারি উপকরণগুলির বৃহত ডেটাবেসগুলির বিশ্লেষণ এবং প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। এটি এ পর্যন্ত দশ কোটিরও বেশি নথি এবং সম্পর্কিত বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে।

- উইকিলিকস ওয়েবসাইটটি অনেকগুলি বিশেষ তথ্য ফাঁসের সাথে জড়িত রয়েছে, যার বেশিরভাগই মার্কিন সরকারের নীতিগুলিকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে।
- আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম, আফগান যুদ্ধের বিবরণ, ইরাক যুদ্ধের বিবরণ, গুয়ান্তানামোর ফাইল এবং এনএসএর ওয়ার্ল স্পাইয়ের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় তথ্য ফাঁস করে উইকিলিকস।
- উইকিলিক্স বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নথি প্রকাশ করেছে যা প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদে পরিণত হয়েছে।
- ২০১০ সালের এপ্রিলে, উইকিলিক্স একটি ভিডিও প্রকাশ করে যেখানে দেখা যায় এএইচ-৬৩৮ অ্যাপাচি হেলিকপ্টার দ্বারা ২০০২ সালের ১২ জুলাই বাগদাদ বিমান হামলার বন্দুকের দৃশ্য, যেখানে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ইরাকি সাংবাদিকরা ছিলেন, যাঁকে জামানত হত্যা ভিডিও হিসাবে ইতিমধ্যে পরিচিত ছিল।

- ২০১০ সালের জুলাই মাসে উইকিলিক্স আফগান যুদ্ধ ডায়েরি প্রকাশ করে, এটি আফগানিস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কিত ৭৬,৯০০ টিরও বেশি নথির সংকলন যা জনসাধারণের জন্য আগে উপলভ্য ছিল না।
- ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে উইকিলিকস বড় বাণিজ্যিক গণমাধ্যম সংস্থার সাথে সমন্বয় করে 'ইরাক ওয়ার লগস' নামে প্রায় ৪০০,০০০ নথির প্রকাশ করেছিল।
- ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উইকিলিকস জনসমক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের গোপন তথ্যের বিশাল আর্কাইভের এনক্রিপ্ট করা সংস্করণ প্রকাশ করে যা কয়েক মাস ধরে বিটোরেন্টের মাধ্যমে উপলব্ধ ছিল এবং সেই সঙ্গে ডিক্রিপশন কী (যা পাসওয়ার্ডের অনুরূপ) উপলব্ধ ছিল।

বিতর্কিত ঘটনাপ্রবাহ:

- এই ঘটনার ফলে ব্যাপকভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে প্রকাশিত তথ্য নিরীহদের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে।
- অনেক গণমাধ্যম সূত্র অ্যাসাঞ্জকে একটি 'নৈরাজ্যবাদী' বলেছিল কারণ তিনি কোনও ব্যক্তির করা দাবী বা তথ্যগুলি কোনও সম্পাদনা, বস্তুনিষ্ঠা, কোনও ব্যাখ্যা, কোন চিন্তাভাবনা, কোনও পরিণতি বিবেচনা না করেই প্রকাশ করেছিলেন।
- অন্যদিকে, বিশ্বজুড়ে হ্যাকার এবং প্রোগ্রামাররা এখনও অ্যাসাঞ্জ এবং উইকিলিক্সের ব্যাপক সমর্থন ছিল।
- মার্কিন সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিশ্লেষক চেলসি ম্যানিং যিনি আগে ব্র্যাডলি ম্যানিং নামে পরিচিত ছিলেন তিনি উইকিলিকসকে কয়েক হাজার শ্রেণিবদ্ধ নথি সরবরাহ করার জন্য দায়ী ছিলেন বলে দাবী করা হয়। এই নথি গুলির মধ্যে ২০০৭ সালের, বাগদাদ স্ট্রাইক, ২০০৯-এর আফগানিস্তানের এয়ারস্ট্রাইক এবং হাজার হাজার মার্কিন কূটনৈতিক তার- যোগাযগের ভিডিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যা পরবর্তীতে "ইরাক যুদ্ধ লগ" হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। শ্রেণিবদ্ধ নথি ফাঁস করার জন্য, ম্যানিংয়ের বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করার জন্য ২২ টি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল।
- ম্যানিংয়ের সমর্থনকারী প্রতিরক্ষা আইনজীবীদের দ্বারা "শত্রুকে সাহায্য করার" অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। অন্যতম আইনজীবী হার্ভার্ড আইন স্কুলের প্রফেসর, বেনক্লারও মত প্রকাশ করেছিলেন, 'উইকিইলিক্স ম্যানিংয়ের ফাঁস হওয়া উপাদান প্রকাশ করা শুরু করা অবধি পেন্টাগন গোপনীয়তাবিরোধী ওয়েবসাইটটিকে বৈধ বলে মনে করত, কারণ এটি ছিল একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ।" এর পরেই মার্কিন জনসাধারণ, সামরিক ও ঐতিহ্যবাহী সংবাদমাধ্যমগুলি উইকিলিকসকে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থনকারী একটি দল হিসাবে গণ্য করে।
- কারাগারে প্রেরণের আগে, প্রকাশিত হয়েছিল যে ম্যানিং নিজেই বলেছিলেন যে তিনি যে তথ্য ফাঁস করেছেন সেগুলি হল "ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ" বিষয় যা একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধের 'সত্য প্রকৃতি' প্রকাশ করেছিল। তবে চূড়ান্ত শুনানি চলাকালীন ম্যানিং তার অতীত কর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাদের অনিচ্ছাকৃত পরিণতির জন্য তিনি দুঃখিত।
- ঘটনায় প্রধান মোড়টি তখন আসে যখন সুইডিশ আদালত দুজন সুইডিশ মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে অ্যাসাঞ্জকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। এই দুই অভিযোগকারীনি উইকিলিকসের প্রাক্তন কর্মচারীও ছিল।

অ্যাসাঞ্জ নিজেকে লন্ডন পুলিশের হাতে সমর্পন করেছিলেন এবং বিচারের জন্য সুইডেনে হস্তান্তর করার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। অন্যদিকে, অ্যাসাঞ্জ জামিনে মুক্তি পান এবং গণমাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় তিনি ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছিলেন যে মামলাটি রাজনৈতিকভাবে তাকে দুর্বল করার জন্য সাজানো হয়েছিল।

- অ্যাসাঞ্জ আশঙ্কা করেছিলেন যে সুইডেনে তাকে সুষ্ঠু বিচার দেওয়া হবে না সেই কারণে তিনি আদালতের প্রত্যর্পণের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন। ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্ট তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। এর পরেই অ্যাসাঞ্জ আদালতের আদেশ মেনে চলতে অস্বীকার করেছিলেন এবং লন্ডনে ইকুয়েডোর দূতাবাসে আশ্রয়ের আবেদন করেছিলেন। এটি বোঝা যায় যে অ্যাসাঞ্জ ভয় পেয়েছিলেন যে যদি তাকে সুইডেনে প্রত্যর্পণ করা হয় তবে বিপদে পড়বেন।
- ব্রিটেন ইকুয়েডরকে হুমকি দিইয়ে মার্কিন সহযোগী হিসাবেই তার ভূমিকা পালন করেছিল।
- এই আচরণটি আন্তর্জাতিক আইনগুলির সম্পূর্ণ অসম্মান প্রদর্শন করেছিল যার জন্য বিশ্বব্যাপী নাগরিক অধিকার সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্রিটেনের সমালোচনা হয়েছিল। ইকুয়েডরও এই হুমকির নিন্দা করেছিল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা অ্যাসাঞ্জকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
- তার পর থেকে, অর্থাৎ ২০১২ সালের আগস্ট মাস থেকে অ্যাসাঞ্জ ইকুয়েডর দূতাবাসের অভ্যন্তরে আবদ্ধ এবং সময়ে সময়ে তাকে দূতাবাসের চত্বর থেকে গণমাধ্যম এবং তার সমর্থকদের উদ্দেশে দেখা যায়।

জাতীয় সুরক্ষা বনাম বাক স্বাধীনতা:

উইকিলিকসের ঘটনাটি এক সঙ্গেই অনেকগুলি দিকের উন্মোচন করে—

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বাক্-স্বাধীনতার বিষয়টি সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যে পরে এবং "বিল অফ রাইটস"-এ তালিকাভুক্ত প্রথম সুরক্ষিত অধিকার। আমেরিকানরা এই অধিকারটিকে ঐতিহাসিকভাবে লালন করেছেন এবং অনেকে যুক্তিও দিয়েছে যে এটি মার্কিন মূল্যবোধকে চিত্রিত করে। উইকিলিক্স মামলায় জাতীয় সুরক্ষা এবং বাক্-স্বাধীনতার বিষয়টির দ্বন্দ্বের স্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে।
- দ্য গার্ডিয়ান এর মতে, মার্কিন সরকার ফেডারেল কর্মীদের জন্য উইকিলিক্সের অ্যাক্সেস ব্লক করেছিল। কংগ্রেসের মার্কিন গ্রন্থাগার, মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলিও এই ওয়েবসাইটটি নিষিদ্ধ করেছিল।
- ম্যাথিয়াস স্পিলক্যাম্প নামক এক সাংবাদিক বলেছিলেন যে উইকিলিকসকে তথ্য প্রকাশে বাধা দেওয়ার জন্য মার্কিন সরকারের প্রচেষ্টাগুলি প্রেসের স্বাধীনতা বিষয়ক নিষেধাজ্ঞার একটি দিক।
- বৃহৎ শক্তির স্বার্থ বা রাষ্ট্রের স্বার্থগুলিকে অনেক সময় 'জাতীয় স্বার্থ' বলে অভিহিত করা হয় যা বাস্তবে কখনই জাতীয় স্বার্থ নয়, মূলত রাষ্ট্রের স্বার্থ। উইকিলিকসের দ্বারা ফাঁস করা তথ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রস্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ হিসাবে উপস্থাপিত করার জন্য একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার পর্দা ফাঁস করেছিল।
- এর সাথে বিশ্বমানবিকতার দিকটিও জড়িয়ে ছিল। যে সাংবাদিকগণ বাগদাদে মারা যান, তাঁদের তথ্য জানাবার অধিকারের বা পেশার দিকটিও জড়িত। আমেরিকার মতো দেশ যে বাক্-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের লালন করে, সেই রাষ্ট্র কিভাবে সাংবাদিক এবং নাগরিক সমাজের দলগুলির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে পদক্ষেপ নিয়েছিল

এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে রাষ্ট্রের স্বার্থ সর্বজনীন এবং তার কাছে বাক্-স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের মতো সমস্ত আদর্শগুলি একটি গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

- এর উল্টো দিকটি হল, যেখনে মার্কিন প্রশাসন তাঁদের গোপন নথিগুলি গোপন রাখতে ব্যার্থ হয়েছেন, সেখানে সাধারণ মানুষের নথি চুরি যাবার ভয় অনেক বেশী।
- আবার জনগণের জানার এক্তিয়ার কতখানি, রাষ্ট্র যেখানে কোনও বিষয়কে অন্য মোড়কে উপস্থাপন করে তখন গণমাধ্যমের ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ!

এই অনেকগুলি বিষয়কেই মিলিয়ে এক নতুন অনিশ্চিত নয়া ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ। জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ তার নিজের ভাষায় উইকিলিক্সকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, "বিশ্বের সবচেয়ে অবদমিত ও গোপন দলিলগুলির একটি বৃহদাকার গ্রন্থাগার।" কিন্তু বর্তমানে এটি এক নিষিদ্ধ গ্রন্থাগার।

৪.৩.৪ সাইবার ট্রোলিং

উৎস:

১৬১০ সাল নাগাদ ইংরেজী বিশেষ 'ট্রোল' শব্দটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লোককাহিনী এবং শিশুদের গল্পগুলিতে পাওয়া যায়। 'ট্রোল' শব্দটি প্রাচীন শব্দ 'ট্রল' থেকে এসেছে যার অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস। ট্রোলগুলি সাধারণত অসামাজিক ও ঝগড়া প্রবণ এবং ধীরে ধীরে প্রাণবন্ত উদ্দীষ্ট ব্যক্তির স্বাভাবিক যাপনকে কঠিন করে তোলে। আধুনিক ইংরেজি ব্যবহারে, 'ট্রোলিং' শব্দটির অর্থ হল চলন্ত নৌকা থেকে আস্তে আস্তে লোভ বা টোপযুক্ত টুকরো টেনে এনে মাছ ধরার কৌশলটি। ১৯৬০ এর দশকে মার্কিন সেনাবাহিনীর মধ্যে গণ-যোগাযোগের জন্য "ট্রোল" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। "ট্রোল" শব্দটি অর্থ হল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অন্যদের উস্কে দেওয়ার চেষ্টা। ইন্টারনেট ব্যবহারের অনেক আগেই, 'ট্রোলিং' শব্দটি তৈরি হয়েছিল এবং বর্তমানে সাইবার ট্রোলিং এর উৎস হিসেবে বলা যেতে পারে।। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ভিয়েতনামের মার্কিন নৌবাহিনীর বিমান চালকরা তাদের 'কুকুর-লড়াইয়ে' ট্রোলিং শব্দটি ব্যবহার করতেন এবং পরবর্তী সময়ে টম ক্রুজ অভিনীত 'টপ গান' ছবিটিতে এই বিষয়টি দেখানো হয় ও তা জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ইন্টারনেটের যুগে প্রতিটি ইন্টারনেট ট্রোলের ব্যবহারে আলাদা আলাদা গল্প থাকে এবং তাই ইন্টারনেটে কোনও সম্প্রদায়কে ট্রোল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পিছনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যারা ট্রোল করেন তাঁরা বেশিরভাগ সময় হতাশাগ্রস্ত, রাগান্বিত, দু:খিত, ঈর্ষা বা অন্য কোনও আবেগ দ্বারা তাড়িত হন যা তাঁরা বাস্তব জগতে ব্যক্ত করতে পারেন না, কিন্তু অনলাইনে সহজেই সেই কথাগুলি ব্যক্ত করেন ট্রোলিং এর মধ্যমে। ট্রোলিং রাগ ও ক্ষোভ প্রকাশের জায়গাটা এত সহজ করে তোলে যে এটি যে কেউ করতে পারে, এবং কম্পিউটার বা মোবাইলের মত নিরাপদ জায়গা থেকে করতে পারে, সামনা সামনি কোনও খারাপ কথা বলতে হয় না। ট্রোলিং অনেকটা নিরিহ মানুষকে আরও শক্তিশালী বোধ করায়।

নিম্নে আমরা কয়েক ধরনের ট্রোলিং বিষয়টি আলোচনা করবো:

- **ক্লাসিকাল বা চিরায়ত ট্রোলিং বনাম বেনামে ট্রোলিং (Classical trolling vs anonymous trolling)**

  ক্লাসিকাল ট্রোলিংটি সাধারণত পরিচিত মানুষজন বা সম্প্রদায়ের সম্মতিতে বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এর ফলে ব্যবহারকারীদের মধ্যে বন্ধন তৈরি হতে দেখা যায়। অন্যদিকে বেনামে ট্রলিং কোন ব্যক্তির নিজস্ব অসুস্থ উপভোগের জন্য কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বাইরের কাউকে কেন্দ্র করে করা হয়।

- খ্যাতি সূচক ট্রোলিং বনাম অপমানকর ট্রোলিং (Kudos trolling vs flame trolling)

  যিনি বেশিরভাগ আপাতদৃষ্টিতে বৈধ প্রশ্ন বা কথোপকথনের সূচনা দিয়ে শুরু করেন তবে অন্যরা নিজেদের আলোচনার মাধ্যমে ট্রোলকে এমন হিসাবে বর্ণনা করেন যাতে মূল আলোচনাটি অকেজো আলোচনায় পরিণত করার চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে যায়। "ট্রোলিং"-এর এই অবমাননাকর রূপটি" অন্যকে বিনোদন দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে "কুডোস ট্রোলিং" হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

- ইন্টারনেট ট্রোলিং

  অনলাইন সামাজিক মাধ্যমগুলি কয়েক মিলিয়ন ব্যবহারকারীর কাছে মূল্যবান তথ্য নিয়ে আসে বা আলাপচারিতার সূচনা করে, —তবে তাদের উপযোগিতা নির্ভর করে তাদের ব্যবহারকারীর উপর। অনলাইন সম্প্রদায়ের সাফল্যের জন্য, পোস্ট, মন্তব্য এবং ভোট আকারে ব্যবহারকারীর অবস্থানের গুরুত্ব থাকে।

- একটি ইন্টারনেট ট্রোলের মাধ্যমে একটি অনলাইন সামাজিক সম্প্রদায়ের সদস্যরা ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু মন্তব্য, ফটো, ভিডিও, জিআইএফ বা অনলাইন বিষয়বস্তুর কোনও ফর্ম পোস্ট করে সম্প্রদায়ের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করতে, আক্রমণ করতে, অপরাধ করতে বা সাধারণত সমস্যার সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

- এক জন সামাজিক মাধ্যম ব্যাবহারকারী পুরো ;ইন্টারনেট অন ম্যাসেজ বোর্ডের' উপরে, ইউটিউব ভিডিও মন্তব্যে, ফেসবুকে, টুইটারে, ব্লগ মন্তব্যে এবং অন্য যে কোনও জায়গায় যেখানে উন্মুক্ত অঞ্চল রয়েছে যেখানে লোকেরা তাদের চিন্তাভাবনা এবং মতামত প্রকাশ করার জন্য পোস্ট করতে পারে তা ব্যবহার করতে পারেন

- একটি ট্রোলে সাধারণ জ্ঞানের বোকামি, মতবিরোধ, কোনও গোষ্ঠী বা মেলিং তালিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে আপত্তিকর অবমাননা বা তুচ্ছ ফলো-আপ পোস্টিংয়ের জন্য অনুরোধ থাকতে পারে।

- ট্রোল অনলাইন সুনামের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকারক। অপমানকর ট্রোল হল বিদ্বেষপূর্ণ, সরল এবং সাধারণ। এমনকি কারও কাছে তাদের ঘৃণা বা অপমান করার কারণও নেই। এই ধরণের ট্রলগুলি নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট জিনিসগুলির জন্য অভিযুক্ত করবে এবং তাদের কাছ থেকে নেতিবাচক মানসিক প্রতিক্রিয়া পেতে তারা যা কিছু করতে পারে।এই ধরণের ট্রোলিং এতটাই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে যে এটি সাইবার বুলিংয়ের একটি গুরুতর রূপ নিয়ে যেতে পারে বা এটি বিবেচনা করতে পারে। প্রায়শই ক্ষোভের সংস্কৃতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে গোষ্ঠীর মধ্যে ভয়, অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহ তৈরি করা হয়।

- ট্রোলিং এমন একাধিক অসামাজিক অনলাইন আচরণের সাথে সম্পর্কিত থাকে যা অনলাইন সামাজিক মাধ্যমগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। অনলাইন ট্রোলিং বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

আমাদের আচরণ সর্বদা নিখুঁত নয়। সমালোচনার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে অনেক সময়েই আমরা সচেতন থাকতে পারি না। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদটি আমাদের মতামত রাখার স্বাধীনতা দেয়, তবে এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য

যেখানে কোনও স্বাধীন মতামত কোনও ব্যক্তির আত্ম-সম্মান এবং সুনামকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে। অযথা ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠলে সমালোচনা তার মান হারাতে থাকে। ইন্টারনেট ট্রলিং হল এমন একটি ঘটনা, সামাজিক মাধ্যমের মঞ্চ যেখানে প্রচণ্ড তর্ক - বিতর্ক ও ভয় দেখানোর কারণে স্বাধীন মতপ্রকাশের নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

কেসস্টাডি: রানু মন্ডলঃ হঠাত জনপ্রিয়তা ও ট্রোল:

পশিমবঙ্গের রানাঘাট রেলস্টেশনে ভবঘুরে পৌঢ়া রানু মন্ডলকে গান গাইতে দেখে এক পথচারী তার ভিডিও রেকর্ড করেন এবং ফেসবুকে আপলোড করেন। খুব জলদি তা অনেক ফেসবুক ব্যবহারকারীর কাছে পৌচ্ছে যায়। হোয়াটসাপের মাধ্যমেও ছড়িয়ে পরে এবং চারিদিকে প্রচন্ড ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। বলিউডের গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক হিমেশ রেশমিয়া রানু মন্ডলের কথা জানতে পেরে তাঁর একটি সিনেমায় গানের সুযোগ করে দেন। সেখানে গান করার পর রানু মন্ডলের ভাইরাল ছবিগুলি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্লাবিত হয় ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কিন্তু খুব শীঘ্রই, একদল মানুষের মনে হতে শুরু করে রানু মণ্ডল প্রয়োজনের অতিরক্ত প্রশংসা পেয়ে গেছেন। ফলে সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে ট্রোল শুরু হয়। মন্ডলের জন্য জনপ্রিয়তা থেকে সক্রিয় অপছন্দের রূপান্তরটিও সমানভাবে বিস্মিত করে। রানু মন্ডলের “মিম” বানিয়ে খোঁচা দিয়ে করে মজা ভাগ করে নিয়েছে এবং অবমাননাকর বা ঘৃণ্য মন্তব্য হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে যে রানু মণ্ডল এর প্রাপ্য কী হল - রাতারাতি খ্যাতিতে ওঠার পরে নির্মমভাবে তাঁর সম্মানকে নামানোর চেষ্টা হচ্ছে। এটি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া নৈতিকতা সম্পর্কে কী বলে? ট্রোলগুলি দেখভাল করার জন্য কোনও সেলিব্রিটি বা রাজনৈতিক নেতা- মন্ত্রীদের সাধারনত জনসংযোগ দল থাকেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই চিত্র এক নয়। এই ধরনের আক্রমণ খ্যাতির অবক্ষয় হিসাবে নিরাপত্তাহীনতা এবং মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে। স্পষ্টতই, সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীরা এই মাধ্যমগুলির আচরন মেনে নিয়ে সচেতন থাকা উচিৎ ও যত্ন নেওয়া উচিৎ যেন অপর ব্যাবহারকারীর সম্মান রক্ষিত হয় এবং মত প্রকাশের নৈতিক দিকগুলি প্রতিফলিত হয়।

৪.৩.৫ ইন্টারনেট স্বাধীনতা ও বর্তমান প্রবণতা

২০১৯ সালের জুন মাসে ফ্রিডম হাউস কর্তৃক প্রকাশিত “ফ্রিডম অন নেট” নামক প্রতিবেদনে ইন্টারনেটের স্বাধীনতা প্রসংগে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে, সেগুলি হল:

১। যদিও সামাজিক গনমাধ্যমগুলি অনেক সময়ই নাগরিক আলোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা করেছে, তবু তাদের ব্যাবহার বিপজ্জনক উদারপন্থার দিকে ঝুঁকছে।

২। এই প্রবণতার ফলস্বরূপ, বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের স্বাধীনতা ২০১৯ সাল পর্যন্ত টানা নয় বছর ধরে হ্রাস পেয়েছে।

৩। চীন, ইরান, সৌদি আরব এবং ক্রমবর্ধমান অন্যান্য দেশের কর্তৃপক্ষগুলি গত ২০১৭- ১৮ সালের তুলনায় ২০১৮-১৯ সালে অনলাইন পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে বিদেশী রাজনৈতিক ফলাফলগুলিকে প্রভাবিত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করেছে।

৪। ফ্রিডম হাউসের গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে সামাজিক মাধ্যমগুলিতে সরকারের স্বার্থবিরোধী মতামত দমনকারী সরকারগুলি সামাজিক মাধ্যমে নজরদারি করার সরঞ্জামগুলি অর্জন করছে এবং ঐ মাধ্যমগুলিতে অনুভূত হুমকিগুলি সনাক্ত করতে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত অভিব্যক্তি চুপ করাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নিয়োগ করে।

৫। প্রতিবেদনে মূল্যায়ন করা ৬৫ টি দেশের মধ্যে ৪৭টি দেশের নথি অনুযায়ী রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় বক্তৃতার জন্য সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৬। যদিও চীন ও রাশিয়ার মতো কর্তৃত্ববাদী শক্তি বৃহত্তর মানবাধিকার সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের সম্ভাবনাগুলিকে সীমিত রাখতে বিশাল ভূমিকা রেখেছে তবে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সামাজিক মাধ্যম মঞ্চগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্টে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং অগনতান্ত্রিক বাহিনী দ্বারা মানবাধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে মার্কিন অবহেলার কারনে।

৭। বিভিন্ন দেশের সরকার অস্থায়ীভাবে ইন্টারনেট সংযোগ বিঘ্নিত করেছে, এক ডজনেরও বেশি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ ওয়েবসাইটগুলিকে অবরুদ্ধ করেছে, এবং সক্রিয় কর্মীদের নীরব করার জন্য এবং ডিজিটাল গতিবদ্ধতা রোধ করার জন্য সামাজিক মাধ্যম মঞ্চগুলির সহজল্যতাকে সীমাবদ্ধ করেছে।

৮। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি কর্তৃক বিভিন্ন সময় অভিনেতা, সাংবাদিক, সরকারি আমলা এবং রাজনৈতিকভাবে জড়িত ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সাইবার আক্রমন হয়েছে।এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারসাজিতে তা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

৯। জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এবং প্রতিকূল তথ্যের বিস্তারকে সীমাবদ্ধ করতে, সরকার স্বাধীন সংবাদ ওয়েবসাইটগুলি অবরুদ্ধ করে, মোবাইল নেটওয়ার্ককে সীমাবদ্ধ করে, এবং সাংবাদিক এবং সাধারণ ব্যবহারকারীদের একইভাবে গ্রেপ্তার করে।

১০। কোনও কারন বশত কোনও রাষ্ট্রে নাগরিক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, কর্তৃপক্ষগুলি নাগরিক সুরক্ষা বাহিনী সহিংস পদ্ধতিতে তা দমন করার চেষ্টা করেছে এবং সেই সঙ্গে যোগাযোগকে সীমাবদ্ধ করেছে এবং সামাজিক মাধ্যমকে অবরুদ্ধ করেছে।

১১। সরকারি আধিকারিকরা ক্রমবর্ধমান সামাজিক মাধ্যম মঞ্চগুলি পর্যবেক্ষণ করে। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং সমালোচনামূলক প্রতিবেদনের মতো সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য ভ্রমণকারীদের বৈদ্যুতিন ডিভাইসের ওয়্যারলেস অনুসন্ধানও চালিয়ে থাকে।

১২। অল্প কিছু সংখ্যক দেশের কর্তৃপক্ষগুলি পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক আরোপিত জরুরি অবস্থা তুলে নিয়েছে, যা মুক্ত মত প্রকাশের ক্ষেত্রে আইনী বিধিনিষেধকে স্বাচ্ছন্দ্য দেয় এবং অনলাইন ক্রিয়াকলাপের জন্য কারাবন্দী মানুষের সংখ্যা হ্রাস করেছে। অনলাইন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে এবং ডিজিটাল নিউজ মিডিয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ থেকে বৃহত্তর স্বাধীনতা উপভোগ করেছে।

১৩। আইসল্যান্ড ইন্টারনেটের স্বাধীনতার বিশ্বের সেরা রক্ষক হয়ে উঠেছে, ২০১৮-১৯ সাল সময়কালে অনলাইনে মত প্রকাশের জন্য ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কোনও দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত করা হয়নি।

৪.৩.৬ জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি, ২০১৮

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নতুন টেলিযোগাযোগ নীতিটি এখন "জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি ২০১৮" (National Digital Communication Policy, 2018) নামে অনুমোদন করেছে এবং টেলিকম কমিশনকে 'ডিজিটাল যোগাযোগ কমিশন' হিসাবে পুনঃনির্ধারণ করেছে।

নতুন জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি -২০১৮ টেলিকম সেক্টরে আধুনিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যেমন ৫জি, (IoT) Internet of Things – M2M Machine to Machine ইত্যাদির চাহিদা পূরণে বিদ্যমান জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি -২০১২ প্রতিস্থাপন করবে।

জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি প্রয়োজন :

১। টেলিযোগাযোগ এবং সফটওয়্যার উভয় ক্ষেত্রেই ভারতের যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে। ভারত উতাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং মঞ্চ ব্যবহারের পাশাপাশি অনাবিষ্কৃত ও নিম্নস্তরের বাজারগুলিতে পৌঁছানোর সুবিধার্থে প্রস্তুত রয়েছে। প্রযুক্তিগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিকাশ, নতুন যুগের কর্মসংস্থান এবং জীবিকা নির্বাহ এবং তার নাগরিকদের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের পরিষেবাগুলিতে পৌছে দেওয়া নিশ্চিত করা।

২। সাক্ষরতা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং নগরায়ণের মতো বিভিন্ন সূচকে ভারতের জনসংখ্যার ধরন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। নীতিগুলি যে তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ বাড়ায় তা প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ। তদনুসারে, এই নীতিটির লক্ষ্যমাত্রা সর্বাধিককরণের পরিবর্তে সর্বজনীন কভারেজের জন্য।

৩। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যমগুলির দ্রুত এবং অভূতপূর্ব বিস্তার—এবং ভারত জুড়ে ডিজিটাল পেমেন্ট, ডেটা ব্যবহারের দ্রুত সম্প্রসারণ ইঙ্গিত দেয় যে একশ কোটির চেয়ে বেশী ভারতীয় জনসংখ্যার ক্ষমতায়নের জন্য তাঁদের কাছে ডেটা অর্থনীতি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং পরিষেবাগুলি আরও বেশি পরিমানে পৌছে দিতে হবে।

৪। এটি ব্যাপকভাবে অনুমান করা হয়েছে যে, দেশে ব্রডব্যান্ড অনুপ্রবেশে 10% বৃদ্ধি ঘটাতে পারলে জিডিপিতে সম্ভাব্য 1% এরও বেশি বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে। অতএব, ভারতের একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক টেলিকম বাজার তৈরি করার প্রয়োজন এবং একটি সুসংগত নীতি এবং নীতি কাঠামোর প্রয়োজন।

৫। সারা দেশে মোবাইল এবং ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রসারিত করার জন্য, ৫জি এবং উপগ্রহ যোগাযোগের মতো পরবর্তী প্রজন্মের নেটওয়ার্কগুলির দ্বারা উপস্থাপিত সুযোগগুলি অন্বেষণ এবং ব্যবহার করা প্রয়োজন।

৬। বিশ্ব যেমন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, ৫ জি, ক্লাউড, IoT এবং ডেটা অ্যানালিটিকাসহ উন্নত প্রযুক্তি গুচ্ছের রূপান্তরিত করে, ভারতকেও তেমন এই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

৭। যোগাযোগ ও ডিজিটাল অর্থনীতি খাত জুড়ে ভারতের সুষ্ঠ প্রতিযোগিতা প্রচার ও সুরক্ষা করা দরকার।

৮। ডিজিটাল ক্ষেত্রটি মূলধন- বিনিয়োগের জন্য উত্তম। সেই কারনে এর প্রকৃতি নির্ধারন, নীতিটি নিয়ামক কাঠামো এবং প্রক্রিয়াগুলির প্রাসঙ্গিক, স্বচ্ছ, জবাবদিহি প্রয়োজন এবং আগামীর বিষয়টি নিশ্চিত করে দীর্ঘমেয়াদী, উচ্চমানের এবং টেকসই বিনিয়োগকে আকর্ষণ করা।

৯। এছাড়াও, বর্তমান নীতিটি বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং ভোক্তার আগ্রহের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক বাধাগুলি হ্রাস করার লক্ষ্য নিয়েছে। নীতিটি ডিজিটাল ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এবং আইন কাঠামোকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপগুলিও চিহ্নিত করে।

জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতির বৈশিষ্ট্য :

জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি তিনটি লক্ষ্যের উল্লেখ করে : ক। সংযুক্ত ভারত (Connect India), খ। প্রোপেল ভারত (Propel India), গ। সুরক্ষিত ভারত (Secure India)।

তিনটি লক্ষ্য সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল :

ক। সংযুক্ত ভারত (Connect India) : শক্তিশালী ডিজিটাল যোগাযোগের অবকাঠামো তৈরি করা :

১। জাতীয় ব্রডব্যান্ড মিশন (রাষ্ট্রীয় ব্রডব্যান্ড প্রচার) - ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিটি নাগরিককে ৫০ এমবিপিএসে সর্বজনীন ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান।

২। ভারতনেট- ২০২০ সালের মধ্যে ভারতের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ১ জিবিপিএস এবং ২০২২ সালের মধ্যে দশটি জিবিপিএস সংযোগ প্রদান।

৩। গ্রামনেট — ১০ এমবিপিএস আপগ্রেডযোগ্য ১০০ এমবিপিএসের সাথে সমস্ত মূল গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থাকে সংযুক্ত করা।

৪। নগরনেট - শহরাঞ্চলে ১ মিলিয়ন জন- ওয়াই-ফাই হটস্পট স্থাপন করা।

৫। ওয়াই-ফাই - গ্রামীণ অঞ্চলে ২ মিলিয়ন ওয়াই-ফাই হটস্পট স্থাপন।

৬। ২০২২ সালের মধ্যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সমস্ত মূল উন্নয়ন সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী ১০০ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড প্রদান।

৭। সর্বাগ্র -ফাইবার উদ্যোগ : ঘরে ঘরে, গ্রামীন উদ্যোগগুলিতে এবং মূল উন্নয়ন সংস্থাগুলিতে ফাইবার সংযোগের মাধ্যমে উন্নতিসাধন।

৮। জাতীয় ফাইবার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি জাতীয় ডিজিটাল গ্রিড প্রতিষ্ঠা।

৯। স্পেকট্রামের নীতি পর্যালোচনা করে, নতুন স্পেকট্রাম ব্যান্ড তৈরি করা, নিয়োগ ও বরাদ্দের প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলিকে সহজতরকরণ, উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত ছাড়পত্র এবং অনুমতি ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতে স্যাটেলাইট যোগাযোগ প্রযুক্তি জোরদার করা।

১০। গ্রাহক সন্তুষ্টি, পরিষেবার গুণমান এবং কার্যকর অভিযোগ নিরসন নিশ্চিতকরণ টেলিকম ওম্বডসম্যান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, পরিবেশ ও সুরক্ষা মান গ্রহণের জন্য একটি বিস্তৃত নীতিমালা প্রণয়ন এবং যোগাযোগ খাতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রযুক্তির ব্যবহারকে উদ্বুদ্ধকরণ।

খ। চালিকা ভারত (Propel India) : বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং IPR প্রজন্মের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি ও পরিষেবাদি প্রদানে সক্ষম করা।

১। ডিজিটাল কমিউনিকেশনস সেক্টরে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণ করা, IoTকে ৫ বিলিয়ন সংযুক্ত ডিভাইসে প্রসারিত করা, ২০২২ সালের মধ্যে প্রযুক্তিকে ৪.০-তে রূপান্তরিত করা।

২। ডিজিটাল যোগাযোগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবনকারী স্টার্ট-আপগুলি তৈরি করা।

৩। ভারতে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত বৌদ্ধিক সম্পদ অধিকার (Intellectual Property Right) তৈরি করা।

৪। ডিজিটাল যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড এসেনশিয়াল পেটেন্টস (এসইপি) এর বিকাশ।

৫। নতুন যুগের দক্ষতা তৈরির জন্য প্রশিক্ষন।

গ। সুরক্ষিত ভারত (Secure India) : সার্বভৌমত্ব, সুরক্ষা এবং ডিজিটাল যোগাযোগের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

১। ডিজিটাল যোগাযোগের জন্য একটি বিস্তৃত ডেটা সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা গোপনীয়তা, স্বায়ত্তশাসন এবং ব্যক্তিদের নিজেস্ব পছন্দকে রক্ষা করবে এবং বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল অর্থনীতিতে ভারতের কার্যকর অংশগ্রহণকে সহায়তা করবে।

২। ইন্টারনেট নিরপেক্ষতা নীতিগুলি পরিষেবা প্রয়োজনীয়তা, ব্যান্ডউইথ প্রাপ্যতা এবং পরবর্তী প্রজন্মের অ্যাক্সেস প্রযুক্তি সহ নেটওয়ার্কের ক্ষমতাগুলির সাথে সংযুক্তকরণ নিশ্চিত করা।

৩। শক্তিশালী ডিজিটাল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সুরক্ষা ফ্রেমওয়ার্কগুলি বিকাশ এবং স্থাপন করা।

৪। সুরক্ষা পরীক্ষার জন্য ক্ষমতা তৈরি এবং যথাযথ সুরক্ষা মান স্থাপন করা।

৫। এনক্রিপশন এবং সুরক্ষা ছাড়পত্র সম্পর্কিত সুরক্ষা - সমস্যাগুলি সমাধান করা।

৬। নাগরিকদের সুরক্ষিত ও সুরক্ষিত ডিজিটাল যোগাযোগের অবকাঠামো এবং পরিষেবাদির আশ্বাস দেওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জবাবদিহি জোরদার করা।

৪.৩.৭ সারাংশ

ইন্টারনেটের ব্যবহার তথ্যের আদান প্রদানকে সহজসাধ্য করেছে, এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। জুলিয়ান আসাঞ্জের দ্বারা তথ্য ফাঁস করার ঘটনা গোটা দুনিয়াকে অবাক করে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে আমেরিকার মতো শক্তিধর দেশের তথ্য সুরক্ষা প্রযুক্তি নিয়েও। আবার অন্যদিকে দেখলে দেখা যায় যে 'শক্তিধর রাষ্ট্র যে সবসময় গণতান্ত্রিক পথেই সব কাজ করে' — সেই ধারণাটি ভুলও হতে পারে। সেদিক থেকে অনেকে মনে করেন যে সাধারণ নিরপরাধ মানুষের পাশে আসাঞ্জের মতন মানুষেরও দরকার রয়েছে।

ইন্টারনেট একদিকে যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে তেমনই স্বাধীনতার নামে হিংসা ছড়ানোর বড় মাধ্যম হবেও কাজ করে ইন্টারনেট। ভারত — পাকিস্তান বিরোধী হিংসা ফেসবুক ও টুইটারের নিত্য ঘটনা। পূর্বে রাজনৈতিক কার্টুন প্রকাশ পেতো সংবাদপত্রে,যারা প্রকাশ করতেন তাঁরা সংবাদ জগতের সঙ্গে জড়িত থাকতেন। কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে সাধারণ ব্যাক্তিই মানহানি বা অন্যান্য আইনগুলি না যেনেই বিভিন্ন রাজনৈতিক 'মিম' তৈরি করছেন, এবং বিপদে

পড়ছেন। নরেন্দ্র মোদী, রাহুল গান্ধী, কেজরিওয়াল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেউই বাদ যাচ্ছেন না ইন্টারনেট ট্রোল থেকে। সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'ফেক নিউজ' এর মতন মারাত্মক ঘটনাগুলিও। ফলে গোটা বিশ্বজুড়েই সাইবার সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভারতও তার থেকে বাদ নয়। অনলাইন টাকার আদান প্রদান থেকে শুরু করে তথ্যের আদান প্রদান সব ক্ষেত্রেই নতুন নীতির প্রয়োজন পরেছে।

৪.৩.৮ অনুশীলনী

১। জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ কে? উইকিলিকসের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক?

২। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র স্বার্থ কিভাবে পরস্পর বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়? উদাহরন সহ ব্যাখ্যা করুন।

৩। "ডিজিটাল মাধ্যম ব্যাক্তির গোপন ঈর্ষা চরিতার্থ করার বিপজ্জনক স্বাধীনতা দেয়" — মন্তব্যটির যথার্থ ব্যাখা করুন।

৪। ব্যক্তিগত ট্রোলিং এবং ডিজিটাল ট্রোলিং এর পার্থক্য কী?

৫। "ডিজিটাল মাধ্যম ব্যাক্তিকে মত প্রকাশে স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু তা আদপে নির্ভর করে রাষ্টের ওপর"- ব্যাখা করুন।

৬। "জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি" উদ্দেশ্য গুলি কি? এই নীতির প্রয়োজনীয়তা কেন?

৭। ট্রোলিং কি?

৮। সাইবার বুলিং কি?

৯। ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে "সুরক্ষিত ভারত" এর ধারণা টি কী?

৪.৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. Int. J. Web Based Communities– Vol. 10– No. 1– 2014

২. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)– 2015– Vol 2– No. 7– 49-54

৩. 2015 DOI- 10.1089/cyber.2014.0670 Source- PubMed

৪. http://www.rug/nl.research/portal.

৫. https://www.freedomonthenet.org

৬. höttp-//dot.gov.in/sites/default/files/EnglishPolicy

Notes

Notes

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

SELF LEARNING MATERIAL

POST GRADUATE DEGREE PROGRAMME

PGJM 2

MA IN JOURNALISM & MASS COMMUNICATION

PGJM-2A MEDIA LAW & ETHICS

PGJM-2B PRINT JOURNALISM

A & B

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হয়ে চলেছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার সুবিধা পেয়ে যাবেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : মে, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau
of the University Grants Commission.

PGJM

M.A. in Journalism & Mass Communication (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

PGJM - Paper IIB : মুদ্রণ সাংবাদিকতা (Print Journalism)

মডিউল ১	রচনা (Content Writer)	সম্পাদনা (Editor)
একক ১	**ড. সৌমেন মুখার্জি**	**ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য** অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ) মানববিদ্যা অনুষদ
একক ২	**ড. সান্ত্বন চট্টোপাধ্যায়,** প্রফেসর ও প্রধান, অ্যাডাল্ট এ্যান্ড কনটিনিউং এডুকেশন এ্যান্ড এক্সটেনশন বিভাগ, কোঅর্ডিনেটর গণজ্ঞাপন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	
একক ৩,৪	**অনিন্দ সিনহা চৌধুরী,** সিনিয়র সাব-এডিটর, সংবাদ প্রতিদিন	
মডিউল ২ একক ১	**ড. সৌমেন মুখার্জি**	
একক ২	**ড: সান্ত্বন চট্টোপাধ্যায়, অরিজিৎ ঘোষ, যজ্ঞেশ্বর দাস**	
একক ৩,৪	**ড. সান্ত্বন চট্টোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর দাস**	
মডিউল ৩	**ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য,** অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ), মানববিদ্যা অনুষদ	
মডিউল ৪		
একক ১	**ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য**	
একক ২,৩	**ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য**	
একক ৪	**অনিন্দ সিন্‌হা চৌধুরী, মিহির গঙ্গোপাধ্যায়**	

বিন্যাস ও প্রুফ-পরিমার্জনা : অরিজিৎ ঘোষ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত

নিবন্ধক

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
স্নাতকোত্তর বিষয় সমিতি (PG Board of Studies)

অধ্যাপক শাশ্বতী গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক, গণজ্ঞাপন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

স্নেহাশিস সুর, প্রবীণ সাংবাদিক, দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা

ড. দেবজ্যোতি চন্দ, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, গণজ্ঞাপন ও ভিডিওগ্রাফি বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ড. পল্লব মুখোপাধ্যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অরিজিৎ ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, ডিরেক্টর, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

PGJM

দ্বিতীয় পত্র ঃ দ্বিতীয় পর্যায়-IIB

দ্বিতীয় পত্র -IIB : মুদ্রণ সাংবাদিকতা (Print Journalism)

মডিউল ১ : সংবাদ প্রতিবেদন

একক ১ ☐ সংবাদ ধারণা 9-30

একক ২ ☐ ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন, তদন্তমূলক প্রতিবেদন-সংবাদপত্র / সংবাদ সংস্থায় প্রতিবেদন লেখার নিয়ম ও পার্থক্য 31-41

একক ৩ ☐ সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে রিপোর্টিং বিভাগ-রিপোর্টার, চিফ রিপোর্টার এবং চিফ অফ নিউজ ব্যুরোর কার্যকারিতা এবং গুণাবলী 42-54

একক ৪ ☐ সংবাদ সূত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব 55-61

মডিউল ২ : বিশেষায়িত প্রতিবেদন

একক ১ ☐ সংবাদের শ্রেণিবিন্যাস 62-73

একক ২ ☐ ফিচার, সাক্ষাৎকার : প্রকার ও কৌশল, সম্পাদকীয়, অপ-এড পৃষ্ঠা, ক্রোড়পত্র 74-86

একক ৩ ☐ সমালোচনা : সঙ্গীত, পুস্তক, সিনেমা, নাটক, শিল্প প্রদর্শনী-ম্যাগাজিনে রিপোর্টিং 87-98

একক ৪ ☐ চিত্র সাংবাদিকতা 99-106

মডিউল ৩ : সম্পাদনা

একক ১ ☐ সম্পাদকীয় নীতি-বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন শৈলীর ব্যবহার-সম্পাদনায় ব্যবহৃত শব্দবন্ধ বৈদ্যুতিন মাধ্যম সম্পদনা-দৈনিক সংবাদপত্র, রবিবারের সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র -পার্থক্যসমূহ-১ শৈলী, ২) আঙ্গিক, ৩) প্রেক্ষা, ৪) পন্থা 107-118

একক ২ ☐ সম্পাদকের সমস্যা : পক্ষপাত (bias), slants, চাপসমূহ (pressures) 119-122

একক ৩ ☐ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় সংগঠন 123-130

একক ৪ ☐ সংবাদ প্রবাহ এবং সম্পাদনা : দ্বারক্ষীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব 131-134

মডিউল ৪ : সম্পাদনা প্রক্রিয়া

একক ১ ☐	সংবাদ নির্বাচন : সংবাদ মান এবং অন্যান্য পরিমিতি	135-138
একক ২ ☐	সংবাদ কপি সম্পাদনা, সংবাদ রচনা (পরিকল্পনা এবং দৃশ্যায়ন)	139-143
একক ৩ ☐	শিরোনাম ও ইন্ট্রো	144-151
একক ৪ ☐	ম্যাগাজিন/সাময়িকী সম্পাদনা	152-156

দ্বিতীয় পত্র : দ্বিতীয় পর্যায়

পেপার - **IIB**

PGJM

মুদ্রণ সাংবাদিকতা

II B : Print Journalism

মডিউল ১ : সংবাদ প্রতিবেদন

একক ১ ❑ সংবাদ ধারণা

১.১.০ গঠন
১.১.১ উদ্দেশ্য
১.১.২ প্রস্তাবনা
১.১.৩ সংবাদ
১.১.৩.১ সংবাদের সংজ্ঞা
১.১.৩.২ সংবাদের উৎস
১.১.৩.৩ সংবাদের সূত্র
১.১.৪ সংবাদের রচনাশৈলী ও উপস্থাপনা
১.১.৪.১ সূচনা বা ইনট্রো লেখার নিয়ম
১.১.৫ সারাংশ
১.১.৬ অনুশীলনী
১.১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে সংবাদ কী ও প্রতিবেদন বা রিপোর্টিং কাকে বলে এবং সংবাদের রচনাশৈলী বা পদ্ধতিই বা কেমন হবে সে সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার একটি ধারণা হবে।

১.১.২ প্রস্তাবনা

এই একক পাঠে কীভাবে মানুষের ভাবের আদানপ্রদানের শুরু থেকেই সংবাদ লেনদেন প্রচলিত হতে থাকে এবং গণমাধ্যমের যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে সংবাদ প্রচার ও পরিবেশনের ধারার কিভাবে বিবর্তন ও পরিবর্তন হয়, সংবাদের উপাদানই বা কী, এর উৎসই বা কী, কত রকম এর প্রকারভেদ, গরম খবর আর নরম খবরের কী পার্থক্য, সংবাদের রচনাশৈলী ও উপস্থাপনার ছক্ কেমন হবে, কিভাবে সংবাদের সূচনা লিখতে হয় যাতে নির্দিষ্ট সংবাদ-সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্নের (কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে) উত্তর সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে আপনার যে ধারণা তৈরি হবে তার সাহায্যে আপনি সংবাদ মাধ্যমে, বিশেষত সংবাদপত্রে, নিজের ভাষায় প্রতিবেদন লিখতে সক্ষম হবেন।

১.১.৩ সংবাদ

সংবাদ কী সে সম্পর্কে প্রত্যেকেরই মোটামুটি একটা ধারণা আছে। লোকসমাজে এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির দেখা হলে প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে—কী খবর, কেমন আছেন, অমুক কেমন আছেন, ছেলেমেয়েরা কে কী করছে? সামাজিক যোগাযোগই তো মূলত সংবাদ লেনদেন। তাছাড়া এই যুগটাই তথ্যের যুগ। তথ্য আদানপ্রদানের যুগ।

যে ব্যক্তি, যে গোষ্ঠী বা যে দেশের তথ্যের ভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ সে তত বেশি শক্তিশালী। অর্থাৎ তথ্যই ক্ষমতা। এই তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের রেওয়াজ চিরাগত। এই কাজ যাঁরা করেন তাঁরা সাংবাদিক, আর যে পেশার মাধ্যমে সংবাদ জনসাধারণের কাছে পরিবেশিত হয় সে পেশার নাম সাংবাদিকতা।

সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ বা পরিবেশনের বিষয়টি আদিযুগ থেকে চলে আসছে। রামায়ণের দুর্মুখ বস্তুতপক্ষে রামচন্দ্রের সংবাদ সংগ্রাহকের কাজই করেছেন। আর মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-সংবাদ সঞ্জয় যেভাবে বিবৃত করেছেন তা নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগের সময়-সাংবাদিকদের সঙ্গে তুলনীয়। পুরাকালে রাজা বাদশাদের নিযুক্ত গুপ্তদূত বা চরদের বৃত্তিই ছিল গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করা। একালেও বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থায় গুপ্তবার্তা দফতর বা গোয়েন্দা বিভাগের কাজ কী সে বিষয়ে মোটামুটি সকলেই অবহিত আছেন। আঠার শতকের শেষ বা উনিশ শতকের গোড়ায় 'নিউজ রাইটার' বা সংবাদ লেখকের প্রধান কাজই ছিল সরকারি সংবাদ সংগ্রহ করে নথিবদ্ধ করা। সতের দশকের প্রথম দিকে বিত্তবান ইউরোপীয়দের নিজস্ব সংবাদলেখক নিয়োগ করার কথা শোনা যায়। রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে এই সংবাদ লেখকরা সামাজিক মর্যাদা লাভ করেন। ভারতবর্ষে মুখল আমলে যাঁরা ছিলেন ওয়াকিয়া-নবিস প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন সংবাদলেখক। চাণক্য বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে 'গূঢ়পুরুষদের' উল্লেখ আছে তাঁদের কাজও সাংবাদিকতা ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। বিভিন্ন যুগে রাজদরবারে যাঁদেরকে বার্তাবহ বা ঘোষক হিসাবে নিয়োগ করা হত তাঁরাও ছিলেন মূলত সাংবাদিক।

লোকপরম্পরাগত কাহিনী, প্রবচন, কিংবদন্তী, প্রবাদ, জনশ্রুতি সবই মানুষের নিজের জানার ও অপরকে জানানোর আগ্রহ বা কৌতুহলের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আর, এই জানা ও জানানোর উপায় ও পদ্ধতিরও সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় রূপান্তর হয়েছে। সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ বা পরিবেশন শতসহস্র বছরের সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হতে হতেই পেশাগত সাংবাদিকতার উদ্ভব। অন্যান্য পেশার মতো এই পেশাও নানা ঘাত-প্রতিঘাত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে আজ এক ঈর্ষণীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। আর এই পেশায় নিযুক্ত সাংবাদিকরাও আজ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

সমগ্র বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে বিপ্লব এসেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও সাংবাদিকতার রীতিনীতি ও গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমগুলিতে অর্থাৎ সংবাদপত্র রেডিও ও টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশনের আদব কায়দা। আর সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে প্রতিযোগিতা। পেশা এবং ব্যবসা হিসাবে সাংবাদিকতার ধারা ও প্রকৃতি এবং প্রতিযোগী সংবাদ মাধ্যমগুলির সংবাদ পরিবেশনের প্রণালীও প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে। সময়োপযোগী হওয়ার জন্যই এই পরিবর্তনের প্রয়োজন। আর তা ছাড়া, প্রতিযোগিতার বৃত্তটাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখন যুক্ত হয়েছে কমপিউটার-নির্ভর ইনফরমেশন সিস্টেম বা তথ্য পরিবেশন ব্যবস্থা স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বা উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সঞ্চারণ, ইত্যাদি। সাংবাদিকতার আদর্শ ও নীতি বজায় রেখে, এবং এই কঠিন প্রতিযোগিতার পরিবেশে থেকে, সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকদের যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন খুবই দুরূহ। এই দুরূহ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনই সাংবাদিক, সাংবাদিকতা ও সংবাদ মাধ্যমের এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জোরেই সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যম সামাজিক দায়িত্বের অংশীদার। জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সঠিক তথ্য ও নির্ভুল সংবাদ ঠিকমতো পরিবেশন করা এবং একই সঙ্গে জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করা এই সামাজিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের

ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সফল গণতন্ত্র সৎ সাংবাদিকতার ওপরই নির্ভর করে। কারণ, গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে জনমত আর জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব ও কর্তব্য। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও অন্যায়ের সঙ্গে আপস ইত্যাদি সংবাদের মাধ্যমেই জনগণ জানতে পারেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের অভাব বা অবক্ষয়, অর্থনৈতিক অবনতি, বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতার অভাব, সুসংস্কৃতি বা কিছু কিছু বিষয়ে অন্ধবিশ্বাসের মতো সামাজিক অভিশাপ, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যচেতনা ও প্রয়োজনীয় পরিষেবার অপ্রতুলতা— সব কিছু বিষয় সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন ও অবহিত করতে পারে সংবাদ মাধ্যম।

সংবাদ মাধ্যমই আবার পারে জনসাধারণকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে। কৃষি ও শিল্পের অবস্থা; সমকালীন সাহিত্য, কারুশিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারা; কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার পাশাপাশি নবতর বিনোদনের আবির্ভাব সবকিছু সম্পর্কেই লোকসমাজকে অবহিত করে সংবাদ মাধ্যম। নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সংবাদ মাধ্যমগুলির মধ্যে থাকলেও সংবাদ মাধ্যম একদিকে সমাজের দর্পণস্বরূপ আর অন্যদিকে সমাজের শিক্ষক।

১.১.৩.১ সংবাদের সংজ্ঞা:

সংবাদের সংজ্ঞা কী? কী তার অর্থ? সংবাদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কী?

আজকের দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিদিত পণ্যগুলির অন্যতম হচ্ছে সংবাদ। প্রতিটি মানুষই কোনও না কোনও একটি ভাষা জানেন এবং গণমাধ্যমে তাঁর প্রবেশ বা অভিগমন অবারিত। গণমাধ্যমের যুগ শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই সংবাদ সম্পর্কিত ধারণা মানুষের মনে ছিল। আদিম সমাজব্যবস্থাতেও গ্রামে গ্রামান্তরে সাপ্তাহিক হাটে বা হাটবারে যখন পণ্য বেচাকেনার জন্য লোকজনেরা মিলিত হতেন তখন তাঁদের মধ্যে স্থানীয় খবরেরও লেনদেন হত। আবার, সাধারণ মানুষকে কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ঢোল-শোহরতের প্রচলন বহুযুগ আগেই ছিল। চলতি কথায় এই ব্যবস্থাটিকেই ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জারি করা বলা হয়। মোটামুটি ভাবের আদানপ্রদানের শুরু থেকেই খবরের আদানপ্রদান চলছে।

কিন্তু খবর বা সংবাদ কাকে বলে? তার সংজ্ঞাটা কী? সংবাদের সংজ্ঞা সংবাদ নিজেই, অথবা সংবাদ হল সংবাদ। যখন যে ধরনের সংবাদ প্রচারিত বা পরিবেশিত হচ্ছে তখন সেই ধরনটিই সেই সংবাদের সংজ্ঞা। সংবাদের কোনও সাধারণ বা সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। প্রতিনিয়তই সংবাদের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হচ্ছে। এবং একইভাবে তার সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে। এই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত সংজ্ঞার কোনটিই কিন্তু ভুল নয়। কারণ, সংবাদের চেহারা বা চরিত্র বদলেই চলেছে। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলির যে বিবরণ কোনও না কোনও পদ্ধতিতে পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের কাছে পৌঁছে যায় তাই সংবাদ। বিষয়ের এবং পাঠকের বৈচিত্র্যভেদে সংবাদের সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রতিটি সংজ্ঞারই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সংবাদটি সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ বা কৌতূহল থাকা চাই এবং সংবাদটির বিষয়বস্তু নতুন হওয়া চাই। যা আগে সংবাদ হিসাবে অন্য কোনভাবে প্রচারিত বা প্রকাশিত হয়েছে তা আর নতুন করে সংবাদ গৃহীত বা গ্রাহ্য হবে না; আর মানুষের তাতে কোনও আগ্রহও নেই।

একটা কথা প্রচলিত আছে যে, কুকুর যখন মানুষকে কামড়ায় তখন সেটা কোনও সংবাদ নয়। মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা সংবাদ। কোনও সুনির্দিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা না থাকলেও সংবাদের একাধিক সংজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া

যায়। এই সংজ্ঞাগুলি নির্ধারণ করেছেন সাংবাদিক বা সংবাদ বিশেষজ্ঞরাই। অথবা এ বিষয়ে যাঁদের পারদর্শিতা কেবলমাত্র কেতাবি বা পুঁথিগত। এখন দেখা যাক কী ধরনের সংজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতিটি সংজ্ঞারই গুণাগুণ যাচাই করে নিতে হবে। এবং কেবলমাত্র গুণগুলিই মাথায় রাখতে হবে।

১। যে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট সময়োপযোগী এবং বেশ কিছু লোকের তাতে আগ্রহ আছে তাই সংবাদ।

২। গতকালের দুনিয়া ও আজকের দুনিয়ার মধ্যে যে প্রভেদ সেটাই হচ্ছে সংবাদ।

৩। একজন সুদক্ষ প্রতিবেদক যে তথ্য সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট হন ও প্রকাশ করেন এবং তাতে যদি পাঠকের আগ্রহ থাকে তাই সংবাদ।

৪। যথার্থ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন সম্পাদক সংবাদপত্রে বা সংবাদ মাধ্যমে যা প্রকাশ করেন তাই সংবাদ।

৫। যে তথ্য পাঠ বা শ্রবণ করে পাঠক বা শ্রোতা/দর্শক সন্তুষ্ট হয় বা উৎসাহিত হয় তাই সংবাদ।

৬। যা চমকপ্রদ বা অভাবনীয় ঘটনা তাই সংবাদ।

৭। জনসাধারণ + ঘটনাবলী + পাঠক বা শ্রোতা-স্বার্থবাহী উপাদান = সংবাদ।

৮। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বা কাহিনীর প্রতিবেদন বা বিবররণ যা একজনের কাছে নতুন তথ্য বলে মনে হল তাই সংবাদ।

৯। ঘটনা বা মতামত, যার সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ আছে বা যা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত তাই সংবাদ।

১০। কারও মতে সঙ্গীত, সুরা ও রমণী হচ্ছে সংবাদের উৎস।

১১। সংবাদ হচ্ছে রমণী, মুদ্রা ও অপরাধের সমান।

১২। সংবাদ বা ইংরাজিতে যাকে বলে নিউজ (NEWS) তা হল North, East, West South (উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ) অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে সংগৃহীত তথ্য। অর্থাৎ চারিদিকে যা ঘটে চলেছে তাই সংবাদ।

১৩। সেটাই সংবাদ যেটা কেউ গোপন রাখতে চাইছে; বাকি সবই তো হয় বিজ্ঞাপন, নয় প্রচার।

১৪। জীবন ও জাগতিক বিষয়ের সবরকম বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে যা যা মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করে তাই সংবাদ।

১৫। যা কিছু নতুন তাই সংবাদ।

১৬। যা কিছু স্বাভাবিকতা থেকে ব্যতিক্রম তাই সংবাদ।

১৭। সংবাদ হচ্ছে সমসাময়িক ঘটনা, মতামত, চিন্তাভাবনা যা জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশকে প্রভাবিত করে বা সেই অংশের মনে আগ্রহ জাগায়।

১৮। বিশেষ বিষয় সম্পর্কে প্রকাশিত যে কোনও নতুন তথ্য সেই বিষয়ে আগ্রহী মানুষের কাছে সংবাদ।

১৯। ধর্ম, আভিজাত্য, দারিদ্র্য, অর্থ, যৌনতা ও রহস্যই হচ্ছে সংবাদ।

২০। সংবাদপত্র যা প্রকাশ করে বা রেডিও এবং টেলিভিশন যা প্রচার করে তাই সংবাদ।

সংবাদের সংজ্ঞা, তার অর্থ বা সংবাদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কী তা মোটামুটি পরিষ্কার। একটা কথা কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে কোন ঘটনা বা কাহিনী বা তথ্য যতই গুরুত্বপূর্ণ, অর্থবহ ও কৌতূহলোদ্দীপক হোক না

কেন, যতক্ষণ তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বা রেডিও/টেলিভিশনে প্রচারিত না হচ্ছে ততক্ষণ সেটা সংবাদ নয়। আর, সংবাদ মাধ্যমে সেটাই পরিবেশিত হয় যেটা সেই মাধ্যমের কর্তাব্যক্তিরা সংবাদ হিসাবে বিবেচনা করেন এবং তা প্রকাশ বা প্রচারের জন্য অনুমোদন করেন। এই কর্তাব্যক্তিরা হচ্ছেন : সম্পাদক, প্রযোজক, 'কপি'-পরীক্ষক, যে সব সাংবাদিকরা সংবাদ বাছাই বাতিল ও পুনর্বিন্যাস করেন। এঁরাই হলেন সংবাদ মাধ্যমের দ্বাররক্ষী বা 'গেটকীপার'। এঁদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং একই সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতা/দর্শকের স্বার্থ।

সুতরাং এই দুদিকের স্বার্থ বজায় রেখে সাংবাদিককে ঠিক করতে হবে 'সংবাদ কী'? একই সঙ্গে সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে তাঁর সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে। একজন বিচক্ষণ সাংবাদিককে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। (১) পাঠক বা শ্রোতা/দর্শক কী চান বা কিসে তাঁদের আগ্রহ। এবং (২) পাঠক বা শ্রোতা/দর্শককে একজন সাংবাদিকের কী দেওয়া উচিত বা কী জানানো উচিত।

সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ব বলতে কী বোঝায়? (১) অর্থপূর্ণ ও সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, (২) সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও তাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র তুলে ধরা, (৩) মানুষের মতামত, ধ্যানধারণা, নানা বিষয়ে ভাষ্য ইত্যাদি বিনিময়ের ক্ষেত্র হিসাবে মাধ্যমকে গড়ে তোলা, (৪) সমাজের লক্ষ্য কী, মূল্যবোধ কী তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা, (৫) দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও তথ্য বিষয়ে মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, (৬) বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের চেতনা বৃদ্ধি করা, এবং (৭) জনগণের শিক্ষক হিসাবে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমেই মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা ও সাক্ষরতা প্রসারে প্রেরণা দেওয়া সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের সামাজিক দায়িত্ব। তাহলে, সাংবাদিকের কাজ হচ্ছে এমন সব সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করা যাতে মাধ্যমের সামাজিক দায়িত্ব। তাহলে, সাংবাদিকের কাজ হচ্ছে এমন সব সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করা যাতে মাধ্যমের ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়, পাঠক বা শ্রোতা/দর্শকরা সেই সংবাদ সম্পর্কে আগ্রহী হন এবং সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্বও পালিত হয়। আবার, একই সঙ্গে সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে যে তাঁর পরিবেশিত সংবাদ যেন সত্যনিষ্ঠ হয় এবং কোনরকম একদেশদর্শিতা বা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট না হয়।

১.১.৩.২ সংবাদের উৎস

এই সংবাদ কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করা হয়? বা, এই সংবাদের উৎস কী? বহতা নদীর মতো সংবাদ বা ঘটনাপ্রবাহের যে অংশটুকু সংবাদ হিসাবে বিবেচিত ও নির্বাচিত হয় তারও একটা উৎস আছে। সংবাদের এই উৎস প্রকটও হতে পারে, অদৃশ্যও হতে পারে। জনসভায় কোন বক্তৃতা, বিধানসভা বা সংসদে কোনও ঘোষণা, বার্ষিক বাজেট-বিবরণে কোনও বিষয়ে উল্লেখ, সরকার বা কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও ঘোষণা ইত্যাদি প্রকট বা প্রকাশ্য উৎস থেকে সংবাদ সংগৃহীত হয়। গোপন বা অদৃশ্য উৎস, যেমন কোনও ওয়াকিবহাল ব্যক্তি নিজের নাম গোপন রেখে কোনও তথ্য সাংবাদিককে জানালেন, এর থেকেও অনেক ভালো ভালো, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আবহিত হয়। এই অদৃশ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সংবাদ লেখার সময়, 'নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়' বলে সাংবাদিকরা উল্লেখ করেন। সংবাদের এই সব গোপন উৎস সম্পর্কে সাংবাদিকদের পূর্ণ আস্থা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের দেওয়া তথ্য কখনোই সংবাদ হিসেবে পরিবেশন করা উচিত নয়। বিচক্ষণ সাংবাদিকরা সে কথা জানেন এবং এই ধরনের কোনও সংবাদসূত্র কেনইবা কোনও তথ্য সংবাদ হিসেবে প্রচারের ব্যাপারে উৎসুক, তাঁর কী স্বার্থ, সাংবাদিককে অভিজ্ঞতার আলোকে তাও যাচাই করে নিতে হয়। এই বিষয়ে সচেতন না হলে সাংবাদিক বিপদে পড়তে পারেন, তাঁর সংবাদ মাধ্যম ক্ষতিগ্রস্ত

হতে পারে এবং পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। সুতরাং সংবাদের সত্যতা ও উৎসের উদ্দেশ্য যাচাই করার জন্য সাংবাদিকদের খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই একটু সন্দেহবাদী হতেই হয়। সাংবাদিকতার স্বার্থে সেটাই কাম্য।

১.১.৩.৩ সংবাদের সূত্র

নির্দিষ্ট কোন উৎস থেকেই যে সব সংবাদ জানা যায় তা কিন্তু নয়। নানা ধরনের সংবাদের জন্য নির্ভর করতে হয় নানারকম উৎসের ওপর। সাধারণত, কোনও বিশেষ কারণ না থাকলে, কোনও উৎস থেকে সংবাদটি সংগৃহীত প্রকাশিত সংবাদে তার উল্লেখ থাকাটা বাঞ্ছনীয়। সরকারি ও পদাধিকারবলে যোগ্য সূত্র থেকে সংগৃহীত সংবাদ নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য ও সংখ্যায়ও অনেক বেশি। এইসব সংবাদ-উৎসকে 'সবল' উৎস বলে বিবেচনা করা হয়। সরকারি বিজ্ঞপ্তি বা বিবরণ, যা সাধারণত প্রেস রিলিজ বা ব্রিফিং হিসাবে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়, 'সবল' উৎস হিসাবেই গণ্য হয়। সরকারি 'মুখপাত্র' জানান বলে যে সংবাদ পরিবেশিত হয় তাও একই পর্যায়ভুক্ত। কোনও সরকারি নীতি বা প্রকল্প বা কর্মসূচি ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী/মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যরা বা বিভাগীয় সচিবরা সব সময়ই 'সবল' উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। অনেক সময় 'সরকারি সূত্র' বা 'প্রামাণিক সূত্র' জাতীয় অভিব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলিকেও মোটামুটি 'সবল' সূত্র বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু ততটা সবল নয়।

কিন্তু 'নির্ভরযোগ্য সূত্র', 'জানা গেছে', 'বিশ্বস্ত সূত্র', 'রাজনৈতিক মহল থেকে শোনা', 'পর্যবেক্ষকদের মতে' ইত্যাদি অভিব্যক্তি বা প্রকাশভঙ্গি 'দুর্বল' সংবাদসূত্রের ইঙ্গিতবাহী। সংবাদসূত্র আবার সরকারি ও বেসরকারি দুরকমই হয়। বিধান-সংক্রান্ত, নির্বাহী ও বিচার-সংক্রান্ত বা 'লেজিসলেটিভ', 'এগজিকিউটিভ' ও 'জুডিসিয়ারি' এবং বিভিন্ন সরকার-সংলগ্ন বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ হচ্ছে সরকারি সূত্র। আর, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং নানাধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা হচ্ছেন বেসরকারী উৎস।

সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ বা প্রচারের জন্য সক্রিয়ভাবে যাঁরা সংবাদ সংগ্রহ করেন তাঁরা হলেন রিপোর্টার বা প্রতিবেদক, নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশেষ সংবাদদাতা, জেলা সংবাদদাতা, বিদেশ সংবাদদাতা ইত্যাদি বা ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন, খেলাধূলা, রাজনীতি, কূটনীতি ইত্যাদি বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত সংবাদদাতা। সাধারণত দৈনন্দিন ঘটনা, দুর্ঘটনা ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করার প্রতিবেদক বা সংবাদদাতারা থানায়, দমকল, হাসপাতাল/অ্যাম্বুলেন্স, আদালত, বিমানবন্দর, বন্দর, খেলার জগৎ, বণিকসভা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন সরকারী দফতর, পুরসভা, পরিবেশ দফতর, আবহাওয়া দফতর ইত্যাদি জায়গায় নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। এটা নিঃসন্দেহে সাংবাদিকদের নিত্যদিনের কাজ। আর, এই সমস্ত যোগাযোগের কেন্দ্র ও সেখানকার অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সংবাদের উৎস বলে বিবেচিত।

এতো সব সত্ত্বেও সংবাদপত্রের প্রধান সংবাদ-উৎস হচ্ছে সংবাদ সংস্থা বা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ইংরাজিতে যাকে বলে নিউজ এজেন্সি। প্রকাশিত সংবাদে এই সব সংবাদ সংস্থাকে সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাদের নাম সংবাদে উল্লেখ করা হয়। তাই পাঠকরা পি টি আই, ইউ এন আই, রয়টারস, এ পি, এ এফ পি, তাস ইত্যাদি সংবাদ সংস্থার নামের সঙ্গে পরিচিত। পূর্বে তার বা টেলিপ্রিন্টার যোগে বর্তমানে, কম্পিউটারের মাধ্যমে দূর দূরান্তে নিযুক্ত সংবাদিকদের সংগৃহীত সংবাদ বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা দেশে-বিদেশে নানা সংবাদপত্র/সংবাদ মাধ্যমকে পাঠিয়ে দেয়। আর সেই সব সংবাদ প্রকাশিত/প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষে দুটি নিউজ এজেন্সি বা সংবাদ সংস্থা আছে—পি টি আই (প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া) আর ইউ এন আই (ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া) সংবাদ

সংস্থাগুলি সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমগুলির কাছে সংবাদ বিক্রি করে। নিজেরা কোনও সংবাদপত্র প্রকাশনা করে না বা নিজেদের অন্য কোন সংবাদ মাধ্যম নেই।

সংবাদ সংস্থা ছাড়া দেশ-বিদেশের রেডিও টেলিভিশন শুনে/দেখে সেখান থেকে সংগৃহীত সংবাদ সংবাদপত্রে কখনও কখনও প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ রেডিও ও টেলিভিশনও সংবাদের উৎস হতে পারে। সংবাদ সংস্থাও এই উৎস কাজে লাগায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সংস্থার তরফে অথবা ব্যক্তিগত স্তরে জনপ্রতিনিধি বা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনেক সময় সংবাদপত্র অফিসে প্রেস রিলিজ বা প্রেস নোট পাঠিয়ে দেন। এগুলিও সংবাদের উৎস হিসাবে গণ্য। আবার, অনেক সময় একজন সাধারণ নাগরিক বা পথচারীও সংবাদের উৎস হতে পারেন। যেমন, কোথাও একটা দুর্ঘটনা ঘটলে একজন অপরিচিত ব্যক্তি সংবাদপত্র অফিসে টেলিফোন করে সেটি জানিয়ে দেন এবং এমন কিছু তথ্য ও আভাস দিয়ে দেন যাতে একজন সাংবাদিক দ্রুত সেই নির্দিষ্ট ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেন এবং ঘটনা-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

এছাড়া সংবাদের উৎস হচ্ছে—প্রকাশ বা প্রচারের জন্য সরকারিভাবে কোনও বিবৃতি যদি কোনও ব্যক্তি বা কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছে থেকে আসে। এই ধরণের সংবাদ বিবৃতিকে ইংরাজিতে প্রেস রিলিজ বা প্রেস নোট বা প্রেস হ্যাণ্ড-আউট বলা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলন বা প্রেস কনফারেন্সও সংবাদের অন্যতম এক বড় উৎস। কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তি বা কোন পদাধিকারী আগাম ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকতে পারেন। সাধারণত কোনও সুনির্দিষ্ট বকতব্য জনসাধারণকে সংবাদ মাধ্যম মারফৎ জানানোর উদ্দেশ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়। এই সম্মেলনে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তরও আহ্বায়ক দিয়ে থাকেন। প্রেস কনফারেন্সকে নিউজ কনফারেন্সও বলা হয়।

এছাড়া আছে নিউজ ব্রিফিং। কোনও একটি বিষয়কে সংবাদ হিসাবে প্রকাশ বা প্রচার করার জন্য দায়িত্বশীল বা পদাধিকারী কোনও ব্যক্তি যখন সাংবাদিকদের কাছে বিষয়টি বিবৃত করেন ও বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন তখন সেটিকে বলা হয় নিউজ ব্রিফিং বা প্রেস ব্রিফিং। প্রেস ব্রিফিং অনেকটা প্রেস কনফারেন্সেরই মতো। পার্থক্য খুবই সামান্য। যেমন প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী প্রেস কনফারেন্স করেন, আর তাঁদের সচিবালয়ের কোনও প্রতিনিধি বা মুখপাত্র করেন প্রেস ব্রিফিং। একটি দলের সভাপতি করেন প্রেস কনফারেন্স, আর তাঁর দলের সাধারণ সম্পাদক করেন প্রেস ব্রিফিং। আবার, এই সভাপতিই যখন দলের জাতীয় সম্মেলনের কার্যাবলী সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছু বলেন, সেটা হয় প্রেস ব্রিফিং। একইভাবে, প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যখন কোনও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন ও সম্মেলনের কার্যাবলী সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন তখন সেটা প্রেস ব্রিফিং বা যদি বিদেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী বা উচ্চ পদাধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সে সম্পর্কে কিছু বলেন, সেটাও প্রেস ব্রিফিং। প্রেস কনফারেন্স ও প্রেস ব্রিফিং এর মধ্যে পার্থক্য যদি যৎসামান্য, প্রেস কনফারেন্স অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক।

সংবাদের উৎস আরও আছে। যেমন, সাক্ষাৎকার বা ইংরাজিতে যাকে বলে ইন্টারভিউ। কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনও আগাম-নির্ধারিত জায়গায় সাক্ষাৎ করা এবং তাঁর কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনও বিষয় সম্পর্কে জানা ও প্রকাশনার মাধ্যমে তা পাঠক সাধারণকে জানানো হচ্ছে সাক্ষাৎকার। বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও আজকাল সাক্ষাৎকার খুব জনপ্রিয় হয়েছে। একান্ত সাক্ষাৎকার বা এক্সক্লুসিভ

ইন্টারভিউ (অর্থাৎ যা কিনা একজন সাংবাদিকই পেরেছেন, অন্যেরা পারেননি) সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার খুব কদর বাড়ায়।

অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদ, পুরসভা ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের উৎস। জেলায় জেলায় পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থায় জেলা পরিষদের নানা স্তরের যে সব আলোচনা সভা হয় সেগুলিও সংবাদের উৎস। সংসদের অধিবেশন যখন চলে তখন সরকারের সমস্ত নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত সর্বাগ্রে সংসদেই ঘোষণা করতে হয়। রাজ্যস্তরে বিধানমণ্ডলের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। সুতরাং অধিবেশন চলাকালীন সংসদ ও বিধানমণ্ডল সংবাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাছাড়া অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদে সমস্ত সাংসদকে ও বিধানমণ্ডলে /বিধানসভায় সমস্ত বিধায়ককে পাওয়া যায়। গোটা দেশের বিভিন্ন এলাকার নানারকম সংবাদের উৎস এইসব জনপ্রতিনিধি।

আদালতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উৎস। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি ও বিচারকদের রায় প্রায়শই সংবাদ হিসাবে প্রকাশিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট/হাইকোর্টের কোনও কোনও মামলার রায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। এবং এসব রায়ের ফলে সরকারকে কখনও কখনও তার নীতি বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়।

এছাড়া নানা বিষয়ে নানারকম সম্মেলন, আলোচনাসভা, আলোচনাচক্র বা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির বক্তৃতা বা কোন শিল্পপতি/বণিকসভার ভোজসভা বা কোনও দূতাবাসে নৈশভোজ সবই সংবাদের উৎস। কোনও বিষয়ে সমীক্ষা বা তদন্তের রিপোর্ট, গবেষণাপত্র, অভিযোগের বই, টাইম-টেবল, বিজ্ঞপ্তি/বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র, পোস্টার, এমনকি হিসাবের খাতাও সংবাদের উৎস হতে পারে।

সংবাদের উৎস বা 'সোর্স' খোদ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে একজন সাধারণ পথযাত্রী সকলেই বা যে কেউ হতে পারেন। এই উৎস-র বিশ্বাস অর্জন করা এবং তার গোপনীয়তা বজায় রাখা প্রতিটি সাংবাদিকদের নৈতিক দায়িত্ব। আবার, এই উৎস-র কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা সে বিষয়েও প্রতিটি সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে।

সংবাদপত্রের উৎস ডিজিটাল যুগে বিস্তৃত হয়েছে। একজন সাধারণ নাগরিকও রিপোর্টারের মতো খবর পাঠাতে পারে সংবাদপত্র বা টেলিভিশনে। একে বলা হচ্ছে সিটিজেন সাংবাদিকতা। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরতে পারেন সিটিজেন সাংবাদিক হিসেবে।

সংবাদের প্রকারভেদ অর্থাৎ সংবাদ কত রকমের হয়। সংবাদের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করার আগে একটা মনে রাখতে হবে যে, সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের প্রধান অলম্বন হচ্ছে সংবাদ। সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় তার অধিকাংশই সংবাদ-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ সংবাদ হচ্ছে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং সংবাদের সঙ্গে সংবাদ-ভিত্তিক যে সব বিষয় সেগুলির পার্থক্য বোঝানোর জন্য 'হার্ড' (Hard) নিউজ বা 'স্ট্রেইট' (Straight) নিউজ ও 'সফ্‌ট' (Soft) নিউজ বা 'ফিচার' (Feature) নামে সংবাদের প্রকারভেদ করা হয়েছে। 'হার্ড' নিউজ বা 'স্ট্রেইট' নিউজকে বাংলায় বলা যেতে পারে 'গরম' খবর বা 'সোজাসাপটা' খবর। প্রসঙ্গক্রমে 'তাজা' খবরও বলা যায়। আর 'সফ্‌ট' নিউজকে 'নরম' খবর বা সংবাদের ভিন্ন স্বাদের বিস্তার বলা যেতে পারে। 'হার্ড' নিউজকে কখনও কখনও 'স্পট' নিউজও বলা হয়। 'স্পট' মানে কোনও নির্দিষ্ট স্থান বা জায়গা। সুতরাং 'স্পট' নিউজ বলতে সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের তরফে সম্ভবত এটাই বোঝানোর অভিপ্রায় থাকে যে 'আমরা অকুস্থলে

উপস্থিত থেকে' সংবাদটি পরিবেশন করছি।

ঐতিহ্যগতভাবে গরম খবর বা সোজাসাপটা খবর ঘটনা-দুর্ঘটনা-দুর্যোগ ভিত্তিক। যেমন, পুলিশ আইনভঙ্গকারীদের /আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালানো, বা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে মুখ্য নির্বাচনী অফিসার সরকারি ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলির আচরণবিধি ব্যাখ্যা করলেন, বা কোনও মন্ত্রী ইস্তফা দিলেন, বা পুলিশ কয়েকজন চোরাচালানকারীকে গ্রেফতার করল, বা কোনও পথদুর্ঘটনায় কয়েকজন ব্যক্তি হতাহত হলেন, বা কোনও পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘ বিশেষ কোনও গিরিশৃঙ্গ জয় করল, বা ভারত ক্রিকেট টেস্ট জিতল, বা মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোনও সিদ্ধান্ত হল, বা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কোনও জনসভা আয়োজন করা হল, বা কোনও প্রাকৃতিক দুর্গোগে বহু জীবনহানি হল, বা কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু জীবনহানি হল, বা শেয়ার বাজারে হঠাৎ কোনও নামী কোম্পানীর শেয়ারদর পড়ে গেল, বা কোনও চিত্রাভিনেতা পুরস্কৃত হলেন, বা বিশ্বসুন্দরী সিনেমায় অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিলেন, বা নামী কোনও ব্যক্তির জীবনাবসান হল ইত্যাদি। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় দৈনন্দিন সংবাদ। এই সংবাদই গুরুত্ব পায় সর্বাগ্রে। কারণ 'হার্ড' নিউজ বা গরম/সোজাসাপটা খবর হচ্ছে নির্মম সত্য। আর এই নির্মম সত্যকে পাঠক/শ্রোতা/দর্শকদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেওয়াটাই সাংবাদিক বা সংবাদ মাধ্যমের প্রথম দায়িত্ব। আর এই সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে আবেদন হবে প্রত্যক্ষ ও অকপট। বিলম্বহীনতাও এই সংবাদ পরিবেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

তাজা বা গরম খবর যদিও মূলত দৈনন্দিন খবর এবং নতুন খবর, কোনও কোনও সময়ে অজানা পুরনো তথ্যও গরম বা তাজা খবরের মর্যাদা পায়। যেমন, কোনও বড় রাজনৈতিক নেতা বা কোনও শিল্পপতির মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার বেশ কিছুদিন পর যদি জানা যায় যে তিনি মৃত্যুর অনেক আগেই তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কোনও সমাজকল্যাণ সংস্থার নামে উইল করে দিয়েছেন, তখন সেটিও তাজা খবর হিসাবেই গণ্য হবে। অবশ্য মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ভিন্নস্বাদের সংবাদ বা নরম খবর/ফিচার হিসাবেও এই তথ্যটি পরিবেশন করা যায়। সংবাদটি পাঠককে জানানো কতটা জরুরি, আদৌ বিলম্ব করা উচিত হবে কিনা বা সংবাদটির রচনাশৈলী কেমন হবে ইত্যাদি বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে সংবাদটি গরম না নরম—কী হিসাবে পরিবেশিত হবে।

প্রতিদিনের অজস্র ঘটনাবলির যেগুলি তাজা সংবাদ হিসাবে চিহ্নিত, বিবেচিত ও প্রকাশিত হয় তা কিছু দিন আগে থেকেই সাংবাদিকদের জানা থাকে। কারণ, এগুলি হয় পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী। যেমন কোনও বড় জনসভা, বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠক, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, রাষ্ট্রপতির রাজ্যসফর, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের বন্যাদুর্গতদের সাহায্যার্থে চ্যারিটি ম্যাচ ইতাদি বিষয় তো পূর্বঘোষিত, আগে থেকেই জানা। সুতরাং এসব বিষয় ও সম্পর্কিত তথ্যসংক্রান্ত সংবাদ নির্ধারিত দিনে সংগৃহীত হবে এবং সেদিনই বা তার পরদিনই প্রকাশিত হবে। এগুলি সবই তাজা বা গরম খবর। আবার, যেহেতু এগুলি পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বঘোষিত, নির্ধারিত দিনের আগেই এসব বিষয় সংক্রান্ত আগাম খবরও করা যায়। তবে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রেই আগাম খবর লেখা হয়। অনেকটা বড় কোনও নাটক অভিনীত হবার আগে তার অংশবিশেষ মঞ্চস্থ করার ধাঁচে অথবা 'পরবর্তী আকর্ষণ' বলে কোন সিনেমার কিছু অংশ 'ট্রেলার' হিসাবে দেখানোর কায়দায় এসব আগাম খবর করার রেওয়াজ আছে। এ ধরণের খবরকে বলা হয় 'কার্টেন রেইজার'। প্রস্তাবিত রাজনৈতিক বৈঠক বা দলীয় অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিরি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রণকৌশল পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে দলের

তৃণমূলস্তরে ইতোমধ্যেই তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে কিনা তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'কার্টেন রেইজার' হতে পারে। আর এ ধরনের খবর তাজা বা গরম হিসাবেই বিবেচিত ও পরিবেশিত হয়। শুধু রাজনীতি-সংক্রান্ত খবরই নয়, যে কোনও বিষয় নিয়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'কার্টেন রেইজার' সংবাদ লেখা যায়।

যে কোনও বড় বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের অনুসারী সংবাদ বা 'ফলো-আপ' নিউজ লেখা হয়। অর্থাৎ প্রথম দিন কোনও একটি বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও একই বিষয়ে নানা অজানা বা নতুন তথ্য সংগ্রহ করে পরের দিন (বা প্রয়োজনে আরও কয়েকদিন) আরও সংবাদ লেখা হয়। এ ধরনের সংবাদকে অনুসারী বা অনুসরণকারী সংবাদ বলে। কোনও বড় দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, সন্ত্রাসবাদী হামলা মহামারী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সর্বদাই অনুসারী সংবাদ লেখা যায়। অনুসারী খবরও তাজা খবর।

এতো গেলো পূর্বঘোষিত বা আগাম-জানা বিষয়-সংক্রান্ত তাজা বা গরম (হার্ড নিউজ) খবরের কথা। এছাড়া এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুই জানা যায় না। এসব ঘটনা আচম্বিতেই ঘটে। এগুলি প্রধানত দুর্ঘটনা। যেমন, ট্রেন দুর্ঘটনা, বিমান ভেঙে পড়া, পথ দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, নৌকাডুবি ইত্যাদি। এছাড়া কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলিকে দুর্ঘটনা বলে না, কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে আগে থেকে কিছু জানাও যায় না। যেমন, মিছিলের ওপর পুলিশের গুলিচালনা, বিক্ষোভ আন্দোলনের হিংস্র পরিণতি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, কোনও নামী ব্যক্তির মৃত্যু, আচমকা হরতাল, দু'দল ছাত্র বা যুবকের মারামারি, কোনও প্লেন ছিনতাই (হাইজ্যাক) ইত্যাদি হঠাৎ-ঘটা ব্যাপারগুলিও তাজা বা গরম খবর। এসব খবর লেখার ক্ষেত্রে আবেদন হবে স্পষ্ট, সহজ সরল সোজাসাপটা।

নরম খবর বা 'সফট নিউজ'-এর মধ্যে পড়ে যেসব খবর যা দু'দিন পরে ছাপলেও ক্ষতি নেই। আর আছে 'ফিচার'। ফিচার ভিন্নস্বাদের, ভিন্নশৈলীর সংবাদ-লিখন যা মানুষের মন কাড়ে, যা জানতে মানুষ উৎসুক, আগ্রহী এবং যা জেনে মানুষ উপভোগ করে। এসব খবর যতটা না সুনির্দিষ্ট ঘটনাভিত্তিক, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবতাধর্মী মূল্যভিত্তিক। কোনও ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত আকর্ষণীয় জীবনবৃত্তান্ত বা রেচাচিত্র (প্রোফাইল), ব্যঙ্গরসাত্মক বা হাস্যরসাত্মক বৃত্তান্ত, মানুষের জীবনযাপনের প্রচলিত গতিধারা ও আদবকায়দার কাহিনী (লাইফ স্টাইল), নানা বিষয়-সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও সমালোচনা, সামাজিক সংবাদ, ভ্রমণ ও বিনোদন বিষয়ক লেখা বা বিচিত্র বিষয়ের সংবাদনামা ও হালকা মেজাজের বৃত্তান্তগুলিই সাধারণত নরম খবর বা ফিচার হিসাবে বিবেচিত। তাৎক্ষণিকতার বা গুরুত্বের দিক দিয়ে ভাবলে নরম খবরের স্থান গরম খবরের চেয়ে এক ধাপ নিচে। নরম খবর সাধারণত বৈচিত্রপূর্ণ বর্ণময় বিবরণ বা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ যা গরম খবরকে ভিত্তি করেও হতে পারে যা গরম খবর ছাড়া অন্য বিষয়ভিত্তিকও হতে পারে।

এই ব্যাখ্যা-বিবরণ-বিশ্লেষণমূলক নরম খবর বা ফিচার বৃহত্তর চিত্রপটের আপাত নরম সংবাদকে যেমন ফুটিয়ে তোলে, তেমনি শিক্ষামূলক তথ্যও পরিবেশন করে এবং একই সঙ্গে উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও রচনাশৈলীর পারদর্শিতায় পাঠকদের আনন্দ বর্ধন করে। নরম খবরের বিষয়ের অন্ত নেই। দৃশ্যমান জগতের সমস্ত বিষয় নিয়েই নরম খবর লেখা যায়, লেখা হয়। আবার, যা অদৃশ্য অর্থাৎ চোখের দেখা নয় বা মননের জগৎ তা নিয়েও লেখা হয় নরম খবর বা ফিচার। এই নরম খবর দু'ধরনের। সংবাদধর্মী ও মানবতাধর্মী মূল্যভিত্তিক বা মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ।

সংবাদধর্মী নরম খবর বা ফিচার কিন্তু অনুযায়ী সংবাদ বা 'ফলো আপ নিউজ' নয়। পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা ও মূল সংবাদের পটভূমি উদ্‌ঘাটন অনুসারী সংবাদের অনন্য উপাদান। "কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং

কীভাবে”-র উত্তর সম্বলিত গরম বা সোজাসাপটা খবর লেখার পদ্ধতির তুলনায় সংবাদধর্মী নরম খবর লেখার ভঙ্গিটা অন্যরকম। ব্যক্তি বা ব্যক্তির কার্যকলাপ, সমসাময়িক ঘটনা, স্থানীয় বা আঞ্চলিক আবেদনের কোনও বিষয় বা বিষয়ের গুরুত্ব ও তার ব্যাখ্যা বা ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা—যা বাঁধা গতের বাইরে এবং একটু আলাদা—সংবাদধর্মী ফিচার বা নরম খবরের বিশেষত্ব।

সংবাদধর্মী বা সংবাদভিত্তিক ফিচার প্রকাশিত সংবাদে পরিবেশিত তথ্যের অতিরিক্ত কিছু কথা বলবে, যা প্রচলিত রীতিধারা থেকে নিশ্চিতভাবে ভিন্নস্বাদের এবং আনন্দদায়ক। এ ধরনের ফিচার বা নরম খবর হবে সৃজনশীল ও অধ্যাত্মীয় (বা চিত্তনিষ্ঠ, যার বিপরীত হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়নিষ্ঠ) যার প্রধান কাজ হচ্ছে পাঠককে তথ্য জানানো ও আনন্দ দান করা। সংবাদধর্মী নরম খবরের সঙ্গে সোজাসাপটা গরম বা সোজাসাপটা খবর লেখার পদ্ধতির তুলনায় সংবাদধর্মী নরম খবর লেখার ভঙ্গিটা অন্যরকম। ব্যক্তি বা ব্যক্তির কার্যকলাপ, সমসাময়িক ঘটনা, স্থানীয় বা আঞ্চলিক আবেদনের কোনও বিষয় বা বিষয়ের গুরুত্ব ও তার ব্যাখ্যা বা ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা—যা বাঁধা গতের বাইরে এবং একটু আলাদা—সংবাদধর্মী ফিচার বা নরম খবরের বিশেষত্ব।

সংবাদধর্মী বা সংবাদভিত্তিক ফিচার প্রকাশিত সংবাদে পরিবেশিত তথ্যের অতিরিক্ত কিছু কথা বলবে, যা প্রচলিত রীতিধারা থেকে নিশ্চিতভাবে ভিন্নস্বাদের এবং আনন্দদায়ক। এ ধরনের ফিচার বা নরম খবর হবে সৃজনশীল ও অধ্যাত্মীয় (বা চিত্তনিষ্ঠ, যার বিপরীত হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়নিষ্ঠ) যার প্রধান কাজ হচ্ছে পাঠককে তথ্য জানানো ও আনন্দ দান করা। সংবাদধর্মী নরম খবরের সঙ্গে সোজাসাপটা গরম খবরের এখানেই পার্থক্য। এ ধরনের নরম খবরকে কিন্তু সমকালীনতা বা সময়োপযোগিতা বজায় রাখতে হবে, এবং এ ধরনের খবরে কল্পনাপ্রবণতার সুযোগ খুবই কম। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্য কোন বাধানিষেধ নেই।

মানবতাধর্মী-মূল্যভিত্তিক বা মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ নরম খবর বা ফিচার যা যা মানুষের মন কাড়ে বা যা যা মানুষের মনকে নাড়া দেয় তাই নিয়েই লেখা হয়। এ ধরনের সংবাদে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় মানুষ। এতে মানুষ থাকবে এবং মানুষের সংবেদনশীল মন যাতে নিশ্চিতভাবে সাড়া দেবে সে ধরনের একটি কাহিনী বা বৃত্তান্ত থাকবে, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। এই মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ নরম খবরে থাকবে একটি সুনির্দিষ্ট আখ্যানের রূপরেখা, থাকবে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র। গল্পের মতো এই খবরের শুরু, মধ্যপর্যায় ও সমাপ্তি থাকবে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, এ ধরনের নরম খবর বা ফিচারের অবস্থান অনেকটা খবর ও ছোটগল্পের মাঝামাঝি কোনও একটা জায়গায়। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের খবর হচ্ছে ঘটনাভিত্তিক ছোটগল্প। এবং তা সরাসরি বলা। এ ধরনের খবরের মূল উপাদান:

- মানবিক আবেদন—এই ধরনের নরম খবর বা আখ্যান মানুষের মনকে নাড়া দেবে।
- ঘটনা বা বাস্তব অবস্থা—এই আখ্যান এমন ঘটনা বা বাস্তব অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করবে যাতে মানুষের আগ্রহ আছে বা যা মানুষের কাছে আকর্ষণীয়।
- ব্যক্তিত্ব—এ ধরনের আখ্যানে ব্যক্তিত্ব যুক্ত হয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। অসামান্য বা অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের কথা থাকলে এই আখ্যান আরও বেশি গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।
- দৃষ্টিকোণ—বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত হলে আখ্যানের বাঁধুনি মানুষের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে।

- গতিশীলতা—এ আখ্যান হবে প্রাণবন্ত। আখ্যানে উল্লিখিত যে সব ব্যক্তিত্ব, তাঁদের কর্মচঞ্চলতায় আখ্যান যেন প্রাণবন্ত ও গতিশীল হয়ে ওঠে।
- অনন্যতা ও সর্বজনীনতা—আখ্যানে যেন অনন্যতা বা ভিন্নতা থাকে, আবার একই সঙ্গে তার যেন একটা সর্বজনীন আবেদন থাকে।
- গুরুত্ব—কোনও বিষয় বা ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, নৈকট্য, সময়োপযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা থাকলে এ ধরনের আখ্যানের গুরুত্ব বাড়ে।
- উৎসাহবর্ধন—আখ্যান যেন মানুষের মনকে নাড়া দেয়, ঠিক যেমন আখ্যানের বিষয়টি সাংবাদিকের মনকে নাড়া দিয়েছিল।

মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচার বা আখ্যানের বিষয় বা চরিত্রের নানা রূপের যে আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়, পাঠক যেন সেই আবেগ ও অনুভূতির ব্যাপারে একাত্ম বোধ করে। আনন্দ, বিষাদ, ভয়, উত্তেজনা, কৌতুক, রাগ, সহানুভূতি ইত্যাদি কত রকমই না আবেগ ও অনুভূতি এ ধরনের ফিচারে ফুটে ওঠে। এ ব্যাপারে পাঠকের একাত্মবোধ এমনই হয় যে, পাঠক যেন নিজেই আখ্যানে বর্ণিত বিষয়ের এক সক্রিয় অংশীদার। উক্ত নাটক বা ছোটগল্পের সে যেন নিজেই একটি চরিত্র। রচনাশৈলী বা লিখনভঙ্গি ও অনন্য বা অদ্ভুত বিষয় বা চরিত্র নির্বাচনের ওপরই মূলত নির্ভর করে এ ধরনের ফিচার বা আখ্যানের গ্রহণযোগ্যতা। মানুষ নিজে যে ব্যাপারে জড়িত, তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী যে ব্যাপারে জড়িত সে বিষয়ে সে জানতে চায়। সে নিজের কথা জানতে-শুনতে চায়। সে অপরের কথা জানতে-শুনতে চায়। না বলা কথা, না-জানা কাহিনী শুনতে/জানতে চায়। এ ধরনের ফিচার বা নরম খবরের বিন্যাস সাধারণত বৃত্তান্তমূলক। অনেকটা গল্পকথনের রূপ। আর সেই কারণেই এ ধরনের সংবাদের সময়োপযোগিতা বহুলাংশেই গৌণ হয়ে যায়। বাস্তবিকপক্ষে মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ অনেক আখ্যান বা ফিচারের আকর্ষণ কালাতীত বা চিরন্তন।

অনেক ভালো ভালো আকর্ষণীয় মানবিক আবেদনসৃদ্ধ ফিচারের উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ—বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি বা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা, বিশেষত শিশুদের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা (যেমন থ্যালাসেমিয়াগ্রস্ত বা প্রতিবন্ধী শিশু)। এছাড়া আছে বড় বড় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট নজর এড়িয়ে যাওয়া কাহিনী, কোনও নামী মানুষের ছেলেমানুষী শখ বা বিশেষ কোন জিনিসের প্রতি লোভ। বহুরূপী, মুশকিল আসান, ভালুক নাচ, বাঁদর খেলা, ফুটপাথের আর্টিস্ট, শিশু শ্রমিক ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে লেখা যায় মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচার। এ ধরনের ফিচারের বিষয়ের কোনও অন্ত নেই।

সংবাদভিত্তিক ও মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচার ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের ফিচার আছে। যেমন, সমীক্ষা, সমালোচনামূলক ফিচার, বর্ণময় বর্ণনামূলক ফিচার, মতামতধর্মী ফিচার, নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানভিত্তিক ফিচার, আবহাওয়া বা বিশেষ ঋতু সম্পর্কিত ফিচার, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক ফিচার, বিজ্ঞানভিত্তিক ফিচার, পটভূমি বা প্রেক্ষাপটভিত্তিক ফিচার, সাক্ষাৎকারভিত্তিক ফিচার, ভ্রমণমূলক ফিচার, ব্যঙ্গ বা হাস্যরসাত্মক ফিচার, খেলাধূলা-সংক্রান্ত ফিচার, ব্যক্তিভিত্তিক ফিচার, জনসেবামূলক ফিচার, ধর্ম বা রাজনীতিভিত্তিক ফিচার ইত্যাদি।

লিখনশৈলী ও লেখার প্রণালী বিষয় বিশেষে ভিন্ন। তার ওপর আছে ফিচার লেখকের পছন্দ ও দৃষ্টিভঙ্গি। কোনও বিষয়ে ফিচারের ভূমিকা বা মুখবন্ধ বা সূচনা কী হবে তারও কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবুও সাধারণভাবে

ফিচারের ক্ষেত্রে কয়েকরকম মুখবন্ধের প্রচলন আছে। যেমন, সারাংশ মুখবন্ধ (সামারি লীড), প্রত্যক্ষ মুখবন্ধ (ডাইরেক্ট লীড) প্রশ্নমূলক মুখবন্ধ (ক্যোইস্চন লীড), বর্ণনামূলক মুখবন্ধ (ডেসক্রিপটিভ লীড), বিস্ময় বা চমকধর্মী মুখবন্ধ (টিজার লীড), উক্তিমূলক মুখবন্ধ (কোটেশান্ লীড), অদ্ভুত বা উদ্ভট মুখবন্ধ (ফ্রীক্ লীড) ও সম্মিলিত মুখবন্ধ (কম্বিনেশন লীড)।

যে ধরনেরই ফিচার হোক আর যেমনই হোক সে ফিচারের মুখবন্ধ বা সূচনা, সবরকম ফিচারেরই গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে কয়েকটি শর্তের ওপর। সেগুলি হচ্ছে ভাষার গুণগত মান, যুক্তিগ্রাহ্যতা, সামাজিক চেতনাবোধ, সত্যতা মানবিকতা ও সামগ্রিক সামঞ্জস্য বা সমন্বয়।

খবর লেখার প্রকরণগত পরিবর্তন (Changing Pattern of News Coverage) : খবর লেখার প্রকরণ বা রীতি-পদ্ধতি ক্রমাগত বদলাচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি, পরিবর্তিত রুচি পছন্দ প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ফলেই প্রতিবেদন প্রচারে অবিরাম পরিবর্তন।

এমন একটা সময় ছিল, যেমন ধরা যাক সদ্যসমাপ্ত বিশ শতকের সাতের দশকের শুরু পর্যন্ত, যখন সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইথার তরঙ্গে বাহিত রেডিও স্টেশন প্রচারিত নিউজ বুলেটিন। সেটাও ছিল দিনে রাতে হাতে-গোনা মাত্র কয়েকবার। এখন যাঁরা প্রৌঢ় তাঁদের অনেকেই সেই আমালে প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়টার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন যখন রেডিওর 'নব্' বা চাবি ঘোরালে শোনা যেতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকটি পরিচিত কণ্ঠস্বর—"আকাশবাণী, খবর পড়ছি নীলিমা সান্যাল/বিজন বসু" অথবা, পরবর্তী কোনও কালে, "খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।" তখনও দূরদর্শন চালু হয়নি। নানারকম চ্যানেলের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা সংবাদ পরিবেশনের রেওয়াজও তাই গড়ে ওঠেনি। খবর তখন ছিল অনেক সোজাসুজি এবং খবরের কাগজে ঘটনা দুর্ঘটনা, রাজনৈতিক কার্যক্রমের গতিপ্রকৃতি, খেলাধূলা, রাষ্ট্রশাসন ইত্যাদি প্রায় সবরকম খবরেই সংবাদপত্রগুলি শুধুমাত্র মূল ঘটনা ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণ বা টীকা-টিপ্পনীসহ তার ব্যাখ্যা করেই সন্তুষ্ট থাকত। তখনকার দিনে পাঠকও সম্ভবত তার বেশি কিছু আশাও করতেন না। কিন্তু এখন যতই দিন যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই বদলাচ্ছে এবং সংবাদপত্রগুলিকেও পাল্লা দিতে হচ্ছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সংবাদ চ্যানেলগুলির সঙ্গে। তাই কেবলমাত্র মূল খবরটুকু সরবরাহ করে আর কিছু কিছু কিছু বিশ্লেষণ পরিবেশন করেই যদি তার কাজ শেষ করতে চায় তাহলে সংবাদপত্রের বাজার হারানোর সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

এই অবস্থায় যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে। এখন সংবাদপত্রগুলি তাদের সংবাদ পরিবেশনের আদলও পালটে ফেলেছে। মূল খবরের সঙ্গে বেশি বেশি করে যুক্ত হচ্ছে তার বিশ্লেষণ, তার পটভূমি, তার ভবিষ্যৎ নির্দেশে এবং তার মন্তব্যমূলক ব্যাখ্যান। যুক্ত হচ্ছে ঘটনার থেকেও তার মানবিক দিকগুলিকে বেশি করে দেখানোর জন্য সংবাদ-সম্পর্কিত অকথিত কাহিনী। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। হয়তো কোনও রাস্তার পাশের জবরদখলকারীদের বে-আইনি বাড়িঘর, দোকান ইত্যাদি ভেঙে দিয়ে রাস্তা চওড়া করার একটা সরকারি পরিকল্পনা নেওয়া হল। পরিকল্পনা মাফিক পুলিশ-প্রশাসন বুলডোজার, লরি, লোকজন ইত্যাদি নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে কাজ শুরু করল। সংবাদপত্র আগের মতোই, ঐতিহ্য অনুযায়ী, ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ দিল। যেমন, কতগুলি ঘরবাড়ি ভাঙা হল, কতজন বাধা দিতে এসে গ্রেফতার হল, কতজন বা পুলিশের লাঠিতে আহত হল, উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলির কোথাও কোনও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হল কিনা, সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এ বিষয়ে কী বলল বা কী করল ইত্যাদি। একই

সঙ্গে দেখা গেল, এসব খবরের পাশাপাশি আলাদা একটি খবরে তুলে ধরা হল কেমন করে কয়েকটি শিশু ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে আনছে তাদের পড়াশুনার বা খেলাধূলার সামগ্রী বা কোনও মা তার সন্তানদের খেতে দেওয়ার অতি সাধারণ তৈজসপত্র ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে।

এরকমভাবেই খবরের অন্যান্য দিকগুলিতেও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে সংবাদপত্র ক্রমশই আরও ব্যাপক ও মনোহারী হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশবিদেশের বিভিন্ন খেলাধূলা আজকাল সরাসরি টিভির পর্দায় মানুষ দেখতে পায় বলে সেসব খেলাধূলার ফলাফলের থেকেও সংবাদপত্র বেশি করে আলোচনা করছে সেসব খেলার নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলি, তাদের পারিবারিক সমস্যা থেকে শুরু করে তাদের ভাবমূর্তি বিপণন বা ইমেজ মার্কেটিং পর্যন্ত। যে সমস্ত বিষয়ে মানুষকে নিত্যদিনই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় খবরের কাগজে সেগুলি আজকাল অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, পৌরসেবা বা পুর-পরিষেবা, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি নিজে আজকাল বিস্তারিত খবর পরিবেশন করা হচ্ছে। এবং সে কারণেই, পরিবর্তিত প্রয়োজনবোধে, খবর লেখার প্রকরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১.১.৪ সংবাদের রচনাশৈলী বা উপস্থাপনা (Style and Approach)

খবর লেখার পদ্ধতি বা শৈলী নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অথচ বলা যায়, বিভিন্ন পদ্ধতির খবর লেখার নমুনা নিয়ে গবেষণা করে কয়েকটি নির্দিষ্ট শৈলীকে আদর্শ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। খবর অবশ্য ঠিক কীভাবে লেখা যেতে পারে তা নিয়ে কখনই শেষ কথা বলা যায় না। কারণ, যতই নতুন নতুন সাংবাদিক আসবেন ততই নতুন নতুন ভাবে খবর লেখার চেষ্টা চলতেই থাকবে। প্রতিটি সাংবাদিকের লেখাই তাঁর স্বকীয়তায় বিভিন্ন সময়ে দিক্‌নির্দেশ করতে পারে এবং তা করে চলেছেও। কারণ, আমরা সকলেই জানি—"Style is the man" অর্থাৎ শৈলীই হচ্ছে ব্যক্তির উৎকর্ষ বা বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ।

এসব সত্ত্বেও সাংবাদিকতা শুরু করার মুখে কয়েক রকম লেখার পদ্ধতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকা খুবই আবশ্যক। একটি একটি করে সেগুলির কথা বলা যাক।

প্রথমেই আসবে সেই চিরায়ত বা সাবেকি শৈলী যার গড়ন অনেকটা ইংরাজি "T" এর মতো। অর্থাৎ খবরের শুরুর দিকে মূল বক্তব্যটি বা খবরটি প্রথম একটি বা দুটি প্যারাগ্রাফের মধ্যে বন্দী করার কাঠামো। যেমন, "অনেক আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে আজ প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে রাজ্যে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। যদিও বিচ্ছিন্ন ঘটনায় ১০ জন অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ৫০ জনকে"।

এরকমভাবে লেখা খবরে মূল বক্তব্যটি রাখা হয় একেবারে শুরুর প্রথম একটি বা দুটি প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদে এবং খবরের বাকি অংশ—যেমন, ভোটদানের শতকরা হার, ঘটনা-দুর্ঘটনার বিশদ বিবরণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি পরপর প্যারাগ্রাফ সাজিয়ে লেখা হয়।

সংবাদ রচনার নানা কাঠামো বা নির্মিতিকে বিশেষজ্ঞরা জ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন। এই জ্যামিতিক নির্মিতি কৌশল জানা থাকলে সংবাদ পরিবেশনের সঠিক রীতিটি বা বিন্যাসভঙ্গিটি যথাযথভাবে আয়ত্ত করা যায়। এই সংবাদ-বিন্যাসভঙ্গিকে কয়েকটি জ্যামিতিক ছকে ভাগ করা যায়। সোজা কথায় সংবাদটিকে কীভাবে সাজানো হবে—প্রথমে বা মুখবন্ধে কী লেখা হবে, তারপরই বা মধ্য অংশেই বা কী থাকবে, আর সব শেষে বা উপসংহারেই

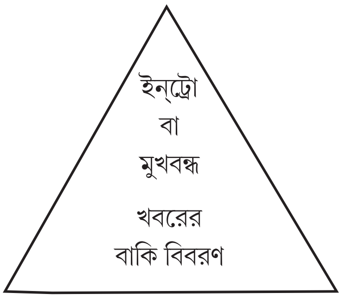

চিত্র ১

বা কী লেখা হবে? এই সংবাদ সাজানোর কায়দা বা বিন্যাসভঙ্গির জ্যামিতিক ছক হচ্ছে পিরামিড, উল্টো পিরামিড, ঘটনানুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্স, পিরামিড ও সমান্তরাল বাক্সের সমন্বয়, রচনা বা প্রবন্ধ জাতীয়, বালি-ঘড়ি সদৃশ, ডিম্বাকৃতি ইত্যাদি।

পিরামিড (Pyramid) : ছোটখাট সাধারণ মানের খবরগুলি প্রধানত পিরামিডের মতো আকৃতিরই হয়। এসব খবরে মুখ্যত একটি বিষয়ই থাকে এবং এর মুখবন্ধ বা ইনট্রোও হয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। গুরুত্ব অনুযায়ী সংবাদের বাকি অংশটুকু ধাপে ধাপে যুক্ত হয় ও কাহিনী বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্তু যেহেতু খবরের বক্তব্যটিই ছোট এবং মূল খবরটি প্রথমেই থাকছে, তাই প্রয়োজনবোধে লিখিত খবরটির নিচের অংশ ইচ্ছামতো ছোট করা যায়। এই নিচের অংশেই থাকে মূল বিষয় সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি খবর যা ক্রমেই বিস্তারলাভ করে। প্রয়োজনে এই নিচের অংশকে ছোট করা হয়। কিন্তু খবরের কাঠামোটা জ্যামিতিক কল্পনায় পিরামিডের মতোই থাকে (চিত্র ১)।

উল্টো পিরামিড (Inverted Pyramid) : ঘটনার ধারাবাহিকতায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্রম অনুসারে ছোটগল্পের শেষ পরিণতিতে বা উপসংহারে আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি। গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রে বিন্যাসের ধাঁচটি ছোটগল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি খবরের শুরুতেই বলতে হবে। এবং বাকিসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সাজানো হবে তাৎপর্যের অধঃক্রম অনুযায়ী। সবচেয়ে কম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি আসবে সংবাদের সর্বশেষ পর্যায়ে। এ ধরনের নির্মিতিকৌশল বা বিন্যাসভঙ্গির নাম জ্যামিতিক কল্পনায় উল্টো পিরামিড। সংবাদলিখনের এই কাঠামোটি ব্যাপকভাবে পরীক্ষিত ও সবচেয়ে নিরাপদ। খবর লেখার সনাতন ধারায় এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ কাঠামো বলে বিবেচিত। সংবাদপত্রের মুদ্রণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে থাকে। সুতরাং সংবাদ লিখতে হবে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে। এবং সর্বদাই সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে পরিবেশিত সংবাদের সত্যতা, সময়োপযোগিতা ও পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখার ক্ষমতা সম্পর্কে।

এইসব মাথায় রেখেই উল্টো পিরামিডের কাঠামোর কল্পনা। পিরামিডের সমস্ত শক্তি তার অধোভাগ বা তলদেশে। উল্টো পিরামিড কাঠামোয় সংবাদ লেখার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, সংবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় শক্তি হচ্ছে তার শুরুর কথাতেই। অর্থাৎ খবরে সূচনাতেই (ইন্ট্রো বা লীড) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কিছুটা বিবরণ দেওয়া হয়। এই লীড (সূচনা বা মুখবন্ধ) একটি অনুচ্ছেদেও হতে পারে অথবা, প্রয়োজনে, তিন চারটি অনুচ্ছেদেও হতে পারে। অর্থাৎ খবরের প্রথম দিকটি হয় প্রসারিত বা ছড়ানো। এবং তারপর ধীরে ধীরে কাহিনীকে গুটিয়ে আনা হয় ও প্রয়োজনে নিচের অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

উল্টো পিরামিড কাঠামোয় লেখা সংবাদের তিনটি অংশ বা পর্যায় থাকে। প্রথমে লীড বা সূচনা। যে কোনও সংবাদের প্রথম কয়েকটি প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ হচ্ছে সেই সংবাদের লীড। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সংবাদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য লীডের মধ্যে থাকবে। মোটামুটি এই লীড থেকেই পুরো সংবাদটি জানা যায়। সংবাদ সংস্থা প্রেরিত কোনও কোনও সংবাদের লীড অনেক সংবাদপত্রেই সংক্ষিপ্ত সমাচার হিসাবে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় বা মধ্যমাংশে লীডের সমর্থনে বা লীডের জোর বাড়ানোর জন্য সেসব বিষয় নিয়ে লেখা হবে যা যথেষ্ট অর্থবহ বা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অপরিহার্য নয়। যেমন, কোনও সংবাদের সূচনায় যদি খুন সম্পর্কে পারিবারিক কলহকে

কারণ হিসাবে লেখা হয়ে থাকে, তাহলে মধ্যমাংশে সেই কলহ-সংক্রান্ত সাক্ষীর বক্তব্য, মৃতদেহটি ঠিক কী অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তার ওপর কতগুলি ক্ষতচিহ্ন ছিল, বাড়িতে কেউ ছিল কিনা, কজন ঝি-চাকর সেই বাড়িতে কাজ করে ইত্যাদি বিষয়গুলি ইঙ্গিতপূর্ণ বিবেচনায় থাকবে। কিন্তু এসব খুঁটিনাটির সবগুলিই যে অপরিহার্য তাও নয়। তৃতীয় বা শেষ অংশকে বলা হয় 'ঠিক তত গুরুত্বপূর্ণ নয়' অর্থাৎ এই অংশটিকে যে কোনও সময়ে বাদ দেওয়া হয়। ইংরাজিতে খবরের এই অংশটিকে বলা হয় 'ইক্স্পেণ্ডেব্ল্ এণ্ডিং' অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে উপসংহারটিকে ত্যাগ করা যায় বা বাদ দেওয়া যায়। যেমন, খুনের খবরের ক্ষেত্রে গত দু'বছরে বা পাঁচ বছরে এই শহরে কতগুলি খুন হয়েছে, পুলিশ কতগুলি খুনের কিনারা করতে পেরেছে, পারিবারিক কলহজনিত খুনের সংখ্যাই বা কত ছিল ইত্যাদি বিষয় যেগুলি বাদ দিলে মূল খবরের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হয় না। খবরের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই এগুলিকে বাদ দেওয়া যায়।

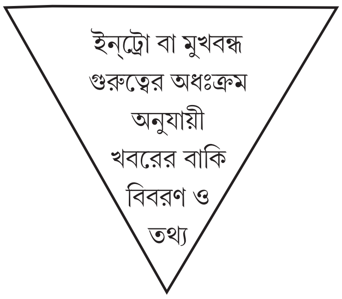

চিত্র ২

উল্টো পিরামিড কাঠামোই সাধারণত গ্রহণযোগ্য। অবশ্য একশ বছর আগে বা তারও আগে যে কাঠামো প্রচলিত ছিল তা হল ঘটনাক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্সের মতো। বাস্তব সমস্যা এড়াতেই শুরু হয় উল্টো পিরামিড। টেলিগ্রাফ সার্ভিসের অবিশ্বস্ততার বা অনিশ্চয়তার ফলে তারযোগে পাঠানো খবরের সবটুকু খবরের কাগজে পৌঁছতই না। মাঝপথে কেটে যেতো। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য উল্টো পিরামিড কাঠামো চালু করা হয়। যার ফলে যে কোনও খবরের সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিই প্রথম দু-তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই বলা হয়ে যেতো। টেলিগ্রাফের গোলমালের ফলে খবরের সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিই প্রথম দু-তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই বলা হয়ে যেতো। টেলিগ্রাফের গোলমালের ফলে খবরের বাকি অংশটুকু না পাওয়া গেলেও খুব একটা ক্ষতি হত না আজকের দিনে অধিকাংশ খবরই উল্টো পিরামিড বিন্যাসে পরিবেশন করা হয়। এতে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংবাদের প্রথম ভাগে থাকে আর সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি থাকে সর্বশেষে। এ ধরনের সংবাদ লিখনভঙ্গি সাংবাদিক ও পাঠক উভয়েরই খুব পছন্দ। পাঠক যেহেতু বেশিরভাগই সংবাদপত্র পড়ার সময় খুব ব্যস্ত করে থাকেন, তাই তিনি চান যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও যেন খুব অল্প সময়ে পড়ে ফেলা যায়। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অর্থাৎ রেডিও টেলিভিশনে অবশ্য এ ধরণের সংবাদ বি ন্যাস সবসময়ে শ্রোতা-দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। যেহেতু কোনও খবরই সাধারণত এক বা দুমিনিটের বেশি হয় না তাই বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সংবাদ বিন্যাস ভিন্ন রূপের হতেই পারে। তবুও এ ধরনের বিন্যাস সকলেই পছন্দ করেন। কারণ শুরুতেই খবরটি জানা হয়ে গেলে, পরিহার্য বাকি অংশ কেউই আর দেখতে চান না (চিত্র ২)।

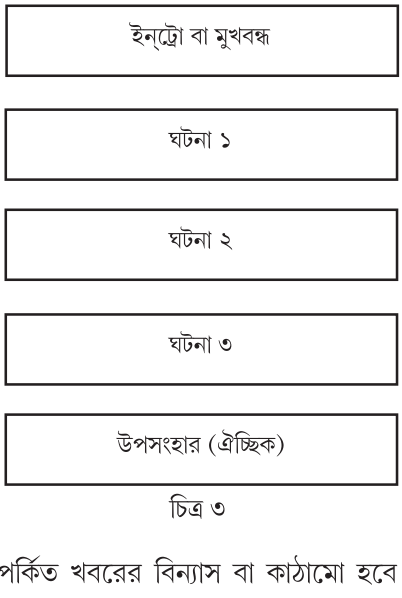

চিত্র ৩

ঘটনানুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্স (Chronological) : যে ঘটনার পর্যায়ক্রমে বা ধাপে ধাপে সম্প্রসার ঘটেছে এবং কোনও পর্যায়ই অন্য কোনও পর্যায়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সে ঘটনা সম্পর্কিত খবরের বিন্যাস বা কাঠামো হবে

ঘটনা-অনুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্স ধাঁচের। এক অর্থে বলতে গেলে এ ধরনের খবরের মধ্যে একাধিক খবর থাকে এবং এ ধরনের খবরের লীড বা সূচনা কী হবে তা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তিও দেখা দেয়। এজন্য সাধারণত এ ধরনের খবরের একটি সমন্বিত সূচনা লিখে তারপর ধাপে ধাপে পরবর্তী বিষয় বা তথ্যগুলিকে সাজিয়ে দিতে হয়। এক একটি ধাপ এক একটি বাক্সের মতো ভাবলে, সব মিলিয়ে কয়েকটি সমান্তরাল বাক্সের চেহারা নেয় এ ধরনের সংবাদ বিন্যাস। এই ঘটনানুক্রমিক বিন্যাসে অনেকে যেমন সমন্বিত সূচনা লেখার পক্ষপাতী, তেমনি অনেকেই আবার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি বাদ দিয়ে তারপর পারম্পর্য অনুযায়ী অন্য তথ্যগুলি দিতে চান যাতে ঘটনার একটি ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে (চিত্র ৩)।

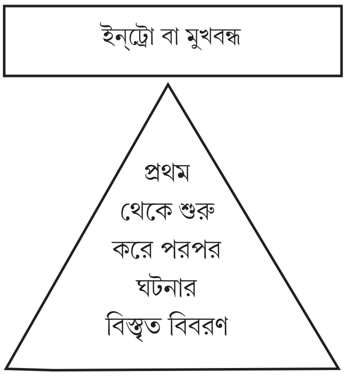

চিত্র ৪

পিরামিড ও সমান্তরাল বাক্সের সমন্বয় : এ ধরনের সংবাদ বিন্যাসের রেওয়াজ এখন আর নেই। এই রেওয়াজ লুপ্ত হয়ে যাবার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, এতে সংবাদের লীড বা সূচনা অত্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় যা আবার মুদ্রণ বিন্যাসে প্রসারিত আয়তক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। সূচনার পরে মূল খবরটিকে আবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে ক্রমশ পিরামিডের মতো নিচের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এখনকার দিনে যেহেতু দীর্ঘায়িত সূচনা লেখার চলন নেই এবং পাঠকও এ ধরণের লেখা পড়তে বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন না, তাই এ ধরনের সংবাদ-লিখনভঙ্গি বর্জিত হয়েছে (চিত্র ৪)

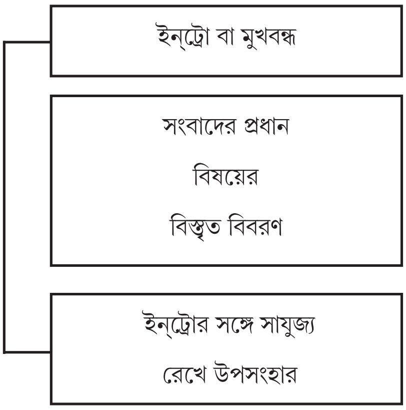

চিত্র ৫

রচনা বা প্রবন্ধ জাতীয় কাঠামো (Essay Approach): সংবাদে রচনা বা প্রবন্ধ জাতীয় বিন্যাস খুবই কম, বলা যায় বিরল। তবে এ ধরনের কাঠামোর লেখা প্রায়শই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, কোনও বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত নিবন্ধ, রবিবাসরীয় বা সাময়িকীর লেখা, ম্যাগাজিন আর্টিকল, সংবাদভাষ্য, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার বিশেষ লেখা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। স্কুল কলেজে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচনার সঙ্গে সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের রচনার একটু তফাৎ আছে। পাঠক বা দর্শককে প্রতিপাদ্য বিষয়টি বা কোনও বিশেষ তত্ত্ব বা কোনও মন্তব্য দিয়ে আকৃষ্ট করে তবে প্রবন্ধ ধাঁচের লেখা শুরু করতে হয়। সাংবাদিক বা লেখককে তাঁর বক্তব্য বা মন্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ ও উদাহরণ দিয়ে লিখতে হবে এই রচনার মধ্যম অংশ। লেখার শেষ অংশে বা উপসংহারে লেখককে প্রতিপাদ্য বিষয়টি ও তৎসংক্রান্ত মন্তব্যের সারাংশ দিয়ে গোটা বিষয়টিকে গুটিয়ে আনতে হবে। শুরুর সঙ্গে তার সাযুজ্য থাকবে (চিত্র ৫)।

বালি-ঘড়ি সদৃশ্য বিন্যাস বা কাঠামো (Hour-glass Organisation) : বালি-ঘড়ি বা আওয়ারগ্লাস (বালি ভর্তি কাচের পাত্র যার মধ্যভাগ সরু এবং ওপরের মোটা অংশ থেকে বালি একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিচের মোটা অংশে সম্পূর্ণরূপে পড়ে যাওয়ার পরই পাত্রটি উল্টে যাবে ও ওপরের বালি আবার নিচে

চিত্র ৬

পড়বে—এরকমভাবে কার্যসাধন পদ্ধতিতে তৈরি যে ঘড়ি) যার আকৃতি অনেকটু ডমরু বা ডুগডুগির মতো সেই রকম জ্যামিতিক বিন্যাসে কখনও কখনও সংবাদ লেখা হয়। এই কাঠামোয় লেখা সংবাদের ওপরের অংশ বা লীড ও নিচের অংশ বা উপসংহার হবে প্রসারিত। মধ্যম অংশ যা তুলনামূলকভাবে সরু সেখানে কাহিনী একটি মোড় নেবে, আর এই অংশটিকে ধরে নেওয়া হবে পরিবেশিত সংবাদটির এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায় উত্তরণের মধ্যবর্তী ধাপ। এই বিন্যাসে বা ধাঁচে লেখা সংবাদের জোরটা থাকে প্রধানত দুটি ভিন্ন অথচ গুরুত্বপূর্ণ অংশের ওপর। আর থাকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ একটা মোড় বা বাঁক যেটা সংবাদের এক অংশ থেকে আর এক অংশে উত্তরণের একটা ধাপ, জ্যামিতিক ছকে যার অবস্থান সংবাদটির মধ্যভাগে। এই পরিবর্তনসূচক মধ্যবর্তী পর্যায়টি হতে পারে কয়েকটি বাক্য বা অনুচ্ছেদ, আর এ ধরনের বাক্য বা অনুচ্ছেদ সাধারণ দীর্ঘ বা প্রলম্বিত সংবাদ-কাহিনীতেই দেখা যায়। এই অংশটিতে অনেক সময় উপ-শিরোনাম বা সাব হেডিং দেওয়া হয়, কোনও কোনও সময় গ্রাফিক্সও ব্যবহার করা হয়, কখনও বা বক্স বা বুলেট ব্যবহার করা হয়। এই মধ্যবর্তী অংশটি হতে পারে সময়ের ব্যবধানের ইঙ্গিতবাহী বা বিবরণমূলক কিছু ভৌগোলিক উপাদান বা হতে পারে অন্য কোনও বিষয় বা ধারার একটি ক্ষেত্র। আর এই ক্ষেত্রটি থাকবে সংবাদটির প্রধান দুটি অংশের সঙ্গে খুব শক্ত সুতোয় বাঁধা। এই ধরনের সংবাদ কাঠামোর প্রথম ও শেষ উভয় অংশই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিতে ঠাসা থাকে। (চিত্র ৬)

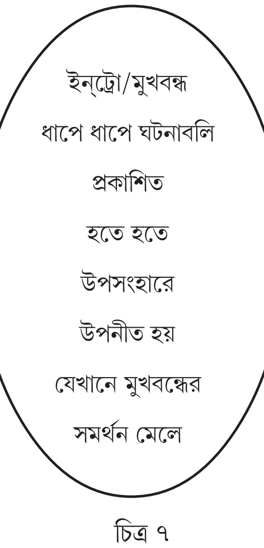

চিত্র ৭

ডিম্বাকৃতি কাঠামো (Goose Egg Organisation) : কোনও বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে সে বিষয়টি নিয়ে বৃত্তাকারে লেখার প্রথা একেবারে অজানা নয়। বস্তুত কুশলী / শৈলীনিষ্ঠ সাংবাদিক বা লেখকদের কোনও বিষয়ের উপস্থাপনা শৈলী আন্দাজ করা বড় কঠিন। যাঁরা খুব অভিজ্ঞ ও রীতিকুশল তাঁরা যে কোনও বিষয়-সংক্রান্ত সংবাদ যে কোনওভাবে শুরু করতে পারেন ও তাঁদের লেখার শেষ ছত্র পর্যন্ত পাঠকের কৌতুহল অটুটভাবে ধরে রাখতে পারেন। বহু উন্নতমানের সংবাদ, বাস্তবিকপক্ষে, বৃত্তাকারেই লেখা। তার মানে, কোনও একটি বিষয় নিয়ে সংবাদ লেখা শুরু হয় এবং সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টি শেষ পর্যন্ত প্রতিপন্ন হয়েছে সেটা সংবাদের উপসংহার বলা হয়। ‘গুজ এগ’ বা ডিম্বাকৃতি অবয়ব আসলে সনাতনী ঢঙে গল্প বলার এক পরীক্ষিত শৈলী। কোনও বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা মানে, প্রথম দৃশ্য শুরু হওয়ার পর ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ঘটনাবলী প্রকাশিত হতে থাকে এবং সবশেষে যে হিতোপদেশটি পাওয়া যায় তার যুক্তিগ্রাহ্য সমর্থন মেলে মুখবন্ধে বর্ণিত ঘটনাটি থেকেই। অর্থাৎ বৃত্তাকারে বা ডিম্বাকৃতি কাঠামোতে লেখার বা গল্প বলার রেওয়াজ সাবেককাল থেকেই প্রচলিত (চিত্র ৭)

সংবাদ লেখার এসব কাঠামো ছাড়াও অন্য কাঠামো হতে পারে। সেটা অবশ্যই সাংবাদিকের ব্যক্তিগত লিখনশৈলীর ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তাছাড়া বিষয় বিশেষে শৈলী ও বিন্যাস বদলাতেই পারে।

এসব ছাড়া বড় ধরনের যে গঠনশৈলী সাধারণত চোখে পড়ে সেটা অনেকটা একটি ক্ষুদ্র অংশকে পর্যবেক্ষণের

মধ্য দিয়ে বৃহত্তর বা সার্বিক বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করা। যেমন 'অনুপমের বয়স এখন দশ। তার কোনও কিছুরই অভাব নেই। বাবা-মা ভালো চাকরি করেন। তার সমস্যা একটাই—তাকে মাঝেমধ্যেই পেয়ে বসে এক অদ্ভুত হতাশা। ক্লাস পরীক্ষায় ভালো করতে না পারলেই সে বাড়ি ফিরে বসে থাকে এক কোণায়, কিছু খেতে চায় না। কখনও কখনও তার মনে হয় সবকিছু উড়িয়ে দেয় মেশিনগানের গুলিতে—অনেকটা টিভিতে দেখা নায়কদের কায়দায়।'

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই সংবাদের মধ্য দিয়ে পাঠককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটি সমসাময়িক সমস্যার দিকে। স্কুলব্যাগের বোঝায় ক্লান্ত, অত্যন্ত কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীতায় হেরে যাওয়ার ভয়ে আজকের অনেক শিশু/কিশোর/তরুণ-তরুণীই যে সমস্যার শিকার, এই সংবাদ সেই সমস্যারই ইঙ্গিতবাহী।

মানবিক উপাদান সম্বলিত এই ধরণের সংবাদ আজকাল প্রায়শই লেখা হয়ে থাকে। অবশ্যই খবর যে বিষয়বস্তুর ওপর লেখা হবে লেখার ভঙ্গি অনেকটাই তার ওপর নির্ভর করবে। কেউ যদি কোনও কঠিন বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়ে লিখতে চান, তাঁকে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব লঘু করেও সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষায় বিষয়টি উপস্থাপিত করতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্য বা অর্থনীতির খবরের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি একইভাবে প্রযোজ্য, যদিও সবটাই নয়। কারণ, মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক পরিভাষা অনেকটাই বোধগম্য, যেটা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবসময় বলা যায় না। একথা সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে, খবর লেখাটা হচ্ছে একইসঙ্গে পাঠককে তথ্য সরবরাহ করা এবং সেই কাজটি মনোহারিত্বের সঙ্গে করা।

লেখার ধরণ এমন হবে যা কিনা পাঠককে আকৃষ্ট করবে, কিন্তু লেখাকে বর্ণাঢ্য করতে গিয়ে ভারসাম্যহীন করে বড় করে ফেলা চলবে না। লেখার ওপরে দখল আনতে গেলে তাই প্রয়োজন প্রতিদিন যিনি যে ভাষায় লিখবেন সেই ভাষায় প্রচারিত যত বেশি সম্ভব সংবাদপত্র পড়া এবং লেখার বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা। ধ্রুপদী সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিশিষ্ট লেখকদের লেখাগুলি পড়লেও লেখার ভঙ্গিতে একটি নিজস্বতা সহজেই জন্মানো সম্ভব।

১.১.৪.১ সূচনা বা ইন্‌ট্রো লেখার নিয়ম

কী করে 'ইনট্রো' বা সংবাদের সূচনা লিখতে হয়? পরিবেশনযোগ্য সংবাদটির সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থেকে সংবাদটির 'ইনট্রো' বা 'লীড' লিখতে হবে এবং এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে 'ইনট্রো' হচ্ছে সংবাদটির সারাংশ। কর্মব্যস্ত পাঠক পুরো সংবাদটি পড়ার সময় না পেলে কেবলমাত্র ইন্‌ট্রোটুকু পড়েই যাতে প্রাথমিকভাবে সংবাদটি জানতে পারেন। সুতরাং সংবাদের সূচনা বা ইন্‌ট্রোতে যেন সংবাদটি-সংক্রান্ত কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এই প্রশ্নগুলি হচ্ছে, 'কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে'। ইংরাজিতে এগুলিকে বলা হয় "The Five Ws and one H : Who, What, When, Where Why and How। আজকাল যদিও 'ইনট্রো' লেখার ক্ষেত্রে অনেকরকম বৈচিত্র এসেছে তবুও চিরাচরিত পদ্ধতিতে লেখা ইন্‌ট্রোতে যে ছটি প্রশ্নের উত্তর নিহিত থাকবে তা খুবই অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক এবং ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য। যদি ইন্‌ট্রোতে বলা হয়, "গতরাতে প্রায় নটার সময় কাশীপুরে একদল সশস্ত্র লোক একটি ব্যাঙ্ক লুট করে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে পালায়"—তাহলেই পাঠক এক নজরে ঘটনাটি সম্পর্কে একটি ধারণা করে নিতে পারবেন।

কে : কেউ না কেউ কোনরূপ ক্রিয়াকলাপ যুক্ত বা কাউকে না কাউকে ঘিরে চলে সক্রিয়তা। এই ব্যক্তি

কে? কে বক্তৃতা দিলেন? কে মারা গেছেন? কে চুরির অভিযোগে ধরা পড়েছে? কখনও নাম হতে পারে, তাতে আবার আভিজাত্যসূচক খেতাব যুক্ত হতে, কখনও বা ব্যক্তির কোন একটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণও থাকতে পারে। নামের আগে খেতাব যথা, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারক, মেয়র, উপাচার্য ইত্যাদি লেখা হয়। সংক্ষিপ্ত বিবরণ যেমন, ছ-ফুট লম্বা এক নতুন খেলোয়াড়, ৩৫ বছর বয়সের এক বিলেত ফেরৎ ডাক্তার, মানসিক বিকারগ্রস্ত এক কয়েদি, ভিন রাজ্যের অসাধু কয়েকজন ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

কী : কী ঘটেছে বা কী হয়েছে? ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধারণত এই অংশে থাকে। যেমন, খোয়া গেছে, খুন হয়েছে, ডাকাতি হয়েছে, পালিয়ে গেছে, গ্রেফতার হয়েছে, বাজেট পেশ হয়েছে, আয়কর বেড়েছে, পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে ইত্যাদি। কখনও বা কিঞ্চিৎ বিবরণ থাকে। যেমন, কার্গিল যুদ্ধে নিহত জওয়ানের স্ত্রীকে সরকার পুরস্কার দিল, উত্তেজিত জনতা ইটপাটকেল ছোঁড়ে ও অফিস ঘর ভাঙচুর করে, গ্রাম থেকে শহরের আদালতে মামলা করতে আসা এক প্রৌঢ় প্রতারিত ইত্যাদি।

কেন : কোনও কোনও সময় খবরের ইন্ট্রোতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ একটা ঘটনা কেন ঘটলো সেটা ঠিক সেই মুহূর্তে জানা বা বোঝা যায় না। তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানা যায়, যেমন চালক গাড়িটির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বলেই দুর্ঘটনা হয়, প্রশ্নগুলি সম্পূর্ণ সিলেবাসের বাইরে ছিল বলেই কেমিস্ট্রি দ্বিতীয় পত্রের আবার পরীক্ষা হবে ইত্যাদি।

কবে / কখন : দৈনিক সংবাদপত্রে সাধারণত সপ্তাহের কোন দিনে ঘটনাটি ঘটেছে তার উল্লেখ করা হয় পাঠকের কাছে এটি খুবই প্রাসঙ্গিক, যেমন কোথায় ঘটেছে সেটাও খুবই প্রয়োজনীয় তথ্য। কখন কখনও নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্ট সময়েরও উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে, যেমন শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ যখন সব অফিস কাছারি বন্ধ হয়ে গেছে তখন দুর্বৃত্তরা এসে হানা দেয়, বুধবার লাঞ্চের সময় সবাই যখন অফিস থেকে বেরোতে শুরু করে ঠিক সেই সময় সুযোগ বুঝে প্রতারকটি বড়বাবুর ঘরে ঢুকে পড়ে ইত্যাদি।

কোথায় : কোলকাতায় না হাওড়ায় না নদীয়ায়—ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে না বললে সংবাদটি পাঠকের কাছে খুব বিভ্রান্তিকর মনে হবে। আবার শুধু কোলকাতায় বললেও ঘটনাস্থলটি পরিষ্কার হবে না, কোলকাতার কোথায় অর্থাৎ কোন রাস্তায়, এমন কি সম্ভব হলে সেখানকার উল্লেখযোগ্য কোন বাড়ি বা লাইব্রেরি বা স্মৃতিস্তম্ভর কাছে কিনা জানাতে পারলে পাঠক খুব খুশি হয় ও খবরটি সম্বন্ধে আরও বেশি আগ্রহী হয়।

অনেক সংবাদপত্রই সংবাদে উল্লিখিত ঘটনার স্থান ও কাল অর্থাৎ কোথায় ঘটেছে এবং কবে ঘটেছে তা লেখে না। এই সংবাদপত্রগুলি লেখে, আজ এখানে বা গতকাল এখানে। এই সংবাদপত্রগুলি ডেটলাইন ব্যবহার করে। অর্থাৎ এসব সংবাদপত্রের প্রতিটি প্রকাশিত সংবাদের প্রথম ছত্রের শুরুতেই একটি জায়গার নাম ও একটি তারিখ (অর্থাৎ যেখান থেকে যেদিন সংবাদটি লেখা হচ্ছে) উল্লেখ করা থাকে—সেটিকেই বলা হয় ডেটলাইন। যেমন—দিল্লি, ডিসেম্বর ২৫ বা কোলকাতা, জানুয়ারী ১২)।

কীভাবে : ঘটনাটি কীভাবে ঘটলো তা সাধারণত প্রকাশিত সংবাদটির মধ্য অংশে বিস্তারিতভাবে বলা থাকে। তবুও তার একটা ইঙ্গিত সংবাদের ইন্ট্রোতে থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন, বহুতল বাড়ির জঞ্জাল পরিষ্কার করার এক অভিনব পরিকল্পনা চালু করতে চলেছেন শহরের মেয়র অথবা বকেয়া বিক্রয়কর কীভাবে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করে স্কুলের মিড্-ডে মিল চালু করা যায় তা নিয়ে আলোচনায় বসতে চান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, স্কুল শিক্ষক

মন্ত্রী ও বাণিজ্য-কর মহাধ্যক্ষ ইত্যাদি।

সংবাদের লীড বা ইন্ট্রোতে যদিও "কে কী কেন কবে কোথায় এবং কীভাবে'-র উত্তর থাকাটা কাম্য, সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে গিয়ে খবরের সূচনা যেন তালগোল পাকানো শ্রুতিকটু বাক্যের সমষ্টি হয়ে না দাঁড়ায়। সংবাদের ভাষা হবে নির্ভুল, সরল, সংক্ষিপ্ত অথচ সাধারণের বোধগম্য। সব প্রশ্নের উত্তর যে একটি বাক্যের মধ্যেই থাকতে হবে বা সব প্রশ্নের উত্তর যে প্রথম প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদেই থাকতে হবে তাও নয়। ইন্ট্রো বা লীড এক প্যারাগ্রাফ থেকে শুরু করে তিন-চার প্যারাগ্রাফও প্রয়োজনবোধে হতে পারে। পাঠক যেন একবার পড়েই খুব সহজে সংবাদটি বুঝতে পারে।

১.১.৫ সারাংশ

মূল পাঠে সংবাদ ও প্রতিবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগই মূলত সংবাদ লেনদেন। তাছাড়া এই যুগটাই তথ্যের যুগ, তথ্য আদানপ্রদানের যুগ। তথ্যই শক্তি। তথ্যই সংবাদের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রতিনিয়তই এই বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হচ্ছে। সংবাদের সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে। সংজ্ঞা যাই হোক, সংবাদের বিষয়বস্তু সব সময়ই হবে নতুন, সময়োপযোগী, অর্থবহ ও কৌতূহলোদ্দীপক। নানা উৎস থেকে সংগৃহীত হয় তথ্য, যার ভিত্তিতে লেখা হয় সংবাদ। এই কাজ যাঁরা করেন তাঁদেরকে বলা হয় রিপোর্টার বা প্রতিবেদক। আর, সংবাদ মাধ্যমে যা প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় তা হচ্ছে সংবাদ, প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন হতে পারে সোজাসাপটা গরম খবর (হার্ড নিউজ) বা ভিন্নস্বাদের ভিন্নশৈলীর নরম খবর (ফিচার)।

খবর লেখার রীতি-পদ্ধতি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, প্রতিযোগিতার ফলে মানুষের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী বদলে যাচ্ছে। সংবাদ রচনার কাঠামো বা বিন্যাসভঙ্গিও নানারকম হয়। সূচনা বা মুখবন্ধ, মধ্যাংশ ও উপসংহার—সংবাদ এই তিনটি অংশে বিন্যস্ত থাকে। সূচনা বা ইন্ট্রোতেই "কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে"-র উত্তর বা সংবাদটির সারাংশ বোঝা যায়। কর্মব্যস্ত পাঠক যেন দ্রুত একজনরে ইন্ট্রোটুকু পড়েই প্রাথমিকভাবে সংবাদটি জানতে পারেন। সংবাদের ভাষা এমন সহজ ও সুখপাঠ্য হবে যে তা পাঠককে আকৃষ্ট করবে। কিন্তু কোনভাবেই সংবাদের ভাষা যেন ভারসাম্যহীন না হয়। এবং নিরপেক্ষতা না হারায়।

১.১.৬ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন:

১) সংবাদ স্তর বলতে কি বোঝেন?

২) পি.টি. আই কী?

৩) সাংবাদিক সম্মেলন বলতে কি বোঝেন?

৪) হার্ড নিউজ কী?

বড় প্রশ্ন:

১) সংবাদ কাকে বলে বা সংবাদের সংজ্ঞা কী?

২) প্রতিবেদন কাকে বলে?

৩) সংবাদের উৎস কী বা সংবাদ কীভাবে সংগ্রহ করা হয়?

৪) সংবাদ কত রকমের হয়? সংবাদের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করুন।

৫) হার্ড নিউজ ও সফ্‌ট্ নিউজ বা গরম খবর বা নরম খবরের পার্থক্য কী?

৬) সংবাদধর্মী ফিচার কাকে বলে?

৭) ফিচারের মূল উপাদান কী?

৮) সংবাদ লেখার প্রকরণগত পরিবর্তন ব্যাখ্যা করুন।

৯) সংবাদের রচনাশৈলী ও উপস্থাপনা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

১০) সংবাদ পরিবেশনের রীতির বা সংবাদের বিন্যাসভঙ্গির জ্যামিতিক ছক কত রকমের হয়। বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

১১) কীভাবে সংবাদের 'লীড' বা 'ইনট্রো' বা সূচনা/মুখবন্ধ লিখতে হয়? বা যে ছ'টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর সংবাদের 'লীড' বা 'ইনট্রো'তে পাওয়া উচিত সেগুলি ব্যাখ্যা করুন।

১.১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. *Professional Journalism* : M. V. Kamath, S. Chand

২. *Journalist's Hand* : M. V. Kamath

৩. *Basic News Writing* : Mevlin Mencher, Wm. C. Brown, Co. Publishers

৪. *সংবাদ প্রতিবেদন* : ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫. *সমাচার সম্পাদনা* : সৌরীন ব্যানার্জি, রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

একক ২ ❑ ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন, তদন্তমূলক প্রতিবেদন- সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থায় প্রতিবেদন লেখার নিয়ম ও পার্থক্য

১.২.০ গঠন
১.২.১ উদ্দেশ্য
১.২.২ প্রস্তাবনা
১.২.৩ ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন
১.২.৪ তদন্তমূলক প্রতিবেদন
১.২.৫ সংবাদপত্র ও সংবাদসংস্থায় প্রতিবেদন লেখায় নিয়ম ও পার্থক্য
১.২.৬ সারাংশ
১.২.৭ অনুশীলনী
১.২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১.২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা হলো

- ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন
- তদন্তমূলক প্রতিবেদন
- সংবাদপত্র / সংবাদ এজেন্সিগুলির প্রতিবেদনে পার্থক্য

১.২.২ প্রস্তাবনা

এই এককে ব্যাখ্যামূলক ও তদন্তমূলক সাংবাদিকতার জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি এখানে আলোচিতত হয়েছে।

১.২.৩ ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন

আধুনিক পৃথিবীতে খবর পরিবেশনের অন্যতম জনপ্রিয় পদ্ধতি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন। নামকরণ থেকে স্পষ্ট যে এই ধরনের প্রতিবেদনে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়। কেবলমাত্র কোনও ঘটনার উল্লেখ নয়, এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য হল ঘটনাকে কার্য-কারণ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা। সেই কারণে নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ পরিবেশন করে বা ব্যাখ্যা করা এই প্রতিবেদনের অন্যতম চাহিদা। প্রত্যেক ঘটনারই কিছু প্রচ্ছন্ন দিক থাকে, থাকে প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক দৃষ্টিকোণ। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ত্রিমাত্রিক এক প্রক্রিয়া। অতীতের প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করাই এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য। রসকু ড্রামণ্ড (Roscoe Drummond) নামে আমেরিকার এক বিখ্যাত ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদকের

মতে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের অর্থ হল গতকালের পশ্চাদপটে আজকের ঘটনাকে বিচার করে আগামীকালের অর্থপ্রদান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঝোঁক দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। কার্টিস ডি. মাকডুগাল (Curtis D. MacDougal) তাঁর Interpretative Reporting গ্রন্থে লিখেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন মার্কিনীরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এর কারণ তাঁর বুঝতে পারেন নি। এর ফলে সংবাদ রচনাশৈলীতে পরিবর্তন দেখা যায়। এর ফলে ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন অধিকাংশ মার্কিনী অবাক হননি।

ম্যাকডুগাল-এর মতে সাংবাদিককে পরিদর্শকের উর্দ্ধে উঠতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি একজন ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিককে মনে রাখতে হবে যে কোন খবরই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই ঘটনার পারম্পর্যে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর কাজ। যুক্তিবোধ, গবেষণাধর্মিতা তাই একজন ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকের অবশ্যম্ভাবী চরিত্র।

আজকের সমাজে ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতার জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। ওয়াল্টার লিপম্যান একদা বলেছিলেন সমাজ যত জটিল ও অস্পষ্ট হবে খবরের পশ্চাদপট ততই গুরুত্বপূর্ণ হবে। একথা কতটা প্রাসঙ্গিক তা বর্তমমানে প্রমাণিত। এছাড়াও বর্তমান সময়ে উদ্দীষ্ট পাঠক/দর্শক (Target audience) মূল সংবাদ পেয়ে যান খুব তাড়াতাড়ি। মূলত টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনও একটি খেলার সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে টেলিভিশনে। তখন উদ্দীষ্ট দর্শক খেলার প্রতিটি মুহূর্তের অগ্রগতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এমনকি সরাসরি সম্প্রচার না হলেও খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বা কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিভিশনের মাধ্যমে খেলার ফলাফল সম্প্রচারিত হয়। তখন পরের দিনের সংবাদপত্রে কেবলমাত্র খেলার ফলাফল প্রকাশ করলে মাধ্যমটি তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলবে। তাই স্বল্প পরিসরে ফলাফল জানানোর পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ফলাফলের ব্যাখ্যা, বিশেষজ্ঞের মতামত। এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালের কথাই ধরা যাক না কেন। ফলাফলের পাশাপাশি টস জিতে ভারতের ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত অথবা ভারতীয় বোলারদের ব্যর্থতা কেবল সংবাদপত্রেই আলোচিত হয়নি। এমনকি টেলিভিশনেও খেলা-সংক্রান্ত অন্যান্য অনুষ্ঠানে ফলাফলের পাশাপাশি এই ব্যাখ্যামূলক আলোচন উঠে এসেছে।

ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ঘটনার নিরস প্রতিবেদন নয়। বরং তা লক্ষ্য দর্শককে শিক্ষিত করে, 'কে' এবং 'কি'র স্বল্প পরিসর থেকে 'কেন' এবং 'কিভাবে'-র বৃহৎ প্রেক্ষাপটে নিয়ে যায়।

১.২.৪ তদন্তমূলক প্রতিবেদন

তদন্তমূলক প্রতিবেদন বলতে বোঝায় জনস্বার্থে রচিত এক বিশেষ ধরনের প্রতিবেদন। সুগভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে জনস্বার্থের পরিপন্থী আপাত লুক্কায়িত কোন তথ্যকে উন্মোচিত করাই মূলত তদন্তমূলক প্রতিবেদন বলে পরিচিত। পল এন উইলিয়ামস্ (Paul N. Williams) -এর মতে এটি একটি বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া, কেবলমাত্র তথ্যের অনুসন্ধান নয়, বরং তথ্যের ভিত্তিতে এই ধরনের প্রতিবেদনে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। কিন্তু সেখানে আবেগ বা পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্তের কোন স্থান নেই।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতার নির্ভীক চরিত্রের মধ্যে অনেকে সমাজে বিবেকের কণ্ঠস্বর খুঁজে পান। জাস্টিস এ এন. গ্রোভার (A. N. Grover) তাঁর Press and Law বইতে ক্লার্ক আর মলেনহফ (Clark R Mollenhoff)-এর Investigative Reporting বইটির মুখবন্ধ থেকে তদন্তমূলক সাংবাদিকতা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন।

সেগুলি হল—

- এটি সাংবাদিকের নিজস্ব কাজ। অন্য কোনও ব্যক্তি তাঁকে সহায়তা করতে পারেন, কিন্তু সাংবাদিকের ভূমিকাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ;
- এই তদন্তের বিষয় অবশ্যই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়া প্রয়োজন; এবং
- জনগণের কাছ থেকে সত্য গোপন করার বা মিথ্যা চাপিয়ে দেওয়ার কোনও প্রচেষ্টা থাকা চলবে না।

সাধারণত অন্যায়, অপরাধ, অর্থ ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি তদন্তমূলক সাংবাদিকতার বিষয় হতে পারে। এছাড়াও সমাজ তথা জনগণের জন্য জরুরি যে কোনও বিষয়ই তদন্তমূলক প্রতিবেদনের বিষয় হতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক অভিপ্রায় বা পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত এ ধরনের সাংবাদিকতার চরিত্রহানি ঘটায়।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতা জনপ্রিয়তা অর্জন করে ওয়টারগেট কেলেঙ্কারির ঘটনা থেকে। ১৯৭২ সালের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে ওয়াশিংটনের ওয়াটারগেট হোটেলে অবস্থিত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদর দপ্তরে আড়িপাতার যন্ত্র বসানো হয়েছিল এবং এই ঘটনায় মদত দিয়েছিলেন খোদ প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং রিপাবলিকান পার্টি—এই তথ্য তদন্দমূলক অনুসন্ধান করে উদ্ধার করেন ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার দুই তরুণ সাংবাদিক কার্ল বার্নস্টেইন (Carl Bernstein) এবং বব উডওয়ার্ড (Bob Woodward)। এই তদন্তের ফলে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়।

বার্নস্টেইন এবং উডওয়ার্ড ওয়াটারগেট ঘটনায় গ্রেপ্তার চার ব্যক্তিকে জেরা করার মধ্যে দিয়েই কাজ শুরু করেছিলেন। তদন্তের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই পরবর্তী ঘটনাসমূহ প্রকাশিত হয়। তাঁরা বলেছিলেন, "আমরা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইনি, আমরা কেবল খবরটাকে তাড়া করেছিলাম।" এরকমই কোনও ঘটনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থেকে তদন্তমূলক প্রতিবেদন তৈরি হয়। পুলিৎজার জয়ী সাংবাদিক রবার্ট গ্রিন এই বিষয়টিকেই বলেছেন খবর শোঁকা। এর ভিত্তিতেই তদন্তের প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথি, প্রমাণ ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সাংবাদিককে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

ভারতবর্ষে তদন্তমূলক সাংবাদিকতা শুরু হয় মূলত ১৯৭৭ সালে আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হবার পর। বিশেষত ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রে সেসময় এই ধরনের বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ভাগলপুর জেলে বন্দীদের পুলিশ কর্তৃক অন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা, কুয়ো তেল কেলেঙ্কারি, বোফর্স কেলেঙ্কারি, হাওলা কেলেঙ্কারি থেকে সাম্প্রতিককালের তহেলকা কাণ্ড বা কার্গিল যুদ্ধের সময় কফিন কেলেঙ্কারির মত অজস্র তদন্তমূলক প্রতিবেদন ভারতের সাংবাদিকতার ধারাকে পুষ্ট করেছে।

ওয়াল্টার লিপম্যান বলেছিলেন সমাজ যত জটিল হবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের গুরুত্ব এবং ক্ষেত্র তত প্রসারিত হবে। বর্তমান জটিল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যায়-অবিচারের সংখ্যা যত বাড়ছে ততই প্রসারিতহচ্ছে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার সুযোগ। কিন্তু এর পাশাপাশি সাংবাদিক তথা সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্বও বাড়ছে। তদন্তমূলক সাংবাদিকতার লক্ষ্য জনস্বার্থে কোনও ঘটনার লুক্কায়িত দৃষ্টিকোণ যথাযথ তথ্যের সাহায্যে উন্মোচন করা। এক্ষেত্রে মিথ্যা বা অর্ধসত্যের কোনও স্থান নেই। কারণ তাতে জনস্বার্থই লঙ্ঘিত হয়। কিন্তু আজকের মারাত্মক প্রতিযোগিতার মাঝে সাংবাদিকের

সামনে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার নামে মিথ্যা বা অর্ধসত্য প্রচারের টোপও প্রচুর। এরকম ঘটনার উদাহরণ দেশে বিদেশে খুব কমও নয়। কিন্তু সমাজের বিবেকের কে কণ্ঠস্বর প্রকৃত তদন্তমূলক সাংবাদিকতা প্রকাশ করে, এ ধরনের প্রবণতা তার পরিপন্থীই কেবল নয়, এই ঘটনা সংবাদ মাধ্যমের প্রতি জনগণের আস্থাও কমিয়ে দেয়। স্বভাবতই তদন্তমূলক সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতার স্বার্থেই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতা বা অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা সম্পর্কে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের মতামত নীচে উল্লিখিত হল—

অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা, আদর্শ ও এক্তিয়ার :

অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনে তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে

(ক) এটি কোনও সাংবাদিকেরই কাজ হতে হবে, অন্য কারোর নয়

(খ) এ বিষয়টি জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট হতে হবে

(গ) জনসাধারণের থেকে সত্যকে গোপন রাখার একটি প্রয়াস চলে

(১) প্রথম আচরণবিধিটি (ক) এর প্রয়োজনীয় অনুসিদ্ধান্তের অনুসারী। এই অনুসিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথাগতভাবেই তদন্তকারী সাংবাদিককে তাঁর লেখাটি সেইসব তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে যেগুলির অনুসন্ধান, অনুবেক্ষণ এবং সত্যতা নিরূপণ তিনি স্বয়ং করেছেন। তৃতীয় কোনও পক্ষের আহরিত তথ্য যা কোনও প্রত্যক্ষ, নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে স্বয়ং সাংবাদিক কর্তৃক পরীক্ষিত নয়—তার ভিত্তিতে লেখাটি তৈরি করা উচিত নয়।

(২) কোন কোন বিষয় প্রকাশ করা উচিত কোন কোন বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন, এ ব্যাপারে একটা সংঘাত দেখা দিতে পারে। তদন্তকারী সাংবাদিককে সেগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং একদিকে উন্মোচন ও অন্যদিকে গোপনীয়তার মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে, তবে সবার ওপরে জনকল্যাণকে স্থান দিয়েই এটা করতে হবে।

(৩) তদন্তকারী সাংবাদিককে অপরিণত, অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট তথ্য, যা স্বয়ং সাংবাদিক কর্তৃক কোনও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সম্পূর্ণভাবে যাচাই করা নয়, সেগুলি থেকে ঝটিতি ভেলকিবাজির মতো চমকপ্রদ কিছু তৈরি করে ফেলার লোভ সংবরণ করতে হবে।

(৪) কাল্পনিক তথ্যকে ভিত্তি করার, অস্তিত্বহীন কোনও কিছুকে খুঁচিয়ে বার করার বা কারণ ব্যতিরেকেই অনুমান করার প্রবণতাকে সতর্কভাবে এড়িয়ে চলা উচিত। যত বেশি সম্ভব তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে, সেগুলি কাজে লাগাতে হবে এবং প্রেসে পাঠানোর মুহূর্ত পর্যন্ত যতটা সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(৫) সংবাদপত্রগুলির তথ্যের সত্যতা ও যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য কঠোর নির্দেশ থাকা উচিত। তদন্তের রায়গুলিকে বিষয়গতভাবে পরিবেশন করা উচিত, অতিরঞ্জন বা বিকৃতি ব্যতিরেকে।

(৬) সাংবাদিকের তদন্তাধীন বিষয় অথব প্রশ্নটি নিয়ে এমনভাবে এগোনো উচিত নয়, যাতে তিনি নিজেই

অভিযোক্তা অথবা মামলার অধিবক্তা হয়ে যান। সাংবাদিকের মনোভাব হওয়া উচিত স্পষ্ট, সঠিক এবং নিরপেক্ষ। বিবেচ্য বিষয়টির পক্ষের ও বিপক্ষের সমস্ত তথ্যগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখার পর সেগুলি স্পষ্টভাবে এবং আলাদাভাবে বিবৃত করা উচিত যার মধ্যে থাকবে না কোনও একতরফা সিদ্ধান্ত বা পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্য। প্রতিবেদনটি সুরে অন্তর্বস্তুতে হওয়া উচিত পরিমিত, শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ, ঠিক এমনটি হওয়া উচিত তার ভাষাও। কখনোই অপ্রয়োজনীয়ভাবে আক্রমণাত্মক, কণ্টকাকীর্ণ, বিদ্রূপাত্মক এবং ভর্ৎসনামূলক হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে যখন সেই ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া হয় যার অভিযোগে বর্ণিত কার্যকলাপ অথবা অশোভন আচরণ নিয়ে তদন্ত চলছে। অথবা তদন্তকারী সাংবাদিকের কাজকর্ম এবং অশোভন আচরণ তদন্তাধীন হয়েছে তার বিরুদ্ধে অপরাধ অথবা নিরপরাধের রায় এমনভাবে দেওয়া উচিত নয় যাতে মনে হয় তিনি (সেই সাংবাদিক) একজন বিচারক হিসাবে অভিযুক্তের বিচার করছেন।

(৭) একটি প্রতিবেদনের তদন্ত, উপস্থাপনা ও প্রকাশনার গোটা প্রক্রিয়ায়, তদন্তকারী সাংবাদিক/সংবাদপত্রের অপরাধ ব্যবহারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এই নীতি অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগকৃত অপরাধ যতক্ষণ পর্যন্ত না নিরপেক্ষ, নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণাদির দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিরপরাধ।

(৮) কারও ব্যক্তিগত জীবন, কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির হলেও, তা তার একান্ত নিজস্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনও ব্যক্তির অপরাধ / অন্যায়ের সঙ্গে তার সরকারি পদ বা ক্ষমতার অপব্যবহার জড়িত থাকার তথা জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত জীবন ও তার গোপনীয়তার উন্মোচন অনুমোদনযোগ্য নয়।

(৯) একজন সাংবাদিকের তদন্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধির স্পষ্ট প্রয়োগ হতে পারে না। তবুও সেগুলির অন্তর্নিহিত মৌলিক নীতিগুলিকে সমদর্শিতা, নৈতিকতা এবং বিবেকের ভিত্তিতে পথনির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

১.২.৫ সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থায় প্রতিবেদনে লেখার নিয়ম ও পার্থক্য

সংবাদপত্র এবং সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের কাজ সংবাদ সংগ্রহ। দ্রুত প্রতিবেদন (কপি) লিখে ফেলা। মনে রাখা প্রয়োজন , দুটি ক্ষেত্রেই একজন সাংবাদিককে একাধিক কপি লিখতে হয়। প্রতিটি প্রতিবেদনেই সমান গুরুত্ব দিতে হয়। আর সাংবাদিকের প্রতিবেদনের উপর সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে। সেই কারণে প্রতিবেদন লেখার সময় সাংবাদিকদের কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখতেই হয়। যেমন—

সঠিক শব্দ ব্যবহার : সংবাদ প্রতিবেদন যে ভাষাতেই লেখা হোক না কেন, সঠিক শব্দ যেন প্রয়োগ করা হয়। যেমন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও প্রতিবেদন লেখার সময় কখনও ‘কলকাতা কলেজ’ লেখা চলবে না।

ব্যাকরণগত ত্রুটি না থাকে : প্রতিবেদনের ভাষা যেন ব্যাকারণগত ত্রুটিমুক্ত হয়। লেখা দারুণ, কিন্তু ব্যাকরণগত ভুল থাকলে তা মোটেই সাংবাদিকের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে না।

বাক্য সহজ-সরল : প্রতিবেদন পড়তে যেন পাঠকের অসুবিধা না হয়। পড়ার পর যেন পাঠকের মনে ভাল লাগা তৈরি হয়। এটা তখনই সম্ভব যখন প্রতিবেদনের বাক্য সহজ-সরল হবে।

অশ্লীল শব্দ নয় : সংবাদ প্রতিবেদনে অশ্লীল শব্দের ব্যবহার সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের মর্যাদা নষ্ট করে এবং পাঠকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

তথ্যের সত্যতা যাচাই : প্রতিবেদন ভাল লেখার অন্যতম শর্ত হল তথ্যের সত্যতা যাচাই করা। প্রকাশিত প্রতিবেদনে তথ্য ভুল হওয়া মানে সাংবাদিকের কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আবার মনে রাখতে হবে, যা তথ্য দেওয়া হচ্ছে তা যেন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা না হয়।

ইন্ট্রো সংবাদের সারাংশ : প্রতিবেদন লেখা হয় মূলত উল্টোনো পিরামিড কাঠামো অনুসরণ করে। অর্থাৎ মূল খবরটাই যেন প্রতিবেদনের প্রথমেই বা ইন্ট্রোতে দেওয়া থাকে। যাতে করে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা না হয় যে খবরটা কী। মূল খবরটা প্রথমেই বুঝতে না পারলে প্রতিবেদনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে পাঠক।

একই শব্দ এড়িয়ে যাওয়া : প্রতিবেদন লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে, একই শব্দ যেন বারবার ব্যবহার না হয়। চেষ্টা করা যতটা সম্ভব একই শব্দ এড়িয়ে যাওয়া। প্রয়োজনে একই শব্দের সমার্থক শব্দ লেখা যেতে পারে।

শৈলী আকর্ষক : এক-একটি বিষয়ের প্রতিবেদন আলাদা আলাদা লিখন শৈলী হয়। সাংবাদিককে সেদিকে অবশ্যই নজর দিতে হয়। লিখন-শৈলী যেন আকর্ষণীয় হয়, তা খেয়াল রাখতে হবে। সোজা ব্যাপার হল, শিক্ষাবিষয়ক কপি লেখার ধরনের সঙ্গে কখনও ক্রীড়াবিষয়ক কপি এক হবে না। আবার রাজনৈতিক কপির সঙ্গে স্বাস্থ্যের প্রতিবেদন লেখার ধরন এক হবে না।

বিজ্ঞাপনধর্মী যেন না হয় : প্রতিবেদন যেন ব্যক্তি বা সংস্থার স্বার্থবাহী বিজ্ঞাপন না হয়ে যায়।

আইনগত সমস্যা থেকে মুক্ত : সাংবাদিককে কপি লেখার সময় অবশ্যই প্রেস আইন এবং সংবিধান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রকাশিত প্রতিবেদন ভবিষ্যতে আইনগত সমস্যার মধ্যে না পড়ে।

ভারতের সংবাদ সংস্থা

পিটিআই : ভারতের বৃহত্তম সংবাদ সংস্থা (নিউজ এজেন্সি) হল প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া বা পিটিআই। বর্তমানে পিটিআই-এর সদর দফতর দিল্লিতে। দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে পিটিআই ইংরেজি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। ছবিও প্রদান করে। প্রায় ৪৫০টি ভারতীয় সংবাদপত্র পিটিআই-এর গ্রাহক। এর মধ্যে যেমন রয়েছে 'হিন্দুস্তান টাইমস', 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' তেমনই আছে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'এই সময়'। সর্বভারতীয় সকল নিউজ চ্যানেল এবং দূরদর্শন কিংবা অল ইন্ডিয়া রেডিও-র মতো সরকারি মাধ্যমগুলিও গ্রাহক। ভারতে ১৫০টির বেশি দফতর রয়েছে। পিটিআই-এর। ব্যাঙ্কক, বেজিং, কলম্বো, ইসলামাবাদ, কুয়ালামপুর, মস্কো, রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্কেও সংস্থার প্রতিনিধি রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার পিটিআই একমাত্র সংবাদ সংস্থা যার নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ (ইনস্যাট) সম্প্রচার ব্যবস্থা রয়েছে।

১৯১০ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রথম সংবাদ সংস্থা 'এপিআই'-এর (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া) পথচলা শুরু হয়। তবে ১৯১৯ সালে এপিআই-কে অধিগ্রহণ করে রয়টার্স। যদিও তখনও এপিআই-এর নামই ব্যবহার

হত। এত কিছু সত্ত্বেও ভারতের নিজস্ব কোনও সংবাদ সংস্থা ছিল না। সেই কারণে, ১৯৪৭ সালের ২৭ আগস্ট মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) প্রকাশ ঘটল 'এপিটিআই'-এর। ১৯৪৯ সালের ১ ফ্রেব্রুয়ারি এপিটিআই-এর সমস্ত কার্যভার গ্রহণ করে সংবাদ সংস্থা হিসাবে কাজ শুরু করল পিটিআই। যদিও রয়টার্সের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই কাজ শুরু হয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালে স্বাধীন সংবাদ সংস্থা হিসাবে কাজ শুরু করল পিটিআই। জরুরি অবস্থার সময় পিটিআই-এর স্বাধীনতা কিছুটা কমে ছিল। ১৯৮৪ সালে বিদেশেও পিটিআই-এর পরিষেবা শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে সূচনা পিটিআই টিভি-র। ১৯৮৭ সালে পিটিআই-এর ছবি প্রদানকারী পরিষেবা চালু হয়। ১৯৯৯ সালে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত হয় পিটিআই। ২০০৩ সাল থেকে সরকারি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পিটিআই-এর পরিষেবা শুরু করে।

ইউএনআই (ইউনাইটেড নিউজ অফ ইন্ডিয়া) : ভারতের জনপ্রিয় সংবাদ সংস্থা হল ইউএনআই বা ইউনাইটেড নিউজ অফ ইন্ডিয়া। ১৯৫৯ সালে সংবাদ সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত হয় এটি। ১৯৬১ সালের ২১ মার্চ থেকেই কাজ শুরু করে এটি। ইংরেজি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে।। ১৯৮২ সালে এই নিউজ এজেন্সিটি হিন্দিতেও সংবাদ সরবরাহ শুরু করে। বর্তমানে উর্দুতেও সংবাদ সরবরাহ করে ইউএনআই। ছবিও প্রদান করে এরা।

ইউএনআই প্রথম সংবাদ সংস্থা যারা আন্দামান নিকোবর সংবাদ প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন শহরের পাশাপাশি দুবাই, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, ইসলামাবাদ, ঢাকা, কলম্বো, সিডনিতেও এখানকার সাংবাদিক রয়েছে। বিশ্বের প্রায় এক হাজারটি প্রচারমাধ্যম ইউএনআই-এর গ্রাহক।

হিন্দুস্তান সমাচার : ভারতীয় ভাষায় প্রায় ১৪০টির মতো গ্রাহককে সংবাদ সরবরাহ করে হিন্দুস্তান সমাচার। বাংলা, হিন্দি সহ ১০টি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে এটি। কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে এই নিউজ এজেন্সির দফতর রয়েছে। হিন্দিতে সংবাদ সরবরাহের জন্য হিন্দুস্তান সমাচার প্রথম দেবনগরী অক্ষরের টেলিপ্রিন্টার চালু করে। ১৯৪৮ সালে এস এস আপ্তে ব্যক্তি মালিকানাধীনে এই সংবাদ সংস্থাটি তৈরি করেন। ১৯৫৭ সালে সমবায়ভিত্তিক মালিকানাধীনে চলে আসে এই সংবাদ সংস্থাটি।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থাগুলির মধ্যে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য 'আইএএনএস' (ইন্দো এশিয়ান নিউজ সার্ভিস) দেশের বেশ কয়েকটি নামী সংবাদপত্র এই নিউজ এজেন্সির গ্রাহক। ইংরেজি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে। ছবিও প্রদান করে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থা এটি। দিল্লিতে এই সংস্থাটির সদর দফতর।

বিদেশি সংবাদ সংস্থা

রয়টার্স : বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবাদ সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'রয়টার্স'। লণ্ডনে এই সংবাদ সংস্থাটির সদর দফতর। ১৮৫১ সালে পল জুলিয়াস রয়টার এই সংবাদ সংস্থাটি তৈরি করেন। যদিও ১৮৫৮ সাল থেকে সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশন শুরু করে রয়টার্স। বিশ্বের প্রায় ৯৪টি দেশের ২০০টির শহরে দফতর রয়েছে এই সংবাদ সংস্থাটির। ২০টি ভাষায় সংবাদ পরিবেশন করে। ছবিও প্রদান করে সংস্থাটি। গোটা বিশ্বে এই সংস্থাটির প্রায় কয়েক হাজার সাংবাদিক ছড়িয়ে রয়েছে। ভারতের নামী সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেগুলি রয়টার্স থেকে খবর সংগ্রহ করে। 'স্কুপ নিউজ' প্রথম পরিবেশক হিসাবে খ্যাতি রয়েছে রয়টার্সের। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের হত্যার খবর প্রথম প্রকাশ করেছিল রায়টার্স।

এএফপি : বিশ্বের প্রাচীনতম সংবাদ সংস্থা 'এএফপি' (Agence France-Presse)। সংবাদ সংস্থাটি ফ্রান্সে অবস্থিত। ১৮৩৫ সালে প্যারিসে চালর্স-লুই-হাভাস এটি তৈরি করেন। তখন সংবাদ সংস্থাটির নাম ছিল 'এজেন্সি হাভাস'। পল রয়টার এবং বার্ণহার্ড উলফ প্রাথমিকভাবে এএফপি-র কর্মী ছিলেন। কিন্তু ১৮৪৮ সালে তাঁরা নিজস্ব সংবাদ সংস্থা তৈরি করেন। ওই সময় এই সংবাদ সংস্থার জনপ্রিয়তায় কিছুটা ভাটা পড়ে। তা সত্ত্বেও ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের এএফপি সংবাদ সংস্থা ক্ষেত্রে আধিপত্য বজায় রেখেছিল। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সে আধিপত্য বিস্তার করে জার্মানি। তখন ফের সংস্থাটির স্বাধীনতা খর্ব হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সাল নাগাদ সরকারিভাবে এএফপি ফের কাজ শুরু করে। সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক জোসেফ স্তালিনের মৃত্যু সংবাদ প্রথম প্রকাশ করেছিল এএফপি। ১৯৫৭ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে স্বাধীন সংবাদ সংস্থার মর্যাদা পায় এএফপি। ইংরেজির সঙ্গে ফরাসি, স্প্যানিস, জার্মান, পর্তুগিজ ও আরবি ভাষাতেও খবর পরিবেশন করে। ছবি পরিবেশনের জন্য বিশেষ খ্যাতি রয়েছে এএফপি-র। হংকং, ওয়াশিংটন, মন্টেভিডিও এবং নিকোসিয়ায় সংস্থাটির আঞ্চলিক দফতর রয়েছে। বিশ্বে ১৫০টি দেশে দফতর রয়েছে।

এপি : আন্তর্জাতিক সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলির মধ্যে বৃহত্তম হল 'এপি' (Associated Press) ১৮৪৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি সংবাদপত্র মিলে প্রাথমিকভাবে এপি চালু করেছিল। ওই সময় 'নিউ ইয়র্ক অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' নামে পরিচিত ছিল। ১৯০০ সালে সরকারিভাবে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস নামে পথ চলা শুরু করে। মেক্সিকো-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে এই নিউজ এজেন্সিটি প্রচারের আলোয় আসে। মার্কনির বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্যের আদানপ্রদান শুরু করে এপি। ১৯১৪ সালে টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে সম্প্রচার শুরু করে এপি। ১৯৩৫ সালে ছবি প্রদানকারী পরিষেবার সূচনা করে। ১৯৪১ সালে রেডিও পরিষেবাও শুরু করে। এটি ১৯৯৪ সালে লণ্ডনের দফতরে বসে ভিডিও ফুটেজ সম্প্রচার শুরু করে। ২০০৬ সালে ইউটিউবের সঙ্গে যুক্ত হয় এপি। ২০০৮ সালে মোবাইলে এপি-র সংবাদ পরিষেবা শুরু হয়। ইংরেজি, জার্মান, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ ও আরবি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে। বিশ্বের ১২০টি দেশে ২৪৩টি দফতর আছে। বিশ্বের ১৭০০টির বেশি সংবাদপত্র এপি-র গ্রাহক। পাঁচ হাজারের বেশি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম এপি-র সংবাদ সম্প্রচার করে। রিপোর্টিংয়ে 'উল্টো পিরামিড' (Inverted Pyramid) তত্ত্বে সংবাদ সম্প্রচার শুরু করেছিল এপি।

সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থায় কাজের (রিপোর্টিং) ধরনের মধ্যে পার্থক্য

সংবাদপত্রের রিপোর্টার এবং সংবাদ সংস্থার রিপোর্টারের কর্তব্য, দায়িত্ববোধ, কাজের উদ্দেশ্য একই-সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তা পাঠকের মধ্যে প্রচার করা। দুই সাংবাদিকের দিনের অধিকাংশ সময়টাই কেটে যায় খবর সংগ্রহ করার কাজে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের রিপোর্টার এবং সংবাদ সংস্থার রিপোর্টারের কাজের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য থেকেই যায়। এগুলি হল :

সংবাদ সংগ্রহের সময়ের পার্থক্য : পাঠকের কাছে সংবাদপত্রের 'খবর' পৌঁছয় প্রত্যেকদিন ভোরে। সংবাদপত্র ছাপা হয় রাতে। তাই সংবাদপত্রের সাংবাদিকের কাছে দিনের বেশিরভাগ সময়ই তার হাতের মুঠোয়। কোনও ঘটনা ঘটার পর ওই সাংবাদিক বেশি কিছুটা সময় পায়। সকালে কোনও ঘটনা ঘটলে সাংবাদিক মোটামুটি ১০-১২ ঘন্টা সময় পেয়ে যান খবর সংগ্রহ ও পরিবেশনের জন্য। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিককে খবর পাঠাতে হয় না। হাতে বেশি কিছুক্ষণ সময় মেলে।

কিন্তু সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকের কাছে বিশেষ সময় থাকে না। ঘটনা ঘটার অল্প সময়ের মধ্যেই সেই খবর সংগ্রহ

করতে হয়। সেই খবর দ্রুত সংবাদ সংস্থাকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হয়। সেই কারণে, সংবাদ সংস্থার কাজের অন্যতম শর্তই হল গতি। যে গতির সঙ্গে সংবাদপত্রের কাজের কোনও তুলনাই চলে না।

সংবাদ বাছাইয়ে পার্থক্য : সংবাদপত্রের সাংবাদিককে তার 'বিট'-এর (বিটের অর্থ যে বিষয়টি দেখেন। সেটা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি হতে পারে) সমস্ত খবর সংগ্রহ করতে হয় না। সাংবাদিক প্রয়োজন মনে করলেন দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বা দুটি খবর সংগ্রহ কিংবা পরিবেশন করতে পারে। এমনকী, সাংবাদিক অনেকগুলি খবর সংগ্রহ করলেও তিনি হয়তো খবরের কাগজের জায়গা বুঝে একটি বা দুটি খবর পরিবেশন করে। সোজা কথা, সংবাদপত্রের সাংবাদিকের খবর বাছাই করে সংগ্রহ কিংবা পরিবেশনের অনেক স্বাধীনতা রয়েছে।

কিন্তু সংবাদ সংস্থার সাংবাদিককে 'ছোট' কিংবা 'বড়'-সমস্ত খবরই সংগ্রহ এবং তা দ্রুত পরিবেশন করতে হয়। প্রতিটি খবরের পিছনেই সমান গুরুত্ব দিয়ে হয় সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের। খবর বাছাইয়ের তেমন একটা স্বাধীনতা তাদের মেলে না।

ডেডলাইনে পার্থক্য : সংবাদপত্রের সাংবাদিকের কাছে 'ডেডলাইন' হল দিনের শেষে কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা। ওই সময়ের মধ্যে সকল সাংবাদিককে সংগৃহীত খবর লিখে দিতে হয়। প্রতিটি সংবাদপত্রের এই 'ডেডলাইন' নির্ধারিত হয় এক এক রকম সময়ে। এমনকী, কোনও খবরের আপডেট হলেও সাংবাদিক প্রয়োজন মনে করলে তা সংগ্রহ করতে নাও পারে। আরও একটি বিষয় নজরে রাখতে হয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের নির্ধারিত শব্দ সংখ্যার মধ্যেই সাংবাদিকদের রিপোর্ট লিখতে হয়। নিজের ইচ্ছে মতো প্রতিবেদন লেখা যায় না। অর্থাৎ কোনও একটি সংবাদের জন্য খবরের কাগজে যতটা জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যেই রিপোর্টারকে প্রতিবেদনটি অবশ্যই শেষ করতে হবে।

কিন্তু সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট কোনও ডেডলাইন নেই। প্রতি মুহূর্তই ডেডলাইন। ইন্টারনেটের দুনিয়ায় প্রতিটি সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক বর্তমানে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি। কেননা, সাংবাদিক যদি দ্রুত খবর পৌঁছে দিতে না পারে, তাহলে তার ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। এমনকী, কোনও খবরের 'আপডেট' যত রাতেই হোক না কেন সেটাও দ্রুত সংবাদ সংস্থার সাংবাদিককে পুরো তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তা দ্রুত পাঠাতেও হয়। আবার শব্দ সংখ্যার ব্যাপারে সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের কিছুটা হলেও স্বাধীনতা রয়েছে। কোনও সংবাদে সাংবাদিক যতটা তথ্য পেয়েছে প্রয়োজন মনে করলে সমস্তটাই লিখতে পারে। প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে শব্দ সংখ্যার ভয় তেমন একটা তাড়া করে না এই সাংবাদিকদের।

সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে পার্থক্য : সংবাদপত্রের সাংবাদিকতা কোনও খবরকে নিজস্ব বিশ্লেষণ এবং ভাষাশৈলীর মাধ্যমে পরিমার্জিত করে পরিবেশন করতে পারে। অনেক সময়ই কোনও খবরকে সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের 'হাউজ পলিসি' অনুযায়ী নিজস্ব রং চড়িয়ে এবং বিকৃত করে পরিবেশন করার সুযোগ রয়েছে। এমনকী, অনেক সময় মূল খবরকে 'ছোট' করে দিয়ে আনুষাঙ্গিক বিষয়কে 'বড়' করে দেখাতে হয় সাংবাদিককে।

কিন্তু সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের প্রতিবেদনের অন্যতম শর্ত হল 'বস্তুনিষ্ঠতা'। যা ঘটনা ঘটেছে সংবাদ সংস্থার সাংবাদিককে সেটাই বস্তুনিষ্ঠভাবে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে হবে। সৃজনশীল এবং সাহিত্যিক ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শনের খুব একটা সুযোগ থাকে না এজেন্সি সাংবাদিকদের।

নীতিগত ক্ষেত্রে পার্থক্য : সংবাদপত্রের সাংবাদিককে নিজস্ব সংস্থার অনুসৃত নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে 'খবর' লিখতে হয়। অনেক সময় কোনও 'বড়' খবর হাউজ পিলিসি অনুযায়ী ছোট করে লিখতে হয় সাংবাদিকদের। এমনকী অনেকসময় তো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা সত্ত্বেও সংস্থার নীতি মেনে বাদ দিতে হয় সাংবাদিককে।

কিন্তু সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের তেমন একটা নীতি নিয়ে বাধ্যবাধকতা নেই। যা ঘটেছে সেটাই সংবাদ সংস্থার সাংবাদিককে সংগ্রহ করে পাঠাতে হয়। সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের দায়বদ্ধতা অনেক বেশি। সংবাদসূত্রকে উদ্ধৃত না করে এজেন্সির সাংবাদিক কোনও সংবাদ পাঠাতে পারে না। সাংবাদিকের প্রেরিত খবরের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর সংশ্লিষ্ট এজেন্সির বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে।

জানার পরিধিগত ক্ষেত্রে পার্থক্য : সংবাদপত্রের সাংবাদিককে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের উপর নজর রাখতে হয়। সোজা কথা, নিজের বিজের খবর সংগ্রহের উপর বেশি মনোযোগ দিতে হয়। খুব বেশি অন্য ক্ষেত্রের খবর নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। মাঝে মধ্যে হয়তো কিছুদিনের জন্য নিজের বিট ছাড়াও অন্য বিষয়ের দিতে হয়। এমন অনেক সাংবাদিক আছে, যারা হয়তো শুধুমাত্র একটি বিষয়, যেমন 'শিক্ষা-বিট' কিংবা 'পুলিশ-বিট' বা 'স্পোর্টস বিট' করেই কর্মজীবন কাটিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের অনেক বিষয় সম্পর্কে খোঁজ রাখতে হয়। কেননা, কোনও একটি শহরে হয়তো সংবাদ সংস্থার একজন মাত্র প্রতিনিধি রয়েছেন। সেক্ষেত্রে ওই সাংবাদিকের উপরই শহরের শিক্ষা, রাজনীতি, স্পোর্টস-সকল বিষয়ে খবর করার দায়িত্ব থাকে। তাই সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের অনেক বিষয়ে জানতে হয়। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিবেদন লেখার ধরন সম্পর্কেও জানতে হয় এজেন্সি সাংবাদিকদের। শুধু সংবাদ সংগ্রহ নয়, আধুনিক প্রযুক্তির যুগে সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের ছবি তুলেও তা দ্রুত পাঠানোর কৌশল রপ্ত করতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকরা মানসিক, শারীরিক, পেশাগত দক্ষতার দিক থেকে সংবাদপত্রের সাংবাদিকের থেকে একধাপ হলেও এগিয়ে থাকে।

১.২.৬ সারাংশ

সংবাদপত্রে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন এবং তদন্তমূলক প্রতিবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দুটি প্রতিবেদনের আলাদা বৈশিষ্ট্য তাদের স্বাতন্ত্র দিয়েছে। সংবাদ সংগ্রহ প্রতিবেদনের চরিত্র আলাদা সংবাদপত্রের প্রতিবেদন রচনা আর সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন রচনা ভিন্ন রকমের হয়। এদের পরিবেশনের শৈলীও পৃথক। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন কেবলমাত্র ঘটনার বিবরণ দেবার পাশাপাশি তার গভীরতর ব্যাখ্যা বা অনুসন্ধান প্রয়োজন। এটি পাঠক বা দর্শককে শিক্ষিত করে, ঘটনার অন্তরালের আপাত লুক্কায়িত ঘটনা সর্বসমক্ষে উন্মোচন করে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যামূলক এবং তদন্তমূলক সাংবাদিকতার জনপ্রিয়তাও উর্ধ্বমুখী।

১.২.৭ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১) কার মতে তদন্তমূলক প্রতিবেদন একটি বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া?

২) ‘Press and Law’ বইটি কে লিখেছেন?

৩) তদন্তমূলক সাংবাদিকতার দুটি মৌলিক উপাদান লিখুন?

৪) ইউ এন আই কোন সালে সংবাদ সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি পায়?

৫) ‘এ পি’ কোন দেশের সংবাদ সরবরাহ সংস্থা?

বড় প্রশ্ন :

ক) ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের জনপ্রিয়তা ঊর্ধ্বমুখী কেন?

খ) তদন্তমূলক সাংবাদিকতা কী? তার সীমা কি নির্দিষ্ট? এর বৈশিষ্ট্য কী?

১.২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. *Professional Journalism* : M. V. Kamath : S. Chand

২. *Journalist's Hand* : M. V. Kamath

৩. *Professional Journalism* : Patanjali Sethi : Orient Longman Mumbai

৪. *Basic News Writing* : Mevlin Mencher, Won. C. Brain Publishers

৫. *Investigative Journalism in India* : S. K. Aggarwal, Mittal Publications

৬. *The Romance of the Newspaper* : Chalapati Rao; NCERT

৭. *সংবাদ বিদ্যা* : পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৮. *সংবাদ প্রতিবেদন* : ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক ৩ ❑ সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে রিপোর্টিং বিভাগ-রিপোর্টার, চিফ রিপোর্টার এবং চিফ অফ নিউজ ব্যুরোর কার্যকারিতা এবং গুণাবলী

১.৩.০ গঠন

১.৩.১ উদ্দেশ্য

১.৩.২ প্রস্তাবনা

১.৩.৩ সংবাদপত্রের রিপোর্টিং বিভাগ

১.৩.৪ ম্যাগাজিনে রিপোর্টিং

১.৩.৫ প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের কাজ

১.৩.৬ প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব

১.৩.৭ প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের গুণাবলী

১.৩.৮ চিফ রিপোর্টার

১.৩.৯ চিফ অফ নিউজ ব্যুরো

১.৩.১০ সারাংশ

১.৩.১১ অনুশীলনী

১.৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১.৩.১ উদ্দেশ্য

সংবাদপত্রে বা ম্যাগাজিনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংবাদ কক্ষ। সেখানেই থাকে প্রতিবেদক বা রিপোর্টাররা। যেখানেই খবর হচ্ছে রিপোর্টোরদের দ্রুত সেখানে ছুটে যেতে হয়। আবার বিভিন্ন সোর্স থেকেও প্রতিবেদকের খবর জোগাড় করতে হয়। তারপর তা দ্রুত সংবাদ কক্ষে পাঠাতে হয়। বর্তমানে রিপোর্টাররা কখনও অফিসে এসে প্রতিবেদনটি লেখে আবার প্রয়োজনে ঘটনাস্থল থেকে সংবাদটি ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়। আসল ব্যাপার হল, রিপোর্টারদের যে করেই হোক সংবাদ বের করতেই হবে। আবার রিপোর্টারদের মধ্যেও অভিজ্ঞতা ও কাজের দক্ষতার ভিত্তিতে নানা ভাগ রয়েছে। কেউ স্টাফ রিপোর্টার, কেউ বিশেষ সংবাদদাতা। আর রিপোর্টারদের প্রধান হচ্ছে চিফ রিপোর্টার। প্রত্যেকদিনই সংবাদ নিয়ে চিফ রিপোর্টারকে আলোচনা করতে হয় বার্তা সম্পাদক বা নিউজ এডিটর এবং চিফ অফ নিউজ ব্যুরোর সঙ্গে। শুধু সংবাদের ব্যাপারে নয়, প্রয়োজনে সংবাদপত্রের বিভাগীয় দিকটিও দেখতে হয় চিফ অফ নিউজ ব্যুরোকে। সংবাদ কক্ষে একটা 'টিম' হিসাবে কাজ করতে হয় সকলকে। তা সংবাদ কক্ষে রিপোর্টারদের ভাগগুলি কী, চিফ রিপোর্টারকে কী কাজ করতে হয়, চিফ অফ নিউজ ব্যুরো কী কাজ করে-প্রত্যেকটি বিষয়ই এই এককে বোঝার চেষ্টা করব।

১.৩.২ প্রস্তাবনা

পাঠক-দর্শক-শ্রোতার কাছে সংবাদের সূত্র হল প্রতিবেদক বা রিপোর্টার। সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের 'মেরুদণ্ড' হল রিপোর্টার। এদের কাজের ভাগ রয়েছে। রিপোর্টারদের মধ্যে কেউ শিক্ষা সংক্রান্ত খবর করে, কেউ আবার স্বাস্থ্য, আবার কেউ পুলিশ-অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ দেয়। রিপোর্টারদের এই আলাদা আলাদা ভাগকেই 'বিট' বলা হয়। আর সাধারণভাবে রিপোর্টারদের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেয় চিফ রিপোর্টার। প্রয়োজন হলে চিফ রিপোর্টারকেও সংবাদ সংগ্রহ করে প্রতিবেদন লিখতে হয়। একই সঙ্গে অন্য রিপোর্টারদের কীভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে, ঠিক মতো প্রতিবেদন লেখা হয়েছে কিনা, তা দেখে চিফ রিপোর্টার। তবে রিপোর্টিং বিভাগ ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, তা দেখার দায়িত্ব থাকে চিফ অফ নিউজ ব্যুরোর। আবার অন্য বিভাগের কাজের ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তার। রিপোর্টিং বিভাগের গঠন কেমন, কী গুণ থাকলে ভাল রিপোর্টার হওয়া যায়, রিপোর্টারদের প্রতিবেদন লেখার সময় কোন কোন দিকে নজর রাখতে হয় প্রতিটি বিষয় যাতে ভাল করে বোঝা যায়, সেজন্য এগুলি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে এই এককে।

১.৩.৩ সংবাদপত্রের রিপোর্টিং বিভাগ

সংবাদপত্র দফতরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল রিপোর্টিং। এই বিভাগের কর্মী অর্থাৎ রিপোর্টারদের সকাল থেকে ব্যস্ততা থাকে তুঙ্গে। প্রতিটি সংবাদপত্রে একাধিক রিপোর্টার থাকে। ওই রিপোর্টারদের মধ্যে কাজের ভাগ করে দেওয়া হয়। কেননা, একজন রিপোর্টারের পক্ষে সমস্ত ঘটনা কভার সম্ভব হয় না। সেই কারণে কোনও রিপোর্টার শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ কভার করে। কেউ আবার পুলিশ বা আদালত সংক্রান্ত খবর করে। আবার অভিজ্ঞতা ও কাজের দক্ষতার নিরিখে রিপোর্টারদের মধ্যে ভাগ রয়েছে। আর রিপোর্টারদের প্রধান চিফ রিপোর্টার। প্রতিটি সংবাদপত্রে একাধিক চিফ রিপোর্টার থাকতে পারে। সাধারণভাবে রিপোর্টিং বিভাগে থাকে হচ্ছে:

ট্রেনি রিপোর্টার : সংবাদপত্রের নবাগতদের জুনিয়র রিপোর্টার বা শিক্ষানবীশ কিংবা ট্রেনি রিপোর্টার হিসাবে দেখানো হয়। যে কোনও সংবাদপত্রে এরা সবচেয়ে কনিষ্ঠ কুশীলব। যেহেতু এরা শিক্ষানবীশ তাই প্রথমদিকে তাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তি, প্রেস হ্যান্ড আউট, আবহাওয়ার খবর, ছোট দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর করতে দেওয়া হয়। কিছুদিন যাওয়ার একটু অভিজ্ঞ হওয়ার পর এদের একটু বড় অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়।

স্টাফ রিপোর্টার : বেশ কিছুটা অভিজ্ঞ হওয়ার পর শিক্ষানবীশরাই স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে পদোন্নতি হয়। এরা চিফ রিপোর্টারের অধীনেই কাজ করতে হয়। আমেরিকায় আবার এই স্টাফ রিপোর্টারদের বলা হয় 'বিট রিপোর্টার'। এই স্টাফ রিপোর্টারদের মধ্যে কেউ বিধানসভা কভার করে কেউ আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খবর করে। কেউ পুরসভা কভার করে। মনে রাখতে হবে, নিজস্ব 'বিট' ছাড়াও প্রয়োজনে বড় পথ দুর্ঘটনা, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, খুনের ঘটনাও কভার করতে হয়।

সিনিয়র রিপোর্টার : কাজের জগতে আরও কিছুটা অভিজ্ঞ ও দক্ষ হওয়ার পর স্টাফ রিপোর্টার থেকে পদোন্নতি হয়ে কেউ কেউ সিনিয়র রিপোর্টার হয়। এরাও চিফ রিপোর্টারের অধীনেই কাজ করে। এই সিনিয়র রিপোর্টাররা নিজের নিজের বিটের স্টাফ রিপোর্টারদের সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে 'গাইড' করে। আবার প্রয়োজনে নিজেরাও

রিপোর্টিংয়ে নেমে পড়ে। যেমন, 'শিক্ষাসংক্রান্ত' বিটের কোনও সিনিয়র রিপোর্টার উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টের দিন প্রয়োজন পড়লে শিক্ষামন্ত্রী কিংবা উচ্চমাধ্যমিকের বোর্ডের কোনও কর্তার সঙ্গে কথা বলে প্রতিবেদন লেখার ব্যাপারে স্টাফ রিপোর্টারকে সাহায্য করতে পারে। কিংবা আলাদা করে কোনও খবর করতে পারে।

চিফ রিপোর্টার : রিপোর্টারদের প্রধান চিফ রিপোর্টার। স্থানীয় স্তরে রিপোর্টারদের পরিচালনা করে চিফ রিপোর্টার। বিট ঠিক করা থেকে শুরু করে প্রয়োজন মতো প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে রিপোর্টারদের পরামর্শ দেয় চিফ রিপোর্টার। রিপোর্টারদের কাজের মধ্যে সমন্বয় নিয়ে এসে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতো সবচেয়ে ভাল কভারেজ পাঠকের কাছে দেওয়াই চিফ রিপোর্টারের দায়িত্ব।

স্পেশাল করসপনডেন্ট বা বিশেষ সংবাদদাতা : সংবাদপত্রে অন্যতম অভিজ্ঞ রিপোর্টার হল বিশেষ সংবাদদাতা। এরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি কভার করে। সাধারণত স্পেশাল করসপনডেন্টরা নিজের উদ্যোগেই সংবাদ করে। এদের লেখা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'এক্সক্লুসিভ' হয়। এদের সংবাদ প্রতিবেদন তথ্যের দিক থেকে হতে পারে, আবার বিশ্লেষণের দিক থেকেও হতে পারে। আবার, এই রিপোর্টাররা দিল্লিতে থেকে সেখানকার খবরগুলি করে। মোটামুটি প্রত্যেক সংবাদপত্রের দিল্লিতে একটি অফিস থাকে। সেখানেই এই রিপোর্টাররা খবর সংগ্রহ করে।

ব্যুরোচিফ : প্রত্যেক সংবাদপত্রের রিপোর্টিং বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ হল চিফ অফ নিউজ ব্যুরো বা ব্যুরোচিফ। বিশেষ সংবাদদাতার কপি ব্যুরোচিফ দেখে 'সবুজ সংকেত' দিলেই তা ছাপার জন্য যায়। রিপোর্টিং বিভাগ ঠিক মতো কাজ করছে কি না, আরও ভাল কী ধরনের সংবাদ করা যায়-এই সমস্ত বিষয়গুলি দেখে ব্যুরোচিফ। প্রয়োজনে নিজেও সংবাদ সংগ্রহ করে প্রতিবেদন করে। এই প্রতিবেদনগুলি অবশ্যই সংবাদপত্রের স্পেশাল প্রতিবেদন বা কপি হিসাবেই বিবেচিত হয়। ধরা যাক, বিধানসভা নির্বাচনের পর মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার ব্যুরোচিফ নিলে সেটি অবশ্যই স্পেশাল প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচিত হবে।

মোটামুটি রিপোর্টিং বিভাগে এই পদগুলি থাকে। এছাড়াও রিপোর্টিং বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকে বিদেশ সংবাদদাতা। কোনও সংবাদপত্রে হয়তো লন্ডনে কোনও প্রতিনিধি আছে। কেউ আবার ওয়াশিংটনে থাকে। এরা সাধারণভাবে যে দেশের প্রতিনিধি সেখানকার খবর করে। সাধারণভাবে এই সাংবাদিকরা বাড়ি থেকেই খবর করে তা মূল সংবাদপত্রের অফিসে পাঠিয়ে দেয়।

১.৩.৪ ম্যাগাজিনে রিপোর্টিং

ম্যাগাজিন গণজ্ঞাপনের একটি মাধ্যম যা সমসাময়িক বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খবরাখবর বিস্তৃত আকারে পাঠককে জানতে সাহায্য করে। ম্যাগাজিন যে কোনও খবরের পশ্চাৎপট এবং বিশ্লেষণ তুলে ধরে খবরের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও পাঠকের বিশ্লেষণমুখী মানসিকতাকে সন্তুষ্ট করে জনমত তৈরি করে। সাধারণভাবে ম্যাগাজিন পাঠকের অবসরের সঙ্গী। সোজা ব্যাপার হল, ম্যাগাজিনের মাধ্যমে পাঠক দৈনন্দিন হার্ড নিউজের জগৎ থেকে নিজেকে অন্যরকম খবরের বিস্তারের স্রোতে গা ভাসাতে পারে। একই সঙ্গে পাঠক চায় একটু ভিন্ন স্বাদের খবরের আস্বাদন করতে। বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে সাধারণ ম্যাগাজিনের সঙ্গে সঙ্গে ই-ম্যাগাজিন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

প্রাথমিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের ফারাক খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু সাংবাদিকের

কাজের ধারা, সম্পাদনার রীতিনীতি, পরিবেশনার কৌশল ও পাঠকের চরিত্রের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। মনে রাখা প্রয়োজন, ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বা বাৎসরিক হতে পারে। ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠার সংখ্যা সংবাদপত্রের থেকে বেশ কিছুটা বেশি হয়। ম্যাগাজিনে সাধারণভাবে ২৪ পাতা, ৩২ পাতা কিংবা ৫০ পাতার বেশি হয়।

প্রথমেই একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তু কী। অর্থাৎ ম্যাগাজিনটা কোন বিষয়ের। কারণ ম্যাগাজিনের নানারকম প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন রয়েছে, ফ্যাশন ম্যাগাজিন, ক্রীড়া ম্যাগাজিন, প্রযুক্তি ম্যাগাজিন, লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, শিক্ষা সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, স্বাস্থ্য বিষয়ক ম্যাগাজিন সহ আরও নানা রকমে ম্যাগাজিন। উল্লেখযোগ্য ম্যাগাজিনের মধ্যে রয়েছে 'টাইম', 'ইন্ডিয়া টুডে', 'আউটলুক', 'ফেমিনা', 'স্পোর্টসস্টার', 'আনন্দমেলা', 'দেশ', 'আনন্দলোক', 'সুখী গৃহকোন,' 'কর্মক্ষেত্র', 'ভ্রমণ'।

সংবাদপত্রের মতোই ম্যাগাজিনেও সাংবাদিক থাকে। অনেক নামী ইংরেজি ম্যাগাজিনের যেমন দেশের খবর দেওয়ার জন্য দিল্লিতে সাংবাদিক থাকে। বিদেশের খবর দেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যেমন, লণ্ডন, ওয়াশিংটন, বেজিংয়ে 'ফরেস করসপনডেন্ট' থাকে। তবে অধিকাংশ ম্যাগাজিনেই আলাদা করে বার্তা বা রিপোর্টিং বিভাগ থাকে না। বেশিরভাগ ম্যাগাজিনে থাকে সম্পাদকীয় বা 'এডিটোরিয়াল' বিভাগ। সেখানেই যারা থাকে তারা একাধারে যেমন খবরও সংগ্রহ করে তেমনই একই সঙ্গে সম্পাদনা বা এডিটিংয়ের কাজও করে। আসলে, সংবাদপত্রের থেকে ম্যাগাজিনে অনেক কম কর্মী থাকে। তাই ম্যাগাজিনে সম্পাদকীয় বিভাগেই রিপোর্টার তথা সাব এডিটরও থাকে। পাশাপাশি, এটাও জানা প্রয়োজন, যে ম্যাগাজিনগুলিতে দেশ ও বিদেশের সংবাদদাতারা কোনও খবরের সূত্র দিলে তা প্রতিবেদন আকারে লিখতে হয় সম্পাদকীয় অফিসে থাকা কর্মীদেরই। সেই কারণে, ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে থাকা রিপোর্টার তথা সাব এডিটরদের বিশাল দায়িত্ব পালন করতে হয়। সাধারণভাবে ম্যাগাজিনে রিপোর্টারদের আলাদা করে কোনও বিভাগ থাকে না।

১.৩.৫ প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের কাজ

সংবাদপত্রের প্রাণ হল প্রতিবেদক বা রিপোর্টার। সংবাদপত্রের সংবাদের কারবারি। সোজা কথায়, সংবাদপত্রের কাছে প্রতিবেদকই সংবাদের প্রাথমিক উৎস। তাই কোনও একটি সংবাদপত্র বা নিউজ চ্যানেলকে মূলত নির্ভর করতে হয় প্রতিবেদকের উপরই। সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের খ্যাতি ও সুনাম অনেকক্ষেত্রে নির্ভর করে প্রতিবেদকের দক্ষতার উপরেই। সেই কারণে, সংবাদপত্র বা নিউজ চ্যানেলের এই নির্ভরতার যথাযথ মর্যাদা দেওয়া রিপোর্টারের আবশ্যিক কর্তব্য। বিখ্যাত সম্পাদক মেলভিন ই স্টোনের মতে, একজন বুদ্ধিমান প্রতিবেদক একজন বুদ্ধিদীপ্ত সম্পাদকের চেয়ে অনেকবেশি মূল্যবান।

একটা কথা প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে যে, ভোর থেকেই রিপোর্টারের কাজ শুরু হয়ে যায়। অনেক সময় তো দিন-রাত কাজ করতে হয় রিপোর্টারকে। বিশেষ করে কোথাও নির্বাচন কভার করতে গেলে বা জঙ্গি হামলা হয়েছে, এমন জায়গায় তো সারাক্ষণ খবরের মধ্যে একজন রিপোর্টারকে থাকতে হয়। কারণ যে কোনও মুহূর্তে সংবাদ তৈরি হতে পারে। এমনকী, সংবাদপত্র ছাপতে চলে যাওয়ার পরেও রিপোর্টারকে সজাগ থাকতে হয়। গভীর রাতে কোনও খবর পেলেও তা গুরুত্ব সহকারে তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে হয় পরের দিনের সংবাদপত্রে ওই সংবাদটি করার জন্য। সেই কারণে, রিপোর্টারদের কাজের কোনও ধরাবাধা সময় নেই।

অধিকাংশ সাংবাদিক মূলত মুখ্য প্রতিবেদক বা চিফ রিপোর্টারের অধীনেই কাজ করে। সাধারণভাবে সংবাদ অফিসে এসে বা আসার আগেই তার নির্দেশ মতো কাজে নেমে পড়তে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, সকালেই কোনও একটি জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সেক্ষেত্রে অফিসে ঢোকার আগেই রিপোর্টারকে ওই সংবাদটি করার জন্য ঘটনাস্থলে চলে যেতে হয়। আবার কখনও অফিসে ঢোকামাত্র চিফ রিপোর্টারের নির্দেশ মেনেই কোন সংবাদ করার জন্য ঘটনাস্থলে চলে যেতে হয়।

চিফ রিপোর্টার যদি কোনও কাজ না দেয় তাহলে সকাল থেকেই প্রতিটি কাগজ বা নিউজ চ্যানেল ভাল করে দেখতে হয়। কী কী খবর হচ্ছে সে সম্পর্কে একটা ধারণা রাখতে হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। যেমন কোনও রিপোর্টার যদি শিক্ষা সংক্রান্ত খবর করে, তাহলে তাকে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে হয়। পাশাপাশি, শিক্ষা দফতরের কোনও পদস্থ কর্তা কিংবা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে হয়। কিংবা কোথাও কোনও খবর রয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে নজর রাখতে হয়। সোজা ব্যাপার হল, রিপোর্টারের লক্ষ্য থাকে, প্রত্যেকদিন অন্তত একটি করে হলেও যেন খবর দেওয়া যায়।

শুধু খবর জোগাড় করা নয়, একজন রিপোর্টার সংবাদ করার সময় দেখে নিতে হবে, তার ব্যবহৃত তথ্যগুলি যেন নির্ভুল ও সম্পূর্ণ হয়। সংবাদ সূত্রের ভিত্তি কতটা সুদৃঢ় তা দেখে নিতে হবে খবরটি বাছাইয়ের আগেই। সংবাদটিকে ভারসাম্য ও স্বচ্ছতা আনতে রিপোর্টারকে সবরকম দিক লক্ষ্য রাখতে হবে। একই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হয় সংবাদটি যেন যথাসম্ভব ছোট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়।

সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের তথ্য জোগাড় করার পর যেটা করতে হয় তা হল দ্রুতগতিতে সংবাদটি লেখা শেষ করতে হয়। এই সময় অবশ্যই নজর করতে হয় যেন, সংবাদ লিখতে গিয়ে কোনওরকম তথ্য বিভ্রান্তি এবং ভাষার অস্বচ্ছতা না থাকে। আর তা হলে কিন্তু সংবাদটি দিশাহীন হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ে প্রায় প্রতিটি সংবাদ ফিচারের ধাঁচে লেখা হয়। সেদিকেও অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। সোজা বিষয়, যেভাবেই রিপোর্টার তার সংবাদটি লিখুক না কেন, সংবাদের মৌলিক চরিত্র যেন কোনওভাবেই নষ্ট না হয়। তাতে পাঠকের কাছে সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেবে। যা বাঞ্ছনীয় নয়।

১.৩.৬ প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব

একজন প্রতিবেদক বাস্তবে কখনওই ছায়াচিত্রের নায়ক নয়। সমাজের বিশেষ প্রভাবশালীও কেউ নয়। তবু তার লেখনী বহু মানুষের ভরসাস্থল। সেই কারণে, প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব অনেক।

প্রথমত : যাতে কোনও ঘটনা সম্পর্কে সমস্ত পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া যায়, সেদিকে নজর রাখতেই হয়। একই সঙ্গে কোনও ঘটনা সম্পর্কে যাতে মানুষের মনে অহেতুক ভীতি না ছড়ায়, সেটাও খেয়াল রাখা জরুরি। যেমন, জাপানের ফুকুশিমা দাইচিতে পরমাণু চুল্লিতে বিস্ফোরণের সময় গুজব ছড়িয়েছিল যে, এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ভারতের পূর্ব অংশ। কিন্তু ওই সময় প্রতিবেদকরাই সঠিক তথ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ কাটিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত : নাগরিকদের দায়িত্ব সম্পর্ক সচেতন করাও প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের অন্যতম দায়িত্ব। বিশেষ

করে নির্বাচনের সময় ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য কী কী নথিপত্র নিয়ে নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোটারদের যেতে হবে, তা জানা যায় প্রতিবেদকদের সংবাদের মাধ্যমেই।

তৃতীয়ত : জনসাধারণের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত প্রধান, বিধায়ক, সাংসদ) উপর। কিন্তু অনেক সময় তা হয় না। সেই সময় প্রতিবেদকের সংবাদের মাধ্যমে বিষয়গুলি সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌঁছয়।

চতুর্থত : পুলিশ-প্রশাসন ঠিক মতো কাজ করছে কিনা সে সম্পর্কেও অনুসন্ধান চালায় রিপোর্টার। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদ হিসাবে তা পরিবেশন করে। যেমন, কোনও একটি ধর্ষণ কাণ্ডে পুলিশ অপরাধীদের খুঁজে বের করার বিষয়টিকে বিশেষ একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। তখন প্রতিবেদকের দায়িত্ব হচ্ছে এই বিষয়টি সংবাদের মাধ্যমে প্রকাশ্যে আনা। এতে প্রশাসনও নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটেছে যে, কোনও ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ বের হওয়ার পর তা নিয়ে খোঁজখবর শুরু করে প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

পঞ্চমত : যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারে প্রতিবেদকরা। কিন্তু অনেক সময়ই সরকার চেষ্টা করে যাতে সরকার-বিরোধী সংবাদ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ না পায়। সরকার নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য একপেশে তথ্য পরিবেশন করে। তখন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব হল পাল্টা তথ্য অনুসন্ধান করে জনসাধারণের সামনে তা তুলে ধরা।

পরিশেষে, প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের সম্পর্কে বলা উচিত, তাকে খুব দ্রুত কাজ করতে হয়। কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় থাকা প্রয়োজন। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে কাজ করার জন্য পেশাদারী মনোভাব গ্রহণ করা দরকার। লক্ষ্য যেন থাকে সবার আগে গুরুত্বপূর্ণ খবর অফিসে পাঠানো। প্রতি মুহূর্তে কাজের ঝুঁকি আছে। যুদ্ধ, দাঙ্গা কিংবা গণবিক্ষোভ কভার করার সময় বিপদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এমনকি, প্রায় সংশয় হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। রিপোর্টার বা প্রতিবেদকের।

১.৩.৭ প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের গুণাবলি

সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ‘চোখ ও কান’ বলা হয় প্রতিবেদক বা রিপোর্টারকে। আর এই দুটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা নিতে হলে কিছু প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও সহজাত ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের চোখ ও কানকে খোলা রাখার জন্য রিপোর্টারকে হতে হয় একজন আগ্রহী ও সচেতন দর্শক। আর এটা তো ঠিকই যে, পেশার প্রতি ভালবাসা ও নিষ্ঠা না থাকলে কোনওভাবেই সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে, প্রতিবেদক বা রিপোর্টারকে কাজের জগতে উন্নতি করতে হলে কয়েকটি গুণ থাকা আবশ্যিক। প্রাথমিক যে গুণগুলি থাকতেই হবে তা হল :

সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক : প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের প্রধান গুণ হল সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকদিন অজস্র সংবাদ হচ্ছে, তার মধ্যে থেকে পাঠক বা দর্শকের জন্য উপযুক্ত এবং আকর্ষণীয় খবর খুঁজে বের করে পরিবেশন করতে হবে। সোজা কথায়, যে খবরের প্রতি মানুষের আগ্রহ রয়েছে, সে ধরণের সংবাদ দিতে হবে আর এই কাজটি করার জন্য রিপোর্টারকে অবশ্যই পাঠক বা দর্শকের আগ্রহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। কোনটা খবর আর কোনটা তথ্য-এই বাছাই ক্ষমতা না থাকলে এক সাংবাদিক কখনও ভবিষ্যতে কাজের জগতে উন্নতি করতে পারে না।

নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক : নিজস্ব মতাদর্শ যাই থাকুক না কেন, কাজের সময় একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারকে থাকতে হয় নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবেই। নিজের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিবেদনে যুক্ত করা কখনও বাঞ্ছনীয় নয়। সংবাদটি সত্য, এ নিয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে বিশ্বাসযোগ্যতার কথা মনে রেখে মানুষের সামনে ঘটনাকে তুলে ধরতে হয় রিপোর্টারকে।

ধৈর্য ও অধ্যবসায় : রিপোর্টার তার ধৈর্য ও অধ্যাবসায়কে সম্বল করে সংশ্লিষ্ট সংবাদ উৎসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। সকলের সঙ্গে মেশার ক্ষমতা থাকতে হবে রিপোর্টারকে। কেননা, বেশিরভাগ সময়ই প্রতিবেদকের স্বচ্ছন্দ মেলামেশার সূত্রে তার কাছে এসে পড়ে কোনও অপ্রকাশিত সংবাদের প্রাক্‌সূত্র। যে কোনও সূত্রকে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। তাই সংবাদ খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রতিটি বিষয়কে ধৈর্য ধরে যাচাই করতে হয়।

উদ্যমী মানসিকতা : পথে না বেরলে, ঘরে বসে থাকলে কোনও সংবাদ আসে না। সেই কারণে, কারণে-অকারণে রিপোর্টারকে অনেক জায়গাতেই যেতে হয়। তাই উদ্যমী মানসিকতা না থাকলে ভাল প্রতিবেদক হওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রত্যেকদিন রিপোর্টারকে বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে একজন রিপোর্টারকে সারাদিনই খবরের মধ্যে থাকতে হয়। তাই কখনও ক্লান্ত হওয়া চলবে না। বিশেষ করে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তা সাংবাদিক উদ্যমী না হলে সাফল্য পাওয়া বেশ সমস্যার।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া : বেশিরভাগ সময়ই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রিপোর্টারকে বলে দেয় কীভাবে কোনও ঘটনা সম্পর্কে তথ্য বের করে আনতে হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেকক্ষেত্রে দেখা ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয় রিপোর্টারকে। ফলে পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারার ক্ষমতা থাকতেই হবে রিপোর্টারের মধ্যে।

বহু বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী : প্রতিবেদককে অনেক জটিল বিষয় নিয়ে রিপোর্ট কভার করতে হয়। তাই কেবলমাত্র একটি নয়, ভাল রিপোর্টারের অনেক বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি। একেধারে যেমন রিপোর্টারকে ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে, তেমনই প্রযুক্তিবিদ্যা, আইন, অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবেশ, খেলাধুলার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আবশ্যক। একই সঙ্গে রিপোর্টারের উপস্থাপন যেন হয় স্বচ্ছ। যাতে করে প্রতিটি মানুষ অনায়াসে রিপোর্টারের প্রতিবেদন সহজেই বুঝতে পারে।

ভাষার প্রতি দখল ও নিখুঁত লেখার ক্ষমতা : ভাল প্রতিবেদক হতে গেলে বেশ কয়েকটি ভাষায় সমান দখল থাকা জরুরি। বাংলা তো জানতে হবেই। তাছাড়া ইংরেজি কথা বলা ও লিখতে পারলে কাজের জগতে অনেকটাই সুবিধা হয়। পাশাপাশি, হিন্দি জানাও দরকারি। শুধু ভাষার প্রতি দখল থাকলেই চলবে না, লেখা বা বলার সময় যেন ব্যাকারণ, উচ্চারণ ও বানান-প্রতিটি দিকেই সমান নজর দেওয়া হয়। অর্থাৎ, কোনও প্রতিবেদন দারুণ লেখা হয়েছে কিন্তু তাতে অনেক বানান ভুল কিংবা নিউজ চ্যানেলে রিপোর্টিং করার সময় 'এক্সক্লুসিভ' রিপোর্ট দেওয়ার সময় উচ্চারণ খারাপ, তাহলে কিন্তু গোটা পরিশ্রমটা মাঠে মারা যাবে। রিপোর্টটি ভাল হওয়া সত্ত্বেও পাঠক বা দর্শকের মনে দাগ কাটতে ব্যর্থ হবে।

চাপ সহ্য করার ক্ষমতা : উচ্চপদস্থের পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিগত বিভিন্ন চাপের মুখে প্রত্যেকদিন পড়তে হয় রিপোর্টারদের। সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে চাপ সঙ্গে নিয়েই প্রতিবেদককে কাজ করতে হয়। মানসিকভাবে একজন রিপোর্টারকে তৈরি হয়েই আসতে হবে যাতে তার চাপ নেওয়ার ক্ষমতা থাকে। প্রত্যেক

রিপোর্টারের পিছনে 'ডেডলাইন' তাড়া করে বেড়ায়। এমনকী, কোনও বিশেষ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রিপোর্টারকে শান্ত মাথায় সবকিছু সামাল দিতে হবে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মনোভাব : বর্তমানে মিডিয়া বিস্ফোরণের যুগে রিপোর্টারদের অনেকবেশি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। যে কোনও ঘটনার সর্বশেষ 'আপডেট' পাঠক বা দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রিপোর্টারদের মধ্যে চলে নিরন্তর দৌড়। তাই এই প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় নিজেকে সেরা প্রতিবেদক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সংবাদের মনোরঞ্জন মূল্য সম্পর্কে ধারণা : এটা তো মানতেই হবে যে, মূলত মনোরঞ্জনের জন্যই অধিকাংশ পাঠক বা দর্শকই অবসর সময়ে সংবাদ পড়েন বা দেখেন। তাই রিপোর্টারকে এমনভাবে প্রতিবেদনটি লিখতে বা বলতে হবে, যাতে করে পাঠক বা দর্শক সেটি উপভোগ করতে পারে। অর্থাৎ রিপোর্টারকে সংবাদের মনোরঞ্জন মূল্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবেই।

পরিশেযে বলা যায়, ভাল সাংবাদিককে সর্বদা কর্তব্যনিষ্ঠ, সৎ এবং পেশার প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হয়। রিপোর্টারকে অবশ্যই সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হতে হবে এবং নির্ভীক হওয়া উচিত। ভাল রিপোর্টারকে মানুষের মনস্তত্ত্ব অনুধাবন এবং ঘটনার যথাযথ বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অবশ্যই অর্জন করতে হয়।

১.৩.৮ চিফ রিপোর্টার

প্রতিবেদক বা রিপোর্টারদের পরিচালনার দায়িত্বে থাকে মুখ্য প্রতিবেদক বা চিফ রিপোর্টার। রিপোর্টিং বিভাগের প্রধান চিফ রিপোর্টার। বলা যায়, সংবাদ যেখানে সংবাদ মাধ্যমের মুখ্য উপজীব্য, সেখানে সংবাদ পরিচালক হিসাবে চিফ রিপোর্টারের ভূমিকা অনস্বীকার্যভাবে প্রধান। সংবাদমাধ্যমের কাজ অবশ্যই দলগত। তাই যে কোনও টিমের সাফল্য নির্ভর করে দক্ষ পরিচালনার উপর। রিপোর্টাররা চিফ রিপোর্টারের নেতৃত্বাধীন। রিপোর্টিং বিভাগকে চিফ রিপোর্টার এমনভাবে চালনা করবে যাতে করে সকল রিপোর্টার নিজেদের সেরাটা দিতে পারে। আর এক্ষেত্রে একাধারে কাজের ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে, তেমনই ব্যক্তিত্ববান হওয়া জরুরি। তাই তো অনেকেই চিফ রিপোর্টারকে 'সংবাদপত্রের চোখ' বলে থাকে।

গুণাবলী :

চিফ রিপোর্টার একজন অভিজ্ঞ রিপোর্টার। দৈনন্দিন কাজে তাকে সাফল্য পাওয়ার জন্য কতগুলি গুণ সাহায্য করে। সেগুলি হল :

কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

স্বচ্ছ সঠিক ও সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ।

সময়ানুবর্তিতা মেনে চলা। শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনযাপন। সময়োপযোগী দ্রুত সিদ্ধান্ত।

অসম সাহসিকতা।

গবেষণাধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী মনোভাব।

সংস্কার ও কুসংস্কার বর্জিত উন্নতমানের পাঠক চরিত্র।

সহকর্মীদের প্রতি সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল মনোভাব।

তীব্র বুদ্ধিমত্তা।

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে স্পষ্ট ধ্যানধারণা।

কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা।

কঠিন পরিস্থিতিতেও শান্ত থাকা। অযথা উত্তেজিত না হওয়া।

রক্ষণশালী নয়, নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তার অধিকারী।

বর্তমান যুগে তাকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী থাকা জরুরি।

একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, শুধু গুণ থাকলেই চলবে না। বাস্তবক্ষেত্রে এই গুণগুলির রূপায়ণ ভীষণ জরুরী। তাহলেই চিফ রিপোর্টার হিসাবে নিজেকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

কাজ বা দায়িত্ব :

চিফ রিপোর্টারের দায়িত্ব ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে। চিফ রিপোর্টারের প্রত্যেকদিনের কাজগুলি হল :

প্রথমত : প্রত্যেকদিন সকাল থেকেই প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র ও টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলগুলির দিকে নজর রাখা। দেখে নেওয়া যে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর 'মিস' হয়েছে কি না। পাশাপাশি, নতুন কোনও খবরের ইঙ্গিত কোনও সংবাদের মধ্যে রয়েছে কি না। এই কারণে, চিফ রিপোর্টারকে প্রথম সারির প্রতিটি সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল দেখতেই হয়।

দ্বিতীয়ত : সকাল থেকে তাকে সেইদিন কি কি হতে পারে কিংবা কোন কোন খবরের 'ফলোআপ' করা উচিত, দ্রুত তার একটি পরিকল্পনা করে ফেলতে হয়। এ জন্য অবশ্যই নিউজ এডিটর বা বার্তা সম্পাদক বা ব্যুরো চিফের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়।

তৃতীয়ত : বিশেষ প্রয়োজনে অনেক সময় অফিসে পৌঁছনোর আগে রিপোর্টারদের 'অ্যাসাইনমেন্টে' পাঠিয়ে দেন। তবে সাধারণভাবে অফিসে ঢুকে প্রথমেই রিপোর্টারদের সঙ্গে মিটিং করে চিফ রিপোর্টার। এরপর কোন রিপোর্টারকে কী সংবাদ করতে হবে, কোন রিপোর্টারকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য কোথায় পাঠাতে হবে, রিপোর্টারের সঙ্গে চিত্র সাংবাদিক প্রয়োজন কি না-সমস্ত বিষয়টি দেখভাল করতে হয় চিফ রিপোর্টারকে। সেই মতো নির্দিষ্ট রিপোর্টার বা চিত্র সাংবাদিককে নির্দেশ দিতে হয়।

চতুর্থত : রিপোর্টারদের অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানোর পর প্রয়োজনে তাদের সংবাদ সংগ্রহের কাজে সাহায্য করতে হবে। কোন সংবাদ সূত্র থেকে খবরটি মিলবে, কার কার সঙ্গে কথা বলতে হবে সে ব্যাপারে রিপোর্টারকে গাইড করতে হবে চিফ রিপোর্টারকে।

পঞ্চমত: সারাদিন ধরেই বিভিন্ন সংবাদ সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। তেমন প্রয়োজন পড়লে তাকেও মাঠে নেমে পড়তে হয়। এটা তো মানতেই হবে যে, রিপোর্টার হিসাবে চিফ রিপোর্টার দক্ষ। ধরা যাক, মুখ্যমন্ত্রীর একটি ইন্টারভিউ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে চিফ রিপোর্টার নিজেই ইন্টারভিউ নেওয়ার কাজটি করতে পারে। আবার যেমন, কলকাতায় বড় কোনও ঘটনা ঘটেছে, এরকম অবস্থায় মেয়রের সঙ্গে কথা বলে একটি সংবাদ প্রতিবেদন করতে হবে, প্রয়োজন মনে করলে চিফ রিপোর্টার অন্যান্য দিক সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে ওই কাজটি করতে পারে।

ষষ্ঠত: শুধু সকালে নয়, সারাদিনই ধরেই খোঁজখবর নিতে হবে অন্য সংবাদ প্রতিষ্ঠান কী ধরনের সংবাদ করছে। সংবাদপত্রের চিফ রিপোর্টারকে অবশ্যই নিউজ চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটগুলির দিকে ভীষণভাবে খেয়াল রাখতে হয়। কারণ, চিফ রিপোর্টারের একটাই লক্ষ্য, কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর যেন 'মিস' না হয়ে যায়।

সপ্তমত: দিনের শেষে রিপোর্টারটা অফিসে এলে তাদের সংগৃহীত খবরের 'ব্রিফিং' শুনতে তাদের নির্দেশ দেওয়া কীভাবে প্রতিবেদনটি লিখতে হবে। কতটা লিখতে হবে। লেখার ক্ষেত্রেও অনেকই সময় রিপোর্টারকে সাহায্য করতে হয় চিফ রিপোর্টারকে।

অষ্টমত : রিপোর্টারদের সংবাদ প্রতিবেদন ঠিক মতো হয়েছে কিনা, তার প্রাথমিক যাচাই করে চিফ রিপোর্টার। ভুলভ্রান্তি হলে তা সংশোধন কিংবা পুনর্লিখনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব চিফ রিপোর্টারের।

নবমত : রিপোর্টারদের প্রতিবেদনের তালিকা করা এবং সেগুলির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে হয় বার্তা সম্পাদককে। বেশিরভাগ সময়েই সংবাদ পরিবেশনের কাজেও বার্তা সম্পাদককে সাহায্য করতে হয় চিফ রিপোর্টারকে। পৃষ্ঠা সজ্জার ক্ষেত্রেও সম্পাদনা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় চিফ রিপোর্টারকে।

দশমত : বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগের সঙ্গেও রীতিমতো যোগাযোগ রাখতে হয় চিফ রিপোর্টারকে। কেননা, খবরের কাগজের কোন পাতায় কতটা জায়গা রয়েছে এবং কটার মধ্যে প্রতিবেদনগুলি তৈরি করে ফেলতে হবে, সে সমস্ত বিষয়গুলি একেবারে হাতের মুঠোয় রাখতে হয় চিফ রিপোর্টারকে।

উপরিউক্ত দায়িত্বগুলি ছাড়াও চিফ রিপোর্টারের আরও কয়েকটি দায়িত্ব পালন করতে হয়। কেননা, চিফ রিপোর্টার শুধুমাত্র সাংবাদিক নয়, বিভাগীয় প্রধানও। সেই কারণে তাকে আরও যে সকল কাজ করতে হয় সেগুলি হল:

১. সংবাদ সংগ্রহ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনভিত্তিক অর্থ মঞ্জুরের জন্য তাকে হিসাব বিভাগের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হয়।

২. খরচের হিসাব অনুমোদন করা।

৩. রিপোর্টারদের ছুটি মঞ্জুর করা। রিপোর্টারের সুবিধা-অসুবিধাগুলি দেখা।

৪. সংবাদ প্রতিবেদন নিয়ে যদি আইনগত সমস্যা হয়, তাহলে সেগুলির দ্রুত সমাধানকরা।

৫. বিভিন্ন জায়গায় চিঠিপত্র লেখা ও সরকারি পরিচয়পত্র বা জরুরি আমন্ত্রণপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

৬. চিফ রিপোর্টার সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের পরিচালন বিভাগের প্রতিনিধিও। ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন মিটিংয়ে

অংশ নেয়। সেখানে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি রিপোর্টারদের জানাতে হয়।

৭. চিফ রিপোর্টারকে মাঝেমধ্যেই সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। সম্পাদক কি ধরনের সংবাদ চাইছে তা জেনে রিপোর্টারদের সেই মতো নির্দেশ দিতে হয় চিফ রিপোর্টারকে।

পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে যাতে, এতটুকু খামতি না হয়, সেদিকে নজর রাখতেই হয় চিফ রিপোর্টারকে। তবে অনেক দায়িত্ব থাকলেও সংবাদমাধ্যমের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নয়।

সীমাবদ্ধতা :

চিফ রিপোর্টারের কতগুলি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. চিফ রিপোর্টারকে মনে রাখতে হয় সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের গৃহীত নীতির বিরুদ্ধাচারণ করা যায় না।

২. দেশের নিয়মকানুন, আইন এবং সাংবাদিকদের জন্য গৃহীত নীতিগুলির উর্ধ্বে ওঠা সম্ভব নয়।

৩. চিফ রিপোর্টার আসলে সাংবাদিক এবং সংবাদকর্মী হিসাবেই তার পরিচয়।

৪. সম্পাদক বা বার্তা সম্পাদকের নির্দেশ চিফ রিপোর্টার অমান্য করতে পারে না।

৫. কোনও অজুহাতেই নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না চিফ রিপোর্টার।

১.৩.৯ চিফ অফ নিউজ ব্যুরো

প্রতিটি সংবাদপত্রের অফিসেই 'চিফ অফ নিউজ ব্যুরো' বা 'ব্যুরো চিফ'-এই পদটি রয়েছে। বেশিরভাগ সংবাদপত্রেই একাধিক ব্যুরো চিফ থাকে। এই পদটি মূলতঃ আলঙ্কারিক এবং কিছুটা প্রশাসনিকও। সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতা এবং প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা দেখেই একজন সাংবাদিককে ওই পদে বসানো হয়। সাধারণভাবে প্রতিটি সংবাদমাধ্যমের একটি প্রধান অফিস থাকে। যেখান থেকে সংবাদপত্র বা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অথবা অন্য গণমাধ্যম যেখান থেকে পরিচালিত হয় তার সংবাদ বিভাগের সর্বোচ্চ পদে থাকে চিফ অফ নিউজ ব্যুরো। তবে অনেক সময়ই বিভিন্ন বড় শহরে সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমগুলির অফিসের মূল দায়িত্বে যিনি থাকে তাকেও সংশ্লিষ্ট ব্যুরোর (অফিস) প্রধান বলা হয়। যদিও তাদের সঙ্গে মূল অফিসের ব্যুরো চিফের কাজ এবং সন্মানের পার্থক্য অনেক। মূল অফিসে যিনি ব্যুরো চিফ তিনি বিশেষ সংবাদদাতা শ্রেণীর পদমর্যাদা পায়। অন্যান্য আঞ্চলিক অফিসে ব্যুরো চিফ মূল অফিসের চিফ রিপোর্টারের সমগোত্রীয়।

সাধারণভাবে রিপোর্টিং বিভাগের প্রত্যেকদিনের কাজ দেখাশোনা করে মূখ্য সংবাদদাতা বা চিফ রিপোর্টার। তবে এই চিফ রিপোর্টার প্রশাশনিকভাবে ব্যুরো চিফের অধীনে। সেই কারণে, প্রয়োজন মনে করলে বা ইচ্ছে হলেই রিপোর্টিং বিভাগের কাজকর্ম কেমন চলছে তা দেখতে পারে চিফ অফ নিউজ ব্যুরো। আবার, চিফ রিপোর্টারের প্রয়োজন হলে ব্যুরো চিফের কাছে সাহায্য চাইতে পারে।

কোনও বিশেষ খবর কভার করার জন্য যে কোনও রিপোর্টারকে 'অ্যাসাইনমেন্ট' দিতে পারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিশেষ সংবাদদাতা ও বিশেষ প্রতিনিধিদের কপি প্রধানত ব্যুরো চিফের কাছেই জমা দিতে হয়। ব্যুরো চিফ কপিটি দেখে সঠিক বলার পরই তা প্রকাশের জন্য যায়। একই সঙ্গে বিশেষ সংবাদদাতা ও বিশেষ প্রতিনিধিদের

নানাভাবে গাইড করতে পারে ব্যুরো চিফ। সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের নীতি অনুযায়ী তাদের সংবাদ কভার করার নির্দেশও দিতে পারে ব্যুরো চিফ।

ব্যুরো চিফ সাংবাদিক হিসাবে সফল। যেহেতু, তার পরিচিতি ব্যাপক, তার যোগাযোগ অনেক, সঙ্গে রয়েছে, অভিজ্ঞতা, তাই সংবাদ সংগ্রহের কাজে কোনো রকম সমস্যা দেখা দিলে তা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করে ব্যুরো চিফ।

বিভাগীয় বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও তার। সফল সাংবাদিকের পাশাপাশি ব্যুরো চিফকে ব্যক্তিত্ববান প্রশাসক হিসাবেও সাফল্য অর্জন করতে হয়।

তাই তো এটা বলাই যায় যে, পাঠক বা দর্শকের কাছে সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা কিছুটা হলেও নির্ভর করে ব্যুরো চিফের কর্মদক্ষতার উপর।

১.৩.১০ সারাংশ

সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের ‘খবরদাতা’ হল রিপোর্টার। কঠোর পরিশ্রমী ও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হয় এই রিপোর্টারকে। সবচেয়ে বড় কথা, দ্রুত ও নির্ভুল প্রতিবেদন লেখার ক্ষমতা থাকতে হয় রিপোর্টারকে। রিপোর্টিং বিভাগে তো একজন রিপোর্টার থাকে না। বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য অনেক রিপোর্টার থাকে। বিদেশের খবর জোগাড় করার জন্য রয়েছে বিদেশ সংবাদদাতা। আর অভিজ্ঞতা ও ভাল কাজ করার নিরিক্ষে রিপোর্টারদের পদোন্নতি হয়। ট্রেনি রিপোর্টার ধীরে ধীরে স্টাফ রিপোর্টার, সিনিয়র রিপোর্টার, বিশেষ সংবাদদাতা হয়। আর রিপোর্টারদের ‘ক্যাপ্টেন’ চিফ রিপোর্টার। প্রতিটি সংবাদপত্রে দুই থেকে তিনজন চিফ রিপোর্টার থাকতে পারে। আর রিপোর্টার থেকে শুরু করে সংবাদ কক্ষের প্রতিটি বিভাগ সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করছে কি না, সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমের নীতি অনুযায়ী প্রতিবেদন লেখা হচ্ছে কিনা, তা দেখে চিফ অফ নিউজ ব্যুরো। সংবাদপত্র কিংবা ম্যাগাজিন তখনই সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাবে যখন সেখানকার রিপোর্টার, চিফ রিপোর্টার, চিফ অফ নিউজ ব্যুরো এবং সম্পাদনা, বিজ্ঞাপন-সহ প্রতিটি বিভাগ এক সঙ্গে সঠিকভাবে কাজ করবে। সেই কারণে রিপোর্টার থেকে চিফ রিপোর্টার ছাড়াও রিপোর্টিং বিভাগের প্রতিটি বিষয় জানলে পরবর্তী সময়ে কাজ করতে গিয়ে অনেক সুবিধা মিলবে। এমনকি, রিপোর্টার হিসাবে কাজে যোগ দিলে আগে থেকে জানা থাকবে তার কাজটা কী।

১.৩.১১ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন : টীকা লিখুন

১. স্টাফ রিপোর্টার

২. বিশেষ সংবাদদাতা

৩. চিফ রিপোর্টার

৪. ব্যুরো চিফ

বড় প্রশ্ন :

১. সংবাদপত্রের রিপোর্টিং বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন?

২. ভারতের একটি খ্যাতনামা ফ্যাশন ম্যাগাজিনের নাম লিখুন? ম্যাগাজিন চালানোর জন্য কাদের উপর বেশি দায়িত্ব থাকে?

৩. রিপোর্টার বা প্রতিবেদকের গুণাবলী কি কি?

৪. সংবাদপত্রে চিফ রিপোর্টারের ভূমিকা কি? চিফ অফ নিউজ ব্যুরো সম্পর্কে টীকা লিখুন।

১.৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১. *সংবাদ প্রতিবেদন*—ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য : লিপিকা প্রকাশনী

২. *সংবাদ সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা*—সুজিত রায় : ভারতী সাহিত্য প্রকাশনী

৩. *সংবাদবিদ্যা*—ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ (রাজ্য) পুস্তক পর্ষৎ

৪. *Reporting Manual*—Sourin Banerji

একক ৪ ❑ সংবাদ সূত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব

১.৪.০ গঠন

১.৪.১ উদ্দেশ্য

১.৪.২ প্রস্তাবনা

১.৪.৩ সংবাদ সূত্র

১.৪.৪ সংবাদ সূত্রের ভূমিকা

১.৪.৫ সারাংশ

১.৪.৬ অনুশীলনী

১.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১.৪.১ উদ্দেশ্য

ভাল সাংবাদিক হওয়ার জন্য যে গুণগুলি প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হল দারুণ 'সোর্স' তৈরি করা। তা এই 'সোর্স' মানেটা কী? যে মাধ্যম বা ক্ষেত্র থেকে সংবাদ পায় সাংবাদিকরা, তাকেই সংবাদের উৎস বা সোর্স বলা হয়। সাংবাদিকরা অনেক সময়ই সংবাদ সংস্থার কাছ থেকে খবর পায়। কখনও আবার প্রেস রিলিজ বা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সংবাদ জোগাড় করে। আবার কখনও প্রশাসনিক কর্তাদের কাছ থেকে সংবাদ পায়। অনেক সময়ই সাংবাদিকরা নিজস্ব সোর্স থেকে খবরের হদিশ পেয়ে থাকে। আর এই নিজস্ব নেটওয়ার্ক কিন্তু একদিনে তৈরি হয় না। তবে এটাও ঠিক, যে সাংবাদিক যত তাড়াতাড়ি নিজস্ব সোর্স গড়ে তুলতে পারবে, সে তত দ্রুত কর্মক্ষেত্রে উন্নত করবে। আসলে, সংবাদ মাধ্যমের জগতে একটা কথা প্রায় বলা হয়, সেই সাংবাদিক বড়, যার সোর্স দুর্দান্ত। আসলে, সংবাদ লেখার আগে তো খবর সংগ্রহ করতে হবে। তাই সাংবাদিকদের খবর পাওয়ার জন্য সংবাদের উৎসগুলির দিকে ভাল করে নজর রাখতে হবেই। সংবাদের জগতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই তাই সংবাদের উৎস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে হবে। না হলে সমস্যায় পড়তে হবে।

সংবাদের উৎস সম্পর্কে একটা কথা প্রথম থেকেই সাংবাদিকদের মাথায় রাখতে হয়, তা হল সংবাদের উৎসের যেন বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে। কেননা, পাঠক বা দর্শকের কাছে সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা একটা বিরাট ব্যাপার। তাই তো সাংবাদিকরা সংবাদের উৎস থেকে তথ্য পাওয়ার জন্য ভাল করে যাচাই করে নেয় যে সংবাদটি সত্যি কি না। কারণ, সংবাদের উৎস থেকে পাওয়া তথ্য বা খবরে যদি একটিও ভুল থাকে, তাহলে সাংবাদিক যে সংবাদ করবে, সেটা ভুল খবর হবে। যা আদপে সাংবাদিকের ভাবমূর্তি নষ্ট করবে। তাই তো সংবাদ রচনার ক্ষেত্রে 'সংবাদের উৎস' খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই এককে আমরা সংবাদের উৎস কাকে বলে, সাধারণভাবে সংবাদের কি কি উৎস রয়েছে এবং সর্বোপরি সংবাদের উৎসের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করব।

১.৪.২ প্রস্তাবনা

কোনটা খবর, আর কোনটা খবর নয়, সেটি সম্পর্কে ভালরকম জ্ঞান থাকা সাংবাদিকদের প্রাথমিক গুণ। একটা ব্যাপার প্রথম থেকেই সাংবাদিকদের জানতে হয় যে, কোন খবরটা পাঠক বা দর্শককে আকর্ষণ করবে। কোন সংবাদ জানা পাঠকের উচিত। শুধু তাই নয়, খবরটি যেন একেধারে তথ্যপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়। সেই কারণে, খবরের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের এটাও বুঝতে হবে, খবরটা কোথা থেকে পাওয়া গিয়েছে। সংবাদটি যে উৎস বা সোর্স থেকে মিলেছে সেটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য। কেননা, বর্তমান ইন্টারনেট-হোয়াটসঅ্যাপের যুগে প্রচুর পরিমাণে 'ফেক নিউজ' ঘুরে বেড়ায়। তাই সঠিক উৎস থেকে খবরটি খুঁজে বের করা এখনকারদিনে সাংবাদিকদের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই তো কিছুদিন আগেই একটি নামী নিউজ ওয়েবসাইটেই বলিউডের একটি প্রখ্যাত অভিতো সম্পর্কে লেখা হয়েছিল তিনি নাকি গুরুতর অসুস্থ। সেই খবরটি মুহূর্তের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েও পড়ে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তা জানা যায়, 'খবর'টি একেবারেই ভুল। সেই কারণে, কোনও সাংবাদিক যদি ওই ওয়েবসাইটকে 'সংবাদসূত্র' হিসাবে ধরে নিয়ে কোনও খবর করত, তাহলে তো তার ভাবমূর্তি নষ্ট হতই। একই সঙ্গে ওই সাংবাদিক যে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলত। সেই কারণে, সংবাদের সূত্র সঠিক বের করাই আসল কাজ। অর্থাৎ খবরটি কে বা কারা দিচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যদি কোনও সেলিব্রেটির মৃত্যু সংবাদ সংবাদ মাধ্যমে তখনই প্রকাশ করা উচিত, যখন সংবাদের 'সোর্স' বিশ্বাসযোগ্য কেউ হয়। যেমন ওই সেলিব্রেটি যদি হাসপাতালে ভর্তি থাকেন, তাহলে সেখানকার কর্তৃপক্ষের পদস্থ আধিকারিক যদি মৃত্যুর কথা বলেন, তখন সেটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নিতে হবে। আরও একটা কথা মাথায় রাখা জরুরি, সাংবাদিকের সংবাদ সূত্র যদি ভুল হয় এবং সেই তথ্য নিয়ে যদি সংবাদপত্রের সাংবাদিক কোনও খবর করে, আর সেটা প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে সেটা কোনওদিনই পরিবর্তন করা যাবে না। এটা ঠিক ভ্রম সংশোধন দেওয়া যাবে। সেখানে নিউজ চ্যানেল বা ওয়েবসাইটগুলিতে ভুল খবর দেওয়ার পর তা আর না দেখানোর সুযোগ রয়েছে। তাই সংবাদমাধ্যমে সংবাদ সূত্র-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে কথা মাথায় রেখেই এই এককে সংবাদ সূত্র ও তার ভূমিকার বিষয়টি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

১.৪.৩ সংবাদ সূত্র

সংবাদপত্র বা টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল নানা দিক দিয়ে এবং নানাভাবে 'সংবাদ' পায়। সেটা কখনও সংবাদ সংস্থা হতে পারে, কখনও আবার সাংবাদিকের নিজস্ব নেটওয়ার্ক। সাংবাদিকদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে, যে করেই হোক খবর বের করতে হবে। দ্রুত খবর জোগাড় করে প্রতিবেদন করতে হবে। আর সাংবাদিকরা যে সকল ক্ষেত্র থেকে খবর বা সংবাদ পায়, সেগুলিকেই বলা হয় সংবাদের উৎস বা 'সোর্স' সংবাদের উৎগুলি কি কি, তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

সংবাদ সংস্থা বা নিউজ এজেন্সি : সংবাদপত্র হোক বা নিউজ চ্যানেল কিংবা রেডিওয়ের 'সংবাদ' বা 'খবর'-এর অন্যতম প্রধান সূত্র 'সংবাদ সংস্থা'। ভারতের অন্যতম সংবাদ সংস্থা হল 'পিটিআই', 'ইউএনআই'। বিদেশি সংবাদ সংস্থার মধ্যে রয়েছে 'এপি', 'এএফপি', 'রয়টার্স'। সংবাদ সংস্থাগুলি অর্থের বিনিময়ে সংবাদমাধ্যমগুলিকে 'খবর' সরবরাহ করে। ছবিও পাঠানোর দায়িত্ব থাকে সংবাদ সংস্থার উপরই। নামী সংবাদ সংস্থার দেশ ও বিদেশের

অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ জাগয়গাতেই প্রতিনিধি রয়েছে। আসলে, কোনও সংবাদ মাধ্যমেই দেশ ও বিদেশের সর্বত্র নিজস্ব প্রতিনিধি রাখা সম্ভব নয়। আবার সমস্ত ঘটনা 'কভার' করার জন্যও অনেক সময়ই সংবাদপত্র কিংবা নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিক পাঠানো যায় না। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সংবাদ সংস্থার পাঠানো 'খবর' সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের অন্যতম ভরসার জায়গা। শুধু তাই নয়, এটাও অনস্বীকার্য যে, নিউজ এজেন্সির খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। সেই কারণে, কোনও খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সাংবাদিকরা সংবাদ সংস্থার প্রতি ভরসা রাখে।

নিউজ চ্যানেল : বর্তমান ২৪×৭ নিউজ চ্যানেলের যুগে সংবাদপত্রের কাছে অন্যতম সংবাদের অন্যতম অবশ্যই খবরের চ্যানেলগুলি। অনেক সময় তো ঘটনা ঘটনার অল্প সময়ের মধ্যেই নিউজ চ্যানেলগুলি তা সম্প্রচার করে দেয়। খবরের আপডেটও দিতে থাকে। মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনার প্রতিটি মুহূর্ত তো প্রায় তিনদিন ধরে দেশের সমস্ত নিউজ চ্যানেলগুলি দেখিয়েছিল।

রেডিও স্টেশন : এফএমের সৌজন্যে সংবাদপত্রগুলি রেডিওর কাছ থেকেও অনেক খবর পেয়ে যায়। কেননা, দেশ বা বিদেশে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলে এফ এম স্টেশনগুলিতে অনুষ্ঠানের মাঝেই সে সম্পর্কে মূল সংবাদটি বলে দেয়। এমনকী, একবার নয়, বড় ঘটনা ঘটলে তো কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর সেই সংবাদের আপডেটও দেওয়া হয়। পাশাপাশি, সরকারি রেডিও স্টেশনগুলিতে সকাল ও সন্ধ্যায় সারাদিনের খবর তো রয়েছেই।

সোশ্যাল মিডিয়া : যুগটাই এখন ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের। নিউজ চ্যানেল কিংবা রেডিওতে সম্প্রচার হওয়ার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর প্রকাশিত হয়ে যায়। কোনও ঘটনা সবেমাত্র ঘটেছে তা ফেসবুকে 'ব্রেকিং নিউজ' হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এখন তো দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোনও কিছু ঘোষণা, কাউকে শ্রদ্ধা বা কিংবা কোনও ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানানোর বিষয়ে অন্যতম জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া 'ট্যুইটার'-এর সাহায্য নেয়। এমনকী, 'ইউটিউব'-এর ভিডিওর মাধ্যমেও এখন অনেক খবর মেলে। সাংবাদিকরা এখন তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই প্রথমে জানতে পারে। সেই কারণে বলাই যায় বর্তমান ডিজিট্যাল দুনিয়ায় সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেলের কাছে সংবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস সোশ্যাল মিডিয়া। একই সঙ্গে মনে রাখা জরুরি যে, সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেলগুলি খবরের জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইটের উপরেও নির্ভর করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজি ওয়েবসাইট। যেমন, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, এনডিটিভি, ইন্ডিয়া টুডে, হিন্দুস্তান টাইমস, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ওয়েবসাইটের দিকে সাংবাদিকরা নজর রাখে। পাশাপাশি, বিবিসি, গার্ডিয়ানের ওয়েবসাইটের খবরের বিশ্বাযোগ্যতা থাকায় সাংবাদিকরা এগুলির দিকেও অবশ্যই দৃষ্টি রাখে।

প্রেস রিলিজ: সংবাদপত্র কিংবা নিউজ চ্যানেলের পক্ষে সমস্ত ঘটনা বা অনুষ্ঠানে 'কভার' করার মতো প্রতিনিধি থাকে না। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের খবর তো করতে হবে। সেক্ষেত্রে সাংবাদিকদের খবরের উৎস হচ্ছে 'প্রেস রিলিজ'। কোনও ঘটনা কিংবা অনুষ্ঠানের সঙ্গে যারা জড়িত (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনসংযোগ আধিকারিক) তারা প্রতিটি সংবাদ মাধ্যমের কাছে ওই ঘটনা বা অনুষ্ঠানের মূল সারকথা লিখে (প্রেস রিলিজ) ইমেল বা হোয়াটঅ্যাপের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়। খবরের সঙ্গে সঙ্গে ছবি বা ভিডিও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই প্রেস রিলিজে অবশ্যই যোগাযোগ নম্বর থাকে। যাতে ওই ঘটনা বা অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কোনও তথ্য সাংবাদিক যোগাযোগ করে অনায়াসেই পেতে পারে। প্রেস রিলিজকে আবার প্রেস নোট বা প্রেস হ্যান্ড আউটও বলা হয়ে থাকে।

প্রেস কনফারেন্স বা সাংবাদিক সম্মেলন : সংবাদপত্র বা নিউজ চ্যানেলগুলির খবরের অন্যতম উৎস সাংবাদিক সম্মেলন বা প্রেস কনফারেন্স। বিশিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থা কোনও কিছু ঘোষণা বা কোনও ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে ডাকতে পারে। সাধারণত, সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি বা সংস্থার কোনও নির্দিষ্ট বক্তব্য সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

নিউজ ব্রিফিং : কোনও একটি নির্দিষ্ট বক্তব্যকে 'সংবাদ' হিসাবে প্রকাশ কিংবা প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা দফতরের পদাধিকারী কোনও ব্যক্তি সাংবাদিকদের কাছে বিবৃতি দেন তখন সেটিকে বলা হয় নিউজ ব্রিফিং। এটাও মাথায় রাখতে হবে, নিউজ ব্রিফিংয়ের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরও দেন। এই যেমন করোনা নিয়ে প্রায় প্রত্যেকদিনই রাজ্যের সচিবালয়ের পদস্থ কর্তা সাংবাদিকদের কাছে তথ্য পরিবেশন (এটাকেই নিউজ ব্রিফিং বলে) করেছেন। অনেক সময় দেখা যায়, কোনও রাজনৈতিক দলরে পদস্থ নেতা দলীয় কর্মসূচির কথা সাংবাদিকদের কাছে নিউজ ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে পৌঁছে দেন। সেই কারণে বলা যায়, সংবাদের অন্যতম উৎস অবশ্যই 'নিউজ ব্রিফিং'।

ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার : সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ উৎস সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউ। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে অনেক সময় শুধু একটি নয়, একাধিক 'খবর' পেয়ে যায় সাংবাদিকরা। অনেক সময় দেখা যায়, ভাল কোনও সাক্ষাৎকার খবরের কাগজের একটি পাতার অনেকটা অংশ জুড়েই ছাপা হয়। আবার এটাও দেখা যায় যে, কোনও নিউজ চ্যানেল হয়তো দেশের প্রধানমন্ত্রীর ইন্টারভিউ নিয়েছে, সেটা থেকেই খবরের কাগজগুলি বিভিন্ন খবর করেছে।

মুখ্য প্রশাসনিক ভবন : রাজ্যের মুখ্য প্রশাসনিক ভবনও সংবাদের অন্যতম উৎস। প্রায় প্রত্যেকদিন মুখ্য প্রশাসনিক ভবন থেকে বিভিন্ন দফতরের খবর মেলে। অনেক সময় তো ওই ভবন থেকে 'এক্সক্লুসিভ' খবরও করে সাংবাদিকরা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য প্রশাসনিক ভবন 'নবান্ন' সেখানে প্রায় প্রত্যেকদিনই সাংবাদিকরা যায় খবরের সন্ধানে।

পুরসভা : স্থানীয় পরিষেবা সংক্রান্ত খবরের জন্য সাংবাদিকদের কাছে 'সোর্স' পুরসভা। তাই পুরসভার মেয়র, মেয়র পারিষদ এবং কাউন্সিলরদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয় সাংবাদিকদের।

পুলিশ ও থানা : পথদুর্ঘটনা, চুরি, ছিনতাই কিংবা নারী নিগ্রহের মতো ঘটনার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের খবর পাওয়ার অন্যতম উৎসই হল পুলিশ বা থানা। শুধু তাই নয়, কোনও খুনের তদন্ত চলাকালীন সাংবাদিকদের সেই সংক্রান্ত সংবাদের তথ্য পেতে সাহায্য করে একমাত্র পুলিশের সংশ্লিষ্ট কর্তা। এমনকী, পুলিশের সদর দফতরের (পশ্চিমবঙ্গের যেমন লালবাজার) থেকেও প্রচুর খবর পায় সাংবাদিকরা। সেই কারণে, যে সকল সাংবাদিক 'পুলিশবিট' করে, তাদের তো রোজই প্রত্যেকটি থানার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়।

সংসদ বা বিধানসভার অধিবেশন : সংসদ বা বিধানসভার অধিবেশন থেকেও সাংবাদিকরা প্রচুর খবর পায়। এই অধিবেশনেই নানা বিল পাস হয়। সেগুলি সম্পর্কে জানার জন্য অধিবেশনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এই অধিবেশনগুলিতে সরকার নানা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করে। তাই অধিবেশন অবশ্যই সাংবাদিকদের কাছে সংবাদের জন্য অন্যতম উৎস।

আদালত : খুন, ফাঁসি, খ্যাতনামা কোনও ব্যক্তির জামিন বা গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ের খবরের একমাত্র উৎস আদালত। সেটা হাই কোর্ট হতে পারে কিংবা সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে সাংবাদিকরা নিম্ন আদলেতের থেকেও অনেক সময় খবর পেয়ে থাকে। সম্প্রতি নির্ভয়া মামলায় দোষীদের ফাঁসি হবে কি না, তার জন্য সাংবাদিকদের আদালতের দিকেই নজর রাখতে হয়েছিল। অর্থাৎ সংবাদের উৎস হিসাবে আদালত ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

হাসপাতাল ও নার্সিংহোম : সংবাদপত্র হোক বা নিউজ চ্যানেল, সেখানে হেলথ রিপোর্টার থাকেই। আর ওই সাংবাদিকদের কাছে সংবাদের মূল উৎস সরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোম। তাই তো ওই সাংবাদিকদের প্রতিদিনই হাসপাতাল ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : সংবাদের অন্যতম উৎস হিসাবে অবশ্যই বলা যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা। প্রায় প্রত্যেকদিনই স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও না কোনও খবর হয়ই। প্রতিটি সংবাদপত্রেই শিক্ষাসংক্রান্ত খবরগুলি করার জন্য সাংবাদিক থাকে।

গবেষণাপত্র ও ম্যাগাজিন : কোনও বিষয় সম্পর্কে গবেষণাপত্র থাকলে সেখান থেকেও সাংবাদিকরা নানা খবর করতে পারে। পাশাপাশি, দেশ-বিদেশের নানান ম্যাগাজিন থেকেও প্রচুর খবরের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই সাংবাদিকদের কাছে গবেষণাপত্র ও ম্যাগাজিন, দু'টোই সংবাদের অন্যতম উৎস হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য সূত্র : উপরিউক্ত সূত্রগুলি ছাড়াও আরও নানা উৎস রয়েছে যেগুলির মাধ্যমেও সাংবাদিকরা খবরের খোঁজ পায় তার মধ্যে রয়েছে বণিকসভার আলোচনা বা শিল্প সম্মেলন, দূতাবাস, বিজ্ঞাপন, প্রচার, পুস্তিকা, পোস্টার ও সংবাদের উৎস হিসাবে কাজ করে।

১.৪.৪ সংবাদ সূত্রের ভূমিকা

সংবাদের তথ্য যদি একেবারে সঠিক 'সূত্র' থেকে পাওয়া যায়, তাহলে সেই সংবাদটি পাঠক বা দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবেই। কেননা, যে কোনও খবর করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রথম যে বিষয়টি মনে রাখতে হয়, তা হল সংবাদটি যেন নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য হয়। প্রত্যেক সাংবাদিকের মূল কাজ হল, পাঠক বা দর্শকের কাছে সঠিক খবর পৌঁছে দেওয়া। যাতে করে সাধারণ মানুষের মনে সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যম তথা সাংবাদিকটির কাজের প্রতি আস্থা অর্জন হয়। কখনও 'চমকপ্রদ' খবর করার লোভে ভুল তথ্য নিয়ে সংবাদ করলে আসলে ভাবমূর্তি নষ্ট হয় সাংবাদিকদের। সেই কারণে, ছোট বা বড়, যে কোনও ধরনের সংবাদ করার ক্ষেত্র 'সংবাদ সূত্র' সম্পর্কে ভালরকম ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। যেমন, কোনও মার্কেটে হয়তো খুব একটা বড় আগুন লাগেনি। মারা যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু কোনও নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিক আগে 'ব্রেকিং নিউজ' দেওয়ার জন্য কোনও বিশ্বস্ত সূত্র (এখানে পুলিশ কিংবা দমকল হল বিশ্বস্ত সূত্র) থেকে তথ্য না নিয়ে বলতে থাকল যে, একটি মার্কেটে বিধ্বংসী আগুন লেগেছে। বেশ কয়েকজন মৃত্যুর আশঙ্কা। দমকলের অনেকগুলি গাড়ি গিয়েছে...। তাই যে কোনও সংবাদ লেখার আগে ভাল করে দেখে নিতে হবে খবরটি কী, কোথা থেকে পাওয়া গিয়েছে। সবকিছু যাচাই করে সংবাদ লেখা বুদ্ধিমানের কাজ।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, রিপোর্টার প্রতিবেদন লেখার সময় সংবাদ সূত্রের উল্লেখ করে দিতে পারে। তাতে

করে পাঠক বুঝতে পারে যে, এই সংবাদটি একেবারেই সঠিক। যেমন ধরা যাক, ভয়াবহ কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। সেখানের মৃতের সংখ্যা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা থাকেই। কিন্তু কোনও রিপোর্টার যদি সংবাদ সংস্থা 'পিটিআই'-এর তথ্য উল্লেখ করে তার প্রতিবেদনে মৃতের সংখ্যা লেখে তাহলে পাঠক সেটিকে একেবারে নির্ভুল বলে মনে করবে। আবার এমন দেখা গেল রিপোর্টার একটি নামী সংস্থার সম্পর্কে প্রতিবেদন করল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংস্থার কোনও কর্তার বক্তব্য উল্লেখ থাকল না ওই প্রতিবেদনে। তাহলে পাঠকের মনে সন্দেহ দেখা দিতেই পারে এই প্রতিবেদনটি সঠিক নয়। সেই কারণে, বর্তমান ইন্টারনেট-হোয়াটসঅ্যাপের যুগে রিপোর্টারকে প্রথম থেকেই সংবাদ সূত্র নিয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়। কেননা, রিপোর্টারের প্রতিবেদন সংবাদ সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই তো সংবাদের ক্ষেত্রে সংবাদ সূত্র বিরাট ভূমিকা পালন করে।

১.৪.৫ সারাংশ

রিপোর্টারের যেমন দ্রুত ও ভাল লেখার ক্ষমতা থাকতে হবে, তেমনই তাদের অন্যতম 'মূলধন' হল সোর্স বা সূত্র। যে রিপোর্টারের যতভাল সোর্স সে তত তাড়াতাড়ি কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারবে। সংবাদমাধ্যমের দুনিয়ায় কদরও মিলবে ওই রিপোর্টারের। আর এই সোর্স তৈরি করাও রিপোর্টারের একটি বড় গুণ। রিপোর্টারকে দ্রুত সংবাদের সোর্স বা সূত্র খুঁজে নিতে হবে। সোজা কথায়, নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। রিপোর্টারের সংবাদের সূত্র যেন হয় গোপনীয়। যা অন্য রিপোর্টারের কাছে থাকবে না। রিপোর্টারের নিজস্ব সূত্র ছাড়াও সংবাদ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত কয়েকটি সোর্স রয়েছে। রিপোর্টারের কাছে অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য সূত্র হল সংবাদ সংস্থা। এছাড়াও পুলিশ, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক ভবন, প্রেস রিলিজ, সংসদ বা বিধানসভা। রয়েছে নিউজ চ্যানেল, রেডিও, ম্যাগাজিন। যেখান থেকে প্রতিটি রিপোর্টার প্রত্যেকদিনই সংবাদ পায়। একই সঙ্গে রিপোর্টারের খেয়াল রাখা হয় যে, তার সোর্স যেন একেবারে সঠিক হয়। না হলেই বিপদ। কেননা, রিপোর্টারের প্রতিবেদনে যদি কোনও ভুল তথ্য থাকে কিংবা পুরো সংবাদটিই মিথ্যা হয়, তাহলে পাঠকের কাছে রিপোর্টারের ভাবমূর্তি যেমন নষ্ট হবে তেমনই সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের প্রতিও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে যাবে। সেই কারণে, সংবাদের ক্ষেত্রে সংবাদ সূত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শেষে একটা কথা বলা দরকার, তা হল ভবিষ্যতে যখন কাজের জগতে পা দেবে এখনকার ছাত্রছাত্রীরা, তখন অবশ্যই সংবাদ লেখার সময় সংবাদ সূত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারবে।

১.৪.৬ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন : টীকা লিখুন

১. সোশ্যাল মিডিয়া

২. প্রেস রিলিজ

৩. নিউজ ব্রিফিং

৪. সাক্ষাৎকার

বড় প্রশ্ন :

১. সংবাদ সূত্র বলতে কী বোঝায়? কী কী সংবাদ সূত্র রয়েছে?

২. সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ সূত্রের ভূমিকা কতটা?

৩. একজন রিপোর্টারের কাছে সংবাদ সূত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোন দিকটা বেশ নজর দেওয়া উচিত? কেন বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন?

১.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. *সংবাদ প্রতিবেদন*—ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য : লিপিকা প্রকাশনী

২. *সংবাদবিদ্যা*—ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৩. *সংবাদ সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা*—সুজিত রায় : ভারতী সাহিত্য প্রকাশনী

৪. *Mass Communication and Journalism in India*—D. S. Mehta : Allied Publishers

৫. *Reporting Manual*—Sourin Banerji

মডিউল ২ : বিশেষায়িত প্রতিবেদন

একক ১ ❑ সংবাদের শ্রেণীবিন্যাস

২.১.০ গঠন

২.১.১ উদ্দেশ্য

২.১.২ প্রস্তাবনা

২.১.৩ বিভিন্ন ধরনের সংবাদ

২.১.৩.১ রাজনৈতিক প্রতিবেদন

২.১.৩.২ আইনসভা বা সংসদ/বিধানমণ্ডলী-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২.১.৩.৩ নগর ও সমাজজীবন-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২.১.৩.৪ অপরাধ ও দুর্নীতি বিষয়ক প্রতিবেদন

২.১.৩.৫ আইন আদালত-সংক্রান্ত সংবাদ

২.১.৩.৬ অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক প্রতিবেদন

২.১.৩.৭ উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২.১.৩.৮ খেলাধূলা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২.১.৩.৯ ফ্যাশন বা শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোশাকের রেওয়াজ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২.১.৩.১০ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিবেদন

২.১.৩.১১ পরিবেশ ও বাস্তু পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২.১.৩.১২ স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন

২.১.৪ সারাংশ

২.১.৫ অনুশীলনী

২.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে সংবাদের পরিধি অর্থাৎ সংবাদ কত রকমের হতে পারে সে সম্পর্কে আপনার একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।

২.১.২ প্রস্তাবনা

এই একক পাঠ করলে বিভিন্ন বিষয়-সংক্রান্ত সংবাদ ও সেইসব সংবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার সচেতনতা বাড়বে। রাজনৈতিক সংবাদ, আইনসভা-সংক্রান্ত সংবাদ, নগর ও সমাজজীবন-সংক্রান্ত সংবাদ বা অপরাধ ও দুর্নীতি

বিষয়ক সংবাদ, অর্থনীতি ও শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বা খেলাধূলা ও ফ্যাশন বা বিজ্ঞান ও উন্নয়ন, পরিবেশ ও বাস্তু পরিবেশ বা স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-পরিষেবা বিষয়ক সংবাদের সামাজিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা পরিষ্কার হবে এবং এইসব বিষয় নিয়ে যথাযথ অনুশীলন করলে আপনারাও এইসব নানা বিষয়ের ওপর খুব ভালো ভালো সংবাদ লিখতে পারবেন।

২.১.৩ বিভিন্ন ধরনের সংবাদ

২.১.৩.১ রাজনৈতিক (Political) প্রতিবেদন

একথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, সংবাদপত্র যেহেতু সমাজের দর্পণ এবং রাজনীতি যেহেতু মোটামুটিভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই সংবাদপত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে রাজনৈতিক সংবাদ। এই রাজনীতি কিন্তু আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে রাজনীতি বা পলিটিক্স-এর কথা পড়েছি তার থেকে আলাদা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনীতির তত্ত্বগত দিকগুলি আলোচনা করা হয় আর সংবাদপত্র রাজনীতির ফলিত বা ব্যবহারিক দিকটিতেই বেশি আগ্রহী। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনীতিতে অংশ নেয় বহু রাজনীতিক দল। সেই দলগুলির কোনটি থাকে শাসন ক্ষমতায়, কোনটির বা ভূমিকা হয় বিরোধীদলের। সংবাদপত্র শাসক ও বিরোধী এই দুই দলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখে বা সেটাই তার আদর্শ হওয়া উচিত। রাজনৈতিক সংবাদ লেখার সময় সদাসতর্ক থাকতে হয় যাতে বিভিন্ন মতাদর্শগত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে পাঠককে অবহিত রাখা যায় এবং একই সঙ্গে শাসকদলের কার্যকলাপ এবং বিরোধীদলের শাসকদল সম্পর্কে সমালোচনার গতিধারা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হয় এবং তাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে মানুষের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের/নেত্রীদের সঙ্গে তো বটেই এমন কি এইসব দলের অন্যান্য স্তরের এবং গণসংগঠনগুলির নেতা/নেত্রীদের সঙ্গেও রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন।

রাজনৈতিক সংবাদে মূলত প্রাধান্য পায় বিভিন্ন দলের গণকল্যাণমুখী কার্যসূচী এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবস্থা। রাজনৈতিক দলগুলির ঘোষিত কর্মসূচী বা প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবের কতটা তফাৎ সেটাকে মানুষের নজরে আনাটাও রাজনৈতিক সংবাদদাতার কাজ। বিভিন্ন উপদলীয় কার্যকলাপের প্রতিও রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের নজর রাখতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, রাজনৈতিক সংবাদ লিখতে গিয়ে সাংবাদিক কখনও তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ বা পছন্দ অপছন্দের ওপর ভিত্তি করে কোন অভিমত প্রকাশ করবেন না। তাঁর কাজ সঠিক তথ্য সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনে দিক নির্দেশ করা, কিন্তু কখনোই কোন পক্ষ অবলম্বন করা নয়। তাঁকে সর্বদাই থাকতে হবে নিরপেক্ষ এবং বিষয়নিষ্ঠ।

২.১.৩.২ আইনসভা (Legislative) বা সংসদ/বিধানমণ্ডলী-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

গণতন্ত্রে মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হল আইনসভা। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হল সংসদ। রাজ্যস্তরে বিধানসভা/বিধানমণ্ডলী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এখানে নতুন আইন প্রণয়ন করেন, কখনও আবার পুরনো আইনকে সংশোধন করেন বা বদলান সেটিকে যুগের উপযোগী করার জন্য। এছাড়াও তাঁরা বিভিন্ন

সমসাময়িক বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন যার মধ্য দিয়ে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সময়বিশেষে অভাব-অভিযোগের প্রতিফলন ঘটে।

আইনসভা সম্পর্কিত প্রতিবেদকের তাই আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত পদ্ধতিগুলির বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে কীভাবে বাজেট পাশ হয় বা money bill পাশ হয় সে বিষয়ে খুব স্বচ্ছ ধারণা থাকা চাই। সভায় যেভাবে ভোট দেওয়া হয় বা অধ্যক্ষ যেভাবে রুলিং দেন সেসব বিষয়গুলি বেশ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সভার মধ্যে কোনও সদস্য যা হোক কিছু বলতে পারেন, কারণ তাঁর সে ব্যাপারে একটা বিশেষ ক্ষমতা বা legislative prerogative আছে। সাংবাদিকদের কিন্তু তা নেই। তাই কোনও সদস্যের কোনও মন্তব্য যদি কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী হয় বা কুৎসামূলক হয় তাহলে সেসব মন্তব্যকে যথাযথ সতর্কতার সঙ্গে এবং মানহানি আইন বাঁচিয়ে সাংবাদিককে পরিবেশন করতে হয়।

২.১.৩.৩ নগর ও সমাজজীবন (Civil and Social Life) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

রাজনীতির মতোই প্রশাসন পরিচালনা-সংক্রান্ত সবকিছুই সাংবাদিকদের কাছে সংবাদের একটি অন্যতম বড় উপাদান। প্রশাসনেরও আবার বিভিন্ন দিক আছে। যেমন, লোকসভা বা বিধানসভার শাসকদল যেভাবে সরকার পরিচালনা করে সেটি যেমন প্রশাসনের মূল অংশ, তোমনই কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত, জেলাপরিষদ প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাগুলিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি প্রশাসন সম্পর্কে খবর লিখতে গেলে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ (যেমন, কৃষি, শিক্ষা স্বাস্থ্য, সেচ, পরিবহন, নগর উন্নয়ন ইত্যাদি) বা দফতরের দৈনন্দিন ভিত্তিতে যে সব কাজগুলি হয় সেগুলি থেকে জনস্বার্থ সম্পর্কিত তথ্যগুলি তুলে এনে পাঠককে অবহিত করাও সাংবাদিকদের কাজ। এইসব খবর কখনো বিভাগীয় মন্ত্রী বা কোনও উচ্চ-পদাধিকারী কর্তাব্যক্তির সাংবাদিক বৈঠক বা বিবৃতির মাধ্যমে হতে পারে, আবার কখনো বা সাংবাদিক তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশেষ অনুসন্ধানের মাধ্যমেও এইসব তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদ পরিবেশন করেন।

অনেক সময় দেখা যায় সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী বা বিভাগীয় কর্মকর্তা যে বিষয়টিতে জোর দিয়ে বলতে চাইলেন সে বিষয়টি সংবাদ হিসাবে ততটা গুরুত্ব পেল না, গুরুত্ব পেল তাঁর বক্তব্যের এমন একটা দিক যার ওপর তিনি আলোকপাত করতে চাননি কিন্তু সাংবাদিকরা তাঁদের অনুসন্ধিৎসার জোরে সেটাকে বার করে আনতে পেরেছেন। এতে মন্ত্রী বা তাঁর অফিসার অসন্তুষ্ট হলেও সাংবাদিক নাছোড়। গণতন্ত্রের প্রহরী হিসাবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখাটা সাংবাদিকের কাজ। একথা তো সকলেরই জানা যে সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্রে অলিখিতভাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই ষাট শতাংশ সাফল্যকে মন্ত্রী বা সরকার তুলে ধরতে চাইলেও সাংবাদিক যদি চল্লিশ শতাংশ ব্যর্থতা তুলে ধরতে চান তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সরকারি বিভাগীয় খবর করতে গেলে বিভিন্ন প্রকল্পের ওপর সরকারি ঘোষণা ভালো করে সাংবাদিককে মনে রাখতে হয়, বা প্রয়োজনে লিখে রাখতে হয়, এবং দেখতে হয় সেইসব ঘোষিত কাজ নির্দিষ্ট সময়ে এবং বরাদ্দ অর্থসীমার বা বাজেটের মধ্যে শেষ হল কিনা। না হয়ে থাকলে তার সমালোচনামূলক লেখা এবং ব্যর্থতার জন্য দায় কার সে সম্পর্কে খবর লেখা যায়।

অনেক সময় দেখা যায় প্রশাসনের উচ্চতম পর্যায়ে হয়তো অর্থ বরাদ্দ হয়েছে কিন্তু মাঝের বা নিচের স্তরের আধিকারিক বা কর্মীদের দীর্ঘসূত্রিতায় বা অবহেলায় তা কার্যকর করা হয়নি যার ফলে হয়তো কোনও জেলার প্রত্যন্ত

গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি বা শিল্প গড়ে ওঠেনি। এই ব্যর্থতাগুলিও খবরের বড় উপাদান। সরকারি সাফল্য বা উন্নয়নমূলক যা কিছু কাজ সেগুলিও নিঃসন্দেহে সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু এগুলি সাধারণত সরকারি প্রচার মাধ্যমের দৌলতেই মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তবুও উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নমূলক সংবাদের ওপর সাংবাদিকদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কখনও কখনও সাফল্যের সংবাদ, তা সে সরকারি বা বেসরকারি যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, প্রকাশিত হলে শ্রমিক-কর্মীরা খুবই উৎসাহিত হন ও কাজের গতি অব্যাহত থাকে।

মানুষের সামাজিক জীবন, সামাজিক সমস্যা, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তার বিচ্যুতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের উপাদান, তেমনই নাগরিক অধিকার, নাগরিক কর্তব্য এবং নাগরিক সুখসুবিধা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দায়িত্বপালনে অবহেলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাংবাদিকের কাজ হবে কিছু কিছু বিষয়ে মানুষকে অবহিত করা, আবার একইভাবে কিছু কিছু বিষয়ে মানুষকে তার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করা।

২.১.৩.৪ অপরাধ ও দুর্নীতি (Crime and Corruption) বিষয়ক প্রতিবেদন

আইনের বাইরে গিয়ে এবং সমাজেব পক্ষে ক্ষতিসাধনকর যেসব কাজকর্মগুলি মানুষ করে সেগুলিই অপরাধ ও দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে।

অপরাধ লঘু অথবা গুরুতর তা ঠিক করা হয় সাধারণত সমাজের ওপর তার প্রতিক্রিয়ার ওপর। যেমন, খুন জখম যে রকম অপরাধ, চলন্ত বাসে কেউ পকেট মারলে তা ঠিক সেই মাপের অপরাধ নয়। আবার সভ্যজগতে কেউ কাউকে অপমান করাটাও এক ধরনের অপরাধ।

অপরাধ দমনের জন্য পুলিশি ব্যবস্থা আছে। পুলিশবাহিনীর একটি সদর দফতর থাকে, যার অধীনে বিভিন্ন শাখা অফিস এবং থানাগুলি থাকে সাধারণ মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। প্রতিটি সংবাদপত্রই সেজন্য নিয়মিত এক বা একাধিক সাংবাদিককে নিযুক্ত রাখে শহর ও গ্রামের নানারকম অপরাধের খবর সংগ্রহ করার জন্য। এইসব সাংবাদিকদের কাজ হল অপরাধ দমনের কাজে নিযুক্ত যে সব পুলিশ অধিকর্তা আছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং অপরাধমূলক ঘটনাগুলিকে একটু অন্যরকমভাবে লেখা। অন্যরকম বলতে এটাই বোঝায় যে, অপরাধ যেহেতু মানুষের ব্যতিক্রমী কাজ তাই সে ব্যাপারে মানুষের জানার আগ্রহ বা কৌতূহল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। দেখা যায় কখনও কখনও কোনো চুরির ঘটনার থেকেও কী কৌশলে সেই চৌর্যবৃত্তিটি সম্পন্ন হয়েছে তার বিষদ বিবরণ এবং সেই চোরকে ধরতে গিয়ে পুলিশ যে পাল্টা কৌশল ব্যবহার করে সেই কাহিনী অনেক বেশি চাঞ্চল্য জাগায় ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একইভাবে কোনো হত্যার থেকে তার কৌশল বা ছকের নতুনত্ব বা বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার ঘটনা কুশলী এবং অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের লেখায় অদ্ভুতভাবে ফুটে ওঠে এবং তা সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে।

দুর্নীতি সাধারণত চোখের আড়ালেই ঘটে থাকে। অনেক সময় তার নথিপত্র সাংবাদিকরা পরিশ্রম করে এবং সংবাদসূত্রের জোরে জোগাড় করে থাকেন। এঁদের দক্ষতা তাই প্রশ্নাতীত। যে সমস্ত সাংবাদিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির খবর প্রকাশ্যে আনেন তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা থাকা একান্ত আবশ্যক। তার মধ্যে প্রধান হল হিসাবশাস্ত্র (Accountancy) এবং প্রশাসনিক রীতিনীতির ওপর বিশেষ দখল। একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক— সরকারি কোনও বিভাগে বেশ কিছু টাকা নয়ছয় হয়েছে। অর্থাৎ যে টাকা যে খাতে খরচ হওয়ার কথা ছিল খাতা-কলমে দেখানো হলেও তা আদৌ খরচ হয়নি। এখন, সেই টাকাটা কে বা কারা আত্মসাৎ করেছে

তা যদি কোনও সাংবাদিক প্রকাশ করতে পারেন তাহলে একই সঙ্গে কাগজের গুণমান বৃদ্ধি পায়, সমাজের কল্যাণ হয় ও তাঁরও সুনাম বাড়ে।

একথা বলাই বাহুল্য যে, এই ধরনের খবর প্রকাশ করার পিছনে শুধুমাত্র সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসাই যথেষ্ট নয়, নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র বা সংবাদসূত্র থাকাটাও খুব জরুরি। সাংবাদিকের এই কাজে সরকারি অফিসার, পুলিশ, কর্মচারী থেকে শুরু করে প্রতারণার শিকার হয়েছেন এমন মানুষ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এমন কি আইনজীবীও সহায়ক হতে পারেন। তাই দুর্নীতির খবর যে সাংবাদিক প্রকাশ্যে আনেন তাঁর সমাজের প্রায় সর্বস্তরের অবাধ যাতায়াত থাকা চাই। আর, তার সঙ্গে চাই কঠোর অধ্যবসায়, ধৈর্য, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ বুদ্ধি ও গভীর মনন।

২.১.৩.৫ আইন আদালত (Law Court) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

যে কোনও শাসনব্যবস্থায়, বিশেষত গণতন্ত্রে, বিচারব্যবস্থার একটি বিশেষ স্থান আছে। আইনসভা, সরকার, কোনও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা অন্য কোনও ব্যক্তির কোন আদেশ, নির্দেশ বা কাজের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় বা অর্থহানি বা সম্মানহানি ঘটে তাহলে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমেই তার প্রতিকার হতে পারে। সংবাদপত্রে কোর্ট রিপোর্টিং তাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নতর আদালতগুলি— যেমন, মুন্সেফ আদালত, জজ আদালত, মহকুমা আদালত বা জেলা আদালতগুলির দায়রা বা Criminal বিভাগে যেমন নিত্যই বহুরকম অপরাধ, অত্যাচার বা বঞ্চনার মামলার ওপর রায় দেওয়া হয়, তেমনই রাজ্যস্তরে হাইকোর্ট একইসঙ্গে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করে থাকে। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ধারাগুলির ব্যাখ্যা করে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে এবং একইসঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ওপর বিষয়ভিত্তিক মামলাগুলিতে রায় দিয়ে থাকেন। কোর্ট রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে তাই একইসঙ্গে দু-তিন রকমের দক্ষতা প্রয়োজন। অপরাধ সম্পর্কিত মামলাগুলি সম্বন্ধে লিখতে হলে যেমন প্রয়োজন Indian Penal Code (IPC)/Criminal Procedure Code (Cr.P.C) সহ বিভিন্ন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে জ্ঞান ও সেইসঙ্গে মামলার গতিপ্রকৃতিকে একটু সরস ভাষায় পরিবেশন করার ক্ষমতা, তেমনই অন্যদিকে হাইকোর্টের রিপোর্টারকে বিভিন্ন দেওয়ানি আইন (Civil Procedure Code), কোম্পানি আইন, আয়কর আইন, বিক্রয়কর আইন, মোটরযান আইন (Motor Vehicles Act) প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে সংবিধান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান খুবই প্রয়োজন। কোর্ট রিপোর্টারকে সবসময় মনে রাখতে হয় যে আদালতের লিখিত আদেশের বাইরে গিয়ে কোনরকম বাড়তি মন্তব্য বা ব্যাখ্যা করাটা গর্হিত কাজ বলে গণ্য হয় এবং তা আদালত অবমাননার (Contempt of Court) আওতায় পড়ে।

২.১.৩.৬ অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প (Economic, Business & Industry) বিষয়ক প্রতিবেদন

রাজনীতি দেশকে শাসন করে, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান যোগায় অর্থনীতি। আবার রাজনৈতিক মতাদর্শগত অবস্থান থেকেই রাজনৈতিক দলগুলি অর্থনীতিকে দেখতে চায়। তাই রাজনীতি ও অর্থনীতির শুরু ও শেষ খোঁজার চেষ্টা অনেকটা 'আগে ডিম না আগে মুরগি' সেই ধাঁধার মতো। সে যাই হোক, যাঁরা অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাপারে খবর লিখবেন তাঁদেরকে অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি, যেমন—মূলধন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান বিভিন্ন বিষয়ে সর্বশেষ সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে হবেই। কোনও নীতির ভালো ও মন্দ দিক, সেইসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট

শিল্পমহল ও বণিকসভাগুলির প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক স্তরে সেইসব নীতির প্রভাব অথবা কোনও বিশেষ আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিণতিতে এ ধরনের নীতি প্রণয়ন হলে তাও জেনে পাঠককে জানাতে হয়। আজকের বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সরাসরি প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে যেমন, ইদানীং ইরাকের ওপর আমেরিকার সম্ভাব্য আক্রমণের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামের দাম ওঠানামার প্রভাব ভারতসহ সব তেল আমদানিকারী দেশের ওপরই পড়েছে। তেমনিই, আবার দেশে বা আন্তর্জাতিক স্তরে নির্মাণ (Construction) ক্ষেত্রে মন্দা দেকা দিলে ভারতের ইস্পাতশিল্পে মন্দা দেখা দেবে। তাই এই সমস্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ খুব সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করাটা অর্থনীতি ও শিল্পবাণিজ্য জগতের রিপোর্টারের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সরকারি শিল্পবাণিজ্য নীতি, ভর্তুকি (Subsidy) নীতি, বিক্রয়কর (Sales Tax) বা অধুনা আলোচিত গুণমানবর্ধিত কর (Value-added Tax), পণ্য ও সেবায় কর (GST), চুঙ্গি কর (Toll Tax), ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সুদের হারের ওঠানামা, শেয়ার বাজারের সূচকের ওঠানামা ইত্যাদি।

ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান, বিপণন, কাঁচামাল সরবরাহের সূত্র প্রভৃতি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে শিল্প বাণিজ্য-অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্টার তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন না। কাজেই এই সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের সম্যক জ্ঞান থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

২.১.৩.৭ উন্নয়ন (Development) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সমাজের উন্নতি বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। একদিকে যেমন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট, সেতু, পয়ঃপ্রণালী, উড়ালপুল, জলসরবরাহ, গৃহনির্মাণ, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গবেষণাগার ইত্যাদি নির্মাণের খবর সরাসরি, অর্থাৎ প্রকল্পগুলির বিবরণ, বিস্তার, অর্থবরাদ্দ ইত্যাদি বিষয়সহ লেখাই হচ্ছে উন্নয়ন সাংবাদিক বা development reporter-এর কাজ; অন্যদিকে তেমনই এসব কাজকর্মের ক্ষেত্রে গাফিলতি, বিচ্যুতি, দুর্নীতি প্রভৃতি সম্পর্কেও মানুষকে এই সাংবাদিকরাই অবহিত করেন।

এছাড়া যে সব উন্নয়ন মানুষের পরিবেশ ও মনোজগৎকে প্রভাবিত করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে সেগুলি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করাটাও এসব সাংবাদিকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মানুষের অংশগ্রহণ কীভাবে হচ্ছে তা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

২.১.৩.৮ খেলাধূলা (Sports) সম্পর্কিত প্রতিবেদন

খেলাধূলা বিষয়ক প্রতিবেদন এক অর্থে একটি বিশেষ ধরনের সাংবাদিকতা। সেজন্য এই ক্ষেত্রে সাংবাদিকের দক্ষতা হওয়া উচিত এমনই যে তিনি যেন নিজেকে খেলাধূলার জগৎ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। দেশবিদেশের প্রভূত জনপ্রিয় খেলা, যেমন—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, বেসবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস থেকে শুরু করে দাবা, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স্ সহ খেলাধূলার জগতের গভীরে প্রবেশ করতে হয় ক্রীড়া সাংবাদিককে। প্রতিটি খেলাধূলার নিয়মকানুন, সেগুলির প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি, পরিসংখ্যান, ক্রীড়াবিদ্‌দের অতীত ও বর্তমান profile বা ব্যক্তিচিত্র প্রভৃতি বিশদ জেনে রাখা দরকার।

সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন খেলাধূলার প্রতি একটি স্বাভাবিক আগ্রহ। সম্ভব হলে নিয়মিত নিজে খেলাধূলায়

অংশ নেওয়া। এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাংবাদিক বুঝতে পারেন যে, তিনি যখন কোনও খেলোয়াড়ের প্রশংসা বা সমালোচনা করছেন প্রকৃতপক্ষে তা যুক্তিসংগত হচ্ছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়ই প্রকৃত বুঝতে পারেন যে একজন খেলোয়াড় যখন নির্দিষ্ট কোনও জায়গা বল গোলে পাঠান তখন তা কতটা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

আজকে টিভি-র কল্যাণে সরাসরি খেলাধূলা দেখার সুযোগ ঘটেছে। ক্রীড়া-সাংবাদিককে তাই খেলা ছাড়াও খেলোয়াড়দের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, অনুশীলন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু বিষয়েই জানতে হয় এবং মাঝে মাঝে সংবাদ হিসাবে পরিবেশন করতে হয়। সেইজন্য ক্রীড়া-সাংবাদিককে খেলোয়াড়, কোচ, ক্লাবের কর্মকর্তা, মাঠের কর্মকর্তা, এমনকি মালীদের সঙ্গেও হৃদ্যতা গড়ে তুলতে হয়। খেলার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয় শুধু খেলাই নয়, যাঁরা খেলছেন তাঁদের ছন্দোময়তা বা ছন্দোহীনতা, তাঁদের উত্তাপ বা শৈত্য, তাঁদের ঐশ্বর্য বা দৈন্য, তাঁদের জেতার তাগিদ অথবা খেলার আগেই হার-মানা মনোভাব।

২.১.৩.৯ ফ্যাশন (Fashion) বা শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোশাকের রেওয়াজ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সাংবাদিকতার জগতে ফ্যাশন বস্তুত সর্বকনিষ্ঠ এবং হয়তো বা সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। সংবাদপত্র শুধুমাত্র সমাজের দর্পণ বা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়েই আবদ্ধ থাকেনি; বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে হয়ে উঠেছে অন্যান্য পণ্যের মতোই সাধারণভাবে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বীতার মধ্যে বিক্রয়যোগ্য একটি পণ্য। তাই তার কোন বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান নেই। অর্থাৎ সমাজের উপরতলার অথবা মধ্যবিত্তদের মধ্যে অধুনা যে ফ্যাশনদুরস্ত হওয়ার তাগিদ রয়েছে সেটাকেই সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে সংবাদপত্র পরিবেশন করছে ফ্যাশনের খবর। সংবাদ মাধ্যমের প্রভাবে আজকাল অবশ্য নিম্নমধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্তদের মধ্যেও ফ্যাশনদুরস্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে বা তৈরি হয়েছে।

ফ্যাশন-সাংবাদিকতার জন্য তাই চাই ফ্যাশন-উদ্যোক্তা নানা ব্যবসায়ী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ। এছাড়াও প্রয়োজন পেশাদার মডেল অথবা চলচ্চিত্র শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। আর চাই আধুনিক ফ্যাশন সম্পর্কে ধারণা। কোন কোন আন্তর্জাতিক বা দেশি ডিজাইনাররা কখন/কোথায়/কী নতুন ডিজাইন আনছেন সেগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর সংগ্রহ করা এবং মডেলের ছবিসহ সেগুলি প্রকাশ করাই হল ফ্যাশন-সাংবাদিকের প্রধান কাজ। রূপচর্চা যাঁর স্বাভাবিকবাবেই আসে বা যিনি কোনও না কোন সময়ে মডেলিং বা সিনেমা জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এরকম মানুষের পক্ষে ফ্যাশন-সাংবাদিকতা খুব স্বাভাবিকভাবেই উপযুক্ত কাজ হতে পারে। তবে, আদৌ যাঁর এরকম অভিজ্ঞতা নেই তিনিও পারবেন এই কাজ। তার জন্য চাই শিল্পীর চোখ আর ফ্যাশনমহলে গণসংযোগ।

২.১.৩.১০ বিজ্ঞান (Science) বিষয়ক প্রতিবেদন

এটি সর্বার্থে একটি বিশেষজ্ঞ-নির্ভর সাংবাদিকতা, যদিও উৎসাহী যে কোন ব্যক্তি ক্রমাগত চর্চা ও পড়াশোনার মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে রিপোর্ট লেখার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে একটু কঠিন এই জন্যে যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যে ধরনের জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে তার সঙ্গে শুধু তাল মিলিয়ে চলাই নয়, সাংবাদিককে বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য করে উপস্থাপিত করতে হয়।

বিজ্ঞান-রিপোর্টিং-এ সাধারণত দুটি জিনিস গুরুত্ব পায়। একটি হল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবতম আবিষ্কার বা পুরাতন ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নতুন ধারণায় উদ্ভব। আর, অন্যটি হল—বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির মিলনে উদ্ভুত মানবকল্যাণমূলক আবিষ্কারের নতুন নতুন ঘটনা।

আধুনিক যুগে মাইক্রোবায়োলজি, জেনেটিক্স্, মহাকাশ-গবেষণা, সমুদ্র-গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর প্রতিনিয়তই বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন আলোকপাত করছেন। আর, সেগুলির সঙ্গে পাঠকসমাজের পরিচয় করিয়ে দেন সাংবাদিক। সুতরাং সেইসব গবেষণালব্ধ ফল মানুষের পক্ষে ভালো না খারাপ সে বিষয়েও সাংবাদিককে ওয়াকিবহাল হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, "ক্লোনিং" (এক প্রাণীদেহ থেকে কোষ নিয়ে অযৌন প্রক্রিয়ায় অন্যদেহে স্থাপন করে ঠিক একই রকম প্রাণী সৃষ্টি করা) নিয়ে, বিশেষ করে মানুষের "ক্লোনিং" করা নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা মানুষ সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জানতে পেরেছে বা পারছে। এই একইরকমভাবে বিজ্ঞান-সাংবাদিক আমাদের জানান যে, কীভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ আরও বেশি উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সুদূরের নীহারিকা থেকে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত মণিমুক্তার সন্ধান পর্যন্ত সবই উঠে আসে সংবাদপত্রের পাতায়, আর তার কৃতিত্ব বিজ্ঞান সাংবাদিকদেরই।

২.১.৩.১১ পরিবেশ ও বাস্তু-পরিবেশ (Environment and Ecology) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(পরিবেশ বা বাস্তু-বিদ্যায় পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীজগতের সম্পর্ক আলোচিত হয়)

পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়করা সবসময় উপলব্ধি করতে পারুন বা না পারুন, আমাদের এই সবুজ গ্রহটিকে রক্ষা করা এবং বাসযোগ্য করে রাখার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের। জাতি-রাষ্ট্রের (nation state) উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর (ethnic group) স্বকীয়ভাবে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা কখনও সীমিত করতে পারেনি পৃথিবীর আবহমণ্ডল, বায়ুস্তর অথবা মহাসাগরগুলির অবিচ্ছিন্নতাকে।

সভ্যতার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত কৃষি-সভ্যতা এবং তৎপরবর্তী পুরায় দু/আড়াইশো বছরের শিল্পসভ্যতার সময়কাল পর্যন্ত পৃথিবী যে এক সেই ধারণা স্বচ্ছ না হলেও আজকের দিনে প্রায় সকলেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে, পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা না করে পরিকল্পনাহীন যন্ত্রসভ্যতার বিস্তার মানা প্রজাতির পক্ষে বিষময় হয়ে উঠছে।

একথা ঠিকই যে কয়লা বা পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি ব্যবহার করে যন্ত্র চালিয়ে মানুষ প্রভূত সম্পদ সৃষ্টি করেছে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে। কিন্তু তার পরিণামে পৃথিবীর পরিবেশ হয়েছে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা এখন জানতে পারছি কলকারখানার ধোঁয়ায়, মোটরযানের ধোঁয়ায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন (ozone) স্তর ক্রমশই নিঃশেষিত হচ্ছে। যার ফলে সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মির (ultra-violet ray) সরাসরি পৃথিবীর বুকে নেমে আসার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। বায়ুমণ্ডল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। পরিবেশবিজ্ঞানীরা এমন সতর্কবাণীও দিয়েছেন যে, পৃথিবীব্যাপী এই উত্তপ্ততা (global warming) এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যে তার ফলে মেরু অঞ্চল থেকে হিমবাহ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলভাগ এমনভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে যার ফলে পৃথিবীর নিচু অঞ্চলগুলি জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে। একইরকমভাবে, সমুদ্রের জলদূষণ এবং বর্জ্য পদার্থ ফেলা যদি অবিলম্বে বন্ধ না করা যায় তাহলেও মানুষের এবং সমুদ্রের প্রাণিজগতের অপূরণীয় ক্ষতি অনিবার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তৈলবাহী কোনও জাহাজ ফুটে হয়ে গিয়ে জল যদি দূষিত হয়ে যায় তাহলে সামুদ্রিক জীব ও পাখি মারা যায় হাজারে হাজারে।

পরিবেশ রক্ষায় অরণ্যেরও যে একটি বিশেষ অবদান আছে সেকথা আমরা সবাই জানি। গাছ কাটা পড়লে কম বৃষ্টিপাত থেকে শুরু করে বাতাসে অক্সিজেন হ্রাস প্রভৃতি ঘটনা মানুষের জীবনে নিয়ে আসতে পারে অপূরণীয় ক্ষতি।

পরিবেশ-সংক্রান্ত রিপোর্টিং বা প্রতিবেদন করতে গেলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্যস্তরে প্রাসঙ্গিক যে সমস্ত সনদ (Charter) ও আইনকানুন আছে সেগুলিও ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। যেমন, সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে, তাকে বলা হয় Earth Summit বা বসুন্ধরা শীর্ষ সম্মেলন। সেখানে যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেগুলিকে সনদে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি রূপায়ণ করে নিজ নিজ দেশে আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশে জল, বায়ু ও পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে এবং শব্দদূষণের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আইন তৈরি হয়েছে। সেগুলিকে বলবৎ করার জন্য কেন্দ্রে আছে Central Pollution Control Board এবং রাজ্যগুলিতে আছে State Pollution Control Board। পরিবেশ সংবাদদাতা যেমন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খবর লক্ষ্য করে এদেশে সেগুলির প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামাবেন, তেমনই তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং পরিবেশ রক্ষায় নিযুক্ত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা NGO-র সঙ্গে। তিনি যেমন লক্ষ্য রাখবেন যে কোথাও বেআইনিভাবে গাছ কাটা হচ্ছে কিনা, তেমনই তিনি লক্ষ্য রাখবেন যে কেউ কোথাও জলাজমি ভরাট করে নিয়ে বাড়ি তৈরি করছে কিনা। মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে তাই তিনি পরিবেশন করবেন দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে পরিবেশ রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ মানুষদের নির্ভীক সংগ্রাম।

২.১.৩.১২ স্বাস্থ্য (Health) বিষয়ক প্রতিবেদন

কথায় বলে স্বাস্থ্যই সম্পদ। প্রতিটি মানুষ ও জাতির সাফল্যের মূলে আছে পরিশ্রম বা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মানুষের সুস্থ শরীরের ওপর। শরীরের সুস্থ অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। প্রতিটি মানুষ চায় সুস্থ থাকতে। মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলির মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে। এরই মধ্যে আবার স্বাস্থ্য সবার আগে। এই স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন একদিকে সুষম খাদ্য, সক্রিয় স্বভাব ও নিয়মানুবর্তিতা আর অন্যদিকে প্রয়োজন সামাজিক ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে ভালো মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা।

চিকিৎসা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য আছে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নার্সিং হোম, পে-ক্লিনিক বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ডাক্তারি-ব্যবসায়। এসব কিছু ব্যবস্থার সবচেয়ে ওপরে আছে স্বাস্থ্য দফতর ও স্বাস্থ্যকর্মী। স্বাস্থ্য দফতরের কাজ অনেক বেশি, তাই একজন প্রতিমন্ত্রীরও প্রয়োজন হয়েছে। স্বাস্থ্যকৃত্যক অধিকার বা Directorate of Health Services-এর প্রধান স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য দফতরের স্বাস্থ্য সচিব বা Health Secretary ও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী অফিসার বা আধিকারিক আছেন যাঁরা সরকারের স্বাস্থ্য দফতর বা বিভাগ ও অধিকার বা directorate-এর বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়োগ বদলি সব কিছু স্বাস্থ্য বিভাগ বা অধিকার থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। হাসপাতালের মধ্যে আবার কয়েকটি আছে যেখানে শুধু রোগের চিকিৎসাই হয় না, চিকিৎস্যক্ষ্ম-বিজ্ঞান নিয়ে পড়ানোও হয় অর্থাৎ ডাক্তারি পড়ানো হয়। এসব হাসপাতালে যেমন একজন অধীক্ষক বা Superintendent আছেন, তেমনই একজন অধ্যক্ষ বা Principalও আছেন। সব হাসপাতালেই বিভিন্ন রোগ বা অসুখের চিকিৎসার

জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে এবং সেইসব বিভাগের বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকও আছেন। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপযোগী হাসপাতালও আছে, যেমন— প্রসূতি হাসপাতাল, সংক্রামক ব্যাধি-হাসপাতাল, চক্ষু হাসপাতাল, টিবি হাসপাতাল, স্নায়ুরোগ-সংক্রান্ত হাসপাতাল, ক্যান্সার হাসপাতাল ইত্যাদি। আরও নতুন হাসপাতাল ও চিকিৎসা বিজ্ঞান কলেজ তৈরির পরিকল্পনাও আছে। আবার একইসঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় হাসপাতালের ফি বৃদ্ধির ফলে সাধারণ গরীব মানুষ অনেক অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনই আবার ফি না বাড়ালে সরকারের পক্ষেও হাসপাতাল চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।

এইসব কিছুই স্বাস্থ্য প্রতিবেদককে মাথায় রাখতে হবে। তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধির কোনও ওষুধ আবিষ্কৃত হল কিনা, দেশে বা শহরে বিশেষ কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এলেন কিনা, কোনও হাসপাতালে নতুন ব্যবস্থা কিছু হচ্ছে কিনা, চিকিৎসায় গাফিলতির ফলে কোনও হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু হল কিনা, মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন নির্দিষ্ট কোনও বিষয় নিয়ে সরব বা সক্রিয় হয়ে উঠেছে কিনা, কোনও হাসপাতালের অধ্যক্ষ বা অধীক্ষককে বদলি করা হল কিনা, কোনও হাসপাতাল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে কিনা, হঠাৎ রক্তদান শিবির উদ্যোগটা কমে গেল কেন এবং প্রকৃতই সেই কারণে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের অভাব দেখা দিয়েছে কিনা, আই ব্যাঙ্কে কেউ কর্ণিয়া দান করেন না কেন ইত্যাদি অজস্র বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে একজন স্বাস্থ্য-প্রতিবেদককে মোটামুটি ভালোভাবে জানতে হবে। এবং প্রয়োজনমতো সময়ে সময়ে মানুষকে সংবাদের মাধ্যমে জানাতে হবে।

স্বাস্থ্য প্রতিবেদককে এও জানতে হবে শহরে বা কোনও নির্দিষ্ট জায়গায়/এলাকায় কোনও বিশে, ধরনের অসুখ দেখা দিয়েছে কিনা, কোনও নির্দিষ্ট স্থানে মশার উপদ্রব বেড়েছে কিনা বা ম্যালেরিয়ার আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে কিনা, নাগরিক স্বাস্থ্যরক্ষার্থে কর্পোরেশন বা পুরসভা তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছে কিনা, শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার স্বার্থে কী বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষ জানতে চায় এবং তাদের জানার প্রধান উপায়ই হচ্ছে সংবাদপত্র। সুতরাং স্বাস্থ্য-প্রতিবেদককে সর্বদাই সজাগ থাকতে হবে এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা দেখা দিলে বা নতুন কোনও সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনা দেখা দিলে মানুষকে জানাতে হবে। মাঝে মাঝে নানা জায়গায় স্বাস্থ্য শিবির বা Health Camp-এর ব্যবস্থা করা হয়, সে বিষয়েও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। এসব স্বাস্থ্য শিবির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেসরকারি উদ্যোগে সংগঠিত হয়। অনেক সময় সরকারি উদ্যোগেও স্বাস্থ্য শিবির খোলা হয়। বিশেষ কোনও রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকাদানের ব্যবস্থাও সময়ে সময়ে করা হয়। এর মধ্যে শিশুদের টিকাদানের ব্যবস্থা কোথাও হলে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সর্বশেষ কী পরিস্থিতি, ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রম ঠিকমতো অনুসৃত হচ্ছে কিনা, অপুষ্টিজনিত কারণে অসুস্থ ও দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি সব বিষয়েই নজর রাখতে হবে। নজর রাখতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বা কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা বা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা। স্বাস্থ্য-সাংবাদিককে এসব খবরও মানুষকে জানাতে হবে।

স্বাস্থ্য, অসুখ ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত সব খবরই সাংবাদিককে জানতে হবে ও মানুষকে তা জানাতে হবে। সুস্থ সমাজ ও সুলভ চিকিৎসা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার। কিন্তু মানুষকে সচেতন করা ও সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ব।

২.১.৪ সারাংশ

সংবাদের শ্রেণীবিন্যাস বা সংবাদ কত রকমের হতে পারে সে বিষয়ক এককটি পাঠ করলেন। এখন দেখা যাক, আলোচিত অংশে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে মূল তথ্যাদি কী আছে।

সংবাদপত্র যেহেতু সমাজের দর্পণ এবং রাজনীতি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই সংবাদপত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে রাজনৈতিক সংবাদ। গণতন্ত্রে মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান আইনসভা। তাই গুরুত্ব পায় আইনসভা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বিশেষত, বাজেট বা বাজেট-সংক্রান্ত নানা বিষয়। নগর ও সমাজজীবন-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয় একদিকে সামাজিক সমস্যা, সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও তার বিচ্যুতির ওপর ও অন্যদিকে নাগরিক অধিকার, সুখসুবিধা ইত্যাদি ওপর। আইন ভঙ্গ কর যেসব কাজকর্ম হয় ও যার ফলে সমাজের ক্ষতি হয় সেগুলি অপরাধ ও দুর্নীতি বলে গণ্য। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ, সমাজে, শাসনব্যবস্থায় বিচার-ব্যস্থার একটি বড় স্থান আছে। স্বাভাবিকভাবেই আইন-আদালত-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুত্ব খুবই। রাজনীতি যেমন দেশ শাসন করে, অর্থনীতি তেমনি যোগায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। সুতরাং অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পবিষয়ক প্রতিবেদনের গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিবেদনের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। এ ধরনের প্রতিবেদন সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচায়ক। খেলাধূলা সম্পর্কিত সংবাদের পাঠক অংখ্য এবং তাঁদের আগ্রহ সীমাহীন। খেলা ছাড়াও খেলোয়াড়দের ব্যক্তি-জীবন, রুচিপছন্দ, দীনতা ও উদারতা সবই সংবাদ। এছাড়া আছে ফ্যাশন বা শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোশাকের রেওয়াজ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন যা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় ও নবতর প্রজন্মকে আকর্ষণ করে। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিবেদনে সাধারণত দুটি বিষয় গুরুত্ব পায়। একটি বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার বা পুরাতন ধারণার অবসান। আর, অন্যটি বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির মিলনে কল্যাণমূলক আবিষ্কার। পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা না করে পরিকল্পনাহীন কর্মকাণ্ডের বিস্তার মানব প্রজাতির পক্ষে বিষময়। সেই জন্য পরিবেশ ও বাস্তু-পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে মানুষের সচেতনতা বাড়ানো খুব প্রয়োজন। প্রয়োজন সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা, প্রাথমিকভাবে যার মূল নিহিত আছে সমাজের প্রতিটি মানুষের সুস্বাস্থ্যের ওপরে। এই সুস্থতা সুনিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে নিয়মিত প্রতিবেদন যা সাংবাদিকদের সামাজিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

২.১.৫ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন

১। সংবাদের শ্রেণীবিন্যাস বলতে কী বোঝেন? অথবা, সংবাদ কতরকম বিষয়ভিত্তিক হতে পারে?

২। রাজনৈতিক প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩। আইনসভা বা সংসদ/বিধানমণ্ডলী-সংক্রান্ত প্রতিবেনের কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে কী? থাকলে কী?

৪। নগর ও সমাজজীবন বিষয়ক প্রতিবেদনের গুরুত্ব কী?

৫। অপরাধ ও দুর্নীতি-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে মানুষের আগ্রহ কেন?

৬। আইন-আদালত বিষয়ক প্রতিবেদনকে সংবাদপত্রে কেন গুরুত্ব দেওয়া হয়?

৭। অর্থনীতি ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পবিষয়ক প্রতিবেদনের গুরুত্ব কেন দিন দিন বেড়েই চলেছে?

৮। খেলাধূলা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য সাংবাদিককে বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। কেন?

৯। ফ্যাশন-সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য বা প্রয়োজনীয়তা কী? শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোশাকের রেওয়াজ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন জনপ্রিয়ই বা কেন?

১০। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রতিবেদন সর্বার্থে একটি বিশেষজ্ঞ-নির্ভর সাংবাদিকতা। এর কারণ ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

১১। পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও পরিকল্পনাহীন যন্ত্র-সভ্যতা প্রসারের বিষময়তা সাধারণ মানুষ কীভাবে জানতে পারেন তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।

১২। শরীরের সুস্থ অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। কীভাবে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা যায়? এ বিষয়ে সাংবাদিকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

২.১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। *The Active Reporter*—James Lewis (Vikas Publications, Delhi).

২। *The Indian Reporters' Guide*—Richard Critchfield (Allied Pacific Private Limited, Bombay).

৩। *Interpretative Reporting*—Curtis D. MacDougall (Macmillan Limited, London).

৪। *সংবাদ সাংবাদিক সাংবাদিকতা*—সুজিত রায় (ভারতী সাহিত্য প্রকাশনী, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯)।

৫। *বিষয়: সাংবাদিকতা*—ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় (লিপিকা, কলেজ রো, কলকাতা ৯)

৬। *The Student Journalist*—Edmund C. Arnold and Krieghbaum (New York University Press).

৭। *The Professional Journalist*—John Hohenberg (Henry Holt and Company, New York.

৮। *The Practice of Journalism*—John Dodge and George Viner (Heinemann, London).

৯। *News Reporters and New Sources*—Herbert Strentz (Prentice Hall of India Private Ltd., New Delhi, 110 001).

১০। *Professional New Writing*—B. Garrison (Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ).

১২। *Professional Feature Writing* — B. Garrison (Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, (NJ)

১৩। *Into the Newsroom : An Introduction to Journalism* — Leonard Ray Teel and Ron Taylor (Prentice Hall of India Private Ltd., New Delhi, 110 001).

১৪। *Basic Journalism*—Rangaswami Parthasarathi.

১৫। *A History of Press in India* — S. Natarajan (Asia Publishing, Calcutta).

১৬। *A History of Indian Journalism*—Mohit Mitra (National Book Agency Private Ltd, Calcutta).

১৭। *Theory and Practice of Journalism*—B. N. Ahuja (Surjeet Publication, New Delhi).

একক ২ ❑ ফিচার, সাক্ষাৎকার: প্রকার ও কৌশল, সম্পাদকীয়, ওপ-এড পৃষ্ঠা, ক্রোড়পত্র (Supplements)

২.২.০ গঠন

২.২.১ উদ্দেশ্য

২.২.২ প্রস্তাবনা

২.২.৩ ফিচার

- ২.২.৩.১ ফিচারের সংজ্ঞা
- ২.২.৩.২ ফিচার ও সংবাদ প্রতিবেদন
- ২.২.৩.৩ ফিচারের বিষয়বস্তু
- ২.২.৩.৪ ফিচারের বৈশিষ্ট্য
- ২.২.৩.৫ ছবির ব্যবহার
- ২.২.৩.৬ ফিচারের গুরুত্ব

২.২.৪ মানবিক আবেদনমূলক প্রতিবেদন

২.২.৫ সাক্ষাৎকার: প্রকার ও কৌশল

- ২.২.৫.১ সাক্ষাৎকারের ধরন ও প্রকার
- ২.২.৫.২ সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি
- ২.২.৫.৩ সাক্ষাৎকার গ্রহণের নিয়ম
- ২.২.৫.৪ লিখন শৈলী

২.২.৬ সম্পাদকীয়

২.২.৭ ওপ-এড পৃষ্ঠা

২.২.৮ ক্রোড়পত্র (Supplements)

২.২.৯ সারাংশ

২.২.১০ অনুশীলনী

২.২.১১ গ্রন্থপঞ্জি

২.২.১ উদ্দেশ্য

আধুনিক বৈদ্যুতিন মাধ্যম জনমানসে এক বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। যত দিন যাচ্ছে, ততই বাড়ছে অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রগুলিও এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিষয়গত পরিবেশনে তারাও

আনছে পরিবর্তন। মানবিক আবেদনমূলক সংবাদের পাশাপাশি, ফিচার, সাক্ষাৎকার, প্রকাশ করছে। কিন্তু এ সমস্তর পিছনে এক যৌথ কর্মকাণ্ড জড়িয়ে আছে। কিন্তু কী ভাবে? তাই এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়াই এই এককের উদ্দেশ্য।

২.২.২ প্রস্তাবনা

সাক্ষাৎকার গ্রহণ, কীভাবে একজন ফিচার লিখবেন, কীভাবে সাংবাদিক সংবাদকে করে তুলবেন মানবিক আবেদনসম্পন্ন প্রতিবেদন, তা শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক পড়লেই শেখা যায় না। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও হাতে-কলমের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শেখা দরকার। তবে বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে ফিল্ডে কাজ করতে সুবিধা হয়। সাধারণ নিয়মগুলি তাই জানতেই হয়। ফিচারকে যথাযথ বুঝে সাংবাদিক ধরে রাখেন তাঁর পাঠককে। এসকল বিষয় হাতে-কলমের কাজ হলেও বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সাংবাদিক, শিক্ষানবিশের কর্মকাণ্ডের পথকে আরো মসৃণ করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২.২.৩ ফিচার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি সংবাদ ও তথ্য জানানোর কৌশলকে ইতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করেছে। আজ শুধুমাত্র সংবাদ জানানোর মধ্যেই সংবাদ মাধ্যমগুলি ক্ষান্ত নয়। তারও বিশেষ বিশেষ ধরন আছে; যা পাঠককে তথ্য ও সংবাদ জানানোর সাথে সাথে আনন্দও দেয়। ফিচার হল সেই সুখপাঠ্যের বিষয়।

২.২.৩.১ ফিচারের সংজ্ঞা

ফিচারের ধরন ও তার কাঠামো কী হওয়া উচিত এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে ফিচার সম্পর্কে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক উইলিয়াম থ্যাকারের কথাটি একজন সাংবাদিক মনে রাখা দরকার— "The most engaging power of an author to make new things familiar and familiar things new", অর্থাৎ চেনা জগতের অজানা দিক এবং অজানাকে জানানো ফিচার লেখকের কাজ।

লুইস আলেকজান্ডার মনে করেন ফিচার শুরু হয় রিপোর্টিং দিয়ে এবং পাঠকের কাছে ঘটনাটির বর্ণনা ও তার অর্থ পৌঁছে দেয়। জি. এফ. মট (G. F. Mott) এর মতে— "Features entertains, informs, teaches" অর্থাৎ ফিচার পাঠককে আনন্দ দেয়, তথ্য জানায় এবং কিছু শেখায়।

বিখ্যাত সাংবাদিক উইলিয়াম ব্লায়ার জি. ফিচার কি তা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন— "a detail presentation of facts in an interesting way adopted to rapid reading for the purpose of entertaining or informing the average persons" অর্থাৎ ফিচার হল এমন এক ধরনের লেখা যা দ্রুতপাঠের উপযোগী করে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করা হয়। ফিচারের উদ্দেশ্য গড়পড়তা সাধারণ পাঠককে তথ্য জানানো বা আনন্দ দেওয়া।

বিশিষ্ট সাংবাদিকদের মতে ফিচার ও সংবাদ প্রতিবেদনের মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে। ফিচারে তথ্য ও সংবাদকে শুধুমাত্র সবিস্তারে সাজিয়েই দেওয়া হয় না, তাকে আকর্ষণীয় ভঙ্গি পরিবেশন করাও হয়, যা পড়ে পাঠক আনন্দ পায়।

২.২.৩.২ ফিচার ও সংবাদ প্রতিবেদন

সংবাদ প্রতিবেদনে কোন ঘটনা বা বিষয়ের তথ্যকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ফিচার কিন্তু তথ্য জানানোর সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পশ্চাদপট তুলে ধরে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশন করা হয়। এমনকি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা হয় ফিচারে।

সংবাদ প্রতিবেদনের মত কে, কী, কখন, কোথায়, কেন এবং কেমনভাবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ক্ষান্ত হয়না ফিচার লেখক। ফিচারকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঘটনার প্রভাবকে ফিচারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

২.২.৩.৩ ফিচারের বিষয়বস্তু

ফিচারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন Sky is the limit. মূলত গভীর ও মননশীল পর্যবেক্ষণ থেকেই এর বিষয়বস্তু বার করে আনতে পারেন ফিচার লেখক। আসলে বিষয়ের নতুনত্বই ফিচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

জে. ইউ. জি. রাও মহাত্মা গান্ধীর ছাগলের দুধ খাওয়া নিয়ে এক 'সাক্ষাৎকার' ভিত্তিক ফিচারে লিখেছিলেন। সবাই জানেন গান্ধীজি ছাগলের দুধ খেতেন নিয়মিত। এ ধরনের বিষয়বস্তুকে নিয়ে লেখা ফিচার পাঠককে আকর্ষণ করেছিল। আবার পি.টি. ট্যান্ডন নেহেরুর সোভিয়েত সফরের সময় তাঁর রাঁধুনী 'বুধি'কে নিয়ে লিখেছিলেন—"The cook who is tomorrow" শীর্ষক ফিচার।

আসলে পাঠকের সামনে অজানা জগতের অজানা ঘটনা বা চেনা জগতের অচেনা কোনও মাত্রা তুলে ধরতে পারলে তা ফিচারের বিষয়বস্তু হতে পারে।

২.২.৩.৪ ফিচারের বৈশিষ্ট্য

ফিচার বিনোদনমূলক বিষয়বস্তু হলেও তার প্রধান আকর্ষণ মানবিক স্পর্শে। ফিচার সংবাদ প্রতিবেদনের তুলনায় একটু হালকা চালের, হালকা মেজাজের লেখা এবং এটি সংবাদ প্রতিবেদনের মতো উল্টো পিরামিড পদ্ধতিতে লেখা হয়না।

ফিচারে তথ্যকে বিস্তৃত ভাবে সাজিয়ে দিলেই হয়না, প্রয়োজনে তথ্যের বিশ্লেষণ প্রয়োজন যা নতুন দিককে তুলে ধরতে সাহায্য করে। ফিচার নিরপেক্ষভাবে তথ্যের বিশ্লেষণ করে। পাঠককে কোনও একটি মতামতে চালিত করা ফিচার লেখকের কাজ নয়। ভালো ফিচার পাঠক গল্পের মত পড়ে যান। তবে ফিচার গল্পের মত কল্পনাপ্রসূত নয়; তা অবশ্যভাবেই তথ্যভিত্তিক।

একটা ভালো ফিচারের সাধারণত তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন—

১। সহজ সরল বর্ণনা।

২। সুনিয়ন্ত্রিত রচনাশৈলী, যাতে পাঠকের বিরক্তিকর উপাদান অনুপস্থিত।

৩। প্রচুর ঘটনা বা বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটানো।

২.২.৩.৫ ছবির ব্যবহার

সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে ফিচারকে আকর্ষণীয় করে তুলতে ফিচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক ছবি বা স্কেচের প্রচলন উল্লেখ করার মতো। যেমন ভ্রমণ সম্পর্কে ফিচার হলে সংশ্লিষ্ট জায়গার ছবি বা খেলাধূলা-সংক্রান্ত ফিচার হলে খেলোয়াড়ের ছবি অথবা খেলার এক বিশেষ মুহূর্তের ছবি ছেপে দেওয়া হয়।

ফিচার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় শিরোনাম, যা সাধারণ পাঠককে ফিচার পড়তে উৎসাহিত করে।

২.২.৩.৬ ফিচারের গুরুত্ব

সংবাদপত্রের ইতিহাসবেত্তারা বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে ফিচারের রমরমা। দেখা গেল উপন্যাস, ছোটগল্পের চেয়ে সংবাদপত্রের ফিচারের আকর্ষণ পাঠকের কাছে বেশি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রেডিও টিভির ক্রমপ্রসারের সঙ্গে পাল্লা দিতেই ফিচারের আবির্ভাব। আজকে ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের যুগে স্পট নিউজ মানুষ সংবাদপত্র দেবার অনেক আগেই পেয়ে যাচ্ছেন। সংবাদপত্র তাই ডুব দিয়েছে সংবাদের অন্তরালে। তথ্য বিশ্লেষণ করে নতুন দিককে তুলে ধরা হয় ফিচারে, যা আদলে পাঠককে চিন্তার সূত্র যুগিয়ে দিতে সাহায্য করে।

মানুষের পাঠাভ্যাসও দ্রুত বদলাচ্ছে। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মানবিক আবেদন পড়ার মত সময় মানুষ পাচ্ছে না। ফিচারের মানবিক স্পর্শেই সে স্বাদ মেটাচ্ছে। তাছাড়া ফিচারের মধ্য দিয়ে তথ্য জানানোর নতুন স্টাইল তাকে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছে। সংবাদপত্রে ফিচার এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে ব্রায়ান নিকোলাস তাঁর 'Feature with Flair' গ্রন্থে ফিচারকে সংবাদপত্রের 'Soul' বা আত্মা বলে বর্ণনা করেছেন।

২.২.৪ মানবিক আবেদনমূলক প্রতিবেদন

এখন গণমাধ্যমগুলিতে চটকদার সংবাদ পরিবেশনের রমরমা ব্যাপার। মানবিক আবেদনমূলক সংবাদের বিষয়টি ধীরে ধীরে আড়ালে আড়ালে সরে যাচ্ছে। ফলত প্রশ্ন ওঠে মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ সংবাদ কী? তার গুরুত্ব কোথায়?

আজকের সংবাদ মাধ্যমে মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ প্রতিবেদন খুবই আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে। সংবাদ ডেস্ক ও রিপোর্টাররা, এমনকি সংবাদ সংস্থা পর্যন্ত এ ধরনের বিষয় ও প্রতিবেদন সম্পর্কে বিশেষভাবে মাথা ঘামাচ্ছে। স্বভাবতই, এই প্রেক্ষাপটে মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ বলতে ঠিক কী বোঝায় এবং কিভাবে তা পরিবেশন করতে হয় তা নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামাতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

মানবিক আবেদনমূলক সংবাদ

আক্ষরিক অর্থে যদি ধরা যায়, যে সংবাদ মানুষকে আকৃষ্ট করে তাই হল হিউম্যান ইন্টারেস্ট বা মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ সংবাদ। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে সমস্ত ধরনেরই খবরেরই প্রথম শর্ত হচ্ছে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যোগ্যতা। যে খবর পাঠককে পড়তে আগ্রহী করে না, তা খবরই নয়। এটাই তো সাংবাদিকতায় সংবাদ নির্বাচনের প্রচলিত রীতি।

এই রীতিকে সামনে রেখে এ ধরনের সংবাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিচার্য বিষয়। পাঠকের মনে আবেদন তৈরি করতে পারলেই কোনও 'সংবাদ'কে 'মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ' সংবাদ বলা যায় না। সমস্ত ধরনের 'সংবাদ' এরই আবেদন আছে বা থাকা উচিত পাঠকের কাছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এই 'আবেদন' এক ধরনের নয়। ঘটনা বা তথ্য জানার জন্য পাঠক যে প্রতিবেদন পড়ছেন তার আবেদন এক ধরনের। কিন্তু 'জোড়া কন্যা গঙ্গা-যমুনা ভোট দিতে যাবে' এই প্রতিবেদনের আবেদন কি একই ধরনের? আবার রামনাথ কোবিন্দ রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথম ভোট দিলেন' এই সংবাদ প্রতিবেদনের সঙ্গে গঙ্গা-যমুনার ভোট দেবার খবরের কোনও পার্থক্য নেই। দুটো সংবাদেরই 'আবেদন' আছে পাঠকের কাছে। কিন্তু পৃথক ধরনের 'আবেদন'। রাষ্ট্রপতি ভোটদানের খবরটার রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণের আবেদন আছে। কিন্তু 'গঙ্গা-যমুনা' ভোটার হিসেবে সাধারণ, রাজনৈতিক গুরুত্বে তাদের খবর হয়ে ওঠার কোনও যোগ্যতা নেই। কিন্তু গঙ্গা-যমুনা রাজনৈতিক বিবেচনায় ভোটার হলেও, সবাই জানেন, তাদের দেহ পরস্পরের সঙ্গে জোড়া, সেই অবস্থাতেই তাদের বয়স আঠের বছর পার হয়েছে এবং তারা ভোট দেবে। এটা 'সংবাদযোগ্য' ঘটনা তার কারণ তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার। এর 'আবেদন' পাঠকের আবেগের (emotion) কাছে। ভোট নিয়ে গুচ্ছ খবরের ভিড়েও গঙ্গা-যমুনার খবরটি পাঠকের মনের নরম কোণে দাগ কাটবে। একেই বলে 'মানবিক-আবেদন-সমৃদ্ধ' সংবাদ বা Human-interest news।

বৈশিষ্ট্য

মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন—

১) মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের মূল আবেদন পাঠকের মানবিক আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণতার কাছে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

২) সাধারণভাবে সংবাদের ক্ষেত্রে কি, কখন, কোথায়, কিভাবে ঘটল বা কারা ঘটালো'র মতো পয়েন্টগুলো যেরকম ও যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ, মানবিক-আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের ক্ষেত্রে তা সেভাবে হয় না। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ব্যতিক্রমধর্মীতা। ঘটনার স্থানকালপাত্রপাত্রীর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল বিষয়টি পাঠক বা দর্শক-শ্রোতার অনুভূতিপ্রবণতায় নাড়া দিতে পারবে কিনা।

৩) সাধারণ সংবাদের ক্ষেত্রে সংবাদযোগ্য হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাৎক্ষণিকতা বা 'immediacy'। ঘটনা কতটা 'টাটকা' তা অন্যতম প্রধান বিবেচ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে মানবিক আবেদ-সমৃদ্ধ সংবাদের তা হয় না। আজকের খবর কালকে বাসি, অর্থাৎ তা সংবাদ— এমনটা এক্ষেত্রে ঘটে না।

৪) সাধারণভাবে, সংবাদ-যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনও বিষয় বা ঘটনা 'সংবাদ' হিসেবে গুরুত্ব পাবার সময় ঘটনার সাম্প্রতিকতম পরিণতি বা চূড়ান্ত পরিণতি কী, সেটাই নজর করা হয়, অর্থাৎ সংবাদ সাধারণভাবে চূড়ান্ত পরিণতিই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পয়েন্ট। এটাই হার্ড নিউজের রীতি। সেকারণেই সংবাদ প্রতিবেদনে থাকে ইন্ট্রো। প্রথমেই পাঠককে 'পরিণতি' অংশটি ধরিয়ে দিয়ে খবর পরিবেশন শুরু করা হয়। মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত ইন্ট্রোরীতি ও মানবিক আবেদনে-সমৃদ্ধ সংবাদের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। যেমন ধরা যাক, 'মানবশিশু পাহারায় তিন কুকুর'—

এই যে সংবাদটি। এর চূড়ান্ত পরিণতি কী? কিন্তু যদি হাসপাতালে বাচ্চাকে খেয়ে ফেলত কুকুর, তাহলে তার সংবাদ হিসেবে মেজাজ হতো আলাদা, তার ইন্ট্রো অথবা লিডও পৃথক হতো।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন সাধারণভাবে সফ্‌ট নিউজ বা নরম সংবাদ।

মানবিক আবেদনমুখী দৃষ্টিকোণ

মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চলে আসে, যা আধুনিক সংবাদ প্রতিবেদন রীতিতে চালু হয়ে উঠছে নজরকাড়া ভাবে।

এ আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, হয়তো শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ বিষয় বা ঘটনার ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রতিবেদন হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ একটি সংবাদ হয় মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে, নয় পারে না।

কিন্তু এটা হলো মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন সম্পর্কে একটি একমাত্রিক ধারণা। অভিজ্ঞ ও দক্ষ সাংবাদিকরা মনে করেন যে কোন সংবাদযোগ্য ঘটনাতে হার্ডনিউজ বার করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদনকে দেখতে হবে, তাতে মানবিক আবেদনের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও খবর করা যায় কিনা। কোনও সংবাদযোগ্য ঘটনার 'হার্ডনিউজ'-এর একটা দিক যেমন থাকে তেমনি থাকতে পারে মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ একটি বা একাধিক দিক। চিত্রকলা-সংক্রান্ত কোন প্রদর্শনী রিভিউ করতে গেলে রঙ সম্পর্কে ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে চিত্রকলা রিভিউ করা অসম্ভব।

শিরোনাম ও ছবির ব্যবহার

প্রদর্শনী রিভিউকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিষয়ের দিক থেকে সামঞ্জস্য রেখে একটি শিরোনাম নির্বাচন করতে হয়। সাধারণ পাঠক যাতে রিভিউটি পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন সেজন্য প্রদর্শনীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছবি রিভিউ প্রকাশের সঙ্গে তুলে ধরতে হয়, নিচে দিতে হয় শিল্পীর নাম।

২.২.৫ সাক্ষাৎকার প্রকার ও কৌশল

সাক্ষাৎকার মারফত সাক্ষাৎদাতার নিজস্ব বাক্যে, তথ্যে কোনও বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে মতামত, কারণ তুলে ধরা হয়। চলতি কোনও ঘটনাকে ঘিরে সাক্ষাৎদাতার মতামতকে সামনে রেখে অন্যান্য পাঠক, শ্রোতা দর্শকরা তাদের মতামত সম্পর্কে একটা সমীকরণ টানতে পারেন।

সাক্ষাৎকার কী

কোনও ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের একটি উপায় সাক্ষাৎকার। প্রতিবেদনকে জীবন্ত, মানবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য একটি ঘটনা, কোনও বিষয় বা ব্যক্তিকে ঘিরে তার আশপাশের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রিপোর্টকে সার্বিক অর্থে সুন্দর ও তথ্যবহুল করে তোলার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে রিপোর্টার বা ঘটনা অনুসন্ধানকারীর এই যে আলাপ-আলোচনা এটাই সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার সাংবাদিকতার একটি বিশিষ্ট দিক।

২.২.৫.১ সাক্ষাৎকারের ধরন ও প্রকার

উপস্থাপনা, বাচনভঙ্গি, প্রশ্নোত্তরশৈলী, বিষয়বস্তু ইত্যাদির ওপর সাক্ষাৎকারের ধরন নির্ভর করে। সাক্ষাৎকারগুলি হল—

(ক) সংবাদ সাক্ষাৎকার : ইতিমধ্যে ঘটে গেছে কিংবা খুব শিগ্‌গির ঘটতে যাচ্ছে এমন কোনও ঘটনার সংবাদকে কেন্দ্র করে যে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়— সেটাই সংবাদ সাক্ষাৎকার। মূলত সাম্প্রতিক কোনও সংবাদের বিষয়বস্তুর ওপর কর্তৃপক্ষের মতামত সংগ্রহ করে পাঠকের সামনে তুলেই ধরাই এর উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদানকারী যা বলেন সেটাই হল বিষয়। যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তিনি সংবাদসূত্র মাত্র।

রাজনীতি, বাণিজ্য, শিক্ষা, অপরাধ, আবিষ্কার, খেলাধূলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি যে কোনও বিষয়ে সংবাদ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার : এ ধরনের সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিই প্রধান। এর মাধ্যমে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যে যে দিকগুলি পাঠকের মনে কৌতূহল বা জানার ইচ্ছেকে প্রভাবিত করে সাংবাদিক সেই সেই দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এখানে সাংবাদিকের সৃজনশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(গ) সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকার : এক্ষেত্রে কোনও একটা বিষয়ের ওপর একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সকলের মতামত থেকে একটি মূলসুর বেরিয়ে আসে। সাংবাদিক সেই মূল বক্তব্যই তুলে ধরেন পাঠকের কাছে।

(ঘ) দলগত সাক্ষাৎকার : একে সংবাদ সাক্ষাৎকারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ ধরনের সাক্ষাৎকারে কোনও বিশেষ ব্যক্তি নয়, বরং কোনও বিশেষ দল কিংবা গোষ্ঠীর একদল ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। যেমন— পাটকল-ধর্মঘট প্রতিবেদন করতে গেলে সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে মালিক পর্যন্ত সকলেরই মতামত শুনতে হয়। এখানে সবার মতই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে ভারসাম্যমূলক সংবাদ প্রকাশে এ ধরনের সাক্ষাৎকার সহায়ক।

২.২.৫.২ সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি

সাক্ষাৎকার গ্রহণে পূর্বপ্রস্তুতি দরকার। প্রস্তুতি ছাড়া সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়া ঠিক নয়। তবে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি কী হবে তা নির্ভর করে বিষয়ের প্রকৃতির ওপর।

কোনও ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিতে যাবার আগে সাক্ষাৎদাতার কাছে কি জানতে হবে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়ে অসংলগ্ন প্রশ্ন করলে সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্য মাটি হয়ে যেতে পারে। খুনের ঘটনায় দারোগার সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় তথ্যকে সামনে রেখেই প্রশ্ননির্বাচন জরুরী। স্বাভাবিক কারণেই এ ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ পূর্বে কিছু সম্ভাব্য প্রশ্নমালা তৈরি করে নিলে সুবিধা হয়।

আবার এমনও হতে পারে যে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বিষয়ের পরিবর্তন করতে হতে পারে। ধরা যাক খুনের মামলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অব পুলিশের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি ওই নির্দিষ্ট খুনের ঘটনা এড়িয়ে ওই ধরনের খুনের ব্যাপারে কোনও রাষ্ট্রীয় তদন্ত বা নীতির ব্যাপারে

কথাবার্তা বলতে বেশি আগ্রহী। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে বিষয় পরিবর্তনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ-পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সাক্ষাৎদাতার মেজাজ-মর্জি সম্পর্কেও আগাম ধারণা করে নিতে হয়। অনেকেই মনে করেন সাক্ষাৎদাতার ছবি দেখলে এ ব্যাপারে আগাম ধারণা আন্দাজ করা যায়।

২.২.৫.৩ সাক্ষাৎকার গ্রহণের নিয়ম

সাক্ষাৎকার গ্রহণপর্বই সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাক্ষাৎকার-প্রদানকারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। প্রথম কাজ হল যথাসময়ে, যথাস্থলে উপস্থিত থাকা এবং দেখা করা। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার শুরুতে একটা ঘরোয়া আবহাওয়া তৈরির দিকে নজর দিতে হয়। আলাপচারিতার মধ্য দিয়েই মূল প্রশ্নের দিকে এগোতে হয়। আলোচনাচক্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এরপর প্রয়োজন সাক্ষাৎকারের গভীরে প্রবেশ করা। কিছু কিছু প্রশ্নে সাক্ষাৎকার-প্রদানকারী এতে বিব্রত ও অস্বস্তিবোধ করলে তা মোকাবিলা করার কৌশলও ঠিক রাখতে হবে। এরপরই সাক্ষাৎকারীকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে হবে। এরজন্য আবার হাল্কা কথাবার্তায় ফিরে আসতে হবে।

বক্তব্য লেখা : সাক্ষাৎকারদানকারী যেসব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন তা হুবহু টুকে নিতে হবে। নোটবুকে লেখার আগে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। সাক্ষাৎকারদানকারী যে কথা বলবেন তা যদি ঠিক ঠিক লিপিবদ্ধ করা না হয় তবে রিপোর্ট লেখার সময় অসুবিধা হবে। রিপোর্ট প্রকাশিত হলে আরও অসুবিধা হতে পারে। রিপোর্টার বিপদে পড়তে পারেন।

রেকর্ড করা : নোট করার সময় অসুবিধা দেখা দিলে মোবাইলরেকর্ডারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তবে মোবাইলরেকর্ডার ব্যবহার করা যাবে কি না সে ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে। অনেকে মোবাইলরেকর্ডিং পছন্দ করেন না। ব্যাপারটি আগেই জানার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিস্তৃত নোট নেবার চেষ্টা করতে হবে। সাক্ষাৎকারের পর কেউ কেউ আবার চূড়ান্তভাবে কী ছাপা হবে তা দেখতে চান। রিপোর্টার যদি মনে করেন তা দেখালে ক্ষতির কারণ নেই তবে তা দেখাতে পারেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য লুকিয়ে মোবাইলরেকর্ডিং করা উচিত নয়। এতে প্রতিবেদকের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় নোটবুক এবং স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করা জরুরী।

অনেক সময় আবার সাক্ষাৎকারদানকারী ব্যক্তি কথা বলার সময় বলতে পারেন 'অফ দি রেকর্ড' যার অর্থ এখন যা বলছি তা ব্যবহার করা যাবে না। 'অফ দি রেকর্ড' বলার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলরেকর্ডিং বা নোট নেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। 'অফ দি রেকর্ড'-এর অন্তর্গত কথাবার্তা প্রতিবেদনে ব্যবহার করা উচিত নয়। এমন কোন কথা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয় যা সাক্ষাৎকারদানকারীর ক্ষতি করে। সে কারণে 'অফ দি রেকর্ড'-এর বিষয়টি স্মরণে রাখা উচিত।

প্রশ্ন করার কৌশল : সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার আগে কিছু প্রশ্ন তৈরি করা জরুরী। তবে এসব প্রশ্নের কোনটি আগে-পরে করতে হবে তা নির্ধারণ করা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনও স্পর্শকাতর প্রশ্ন দিয়ে সাক্ষাৎকার শুরু করলে

সাক্ষাৎকারের আসল উদ্দেশ্য বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। একারণে হালকা প্রশ্ন দিয়ে সাক্ষাৎকার শুরু করা বাঞ্ছনীয়। সেনসেটিভ এবং কঠিন প্রশ্নগুলির শেষের দিক তুলে ধরা উচিত। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বড় প্রশ্ন করা অনুচিত এবং প্রশ্নে নিজের মতামত প্রকাশ করা ঠিক নয়।

সাক্ষাৎকারের পরিবেশ : সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান বা পরিবেশ কী হবে তা নির্ভর করে সাক্ষাৎকারের বিষয় ও ব্যক্তিত্বের ওপর। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের স্থান যেমন কোনও রেলস্টেশন হতে পারে না তেমনি একজন আদিবাসীর সাক্ষাৎকারের স্থান পাঁচতারা হোটেলের শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ হলে বেমানান লাগে। সাক্ষাৎকারের পরিবেশ যথাযথ ও অনুকূল না হলে আলাপচারিতায় ছেদ পড়তে পারে এবং তার আসল বৈশিষ্ট্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

২.২.৫.৪ লিখন শৈলী

সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন লেখার স্টাইল প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব স্টাইল। সে ব্যাপারে লেখকের নিজস্বতা থাকতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎকার নেবার পর যা জরুরী সেটি হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাক্ষাৎকার লিখে ফেলা। এতে তথ্য হারিয়ে যাবার ভয় কম থাকে। সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন লেখার পরও কিছু কাজ বাকি থাকে। তা হল প্রয়োজনবোধে প্রতিবেদন সাক্ষাৎকারদানকারীকে দেখিয়ে প্রয়োজনীয় কাটছাট বা সংযোজন।

২.২.৬ সম্পাদকীয়

একটি সম্পাদকীয় একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রকাশনার সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি হয়। এটি একটি দেশের এজেন্ডা চালানোর সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পাদকীয় সাধারণত স্বাক্ষরবিহীন হয়। এটি জনমতকে প্রভাবিত করে, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা প্রচার করে, কখনও কখনও সম্পাদকীয় কোনও ইস্যু গ্রহণের জন্য মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করে বা অনুপ্রাণিত করে।

সম্পাদকীয় একটি সংবাদপত্রের প্রাণ হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি দিনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সংবাদপত্রের নীতি এবং অবস্থান প্রতিফলিত করে। সম্পাদকীয়গুলি সমাজে বিরাজমান সমস্যাগুলির জন্য পরামর্শ এবং সমাধানও দেয়।

সম্পাদকের নামে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলেও সেগুলি সবসময় সম্পাদক নিজেই লেখেন না। একটি পত্রিকায় সাধারণত সম্পাদকীয় লেখকদের একটি প্যানেল থাকে যারা এই কাজটি সম্পন্ন করেন। সংবেদনশীল সমস্যাগুলি প্রায়শই সম্পাদক নিজে বা সংবাদপত্রের নীতিগুলির সাথে পরিচিত কেউ পরিচালনা করেন।

সম্পাদকীয় লেখাকে সর্বদা এমন একটি শিল্প হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে যা অনুশীলন এবং ভাষার ন্যায়বিচারের ব্যবহারের মাধ্যমে আয়ত্ত করা দরকার। এটি কোনও সংবাদ প্রতিবেদনের স্টাইলে বা কোনও নিবন্ধের বিন্যাসে লেখা হয় না। একটি ভাল সম্পাদকীয় কেবল চিন্তার প্রক্রিয়াটিকেই উস্কে দেয় না, পাঠযোগ্যও হয়।

যদি আপনাকে কোনও বিষয়ে সম্পাদকীয় লিখতে বলা হয়, আপনার লেখার সময় এই উপাদানগুলি মাথা এ রাখার চেষ্টা করা উচিত :

ক) সম্পাদকীয়টির অন্যান্য সংবাদের মতো একটি ভূমিকা, বডি এবং উপসংহার থাকতে হবে

খ) এটি ইস্যুটির, বিশেষত জটিল সমস্যাগুলির একটি উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা সরবরাহ করা উচিত

গ) এটি একটি সময়োচিত সংবাদ কোণ থাকা উচিত

ঘ) পাঠকের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার জন্য সম্পাদকীয়টিরও বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির মতামত থাকতে হবে

ঙ) সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্ব নয়, ইস্যুতে পাঠকদের জড়িত করার চেষ্টা করা উচিত। আপনার নামকরণ বা প্ররোচিত করার ক্ষুদ্র কৌশলগুলি থেকে বিরত থাকা উচিত।

চ) সম্পাদকীয়তে সমালোচিত হওয়ার সমস্যা বা ইস্যুটির বিকল্প সমাধান সরবরাহ করা উচিত। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরুটিকে আকর্ষণীয় করে তুলুন। বেশিরভাগ সময় তৃতীয় ব্যক্তিতে লিখুন। প্রচারক হওয়ার চেষ্টা করবেন না। বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি ব্যবহার করুন এবং খাঁটি তথ্যসহ তাদের পেশ করুন।

২.২.৭ ওপ-এড পৃষ্ঠা

মেরিয়াম-ওয়েবস্টার অভিধানে একটি ওপ-এড পৃষ্ঠার সংজ্ঞা দেয় "সাধারণত একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির একটি পৃষ্ঠা"।

ওপ-এড সমার্থকভাবে কোনও নিবন্ধ বা প্রবন্ধের জন্য কোনও ইস্যুতে কোনও লেখকের মতামত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। অভিধানটি এটিকে সংজ্ঞায়িত করেছে: "একটি সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ যা লেখকের মতামত দেয় এবং এটি এমন কেউ লিখেছেন যিনি সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিন দ্বারা নিযুক্ত নয়।"

ওপ-এড লেখকদের জন্য টিপস

* একটি ওপ-এডের উদ্দেশ্যটি হল মতামত দেওয়া। এটি কোনও সংবাদ বিশ্লেষণ বা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠি নয়।
* কোনও পত্রিকা কলামের স্টাইলে কোনও ওপ-এড লেখা উচিত নয়। একটি ওপ-এড লেখক হলেন এমন বিশেষজ্ঞ যিনি কেবল বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন।
* আপনার যুক্তি সমর্থন করতে তথ্য, পরিসংখ্যান এবং অধ্যয়ন ব্যবহার করুন।
* পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রথমে সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ অনুচ্ছেদের সাথে ওপ-এডটি লিখুন।

The op-ed page

Life repeats itself, great-grandma finds

২.২.৮ ক্রোড়পত্র (Supplements)

সংবাদপত্রগুলি পাঠকদের ব্যস্ততা বাড়ানোর জন্য বিশেষ নিবন্ধ, উইকএন্ডের পুল-আউট এবং ক্রোড়পত্র নিয়ে আসে। বিশেষ নিবন্ধগুলি একটি বিশদ বিশ্লেষণের পাশাপাশি কোনও সমস্যা, একটি জায়গা এবং ইভেন্টের দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে। সাধারণত একটি বিশেষ নিবন্ধ পত্রিকার অভ্যন্তরে প্রকাশিত হয়, সপ্তাহান্তে পুল-আউট এবং পরিপূরক পাঠকদের বিভিন্ন স্বাদ পূরণ করে। সমস্ত বড় সংবাদপত্র সপ্তাহান্তে পুল-আউট এবং ক্রোড়পত্রগুলি নিয়মিত প্রকাশ করে।

বিশেষ নিবন্ধগুলির জন্য নীতি রচনাগুলি, উইকএন্ডের পুল-আউটস বা ক্রোড়পত্রগুলি কমবেশি একই থাকে। আপনাকে অবশ্যই একটি আকর্ষণীয় এবং সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে লেখার চেষ্টা করতে হবে। আপনার উদ্দেশ্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

২.২.৯ সারাংশ

এই এককে আমরা যে বিষয়ে জানলাম সেগুলো হলো :

* ফিচার
* সাক্ষাৎকার
* সম্পাদকীয়
* ওপ-এড পৃষ্ঠা
* ক্রোড়পত্র

২.২.১০ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

ক) সংবাদে মানবিক আবেদন বলতে কী বোঝায়?

খ) সাংবাদিক হিসেবে ফিচারের বিষয় নির্বাচন কেমনভাবে করবেন?

গ) 'অফ দি রেকর্ড' কী? এ বিষয়টিকে কি গুরুত্ব দেওয়া উচিত?

বড় প্রশ্ন :

ক) চটকদার সংবাদপ্রবণতার যুগে মানবিক আবেদনমূলক সংবাদ কি কোনও প্রভাব ফেলতে পারে? উত্তরের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি দিন।

খ) সংবাদপত্রগুলি নিয়মিত ফিচার প্রকাশ করে। পাঠক হিসেব আপনি কী ধরনের ফিচার পড়েন? কেন পড়েন?

গ) ফিচারের দায়িত্বে থাকলে আপনি কোন কোন বিষয়কে নির্বাচন করবেন? যুক্তি দিয়ে বোঝান?

ঘ) সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াকে সফল করে তুলতে একজন সাংবাদিক কী কী ভাবে প্রস্তুতি নেবেন?

ঙ) সাক্ষাৎকার কী? সাক্ষাৎকারের ধরন অনুযায়ী কোনও সাক্ষাৎকার কীভাবে পরিচালনা করা দরকার?

২.২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১. *রিপোর্টিং*—সুধাংশু শেখর রায়

২. *সাংবাদিকতা, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র* — সুধাংশু শেখর রায়

৩. *সাংবাদিকতা পরিচিতি* — সম্পাদনা: রোল্যান্ড ই উলস্লে

৪. *ফটো সাংবাদিকতা* — নীরোদ রায়

৫. *The Professional Journalism* — John Hohenberg (Henry Hat and Company Newyork)

৬. *Professional Journalism* — M. V. Kamath : S. Chand

৭. *Book Reviewing* — Drewry John Eldrige: Westport, Conn, Greenwood Press

৮. *Film* — Heinzkill Richard

৯. *Guide Book to the Drama* — Vargas Lais

১০. *Writing the Feature Article* — Steigleman, Walter Allen

১১. *Writing and selling Feature Articles* — Patterson Hallen Marguerite; New York : Prentice-Hall

১২. *বিষয়: সাংবাদিকতা*—ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়-লিপিকা

সহায়ক গ্রন্থ :

১. *Here is the News* — Partha Sarathi Rangswami

২. *News Reporting and Press Photography* — Amar Nath

৩. *The Publishing and Review of Reference Sources* — Bill Katz and Robin Kinder

৪. *(The) Book Review Digest* — H. W. Wilson : [Bronx, N.Y.] : H.W. Wilson.Co.

৫. *Figures of Light* — Kauffmann Stanley : Harper an Row Publishers

৬. *A Guide to Critical Reviews* — Salem James M.

৭. *সংবাদ প্রতিবেদন*—ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য-লিপিকা

একক ৩ ❑ সমালোচনা: সঙ্গীত, পুস্তক, সিনেমা, নাটক, শিল্প—ম্যাগাজিনে রিপোর্টিং

২.৩.০ গঠন

২.৩.১ উদ্দেশ্য

২.৩.২ প্রস্তাবনা

২.৩.৩ সঙ্গীত সমালোচনা বা পর্যালোচনা

২.৩.৩.১ সমালোচনাকারী

২.৩.৩.২ সঙ্গীত সমালোচনা কী

২.৩.৩.৩ ছবির ব্যবহার

২.৩.৩.৪ মিউজিক রিভিউ এর প্রয়োজনীয়তা

২.৩.৪ পুস্তক সমালোচনা

২.৩.৪.১ সমালোচনাকারী

২.৩.৪.২ সমালোচনা কী

২.৩.৪.৩ পাঠক কারা

২.৩.৪.৪ পুস্তক সমালোচনার বৈশিষ্ট্য

২.৩.৪.৫ পুস্তক সমালোচনার নিয়ম

২.৩.৪.৬ মাধ্যম নির্বাচন

২.৩.৪.৭ সমালোচনা লেখার পদ্ধতি

২.৩.৪.৮ পুস্তক সমালোচনায় সাংবাদিকতা সুলভ লেখা

২.৩.৫ সিনেমা সমালোচনা

২.৩.৫.১ সিনেমা সমালোচনা কী

২.৩.৫.২ সমালোচনাকারী

২.৩.৫.৩ সমালোচনা শৈলী

২.৩.৫.৪ সমালোচনা করার নিয়ম

২.৩.৫.৫ জনপ্রিয়তার কারণ

২.৩.৬ নাটক সমালোচনা

২.৩.৬.১ নাটক সমালোচনা কী

২.৩.৬.২ সমালোচনা করার নিয়ম

২.৩.৬.৩ সমালোচনা লেখার কৌশল

২.৩.৭ প্রদর্শনী সমালোচনা

২.৩.৭.১ সমালোচনাকারী

২.৩.৭.২ প্রদর্শনী সমালোচনা লেখার নিয়ম

২.৩.৭.৩ চিত্রকলা ও রং প্রসঙ্গ

২.৩.৭.৪ শিরোনাম ও ছবির ব্যবহার

২.৩.৮ ম্যাগাজিনে রিপোর্টিং

২.৩.৯ সারাংশ

২.৩.১০ অনুশীলনী

২.৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

২.৩.১ উদ্দেশ্য

আধুনিক বৈদ্যুতিন মাধ্যম জনমানসে এক বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। যত দিন যাচ্ছে, ততই বাড়ছে অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রগুলিও এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিষয়গত পরিবেশনে তারাও আনছে পরিবর্তন। নানা ধরনের রিভিউ প্রকাশ করছে। কিন্তু এ সমস্তর পিছনে এক যৌথ কর্মকাণ্ড জড়িয়ে আছে। কিন্তু কী ভাবে? তাই এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়াই এই এককের উদ্দেশ্য।

২.৩.২ প্রস্তাবনা

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে রিভিউ লেখা যায় না। সাধারণ নিয়মগুলি তাই জানতেই হয়। এসকল বিষয় হাতে-কলমের কাজ হলেও বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সাংবাদিক, শিক্ষানবিশের কর্মকাণ্ডের পথকে আরো মসৃণ করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২.৩.৩ সঙ্গীত সমালোচনা বা পর্যালোচনা

ইংরেজি 'মিউজিক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সংগীতবিদ্যা। আবার কবিতায় সুরারোপ করাও মিউজিকের পর্যায়ে পরে। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য মিউজিক রিভিউ বলতে এখানে সাম্প্রতিক সময়ের সংগীত রিভিউকে বোঝানো হল।

গান বা সঙ্গীত বিনোদনের এক বিশেষ মাধ্যম। গানের বিশাল বাজারকে সামনে রেখে ছোটবড় বহু কোম্পানি গড়ে উঠেছে। তৈরি হচ্ছে গানের সিডি। এইসব কোম্পানিগুলি সিডি এবং চিপস্ সংবাদপত্র অফিসে পাঠান রিভিউ-এর জন্য।

২.৩.৩.১ সমালোচনাকারী

সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে সংবাদপত্রের সাংস্কৃতিক বা বিনোদনের পৃষ্ঠার দায়িত্বে থাকেন একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ

সাংবাদিক। তাঁরা নিজে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে মিউজিক রিভিউ করিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সংবাদপত্র দফতরগুলিতে বহু সিডি আসে রিভিউ-এর জন্য। কিন্তু সবগুলিই রিভিউ করা সম্ভব হয় না। সংবাদপত্রগুলি তাই বেছে বেছে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী গুটিকয়েক মিউজিক রিভিউ করে থাকে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মিউজিক রিভিউ খুব জনপ্রিয়।

২.৩.৩.২ সঙ্গীত সমালোচনা কী

মিউজিক রিভিউয়ে সিডির নাম কে বা কারা গেয়েছেন তাদের বয়স, প্রকাশক কোম্পানীর নাম এবং সিডির দাম উল্লেখ করতে হয়। সিডিতে কটি গান আছে সে কথাও তুলে ধরতে হয়। তবে ভাল মিউজিক রিভিউয়ে গায়কের কণ্ঠমাধুর্য, সুর ও তাল-লয়ের ওঠানামা প্রসঙ্গে সমালোচক তাঁর মতামত প্রকাশ করে থাকেন। নতুন শিল্পীদের দুর্বলতা যেমন তুলে ধরে, তেমনি শিল্পীর ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে একটা আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়। মিউজিকের নতুন আঙ্গিক, গানের খামতি বা কোন গানটি আরো একটু ভালো করা যেত, এ বিষয়গুলিও সমালোচক তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন। এছাড়া প্রতিদিনই নানারকম সংগীতানুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানের কভারেজ থাকে সংগীতের পাতায়।

২.৩.৩.৩ ছবির ব্যবহার

মিউজিকে সিডি, অ্যালবামের প্রচ্ছদের ছবি, গায়ক-গায়িকার ছবি দিয়ে সমালোচনাটিকে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়।

২.৩.৩.৪ মিউজিক রিভিউ-এর প্রয়োজনীয়তা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকস্তরে মিউজিক বা গানের একটা বড় বাজার রয়েছে। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক সংগীতপ্রিয় শ্রোতা রয়েছেন, যারা নতুন নতুন শিল্পী ও তাদের গান সম্পর্কে আগ্রহী। তাদের প্রিয়শিল্পীর নতুন সিডি অথবা ইউটিউবে নতুন কিছু প্রকাশিত হল কিনা তা জানতে চান। আবার নতুন শিল্পীরও সন্ধান করেন তারা।

মিউজিক রিভিউ শ্রোতাদের ওই চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে। এদিক থেকে বিচার করলে মিউজিক রিভিউ-এর সংবাদমূল্যও কম নয়। পাঠক এই রিভিউ পড়ে সিডি কেনায় অথবা ইউটিউবে অনুষ্ঠান দেখায় আগ্রহ প্রকাশ করেন।

২.৩.৪ পুস্তক সমালোচনা

পুস্তক সমালোচনা বা বুক রিভিউ-এর জন্য কোন পূর্বনির্ধারিত সর্বসম্মত বিধিনিয়ম নেই। রিভিউ-লেখকের নিজস্ব কুশলতা, কাগজের নীতি, বইয়ের ধরন, পাঠকের রুচি-চাহিদা— এসবের ওপর নির্ভর করে তা গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে তাই বাঁধাছক অচল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমী দেশগুলিতে এবং সম্প্রতি আমাদের দেশে সীমিতভাবে বেতার, দূরদর্শনে পুস্তক সমালোচনার চল থাকলেও সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রেই তা জনপ্রিয়। চলতি রীতি অনুযায়ী দৈনিক সংবাদপত্রে বুক রিভিউ প্রকাশিত হয় সপ্তাহের কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে।

২.৩.৪.১ সমালোচনাকারী

বই রিভিউ করার জন্য অনেক সংবাদপত্রে নিজস্ব স্টাফ থাকে। তবে আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বই রিভিউ করানো হয়। অধ্যাপক, গবেষকরাই মূলত একাজ করে থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা কাগজের বেতনভোগী নিয়মিত কর্মী নন। নির্দিষ্ট সমালোচনার ভিত্তিতে সংবাদপত্র থেকে অর্থ পেয়ে থাকেন।

২.৩.৪.২ সমালোচনা কী

বুক রিভিউ বলতে বোঝায় কোনও বই সম্পর্কে সম্ভাব্য পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আনন্দবাজার পত্রিকার বুক রিভিউ সংক্রান্ত সাপ্তাহিক বিশেষ পাতাটির নামই দেওয়া হয়েছে 'পুস্তক পরিচয়'। বইয়ের বিষয়বস্তু, বইয়ের দাম, প্রকাশক, লেখকের স্টাইল ইত্যাদি সম্বন্ধে পাঠককে জানানো হয়। বিশেষজ্ঞ জন ড্রিউই তাঁর 'বুক রিভিউ' গ্রন্থে আদর্শ বুক রিভিউ বলতে তেমন লেখাকেই উল্লেখ করেছেন যে লেখায় একদিকে থাকবে বইটির প্রাথমিক পরিচয়, অন্যদিকে থাকবে রিভিউ লেখকের বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধি নিজস্ব মূল্যায়ন।

২.৩.৪.৩ পাঠক কারা

সার্থকভাবে পুস্তক সমালোচনা করতে হলে তার পাঠকমহল এবং পাঠক চাহিদা সম্বন্ধেও স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। তা না হলে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে বলা যায়—

ক) সাধারণ পাঠক বা লাইব্রেরিওয়ালারা বইপত্র কেনার জন্যে রিভিউ পড়েন এবং পড়ে বই সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা তৈরি করেন।

খ) অনেকে পড়েন কোনও প্রকাশনা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা কী মনে করছে তা জানার জন্য।

গ) অনেক সময় সব বই সকলের পক্ষে পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই রিভিউ পড়েই বইটি সম্পর্কে আপাত ধারণা করে নিতে চান।

ঘ) আবার অনেকে পড়েন শুধুই পড়ার জন্য। সম্পাদকীয়, ফিচার, কলাম বা সংবাদ প্রতিবেদন পড়ার মতন নেহাতই তাৎক্ষণিক আকর্ষণ।

২.৩.৪.৪ পুস্তক সমালোচনার বৈশিষ্ট্য

সংবাদপত্র প্রকাশনার জন্য বুক রিভিউ করতে গেলে কিছু রীতি বা নিয়ম মেনে চলা উচিত—

ক) একজন বিশেষজ্ঞের মতে— "The reviewer should convey to the reader the news of the book, the who, what, when, where and 'how' of the book and the way." অর্থাৎ বইটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

খ) লেখকের পরিচয়।

গ) একই বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশিত অন্যান্য লেখা এবং একই লেখকের অন্যান্য রচনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা।

ঘ) লেখকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর মত বা মূল্যায়নকে যুক্তিপূর্ণ স্পষ্টভাষায় পেশ করতে হয়।

ছ) রিভিউ লেখাটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লেখা হয়ে উঠতে হবে। রিভিউ-এ যে বইটি সম্বন্ধে লেখা সেই বইটির ওপর নির্ভরশীল হবে না। রিভিউ লেখাটি যেন সুখপাঠ্য হয়।

২.৩.৪.৫ পুস্তক সমালোচনার নিয়ম

সঠিকভাবে বই নির্বাচন করা রিভিউ-এর ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। সংবাদপত্রগুলিতে বহু বই আসে সমালোচনার জন্য; কিন্তু সব বই রিভিউ করা সম্ভব হয় না, তাই ঝাড়াই-বাছাই করতেই হয়।

শুধু বই নির্বাচন করলেই হল না, পেশাদারি সাফল্য অর্জন করতে গেলে আগাম প্রস্তুতি দরকার। নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া তা সম্ভব নয়। এজন্য প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে বই এ প্রকাশনা জগৎ সম্বন্ধে যতটা সম্ভব ওয়াকিবহাল থাকা। সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক ও সাময়িক পত্রগুলির বই রিভিউ-সংক্রান্ত পাতাগুলি নিয়মিত পড়া দরকার। বই ও লেখকদের নিয়ে বেতার ও দূরদর্শন যে সকল অনুষ্ঠান করে তা শোনা ও দেখা প্রয়োজন। বই সম্বন্ধে সাম্প্রতিক তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার নিউজলেটার, বুলেটিন, বিজ্ঞাপন, প্রকাশন সমিতির মুখপত্রগুলি নিয়মিত পড়া দরকার। আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার অভ্যাসের গুরুত্ব তো রয়েছেই।

রিভিউ-এর প্রধান কাজই হচ্ছে বইটি ভালো করে পড়া। অভিযোগ, রিভিউ লেখকরা বহুক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ না পড়েই বই রিভিউ করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে কিছু খামতি থেকে যায়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিভিউ প্রতিবেদনের একটি খসড়া তৈরি করে নেওয়া উচিত। সাথে সাথে পয়েন্টগুলো লিখে নেওয়া উচিত। এতে রিভিউ করতে সুবিধা হয়।

২.৩.৪.৬ মাধ্যম নির্বাচন

রিভিউ কোন মাধ্যমে প্রকাশিত হবে তা লেখায় হাত দেবার আগে বুঝে নেওয়া দরকার। কারণ প্রতিটি মাধ্যমেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। রিভিউ লেখককে দেখে নিতে হবে— কোনও পত্রিকার জন্য লিখছেন, না কি কোনও জনপ্রিয় সাময়িকপত্রের জন্য লিখছেন, না কি দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য লিখছেন। এছাড়া বেতার, দূরদর্শনে বই রিভিউ সম্পূর্ণ আলাদা।

২.৩.৪.৭ সমালোচনা লেখার পদ্ধতি

রিভিউ-এর বিষয়বস্তুকে খসড়া থেকে সাজিয়ে লেখার জন্য কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি দরকার। অনেকে মনে করেন লেখার আগে কিছুটা আত্মস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে। যা মানসিক দূরত্বের জন্য দরকার। 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এর ডঃ অ্যালেনসিন ক্লেয়ার উইলের কথা অনুযায়ী—"Sleep over your review. Do not attempt to write a review immediately upon completing a book. Think about the book and decide upon your approach before sitting down to typewriter."

শিরোনাম লেখা : প্রতিটি রিভিউ প্রতিবেদনেরই একট উপযুক্ত শিরোনাম দেওয়া দরকার। লেখ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিরোনাম গঠন করতে হয়, যা হবে রিভিউ-এর সামগ্রিক মূল্যায়নের একটি চুম্বক। রিভিউ প্রতিবেদনের প্রথম ধাপ তার শিরোনাম, ফলে এমন শিরোনাম গঠন করতে হবে যা পাঠককে পুরো প্রতিবেদনটি পড়তে উৎসাহিত করে।

নির্দেশিকা ও ছবি : যে কোন রিভিউ লেখাতেই পাঠক যাতে এক ঝলকে জানতে পারেন, সেজন্য বইয়ের

নাম, লেখকের নাম, বইয়ের দাম, প্রকাশকের নাম— ইত্যাদি বিষয়গুলি মোটা হরফে রিভিউ লেখার গোড়ায় বা সব শেষে জুড়ে দেওয়া হয়। এই অংশকে বলে নির্দেশিকা।

এছাড়া খবরের কাগজে ও ম্যাগাজিনে সংশ্লিষ্ট বইটির প্রচ্ছদের ছবি দেওয়াও প্রচলিত রীতি। এর ফলে পাঠক বইটির দৃশ্যরূপটিও পেয়ে যান। আবার অনেক সময় বইটির মধ্যে ব্যবহৃত কোনও ফটো বা স্কেচ প্রাসঙ্গিক মনে হলে রিভিউ-এর মধ্যে পুনঃমুদ্রিত করা হয়।

২.৩.৪.৮ পুস্তক সমালোচনায় সাংবাদিকতা সুলভ লেখা

'রিভিউ' শব্দটির মধ্যে বিশেষজ্ঞ সুলভ গাম্ভীর্যের আভাস থাকলেও, তা বিশেষজ্ঞদের জন্য লেখা হয় না। তার লক্ষ্য যত বেশি সংখ্যক পাঠককে আকর্ষণ করা। তাই রিভিউ লিখন কৌশল সাংবাদিকতা সুলভ লেখার বাইরে নয়। সার্থক রিভিউ সাংবাদিকতারই অংশ। জন ড্রিউই-র মতে বই রিভিউতে সম্পাদকীয়, সংবাদ প্রতিবেদন এবং ফিচারের লক্ষণগুলি বর্তমান। রিভিউতে বর্ণনা করতে হয় সংবাদের ঘটনা, বিবরণী পেশ করার মতন। সম্পাদকীয়তে যেমন থাকে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন— তেমনি থাকে রিভিউতেও। আবার লেখকের মতামতও এতে থাকে। ফলে রিভিউ অনেকটা কলাম লেখার মত।

রিভিউ লেখার শৈল্পিক কৌশল লেখকের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। সংশ্লিষ্ট বইটি পড়তে পাঠককে উৎসাহিত করার বিষয়টি তাকে বিবেচনায় রাখতে হয়।

প্রয়োজনীয় সতর্কতা : বই রিভিউ করার সময় কিছু সতর্কতা ও নীতি অবলম্বন করতে হয়—

১) কখনো কোনও বন্ধু বা নিকটাত্মীয়ের লেখা বই রিভিউ করা উচিত নয়। তাহলে সঠিক বিচারের ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে।

২) রিভিউতে কখনো ব্যক্তিগত আক্রমণ বা বিদ্বেষপ্রসূত কোনও সমালোচনা করা উচিত নয়।

৩) উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বই রিভিউ লেখা অনুচিত।

২.৩.৫ সিনেমা সমালোচনা

জনমানসে সিনেমা আজ বেশ জনপ্রিয়। স্বাভাবিক ভাবেই সাংবাদিকতায় এই জনপ্রিয় বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। টেলিভিশনের পাশাপাশি সংবাদপত্রগুলিও সিনেমা-সংক্রান্ত ফিচার, রিভিউ ইত্যাদি প্রকাশ করছে নিয়মিত।

২.৩.৫.১ সিনেমা সমালোচনা কী

সিনেমা রিভিউ বলতে বোঝায় সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া কোন সিনেমা সম্পর্কে সম্ভাব্য দর্শককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই পরিচয় কিন্তু বহুমাত্রিক। গল্প, পরিচালক, নায়ক, নায়িকা থেকে শুরু করে টেকনিক্যাল বিষয়গুলিও তুলে ধরা হয় এই সমালোচনায়। এছাড়া থাকে সমালোচকের মতামত। এই মতামত কখনো সরাসরি, আবার কখনো প্রচ্ছন্ন থাকে।

২.৩.৫.২ সমালোচনাকারী

সংবাদপত্রগুলি তাদের বিশেষ ও দক্ষ সাংবাদিকদের দিয়ে সিনেমা রিভিউ করিয়ে থাকে। তবে আজকাল দক্ষ সিনেমা পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের দিয়েই সিনেমা রিভিউ করিয়ে থাকে।

২.৩.৫.৩ সমালোচনা শৈলী

সিনেমা রিভিউ-এর মধ্যে ফিচারের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। রিভিউ লেখকের লক্ষ্য হল যত বেশি সম্ভব পাঠকের কাছে সিনেমাটির বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা। সিনেমার মূল আকর্ষণই হল বিনোদন। সেজন্য রিভিউকে গুরুগম্ভীর করে পরিবেশন করা উচিত নয়; আকর্ষণীয় ভাবে তাকে তুলে ধরতে হয়।

রিভিউ লেখার আকর্ষণীয়তাকে বজায় রেখেই রিভিউ-এ সিনেমার বহুমাত্রিক বিষয়কে সঠিক বিন্যাসে সাজাতে হয়। সংশ্লিষ্ট সিনেমার গল্প, অভিনয়, মিউজিক, গান, ক্যামেরার কাজ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন রিভিউ লেখক। এরই সঙ্গে থাকে অন্যান্য দেশি-বিদেশি সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিনেমাটির তুলনামূলক আলোচনা নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রীর অভিনয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অভিনয়কলার ইতিবাচক দিকটি রিভিউ লেখক তুলে ধরেন আকর্ষণীয়ভাবে। এমনকি সিনেমা হলের শ্রোতা দর্শকদের প্রতিক্রিয়া, হলগুলিতে শ্রোতা-দর্শকদের ভিড় ইত্যাদি তুলে ধরে রিভিউ লেখক সিনেমাটির সাফল্যের আগাম ধারণা তুলে ধরতে চান।

২.৩.৫.৪ সমালোচনা করার নিয়ম

সিনেমা রিভিউ-এ পেশাদারি সাফল্য অর্জন করতে গেলে সিনেমা জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। সিনেমা রিভিউ বহুমাত্রিক কাজ, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই সিনেমা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্য জানা জরুরী। সিনেমা রিভিউ-এর প্রধান শর্তই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সিনেমাটি খুঁটিয়ে দেখা। দেখতে দেখতেই সিনেমাটির রিভিউ কি হতে পারে সে ব্যাপারে একটা খসড়া পরিকল্পনা করে নিলে ভাল হয়। সিনেমাটির দেখার পর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি লিখে নেওয়া দরকার। এতে রিভিউ লিখতে সুবিধা হয়।

এতো গেল একটা দিক। রিভিউ করতে গেলে সিনেমা রিভিউ এবং সিনেমা-সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা ম্যাগাজিনগুলি পড়া দরকার। আজকাল বহু ভারতীয় সিনেমা বিদেশি সিনেমার ধাঁচে, পশ্চিমী লেখকদের গল্প, উপন্যাস অবলম্বনেও নির্মিত হচ্ছে। ফলে পশ্চিমী সিনেমা ও সেসব দেশের গল্প, উপন্যাস লেখকদের লেখা পত্র সম্পর্কে জানা থাকাটাও দরকার। আর এসব তথ্য আদতে রিভিউ লেখককে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত তথ্য রিভিউ-এর বিন্যাসকে আকর্ষণীয় করে। পাঠকও পেয়ে যান নানা প্রকার অজানা তথ্য।

শিরোনাম লেখা : প্রতিটি সিনেমা রিভিউ প্রতিবেদনের একটা উপযুক্ত শিরোনাম দেওয়া দরকার। ফিল্ম সমালোচনার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে শিরোনাম লিখতে হয়। রিভিউ-এর মূল্যায়নটি প্রতিফলিত হয় এই শিরোনামের মধ্যে। কিন্তু দেখতে হবে শিরোনাম যেন পাঠককে টেনে নিয়ে যায় পুরো রিভিউটি পড়ার দিকে।

নির্দেশিকা ও ছবি : সিনেমার নাম, প্রধান প্রধান চরিত্রাভিনেতাদের নাম তুলে ধরা হয় এই নির্দেশিকায়। সিনেমাটিতে ওই ব্যক্তিরা কে কেমন অভিনয় করেছেন তা জানতে শ্রোতা-দর্শকের স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে। রিভিউ পড়ে অনেকেই সংশ্লিষ্ট ছবিটি দেখার পরিকল্পনা করেন।

রিভিউকে আকর্ষণীয় করে তোলে সংশ্লিষ্ট সিনেমার ছবি। সিনেমার কোন বিশেষ মুহূর্তের ছবি এক্ষেত্রে উপযুক্ত। হিন্দী 'লগান' দলবদ্ধ অভিনেতার ছবির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ছবিটি 'লগান' সিনেমার লোগোতে পরিণত হয়েছিল।

২.৩.৫.৫ জনপ্রিয়তার কারণ

গড়পরতা বেশিরভাগ মানুষের বিনোদনের উৎস সিনেমা। সিনেমা-সংক্রান্ত গান, মিউজিকে ইত্যাদির রমরমার দিকে নজর ফেললেই আন্দাজ করা যায় সিনেমার জনপ্রিয়তা ঠিক কোথায়। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ সিনেমা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। সিনেমা রিভিউ এই অভাব পূরণ করতে চায়।

সিনেমার দর্শক শ্রোতা রিভিউ পড়ে তার ভাল-লাগা না-লাগার দিকটিতেও মিলিয়ে নিতে চান। আবার অনেকে রিভিউ পড়ে ছবিটি দেখার পরিকল্পনা করেন।

সিনেমা পরিচালক তার ছবির সাফল্য সম্পর্কে আগাম ধারণা করে নিতে পারেন। সিনেমার ক্রটি-বিচ্যুতিও রিভিউ লেখক তুলে ধরেন। ফলে পরিচালক সেই সব ভুল-ক্রটি সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারেন। নবাগত নায়ক-নায়িকার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আলোচনা করেন রিভিউ লেখক। অন্যান্য পরিচালক তাদের ছবিতে অভিনয় করানো বিষয়টি ভাবতে শুরু করেন। অর্থাৎ সিনেমা রিভিউ অন্য পরিচালকদের ভাবনার সূত্র জুগিয়ে দেয়।

২.৩.৬ নাটক সমালোচনা

সংগীত, মিউজিকের মতো নাটকের বিশেষ আবেদন আছে সাধারম মানুষের কাছে। পশ্চিমে দেশগুলিতে তো বটেই এমনকি আমাদের দেশেও নাটকের একটা ইতিহাস আছে। আছে নাট্যধারার উত্থান-পতন। অর্থাৎ আমাদের কাছে নাটকের যোগসূত্র ঐতিহাসিক ভাবে গড়ে উঠেছে। ফলে শুধুমাত্র নাটক-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকাগুলিই নয়, দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতেও নাটক-সংক্রান্ত আলোচনাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করছে।

২.৩.৬.১ নাটক সমালোচনা কী

নাটক সমালোচনা বলতে নাট্য ঘটনাকে হুবহু বর্ণনা করা বোঝায় না। নাটকের মূল ভাবনা বা বক্তব্য, প্রধান চরিত্র ও তার প্রকাশভঙ্গির টানাপড়েন, নাটকের প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি নিয়েই নাট্যসমালোচনার বিন্যাস গড়ে ওঠে। সংবাদপত্রে বরাদ্দ পাতায় রিভিউকে যথার্থ ভাবে তুলে ধরতে হয়।

২.৩.৬.২ সমালোচনা করার নিয়ম

প্রতিটি বিনোদন মাধ্যমে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা জানি আমাদের দেশে আধুনিক নাটকের সূচনা ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্র ধরেই। সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত নাট্যসাহিত্য প্রবাহিত হয়েছে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। রিভিউ লেখককে এই উত্থান-পতন তথা নাট্য-ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়।

আজকের দিনে নাটক-সংক্রান্ত বহু পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। সেগুলি খুঁটিয়ে পড়া দরকার। রিভিউ

লেখককে তাঁর লেখার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে আহরণ করে নিতে হয়। ফলে নাট্য-সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশুনার অভ্যাস না থাকলে একাজ সহজ নয়।

এই অভ্যাসের পাশাপাশি নিয়মিত নাটক দেখাও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমালোচক একজন সাধারণ দর্শক-শ্রোতা নন, তার দৃষ্টি থাকে অনেক গভীরে। যে নাটকটির রিভিউ লেখা হবে সেই নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য, নাট্যচরিত্র, নাটকের ভাবনা, পরিচালকের প্রায়োগিক দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক নজর থাকা দরকার।

নাটকের প্রেক্ষাপট, নাট্যকলার প্রয়োগ এবং বিভিন্ন আঙ্গিক যথাযথভাবে অনুধাবন করা জরুরী। বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে বহু নাটকের প্রেক্ষাপট, ঘটনা গড়ে উঠেছে ইতিহাসকে ঘিরে। কখনো বা নাটকে উঠে এসেছে কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা বা বৃত্তান্ত। লোকসংস্কৃতির নানা দিক নাটকে প্রয়োগ হতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে অন্ধকারে থেকে সার্থক রিভিউ সম্ভব নয়। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি-সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস রাখতে হয় রিভিউ লেখককে।

২.৩.৬.৩ সমালোচনা লেখার কৌশল

নাটক দেখার পরে পরেই রিভিউ-এর চূড়ান্ত লেখায় হাত না দেওয়াই ভাল। লেখার পূর্বে বিষয়টি আত্মস্থ করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। মূল ঘটনা, চরিত্রগুলি সম্পর্কে একটা খসড়াপত্র অর্থাৎ রিভিউ-এর বিন্যাসটি সাজিয়ে নিলে ভাল হয়।

নাট্যগোষ্ঠীর নাম, নাটকের নাম, মূলচরিত্র ইত্যাদি তথ্যকে গোড়াতেই তুলে ধরতে হয়। মূল চরিত্রকে সামনে রেখে নাট্যঘটনা কি ভাবে পড়তে পড়তে এগিয়ে গেল তা আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরেন রিভিউ লেখক। কিন্তু প্রসঙ্গগুলি এমনভাবে উপস্থাপন ও শেষ করতে হয় যাতে পাঠক রিভিউ পড়েন এবং নাটকটি দেখার কৌতূহল বোধ করেন।

নাট্যপ্রসঙ্গ আলোচনা করার পাশাপাশি রিভিউ লেখক তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। এই মতামত কখনো স্পষ্ট, কখনো বা প্রচ্ছন্ন হতে পারে।

২.৩.৭ শিল্প/প্রদর্শনী সমালোচনা

বুক রিভিউ, সিনেমা রিভিউ-এর মতো প্রদর্শনী রিভিউ আজকের সাংবাদিকতায় বিশেষ জনপ্রিয়। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র, তা ইংরেজিই হোক আর বাংলা, নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট পাতায় নিয়মিত প্রদর্শনী রিভিউ প্রকাশ করে থাকে। যেমন, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতি শনিবার বুক রিভিউ প্রকাশ [পুস্তক পরিচয়] করার সাথে সাথে প্রদর্শনী রিভিউ প্রকাশ করে থাকে।

২.৩.৭.১ সমালোচনাকারী

প্রদর্শনীর বিষয়, ধরন অনুযায়ী দক্ষ সাংবাদিকদের দিয়ে প্রদর্শনী রিভিউ করানো হয়। আজকের দিনে প্রদর্শনীর বিষয়গত বৈচিত্র্য বেড়েছে। চিত্রকলায় গঠন ও রঙ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সে বিষয়-সংক্রান্ত প্রদর্শনী রিভিউ করা শক্ত। আবার ভাস্কর্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে রিভিউ করা সহজ হয়।

২.৩.৭.২ প্রদর্শনী সমালোচনা লেখার নিয়ম

এই রিভিউ-এ গোড়াতেই প্রদর্শনীর বিষয়, প্রদর্শনীটি কোথায় চলছে তুলে ধরতে হয়। এরপর রিভিউ লেখকের দায়িত্ব প্রদর্শনীকারের বা শিল্পীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই পরিচয়পর্বে প্রদর্শনীকারের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট। সংক্ষেপে কিন্তু প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে যতটা সম্ভব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেন রিভিউ লেখক। শিল্পীর জন্ম, শিল্পীর জীবন এবং প্রয়োজন শিল্পীর পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গেও পরিচয়সূত্র গড়ে তোলেন রিভিউ লেখক।

এইভাবে রিভিউ লেখক শিল্পীর শিল্পে বা প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুতে পাঠককে টেনে আনেন। প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ইত্যাদির মারফত শিল্পীর বা প্রদর্শনীকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেন। দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা, সমকালীন প্রেক্ষিতে সেই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গেও রিভিউ লেখক তাঁর মতামত তুলে ধরেন।

২.৩.৭.৩ চিত্রকলা গঠন ও রং প্রসঙ্গ

চিত্রকলায় নানা রঙের ব্যবহার, রঙের মাত্রাগত প্রয়োগ ও গঠন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। কেননা রঙের এই ব্যবহার বিশেষ অর্থবাহী। উষ্ণ ও উজ্জ্বল বর্ণের সংঘাত বিশেষ এক নান্দনিক পরিমণ্ডল রচনা করে। আবার শিল্পী প্রশান্ত রায় (১৯০৮-১৯৭৩) জলরঙেই কাজ করতেন। কালো কালি দিয়ে কালো ও সাদার মধ্যবর্তী অজস্র সূক্ষ্ম স্তরগুলি ফুটিয়ে তুলতে তাঁর মুন্সিয়ানা ছিল অতুলনীয়। স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে চিত্রকলা-সংক্রান্ত কোনও প্রদর্শনী রিভিউ করতে গেলে রঙ সম্পর্কে ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে চিত্রকলা রিভিউ করা অসম্ভব। চিত্রকলার নিজস্ব গঠন আছে। এটাই তার জ্যামিতি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন।

২.৩.৭.৪ শিরোনাম ও ছবির ব্যবহার

প্রদর্শনী রিভিউকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিষয়ের দিক থেকে সামঞ্জস্য রেখে একটি শিরোনাম নির্বাচন করতে হয়। সাধারণ পাঠক যাতে রিভিউটি পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন সেজন্য প্রদর্শনীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছবি রিভিউ প্রকাশের সঙ্গে তুলে ধরতে হয়, নিচে দিতে হয় শিল্পীর নাম।

২.৩.৮ ম্যাগাজিনে রিপোর্টিং

ম্যাগাজিন গণজ্ঞাপনের একটি মাধ্যম যা সমসাময়িক বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খবরাখবর বিস্তৃত আকারে পাঠককে জানতে সাহায্য করে। ম্যাগাজিন যে কোনও খবরের পশ্চাৎপট এবং বিশ্লেষণ তুলে ধরে খবরের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও পাঠকের বিশ্লেষণমুখী মানসিকতাকে সন্তুষ্ট করে জনমত তৈরি করে। সাধারণভাবে ম্যাগাজিন পাঠকের অবসরের সঙ্গী। সোজা ব্যাপার হল, ম্যাগাজিনের মাধ্যমে পাঠক দৈনন্দিন হার্ড নিউজের জগৎ থেকে সরে এসে নিজেকে খবরের বিস্তারের স্রোতে গা ভাসাতে পারে। একই সঙ্গে পাঠক চায় একটু ভিন্ন স্বাদের খবরের আস্বাদন করতে। বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে সাধারণ ম্যাগাজিনের সঙ্গে 'ই-ম্যাগাজিন' ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

প্রাথমিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের ফারাক খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু সাংবাদিকের কাজের ধারা, সম্পাদনার রীতিনীতি, পরিবেশনার কৌশল ও পাঠকের চরিত্রের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। মনে রাখা প্রয়োজন, ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বা বাৎসরিক হতে পারে। ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠার সংখ্যা সংবাদপত্রের থেকে বেশ কিছুটা বেশি হয়। ম্যাগাজিনে সাধারণভাবে ২৪ পাতা, ৩২ পাতা কিংবা ৫০ পাতার বেশি

হয়।

প্রথমেই একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তু কী। অর্থাৎ ম্যাগাজিনটা কোন বিষয়ের। কারণ ম্যাগাজিনের নানারকম প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন রয়েছে, ফ্যাশন ম্যাগাজিন, ক্রীড়া ম্যাগাজিন, প্রযুক্তি ম্যাগাজিন, লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, শিক্ষা সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, স্বাস্থ্য বিষয়ক ম্যাগাজিন-সহ আরও নানারকমে ম্যাগাজিন। উল্লেখযোগ্য ম্যাগাজিনের মধ্যে রয়েছে 'টাইম', 'ইণ্ডিয়া টুডে', 'আউটলুক', 'ফেমিনা', 'স্পোর্টসস্টার', 'আনন্দমেলা', 'দেশ', 'আনন্দলোক', 'সুখী গৃহকোণ', 'কর্মক্ষেত্র', 'ভ্রমণ'।

সংবাদপত্রের মতোই ম্যাগাজিনেও সাংবাদিক থাকে। অনেক নামী ইংরেজি ম্যাগাজিনের যেমন দেশের খবর দেওয়ার জন্য দিল্লিতে সাংবাদিক থাকে। বিদেশের খবর দেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যেমন, লন্ডন, ওয়াশিংটন, বেজিংয়ে 'ফরেন করসপনডেন্ট' থাকে। তবে অধিকাংশ ম্যাগাজিনেই আলাদা করে বার্তা বা রিপোর্টিং বিভাগ থাকে না। বেশিরভাগ ম্যাগাজিনে থাকে সম্পাদকীয় বা 'এডিটোরিয়াল' বিভাগ। সেখানেই যারা থাকে তারা একাধারে যেমন খবরও সংগ্রহ করে তেমনই একই সঙ্গে সম্পাদনা বা এডিটিংয়ের কাজও করে। আসলে, সংবাদপত্রের থেকে ম্যাগাজিনে অনেক কম কর্মী থাকে। তাই ম্যাগাজিনে সম্পাদকীয় বিভাগেই রিপোর্টার তথা সাব এডিটরও থাকে। পাশাপাশি, এট্যা জানা প্রয়োজন, যে ম্যাগাজিনগুলিতে দেশ ও বিদেশের খবর দেওয়ার জন্য সাংবাদিক রয়েছে এবং ওই প্রতিবেদকদের 'কপি' বা প্রতিবেদনও ঠিক হয়েছে কি না, তার কোনওরকম সংশোধন প্রয়োজন কি না সমস্ত দিকই সংশ্লিষ্ট ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় অফিসে থাকা সম্পাদকীয় দফতরের কর্মীরাই করে। আবার এমনও হয় যে, দেশ বা বিদেশের সংবাদদাতারা কোনও খবরের সূত্র দিলে তা প্রতিবেদন আকারে লিখতে হয় সম্পাদকীয় অফিসে থাকা কর্মীদেরই। সেই কারণে, ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে থাকা রিপোর্টার তথা সাব এডিটরদের বিশাল দায়িত্ব পালন করতে হয়।

২.৩.৯ সারাংশ

এই এককে আমরা যে বিষয়ে জানলাম সেগুলো হলো:

* সংগীত সমালোচনা
* পুস্তক সমালোচনা
* সিনেমা সমালোচনা
* নাটক সমালোচনা
* শিল্প সমালোচনা
* ম্যাগাজিনে রিপোর্টিং

২.৩.১০ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

ক) একজন বুক রিভিউয়ার হিসেবে আপনি কোন কোন নিয়ম মেনে চলবেন?

খ) ভিডিও, সিডি প্রকাশের যুগে সিনেমা রিভিউ কী জরুরী বা কার এবং কেন সিনেমা রিভিউ পড়েন?

গ) মিউজিক রিভিউ কী?

ঘ) নাটক দেখার পরে পরেই চূড়ান্ত রিভিউ লেখা উচিত নয়— এ বিষয়ে যুক্তি দিন।

বড় প্রশ্ন :

ক) অভিযোগ বই-পাঠকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তবুও বড় বড় সংবাদপত্রগুলি নিয়মিত বুক রিভিউ প্রকাশ করছে কেন? এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

খ) একজন রিভিউয়ার কীভাবে প্রদর্শনী রিভিউ করবেন?

গ) নাট্যসমালোচক বা রিভিউয়ার হিসেবে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

২.৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

অবশ্য পাঠ্য:

১. *রিপোর্টিং* — সুধাংশু শেখর রায়

২. *সাংবাদিকতা, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র* — সুধাংশু শেখর রায়

৩. *সাংবাদিকতা পরিচিতি* — সম্পাদনা: রোল্যান্ড ই উলস্‌লে

৪. *ফটো সাংবাদিকতা* — নীরোদ রায়

৫. *The Professional Journalism* — John Hohenberg (Henryhatand Company, New York)

৬. *Professional Journalism* — M. V. Kamath S. Chand

৭. *Book Reviewing* — Drewry John Eldrige : Westport, Conn. Greenwood Press

৮. *Film* — Heinzkill Richard

৯. *Guide Book to the Drama* — Vargas Lais

১০. *Writing the Feature Article* — Steigleman, Walter Allen

১১. *Writing and selling Feature Articles* — Patterson Hallen Marguerite : New York : Prentice-Hall

১২. *আধুনিক গণমাধ্যম*—ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

সহায়ক গ্রন্থ :

১. *Here is the News* — Partha Sarathi Rangswami

২. *News Reporting and Press Photography* — Amar Nath

৩. *The Publishing and Review of Reference Sources* — Bill Katz and Robin Kinder

৪. *(The) Book Review Digest* — H. W. Wilson [Bronx, N.Y.) : H. W. Wislson Co.

৫. *Figures of Light* — Kauffmann Stanley

৬. *A Guide to Critical Reviews* — Salem James M.

একক ৪ ❑ চিত্র সাংবাদিকতা

২.৪.০ গঠন
২.৪.১ উদ্দেশ্য
২.৪.২ প্রস্তাবনা
২.৪.৩ চিত্র সাংবাদিকতা
২.৪.৩.১ চিত্র সাংবাদিকতার অর্থ
২.৪.৩.২ চিত্র সাংবাদিকতায় ফটো
২.৪.৩.৩ চিত্র সাংবাদিকতার গুরুত্ব
২.৪.৩.৪ সংবাদ চিত্র
২.৪.৩.৫ সংবাদ চিত্র সম্পাদনা
২.৪.৩.৬ ক্যাপশন ও সূত্র
২.৪.৩.৭ নৈতিকতা
২.৪.৩.৮ ফটোগ্রাফার সাংবাদিক কি না
২.৪.৩.৯ ফটোগ্রাফার সাংবাদিকের গুণাবলী
২.৪.৪ সারাংশ
২.৪.৫ অনুশীলনী
২.৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২.৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা হলো চিত্র সাংবাদিকতায় ফটোর গুরুত্ব, সংবাদচিত্রের ধারণা, চিত্র সম্পাদনা, ক্যাপশন, নৈতিকতা এবং ফটোগ্রাফারের কার্য ও গুণাবলী।

২.৪.২ প্রস্তাবনা

সাধারণ ফটো আর সংবাদচিত্র-র ধারণা থাকলে সাংবাদিক সহজেই চিনে নিতে পারেন সংবাদকচিত্রকে। এসকল বিষয়ে হাতে-কলমের কাজ হলেও বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সাংবাদিক শিক্ষানবিশের কর্মকাণ্ডের পথকে আরও মসৃণ করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২.৪.৩ চিত্র সাংবাদিকতা

লিপি উদ্ভাবনের আগে মানুষ ছবির সাহায্যে তার কথা প্রকাশ করেছে, যোগাযোগ সাধন করেছে। প্রকৃতপক্ষে ছবি দিয়েই মানুষের সাংবাদিকতার শুরু। সেই প্রাচীনতম আবিষ্কার ছবির ব্যবহার আজকের সাংবাদিকতায় এক

অপরিহার্য অঙ্গ। মানুষ হাজারো কথা বলে একটি কথার অন্তর্নিহিত অর্থ নাও বোঝাতে পারে। কিন্তু একটিমাত্র ছবিই সেই একটি কথার অন্তর্নিহিত অর্থকে সরলভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কীভাবে? স্বাভাবিক কারণেই চিত্রসাংবাদিকতার বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

আমরা প্রতিদিন নানারকম সংবাদপত্র পড়ে থাকি—সেটা দৈনিক, সাপ্তাহিক, সংবাদ ম্যাগাজিন যাই হোক না কেন—সেসব সংবাদপত্রে সংবাদ, বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য বিষয় ছাড়াও পাতার বিভিন্ন অংশ জুড়ে থাকে ছবি বা ফটোগ্রাফ। কারণ সংবাদ পরিবেশনা শুধু লিখেই হয় না। ফটোগ্রাফ বা চিত্রের মাধ্যমে যে সংবাদ পরিবেশন রীতি তাকেই বলে ফটো জার্নালিজম বা চিত্রসাংবাদিকতা।

এখানে ফটো স্বাভাবিকভাবেই স্টিল ফটোগ্রাফ বা স্থিরচিত্র। পরবর্তীকালে চিত্র পরিবেশনায় যখন গতির সঞ্চার করা সম্ভব হল এবং যখন এই গতিশীল মাধ্যমকে বেতারের সাহায্যে ঘরে ঘরে পৌঁছানো সম্ভব হল তখন একটি স্বতন্ত্র গণমাধ্যমের জন্ম হল, যা টেলিভিশন নামে পরিচিত। টেলিভিশনের মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনাই হল টেলিভিশন সাংবাদিকতা। ফটো জার্নালিজমের আলোচনা আমরা অবশ্য স্থিরচিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

২.৪.৩.১ চিত্র সাংবাদিকতার অর্থ

ইংরাজি ফটোগ্রাফি (Photography) শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'ফটোস' (Photos) এবং 'গ্রাফোস' (graphos) থেকে। 'ফটোস' শব্দের অর্থ আলো। 'গ্রাফোস' মানে লেখা। দুটো মিলিয়ে হল 'আলো দিয়ে লেখা'।

চিত্রসাংবাদিকতায় ফটো লিখিত সংবাদ প্রতিদিনের পার্শ্ববর্তী শোভা হবে না, তা হবে স্বতন্ত্র একটি সংবাদ প্রতিবেদন। সে কারণে আধুনিক ধারণায় সংবাদচিত্রী বা News Photographer একজন সাংবাদিক হিসেবেই বিবেচিত হন। যেহেতু অন্যান্য সাংবাদিকের মতই তার কাজ সংবাদ নিয়েই। তিনি সংবাদ খোঁজেন, সংবাদ পরিবেশন করেন। শুধু কলমের বদলে তাঁর হাতিয়ার ক্যামেরা। সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে পাঠক ছবি শুধু দেখেন না, তিনি ফটো পড়েন।

২.৪.৩.২ চিত্র সাংবাদিকতায় ফটো

চিত্র সাংবাদিকতা প্রথম শুরু হয় জার্মানীতে। সাংবাদিকতায় ফটোর ব্যবহার শুরু হয়েছে ফটোগ্রাফির বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে। কারণ, ফটোগ্রাফ হলেই তা সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে ব্যবহার করা যায় না। তার জন্য চাই মুদ্রণ পদ্ধতির বিকাশ।

ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৮১৩ সালে দুজন ফরাসী জোসেফ এন নিপসে এবং লুই জ্যাক মান্তে দাগরে সর্বপ্রথম ফটোগ্রাফির সূত্রপাত করেন। এঁরাই ধাতব পাতের ওপর দৃশ্যের ছবি তোলার পদ্ধতি বার করেন। ১৮৩৯ সালে ইউলিয়াম এইচ এফ ট্যালিকট সিলভার ক্লোরাইডের প্রলেপ দেওয়া কাগজের ওপর ফটোগ্রাফ তোলার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ১৮৪০ সালে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জন ডব্লিউ ড্রেপার সর্বপ্রথম মানুষের মুখের ছবি পুনর্নির্মাণ করেন। এতে এক্সপোজারের সময় লেগেছিল পাঁচ মিনিট। ১৮৫১ সালে শুরু হয় কলোডিয়ানযুক্ত ভিজে প্লেটের ব্যবহার। কলোডিয়ান হল ইয়ার ও গলিকটলের দ্রবণ। এই ভিজে প্লেটের সাহায্যে ম্যাথু ব্রাডি নামে একজন ফটোগ্রাফার আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের ফটো তুলেছিলেন। প্রথম চিত্রসাংবাদিক বলা হয় ব্র্যাডিকেই।

১৮৭০-র দশকে ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। ১৮৮৯ সালে জর্জ ইস্টম্যান একটি কোম্পানী

খোলেন। ইস্টম্যানই প্রথম স্বচ্ছ ফিলমের ব্যবহার শুরু করেন। এর ফলে আর ভারি কাচের প্লেট লাগতো না। ক্যামেরা অনেক হালকা হয়ে যায়।

১৮৯৭ সালে আমেরিকার এম এইচ হুগান প্রথম হাফটোন স্টিরিওটাইপ তৈরি করেন খবরের কাগজে ব্যবহারের জন্য। হাফটোনের প্রথম ছবি নিউইয়র্ক ট্রিবিউন-এ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯ সালের ২১ জানুয়ারি।

১৯১২ সালে চালু হয় স্পীড গ্রাফিক প্রেস ক্যামেরা। এর এক দশকের মধ্যেই আসে জার্মান লাইকা ও রলিফ্লেক্স ক্যামেরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা চিত্রসাংবাদিকতাকে অনেকদুর এগিয়ে দিয়েছিল তার পিছনে এই প্রযুক্তিগত ক্রমোন্নতিই ছিল প্রধান সহায়।

ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে রঙীন ফটো তোলা সম্ভব হয় ১৯৩৫ সাল থেকে।

অবশ্য চিত্রসাংবাদিকতা শুধু ক্যামেরা বা ফিল্মের উন্নতির ওপরই নির্ভর করে না। মুদ্রণ পদ্ধতির বিকাশের ওপরও তা নির্ভর করছে। কারণ ফটো হলেই হল না, তা কাগজে ছাপতে হবে। রোটারি প্রেসের আবিষ্কার ফটোর ব্যবহারকে সুবিধাজনক করে দিয়েছিল। অফসেট আরও সুবিধা করে দেয়। এখন মাল্টিমিডিয়ার যুগে কাজের আরও সুবিধা।

এ প্রসঙ্গে আরও বলতে হয় যে, চিত্র সাংবাদিকতার বিকাশের জন্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ফটো পাঠানোর পদ্ধতির বিকাশের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দ্রুততা সংবাদপত্রকে সাহায্য করে ফটোগ্রাফের সংবাদমূল্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে। বিশশতকের গোড়া থেকে তার মারফৎ ফটো পাঠানো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। বিশ্বে প্রথম তার মারফৎ (wire photograph) পাঠানো সম্ভব হয় আমেরিকায় ১৯২৪ সালে।

এখন তো ফ্যাক্সের সাহায্যে বিশ্বের যে কোন জায়গার রঙীন ছবি পর্যন্ত লেনদেন করা যায়। এছাড়া কম্পিউটার সংযোগ মারফৎ ই-মেলের সাহায্যেও ফটো লেনদেন এখন বাংলা সংবাদপত্রেও চালু।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, টেলিভিশন চালু হবার পর টিভিও সূত্র বা Source হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খবরের কাগজের অফিসে বসে টিভির পর্দায় ভাসমান ছবি তুলে নিয়ে তা কাগজে ছাপা হচ্ছে।

ফটো লেনদেনে প্রযুক্তিগত বিকাশের পরিণতিতে সংবাদ সংস্থাগুলিও ফটো সার্ভিস শুরু করেছে। যেমন-কলকাতায় 'ল্যাণ্ড অ্যান্ড লাইফ'। এখন সংবাদ সংস্থাও টেলিপ্রিন্টারে সংবাদের লিখিত বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে ফটোও যোগান দিচ্ছে। বিশ্ব সংবাদ সংস্থা হিসাবে প্রথম ফটো সার্ভিস শুরু করে ১ জানুয়ারি ১৯৩৫ সালে আমেরিকার 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' (এ.পি)। ভারতে সংবাদ সংস্থা ইউ এন আই প্রথম ফটো সার্ভিস দিতে শুরু করে ১৯৮৬ সালে। সংবাদ সংস্থা পিটি আই ফটো সার্ভিস শুরু কর ১৯৮৭ সালে। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে সংবাদপত্রে ফটোর কদর বেড়েছে।

২.৪.৩.৩ চিত্র সাংবাদিকের গুরুত্ব

সংবাদপত্রে চিত্র সাংবাদিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। সংবাদ পরিবেশন এবং কাগজকে পাঠকদের কাছে দর্শনধারী করে তুলতে ফটোগ্রাফের সঠিক ব্যবহার অবিশ্বাস্য ফল দিতে পারে।

সংবাদপত্রে ফটোগ্রাফ ছাপা হয় নানা ভাবে। কখনও সংবাদের সহযোগী হিসেবে। কখনও বা স্বতন্ত্রভাবে একটি

ফটোগ্রাফ প্রতিবেদনের কাজ করে। এখানে ফটোগ্রাফের সঙ্গে কোন লিখিত প্রতিবেদন থাকে না। ফটোগ্রাফ ছাপা হয় ফিচারের সঙ্গে, চিঠিপত্রের সঙ্গে, এমনকি রিভিউ-এর সঙ্গে। এছাড়া রয়েছে ফটো ফিচার। যেমন, কলকাতায় বনধ পালিত হয়েছে। পরের দিন একপাতা বা আধপাতা জুড়ে একাধিক ছবি—শুনশান হাওড়া ব্রিজ, চৌরঙ্গীর ফাঁকা রাস্তায় ক্রিকেট লড়াই অথবা হাওড়ার জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা স্তব্ধ লঞ্চের সারির ফটো। একে বলে ফটো-ফিচার।

একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় সংবাদপত্র ফটোগ্রাফের ব্যবহার সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিল না। যে ফটো ব্যবহার করা হত তাও ছিল গৌণ বিষয়। কিন্তু এখন অবস্থা সে রকম নয়। ইংরেজি তো বটেই ভারতীয় ভাষার কাগজগুলিও এখন একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সংবাদচিত্রকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ছাপার ক্ষেত্রে উন্নততর ব্যবস্থার ব্যবহার চিত্র সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করেছে। ফটোগ্রাফ-সংক্রান্ত পৃথক বিভাগই থাকছে কাগজগুলিতে। ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলে সাংবাদিকতায় ফটোগ্রাফ অব্যর্থ উপাদান হতে পারে। এ প্রসঙ্গে ফটোর গুরুত্বের পিছনে নানা কারণও উল্লেখ করা যায়—

(১) চীনা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে যার বাংলা অর্থ—একটি ফটো হাজার শব্দের সমতুল। ফটোর সাহায্যে কোনও বিষয় বা ঘটনার বিস্তারিত ও খুঁটিনাটির পরিচয় দেওয়া সম্ভব। দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়া বিমানের ফটো থাকলে পাঠকের কাছে যা প্রতিক্রিয়া হয় তা ভাষায় বর্ণনা দিয়ে লাভ করা অসম্ভব।

(২) ফটো সহজবোধ্যভাবে কোনও বিষয়কে পরিবেশন করতে পারে। সাধারণ পাঠকের এতে সুবিধা হয়।

(৩) ফটোর বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি। কোনও বিষয় লিখে বলা এক, ফটো থাকলে মানুষ চোখেও তা দেখে নিতে পারেন। এতে প্রতিবেদকের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে।

(৪) ফটোর অবদান সবার কাছে। নিরক্ষর অথবা স্বল্পশিক্ষিত পাঠকের পক্ষে ফটো অনুধাবন যোগ্য। এই সার্বজনীন আবেদন উল্লেখযোগ্য।

(৫) ফটো পাঠককে রিলিফ দেয়। কাগজের পাতাভর্তি অক্ষর বিন্যাস পাঠকের মধ্যে একঘেয়েমি আনতে পারে। মানবিক আবেদনসম্পন্ন ছবি পাঠককে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

(৬) ফটোগ্রাফ কাগজকে আকর্ষণীয় করে। আজকের দিনে পাঠক চান দৃশ্যরূপ। পৃষ্ঠাসজ্জার সময় তাই ফটোর সঠিক বিন্যাস পাঠকমহলে কাগজকে জনপ্রিয় করে। অনেকে মনে করেন, টেলিভিশনের যুগে দৃশ্যময়তার প্রতি পাঠকের আকর্ষণ বেড়েছে। মানুষ এখন দেখতে চান বেশি। সে কারণে সংবাদপত্রও আজকাল ফটোগ্রাফ ব্যবহারের দিকে বেশি ঝুঁকছে।

২.৪.৩.৪ সংবাদ চিত্র

সাংবাদিকতার অঙ্গ হিসেবে চিত্র বা ফটোর ব্যবহারে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে কোনও ফটোই সংবাদপত্রে ছাপার জন্য বিবেচিত হয় না। ছাপার জন্য দরকার সংবাদ উপাদান সমৃদ্ধ সংবাদচিত্র বা News Photo। এমনি সাধারণ ফটোর সঙ্গে সংবাদচিত্রের এখানেই পার্থক্য। চিত্রসাংবাদিকতায় ছবি তোলা থেকে শুরু করে সম্পাদনা এবং তা ছাপা হয় সংবাদকে বিবেচনায় রেখে।

আর সংবাদ মানে যেহেতু সক্রিয়তা (activity) তাই সংবাদচিত্রের থাকবে অ্যাকশন। একজন বিশেষজ্ঞের ভাষায়—"Every news picture must tell a story at a glance. The best pictures show life happening. They show suspended animation."

ভাল সংবাদচিত্র কী : সংবাদচিত্রের গুণাগুণ বিচার করেই তা ছাপার জন্য বিবেচিত হয়। ছাপার জন্য সংবাদচিত্র নির্বাচন করতে গেলে সাধারণত দুটি দিকের ওপর নজর দিতে হয়—(১) টেকনিক্যাল বা কারিগরি উৎকর্ষ, (২) সম্পাদকীয় মূল্য।

টেকনিক্যাল বা কারিগরি উৎকর্ষ : টেকনিক্যাল বা কারিগরি উৎকর্ষ বলতে বোঝায় ফটোর প্রিন্টের মান, ফটোর সাইজ বা আকার। প্রিন্টের মান বলতে বোঝায়, ফটোগ্রাফকে কাগজে ছাপার পর তার মান কী হবে এটা বুঝতে হয়। অনেক সময় ছাপার পর দেখা যায় ফটো হয় খুব হালকা হয়ে গেছে, নয়তো কালো হয়ে গেছে। এটা মূল ফটোর কোয়ালিটির ওপর নির্ভর করে। তবে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য ছবি 'ম্যাটপেপারের' বদলে গ্লসী পেপারে ছাপা হলেই ভাল হয়।

সম্পাদকীয় মূল্য : সম্পাদকীয় মূল্যের অর্থ হল ফটোর সংবাদমূল্য। ছবিটির আবেদন ইত্যাদি বিষয়। এক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য হল ছবিটি পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে কিনা, দ্বিতীয়ত, ছবিটি প্রভাব ফেলতে পারে কিনা, তৃতীয়ত, ছবিটি পাঠককে তৃপ্তি দেবে কিনা।

উল্লেখ্য, ভালো ফটো লিখিত সংবাদ প্রতিবেদনকে একটা দৃশ্যময় মাত্রা (visual dimension) দেয়। সংবাদচিত্র সংবাদপত্র পাঠকের দ্রুততায় সাহায্য করে পাঠককে।

২.৪.৩.৫ সংবাদ চিত্র সম্পাদনা

সংবাদপত্রের মতো সংবাদচিত্রেরও সম্পাদনা করা প্রয়োজন। এই সম্পাদনার উদ্দেশ্য হল ফটোগ্রাফের সঠিক, প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক সংবাদমূল্যকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ জন্যই সংবাদচিত্র কোন সাইজে যাবে তা দেখতে হয়। সংবাদের গুরুত্ব কেমন তার ওপরই নির্ভর করে ফটোটি এক কলমে যাবে না পাঁচ কলমে যাবে।

ছবির আকার (Shape) কী হবে তাও ঠিক করতে হয় সম্পাদনার সময়। এমনিতে ফটো বর্গাকারে ছাপার চল নেই। কারণ এ ধরণের ফটো নিষ্প্রাণ লাগে। ফটো সাধারণভাবে আয়তাকারে ছাপা হয়। কিন্তু আকার বলতে ছবিটা চওড়া করে না লম্বা করে ছাপা হবে তাও বোঝায়। যেমন কোনও পঁচিশ তলা বাড়ির মাথায় আগুন লাগলে যদি দুকলমে চওড়ায় লম্বা করে বসালে যেমন লাগবে, পাঁচকলমে কিন্তু ততটা খুলবে না। সম্পাদনা যিনি করছেন তাকে এটা বুঝতে হবে।

সম্পাদনার কারণেই অনেক সময় ফটোকে কাটছাঁট করতে হয়। পরিভাষায় একে বলে ক্রপিং (cropping)। ফটোগ্রাফের মধ্যে সংবাদ মূল্যের ভিত্তিতে অপ্রয়োজনীয় অংশকে বাদ দেওয়াই হল ক্রপিং।

২.৪.৩.৬ ক্যাপশন ও সূত্র

ক্যাপশন হল ফটোর বিষয় সম্পর্কে পরিচয়জ্ঞাপক লিখিত বিবরণ। সাধারণত দুই থেকে তিনটি বাক্যে তা লেখা হয়।

ক্যাপশন লেখার প্রাথমিক দায়িত্ব ফটোগ্রাফারেরই। তবে অনেক সময় তা পরিমার্জনের দায়িত্ব থাকে সাব-এডিটর অথবা চিফ সাব এডিটরের ওপর।

যে কোনও রকমভাবে ফটোর বিষয়বস্তু লিখে দিলেই ক্যাপশন লেখা হয় না। যেমন ধরা যাক, প্রথম পাতায় বাঁদিকে লিড ছাপা হয়েছে ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার খবর। খবরের ডান দিকে ধরা যাক তিনকলম জুড়ে ব্রিগেডে ভাষণরত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ছাপা হবে। এই ফটোর ক্যাপশনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দিচ্ছেন লেখার দরকার নেই। কারণ তা অতি স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে। বরং লেখা যেতে পারে 'বুধবার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে'। ক্যাপশনে কোথায় এবং কবে ছবি তোলা হয়েছে তার উল্লেখ থাকা ভাল। এবং প্রয়োজন বুঝে অবশ্যই কার বা কী ঘটনার ছবি তা বলে দিতে হবে। বাংলা কাগজের ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ হয়তো দরকার নেই, কিন্তু ওড়িশার কি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর ফটো হলে দরকার আছে।

এছাড়া ক্যাপশন পরিস্থিতি অনুযায়ী লিখতে হয়। সেদিক থেকে ক্যাপশনকে আমরা তিনটি ধরনে ভাগ করতে পারি—

(১) যখন ফটো ও লিখিত প্রতিবেদন পাশাপাশি ছাপা হবে তখন ক্যাপশন হবে সংক্ষিপ্ত।

(২) প্রতিবেদন প্রথম পাতায় এবং ফটো প্রথম পাতায় যখন, তখন ক্যাপশন বিস্তৃততর।

(৩) লিখিত প্রতিবেদন নেই, শুধুমাত্র ফটোই ছাপা হলে, ক্যাপশনের মধ্যেই ফটোর প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা ছ-সাতটি বাক্যে বিবৃত করতে হয়।

অবশ্য সবসময়ই যে ক্যাপশন ছাপা হবে তারও দরকার নেই। যেমন ধরা যাক রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর ছবি ছাপা হয়েছে প্রথম পাতায়। সঙ্গে রাজীবের তিন কলমের মুখের ফাইল ফটো। এধরনের ফটোর নিচে নাম লেখার দরকার নেই।

ক্যাপশন প্রসঙ্গেই চলে আসে সোর্স বা ফটো-সোর্সের উল্লেখ করা। সাধারণত, ক্যাপশনের সঙ্গেই ফটোগ্রাফারের নাম উল্লেখ করা হয়, অথবা থাকে 'নিজস্ব চিত্র'। সংবাদ সংস্থার পাঠানো হলে সংবাদ সংস্থার নাম দিতে হয়।

২.৪.৩.৭ নৈতিকতা

সংবাদের মতো সংবাদচিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কোড অব এথিকস্ বা নীতি মেনে চলতে হয়। আজকাল কাগজের বিক্রি বাড়াতে যৌন আবেদনমূলক ফটো ছাপার প্রবণতা বেড়েছে। একাজ অনৈতিক। এছাড়া দাঙ্গা ধর্ষণের মতো স্পর্শকাতর ঘটনাগুলির ক্ষেত্রেও সতর্কতা দরকার। যেমন প্রচলিত রীতি হল ধর্ষিতা মহিলার ছবি না ছাপা।

সেইসঙ্গেও সংবাদের সঙ্গে সাযুজ্যহীন ছবি ছাপাও উচিত নয়। ফটো কখনো মিথ্যা কথা বলে না একথা সত্যি। কিন্তু তা আপেক্ষিক সত্য। ফটো সত্যি বলছে কিনা নির্ভর করছে যে বা যারা তা ব্যবহার করছে তার ওপর। লেখার মতো ফটোও বিকৃত করা যায় অতি সহজে। ছবি তোলার কারসাজিতে সমাবেশের জমায়েতে কত মানুষ ছিল সে সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা যায়। কারও গম্ভীর মুখের ছবি ছাপা হবে নাকি হাসি মুখের তার ওপর পাঠকদের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই নির্ভর করে। কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ক্যামেরা নক্ করা হচ্ছে তার ওপরও অনেক কিছু নির্ভরশীল। এতে ঘটনার মাত্রা বদলে দেওয়া যায়। সে জন্য সংবাদচিত্রীকেও বস্তুনিষ্ঠতার নীতি মেনে চলা উচিত।

২.৪.৩.৮ ফটোগ্রাফার সাংবাদিক কি না

সাংবাদিকতায় ফটোগ্রাফারের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির ঘাটতি থাকলেও ১৯৫৫ সালের ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাক্ট সাংবাদিক হিসেবে সংবাদচিত্রী বা নিউজ ফটোগ্রাফারদের স্বীকৃতি দিয়েছে। আইন অনুযায়ী সংবাদচিত্রীরা বেতনক্রম ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে সাব-এডিটর ও রিপোর্টারদের সমতুল্য। সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মীদের বেতনক্রম সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য গঠিত বাচওয়াত কমিটির রিপোর্টে (১৯৮৯) সংবাদচিত্রীদের দায়িত্বেরও উল্লেখ আছে স্পষ্টভাবে—"News phtographer is a person who covers news events of public interest through photographs."

গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রগুলিতে চিফ নিউজ ফটোগ্রাফারের পদও থাকে। যাঁর দায়িত্ব হচ্ছে নিউজ ফটোগ্রাফারদের দায়িত্ব বন্টন করা ও তাদের কাজের তদারকি করা। বাচওয়াত কমিটির রায় অনুযায়ী, চিফ নিউজ ফটোগ্রাফার পদটি সংবাদপত্রে চিফ রিপোর্টার ও চিফ সাব-এডিটর পদের সমতুল্য। এ থেকে নিউজ ফটোগ্রাফারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। সংবাদচিত্রীদের সাংবাদিক হিসেবে সাব্যস্ত করার কারণ রিপোর্টার মতো তাঁদেরও দায়িত্ব হচ্ছে সংবাদ পরিবেশন। সংবাদের সন্ধান ও সংবাদ পরিবেশনা তাঁর কাজ। সংবাদপত্রের চাহিদা অনুযায়ী সংবাদচিত্র তাঁকে যোগান দিতে হয়।

২.৪.৩.৯ ফটোগ্রাফার সাংবাদিকের গুণাবলী

১) সংবাদচিত্রী বা নিউজ ফটোগ্রাফার যেহেতু সাংবাদিক তাই সংবাদ অনুভূতি বা সংবাদ সম্পর্কে ধারণা থাকে তাঁর প্রাথমিক গুণ। সেজন্য নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় নীতি ও সংবাদ পরিবেশনার ধরন সম্পর্কে তাকে সজাগ ও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

২) ফটোগ্রাফার হিসেবে তাকে দক্ষ হতে হবে। ফটোগ্রাফি, ক্যামেরা, ফিল্ম, মুদ্রণরীতি এসব ব্যাপারে সাম্প্রতিকতম পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা হবে স্বচ্ছ।

৩) ক্যামেরা চালানোর দক্ষতায় একজন ভালো ফটোগ্রাফার হওয়া যায়, কিন্তু ভালো নিউজ ফটোগ্রাফার হবার জন্য দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এজন্য নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস থাকা প্রয়োজন।

৪) তাকে উদ্যমী ও পরিশ্রমী হতে হবে। সংবাদ সংগ্রহের মতো, সংবাদচিত্র সংগ্রহ করাও সহজ কাজ নয়। নানা প্রতিকূলতা থাকে। সংবাদচিত্রীকে ঘটনাস্থলে থাকতেই হবে। পুলিশের লাঠিচার্জ, দাঙ্গা, বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালনা— যাই ঘটুক তাকে সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতেই হবে। এজন্য সাহস দরকার।

৫) দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা। সঠিক মুহূর্তে সঠিক দৃশ্যটাকে ক্যামেরায় বন্দী করতে হয়। স্টুডিওতে ছবি তোলার মতো গুছিয়ে আস্তে ধীরে কাজ করার সময় সংবাদচিত্রী পান না, অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। এখানে তাই দ্রুত সঠিক সংবাদ মুহূর্তকে চিহ্নিত করে ফটো তোলার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

৬) সংবাদচিত্রীর মধ্যে একটি শিল্পীমন থাকতে হবে। সংবাদপত্রের ব্যস্ত গড়পড়তা পাঠকের মন ফটোর ওপর আটকে রাখতে হলে ফটোকে জীবন্ত ও অনুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। এমন কিছু যা ছবির ফ্রেম ছাপিয়ে

যাবে। নোয়াখালির দাঙ্গার সময় সফররত গান্ধীজির লাঠি হাতে সাঁকো পার হবার বিখ্যাত সেই ফটো। তা শুধু ডকুমেন্ট নয়, সেই মুহূর্তের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

৭) অবশ্য ভালো ফটোগ্রাফার এক দিনে জন্ম নেয় না। নিরন্তর চর্চা, নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণই ভালো সংবাদচিত্রী তৈরি করে।

২.৪.৪ সারাংশ

এই এককে আমরা যে বিষয়ে জানলাম সেগুলো হলো:

- চিত্র সাংবাদিকতা
- সংবাদ চিত্র
- ক্যাপশন
- ফটোগ্রাফার সাংবাদিকের গুণাবলী

২.৪.৫ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

ক) সাধারণ ফটো ও সংবাদ ফটোর পার্থক্য আছে কি?

খ) সংবাদ ফটো সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

বড় প্রশ্ন :

ক) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন চিত্রসাংবাদিকতায় কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে?

খ) চিত্রসাংবাদিকতা কী? আজকের দিনে চিত্র বা ফটোবিহীন সংবাদপ্রকাশ কি সম্ভব? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

২.৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. *রিপোর্টিং* — সুধাংশু শেখর রায়

২. *সাংবাদিকতা, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র* — সুধাংশু শেখর রায়

৩. *সাংবাদিকতা পরিচিতি* — সম্পাদনা: রোল্যান্ড ই উলস্‌লে

৪. *ফটো সাংবাদিকতা* — নীরোদ রায়

৫. *The Professional Journalism* — John Hohenberg

মডিউল ৩ : সম্পাদনা

একক ১ ❑ সম্পাদকীয় নীতি— বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন শৈলীর ব্যবহার-সম্পাদনার ব্যবহৃত শব্দবন্ধ বৈদ্যুতিন মাধ্যম সম্পাদনা, দৈনিক সংবাদপত্র, রবিবারের সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র পার্থক্যসমূহ— ১) শৈলী, ২) আঙ্গিক, ৩) প্রেক্ষা ও ৪) পন্থা

৩.১.০ গঠন

৩.১.১ উদ্দেশ্য

৩.১.২ প্রস্তাবনা

৩.১.৩ সম্পাদকীয় নীতি

৩.১.৪ বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন শৈলীর ব্যবহার

৩.১.৫ সম্পাদনা ব্যবহৃত শব্দবন্ধ

৩.১.৬ বৈদ্যুতিন মাধ্যম সম্পাদনা

৩.১.৭ দৈনিক সংবাদপত্র, রবিবারের সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র-পার্থক্যসমূহ (১) শৈলী, (২) আঙ্গিক, (৩) প্রেক্ষা ও (৪) পন্থা

৩.১.৮ সারাংশ

৩.১.৯ অনুশীলনী

৩.১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়ে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা হলো:

- সম্পাদকীয় নীতি
- বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন শৈলীর ব্যবহার
- বৈদ্যুতিন মাধ্যম সম্পাদনা
- দৈনিক সংবাদপত্র, রবিবারের সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র পার্থক্যসমূহ, শৈলী, আঙ্গিক, প্রেক্ষা ও পন্থা

৩.১.২ প্রস্তাবনা

যে কোনও পরিবেশনার জন্য সম্পাদনা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। লেখা থেকে টেলিভিশন সর্বত্র রয়েছে

সম্পাদনা। এমনকি বেতারেও সম্পাদনা প্রয়োজন। লেখা থেকে ছবি, শব্দভিত্তিক বেতার প্রযোজনাও সম্পাদনা ছাড়া সম্ভব নয়। যা কিছু এলোমেলো থাকে তাকেই সংহত করে সম্পাদনা। একেবারে পরিপাটি করে পরিবেশনযোগ্য করে তোলে। ত্রুটি, আধিক্য বর্জিত হয়, অপ্রয়োজনীয় অংশকে কেটে ফেলে একটি ঝকঝকে পরিবেশনা নির্মিত হয় সম্পাদনার মধ্য দিয়ে।

মুদ্রণ মাধ্যমের অন্যতম হল সংবাদপত্র। এরপর আছে সাময়িকপত্র ও বই। এই তিনটি ক্ষেত্রে সর্বত্রই রয়েছে সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা। সম্পাদনা যে কোনও বিষয়কে মুদ্রণ উপযোগী করে তোলে। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও বই-এর ক্ষেত্রে যে কোনও বিষয় মুদ্রণ উপযোগী হয়ে ওঠে সম্পাদনার মাধ্যমে। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে ত্রুটি সংশোধন করে। প্রয়োজনে বাক্যবিন্যাসের পরিবর্তন করে, শিরোনাম বসিয়ে এবং ছাপার আয়তন নির্ধারণ করে সম্পাদনার কাজ করা হয়। আই আই এম সি ম্যানুয়ালে বলা হয়েছে editing is a process of improving reports making them easily comprehensible and livelier and removing possible inaccuracies, এককথায় বলা যেতে পারে একটি রচনাকে ঘষে মেজে প্রয়োজনমতে পরিবর্তন করে পরিবেশনযোগ্য করে তোলাই সম্পাদনা। বই-এর সম্পাদনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বই-এর বিষয়-এর যাবতীয় খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করে, প্রয়োজনে ত্রুটিমুক্ত করে। অধ্যায়গুলি সঠিকভাবে ভাগ করে এবং বানানবিধি সঠিকভাবে মেনে সম্পাদনার কাজ করা হয়। এখানে বইটির প্রকাশনার যাবতীয় বিষয় পর্যালোচিত হয় সম্পাদনার সময়। একটি ভালো বই মানেই তার পিছনে অবশ্যই আছেন একজন দক্ষ সম্পাদক।

৩.১.৩ সম্পাদকীয় নীতি

এখানে সম্পাদকীয় নীতি বলতে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র বুঝতে হবে। এই নীতিগুলি মেনে চললে সম্পাদনার কাজটি সহজ হয়। এগুলি হল:

১) সঠিকতা (Accuracy) : সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে পরিবেশিত সংবাদকে সর্বদা সঠিক হতে হবে। কারণ পাঠকরা সংবাদকে সত্য বলে ধরে নেয়। এখানেই নিহিত থাকে সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা। এম.ভি. চার্নলি (M.V. Charnley) বলেছেন অধিকাংশ পাঠক গণমাধ্যম পরিবেশিত ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নেয় (Most news consumers accept most of the facts the media offer without question)। সংবাদপত্রকে তাই সর্বদাই চেষ্টা করতে হয় সংবাদের সঠিকতা যেন বজায় থাকে। এই জন্যই সংবাদ গুরুত্ব পায়। পাঠক জানে কাগজে বা সাময়িকপত্রে যা বেরোচ্ছে তা সত্য, কোনও মতেই তা গল্প-কাহিনী নয়। সঠিকতা বজায় রাখার জন্য সম্পাদনার সময় দেখতে হয় যাতে নাম, তারিখ, সময়, উদ্ধৃতিতে যেন কোনও ভুল না থাকে। ঠিক যখন যা ঘটেছে, যা বলা হয়েছে তাই যেন ছাপা হয়। এটা হলেই সঠিকতা বজায় রাখা যাবে।

২) সময়োপযোগিতা (Timeliness) : সংবাদের সঙ্গে সময়ের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। একেবারে এখনই ঘটে যাওয়া খবরই হল তাজা খবর। সাংবাদিকতার পরিভাষায় ঘড়ির কাঁটা যত এগোতে থাকে সংবাদের মূল্যও তত হ্রাস পায়। Ken Metzler বলেছেন সংবাদকে সবসময়ই নতুন হতে হবে (news must be new)। দেরি হলে গুরুত্ব কমবে। সময়ের সঙ্গে মানুষের এই আগ্রহের যোগের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন M.V. Charnley, তিনি বলেছেন 'people are aware of the transistory nature of existence', অর্থাৎ মানুষ জানে

তার অস্তিত্ব খুব অল্প সময়ের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব পাল্টে যাচ্ছে আর এই পরিবর্তনের ধারা উঠে আসছে সংবাদপত্রের পাতায়, টুকরো টুকরো সংবাদের মধ্য দিয়ে। নির্বাচনের ফল মানুষ সঙ্গে সঙ্গে জানতে চায়। দুর্ঘটনা ঘটলে কী ঘটলো। কেন ঘটল এসব জানতে আগ্রহী হয়। Carl Lindstorm বলেছেন, 'The news room clock is the master of us all', অর্থাৎ সংবাদ বিভাগের ঘড়ির কাঁটাই আমাদের পরিচালিত করে।

৩) অভিনবত্ব (Novelty) : সম্পাদনার সময় মাথায় রাখতে হবে সংবাদটির মধ্যে অভিনবত্ব আছে কিনা। অনেকে ঘুরিয়ে বলেন সংবাদকে unusual হতে হবে। মানুষ যদি কুকুরকে কামরায় তখনই তা সংবাদ হবার যোগ্যতা পায়। কারণ সেটা unusual, একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। এই জন্যই এভারেস্ট বড় খবর হয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন খবরের পাতায় জায়গা পায়।

৪) কোন পক্ষপাত যেন না থাকে (Impartiality) : সংবাদ পরিবেশনে সর্বদাই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অনেকে বলেন সংবাদ পরিবেশন হবে বস্তুনিষ্ঠ, কোনরকম পক্ষপাত সেখানে থাকবে না। M.V. Charnley-র কথায় 'The fact must be reported impartially, as they occurred—এর মানে হল সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে কোনওরকম পক্ষপাত থাকবে না। যিনি সংবাদ লিখছেন তাঁর মতামত থাকবে না প্রতিবেদনে। এটা যদি করা যায়, সম্পাদনার সময় তাহলে পক্ষপাতহীনতা বা impartiality-কে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

তবে গবেষণা করে দেখা গেছে পুরোপুরি পক্ষপাতহীনতা প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। লেখা হবে এবং সেখানে কোনরকম মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে না, এটা খুব শক্ত। যিনি লিখছেন তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি, বিবেচনা আবেগ লেখার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক। তবে তা কখনই পক্ষপাতহীনতার বা impartiality-কে উপেক্ষা করবে না।

তবে গবেষণা করে দেখা গেছে পুরোপুরি পক্ষপাতহীনতা প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। লেখা হবে এবং সেখানে কোনরকম মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে না, এটা খুব শক্ত। যিনি লিখছেন তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি, বিবেচনা আবেগ লেখার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক। তবে তা কখনই পক্ষপাতহীনতার ধর্মকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

৫) উদ্ধৃতি (Attribution) : সম্পাদনার সময় দেখতে হবে ঠিকমতো উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে কিনা, যে কোনও ঘটনা ঘটুক না কেন, ওই ঘটনা সম্পর্কে উদ্ধৃতি থাকবেই। এই উদ্ধৃতি প্রমাণ করে সাংবাদিক মনগড়া কোনও কথা বলছেন না। কোনও অপরাধের ঘটনা ঘটলে পুলিসি উদ্ধৃতি থাকবেই। পুলিস কী বলছে ঐ ঘটনা সম্পর্কে এটাই হল ঘটনাটির বিশ্বাসযোগ্যতার সূত্র। পুলিস কী বলছে, আদালত কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে এগুলি উদ্ধৃতির মারফৎ জানানো হয়। রাজনৈতিক খবরে রাজনৈতিক নেতাদের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়, রাজনৈতিক দলের মুখপাত্ররা কী বলছেন তা উঠে আসে উদ্ধৃতির মাধ্যমে।

৬) সংক্ষিপ্ততা (Brevity) : প্রয়োজনীয় নিউজ পয়েন্টগুলো ঠিকঠাক রেখে খুব সংক্ষেপে সংবাদ পরিবেশন করতে হয় অল্পকথায় দ্রুত কোনও বিষয়কে প্রকাশ করাই হল ভালো সাংবাদিকতার লক্ষণ। সম্পাদনার অন্যতম উদ্দেশ্যই হল আধিক্যকে ছেঁটে ফেলা। একেবারে যেটুকু দরকার তাই লিখতে হবে। এখানেই সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পাদনার গুণমান বাড়ায়। খুব অল্প জায়গার মধ্যে বেশি কিছু বলতে হবে, এটাই ভালো সাংবাদিকতা।

৭) স্বচ্ছতা (Clarity) : লেখার মধ্যে থাকবে স্বচ্ছতা, একবার পড়েই বিষয়বস্তু সহজে বোঝা যাবে। লেখার

মধ্যে এই ব্যাপারটাকে সম্পাদনার সময় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সহজ লেখার অন্যতম নীতি হল 'যেমন কথা বল তেমনি লেখ' (write as you talk), কথাবার্তা বলার সময় যে স্বচ্ছতা থাকে তাকেই তুলে আনতে হবে লেখায়। ডেইলি এক্সপ্রেসের সম্পাদক Arthur Christiansen বলেছিলেন আমি খবরকে এত সরলীকৃত করেছি যে ফরেন সেক্রেটারি ও একজন ঝাড়ুদার দুজনেই সমান বুঝতে পারে। সংবাদ রচনায় তাই সহজসরল ব্যাপারটা নিয়ে আসতে হবে।

৮) পাঠযোগ্যতা (Readability) : সম্পাদনা নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পাঠযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করা। পাঠক কোনরকম হোঁচট খাবেন না পড়তে গিয়ে, এটা নিয়ে আসতে হবে লেখার মধ্যে। একেই বলে পাঠযোগ্যতা বা Readability, তরতর করে সংবাদ রচনা পড়তে হবে। এটা তখনই সম্ভব যখন পাঠযোগ্যতাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বাক্যবিন্যাস সহজ হবে, ছোট ছোট বাক্যে একেবারে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে লিখতে হবে। দুর্বোধ্যতাকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা প্রয়োজন।

৩.১.৪ বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন শৈলীর ব্যবহার (Different style for different media)

গণমাধ্যম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র হল বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম। এদের সম্পাদনা শৈলীও আলাদা। এর আগে আমরা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সম্পাদনা শৈলী নিয়ে আলোচনা করেছি। সম্পাদনা নীতির মধ্যেই শৈলী নিহিত আছে।

বেতার হল শ্রুতিমাধ্যম। বেতার হল কথার তাজমহল। শুধুমাত্র কথা দিয়ে ছবি তৈরি হবে। কণ্ঠস্বরের যাদুতে নাটকীয়তা নিয়ে এসে হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠান পরিবেশনা করা সম্ভব। এই বেতার অনুষ্ঠান প্রযোজনায় সম্পাদনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে সংবাদ, নাটক, বা কথিকা যাই হোক না কেন প্রতিটি অনুষ্ঠানেই প্রয়োজন সম্পাদনা। সংবাদ পরিবেশনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে খুব সামান্য কথায় টুকরো টুকরো সংবাদকে তুলে ধরতে হবে সংবাদ বুলেটিনে। প্রয়োজনমতো ভয়েস ওভার যোগ করতে হবে। বেতার প্রতিবেদক ঘটনাস্থল থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারেন। সেটা ভয়েসওভারে যোগ করতে হবে। তারপর আবার ফিরে আসতে হবে সংবাদপাঠে। একটা দশ মিনিটের সংবাদ ক্যাপসুলে অনেকগুলি টুকরো খবরের কথা বলা হবে। সংবাদপত্রে যে খবর ২০০ শব্দে লেখা হয়, বেতার সংবাদে তা বলা হয় মাত্র চল্লিশটি শব্দে। টুকরো টুকরো সংবাদ দিয়ে একটা সংবাদমালার ক্যানভাস তৈরি হয়। সংবাদপাঠক পরিস্কার উচ্চারণে সেগুলি পড়ে যান।

অনেক সময় নাটক বা কথায় সুরে বিচিত্র অনুষ্ঠান তৈরি হয় বেতারে। নাটকের হাতিয়ার সংলাপ, উপযুক্ত স্বরক্ষেপণ এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। ভালো সম্পাদনা তৈরি করতে পারে উচ্চমানের বেতার সিকোয়েন্স যা কণ্ঠ অভিনয়ের যাদুতে মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মহালয়ার দিন ভোরবেলায় পরিবেশিত হয় এক ভীষণ জনপ্রিয় অনুষ্ঠান মহিষাসুরমর্দিনী। বহুদিনের পুরনো অনুষ্ঠান, কিন্তু এখনও তার আকর্ষণ কণামাত্র কমেনি। অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের কাছেও এই অনুষ্ঠান খুব জনপ্রিয়। এই অনুষ্ঠান পাঠ, গান, স্তোত্রপাঠ এবং নেপথ্য সংগীতের সমন্বয়ে তৈরি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর যাদুতে আজও বাঙালী মোহিত। এই অনুষ্ঠানের স্ক্রীপট লিখেছিলেন বাণীকুমার, সংগীত পরিচালনা করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে ছিলেন দিকপাল গায়ক-গায়িকারা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গুণী শিল্পীরা। অনুষ্ঠানটি এখনও মনে করা হয় বাতাসের তাজমহল। এই তাজমহল নির্মাণে সম্পাদনার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ।

টেলিভিশন অনুষ্ঠান তৈরিতেও সম্পাদনার প্রয়োজন। এই সম্পাদনা অনেক বেশি প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই সম্পাদনার কাজ করা হচ্ছে। টেলিভিশনের নতুন মাত্রাটি হল দেখা ও শোনা। আগে ছিল পড়া এবং শোনা, এখন একই সঙ্গে দেখাশোনা সম্ভব হল। যেমন ঘটছে তেমনটি দেখতে পাওয়া যায়। নানান ভঙ্গী, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ, শব্দ ও কথার অনুষঙ্গ যে অডিও ভিসুয়াল যাদু তৈরি করে তা দর্শককে দেয় এক অনন্য সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা। বিষয়ের চেয়ে বিষয়ের উপস্থাপনই বেশি প্রভাব বিস্তার করে দর্শকের ওপরে।

টেলিভিশন সংবাদের আর একটি নতুন দিক হল লাইভ কভারেজ। আগে সংবাদ বলতে বুঝতাম একটু আগে যা ঘটে গেছে। এখন টেলিভিশনের দৌলতে যা ঘটছে তাও সরাসরি সংবাদ হচ্ছে। লাইভ কভারেজের ক্লিপিংস ধরিয়ে দেওয়া হয় সংবাদ পাঠের সময় সংবাদ পাঠক বা পাঠিকা বলে দেন এখন আপনারা সরাসরি দেখুন, চলে আসে লাইভ কভারেজ, দর্শকের মনোযোগ আরও বেড়ে যায়। এই যে সংবাদ পাঠ করতে করতে ভয়েস ওভার চলে আসছে, এটা সম্ভব করছে সম্পাদনা। সম্পাদনা হচ্ছে যুক্ত এবং বাদ দেওয়া, পরিবেশনার স্বার্থে এই কাজ করা হয়, আর এটাই হল সম্পাদনা।

চলচ্চিত্রেও সম্পাদনা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনার মাধ্যমেই নির্মিত হয় একটি চলচ্চিত্র। রাশপ্রিন্ট যা তোলা হয় তার মধ্য থেকে অল্প কিছু সম্পাদনার মাধ্যমে নির্বাচিত হয় পরিবেশনার জন্য। সংলাপ ডাবিং-এর মাধ্যমেও যুক্ত হয়। নেপথ্য সংগীত দৃশ্য নির্মাণকে সম্পূর্ণতা দেয়। যে কোনও চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রয়োজন একজন দক্ষ সম্পাদকের এখানে সম্পাদনার শর্তই হল দৃশ্য নির্মাণকে বোধগম্য এবং শিল্পসম্মত করে তোলা। সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি ছবিতে ছিলেন দুলাল দত্তের মতো দক্ষ সম্পাদক, যার হাতের ছোঁয়ায় 'পথের পাঁচালী' থেকে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' আমাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

৩.১.৫ সম্পাদনায় ব্যবহৃত শব্দবন্ধ (Terminology used in the editing)

কিছু শব্দ প্রকৃতভাবে ব্যবহৃত হয় সম্পাদনা সময়। এই শব্দগুলির কারিগরী তাৎপর্য আছে। মুদ্রণ থেকে অন্যান্য গণমাধ্যমে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় তা নীচে দেওয়া হল :

মুদ্রণ মাধ্যম:

১। বীট, যেখানে রিপোর্টারদের ডিউটি পড়ে। ইনট্রো/লীড, সংবাদের সূচনা। পেজ মেক আপ বা পেজিনেশান। সংবাদপত্রে পৃষ্ঠাসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি পৃষ্ঠাকে আলাদা করে সাজাতে হয়। সম্পাদনার একটি অংশ হল এই পেজ মেকআপ বা পেজিনেশন। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে পৃষ্ঠা তৈরি করার পদ্ধতিকে বলে পেজিনেশন।

ডেট লাইন, ডেডলাইন, বাই লাইন, মাস্ট হেড, অ্যাঙ্কর, এডিট পেজ, কলাম, কলামনিষ্ট, ফিচার, পোষ্ট এডিট, প্রিন্টারস লাইন, সোলাস অ্যাড, ব্যানার হেডলাইন, ইনভারটেড পিরামিড, স্টপ প্রেস, এজেন্সি কপি, প্রুফরিডিং, সাপ্লিমেন্টারি পেজ, পেজ থ্রি ডামি, ফার্স্ট লীড, সেকেন্ড লীড প্রভৃতি হল বহুল ব্যবহৃত সংবাদ প্রকাশনার ক্ষেত্রে।

ডেটলাইন : যে তারিখে প্রতিবেদন লেখা হয়েছে সেই তারিখ। ১৫ সেপ্টেম্বরের কাগজে ডেটলাইন হবে ১৪ সেপ্টেম্বর।

ডেডলাইন : সংবাদের কপি জমা দেবার শেষ সময়, প্রতিবেদকদের সবসময় মাথায় রাখতে হয় ঐ সময়সীমা তা না হলে দেরি হয়ে যাবে। আর সম্পাদক, বার্তা সম্পাদককেও ডেডলাইন মেনে চলতে হয়, সংবাদপত্র সময় মতো ছাপার জন্য এটা জরুরী।

বাইলাইন : কিছু কিছু সংবাদ সাংবাদিকদের নাম দিয়ে বেরোয়। একে বলে বাইলাইন। প্রতিবেদনের মাথায় নাম থাকলেই সেটাকে বলে বাইলাইন।

মাষ্ট হেড : প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে মাথায় থাকে কাগজের নাম। বিশেষ এক ক্যালিগ্রাফিতে নামটা লেখা হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা, আজকাল, এই নামগুলি হল মাষ্ট হেড।

অ্যাঙ্কর : প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে তলায় থাকে চার বা পাঁচ কলামের একটি সংবাদ একে বলে অ্যাঙ্কর স্টোরি (Anchor story)। আজকাল সব কাগজেই এই সংবাদ দেখা যায়।

এডিট পেজ : সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার ছোট নাম এডিট পেজ। আনন্দবাজার পত্রিকায় চার নম্বর পাতা হল এডিট পেজ। এই পাতার সম্পাদকের মতামত, চিঠিপত্র ও বিশেষ প্রবন্ধ থাকে।

পেজিনেশন : পৃষ্ঠা তৈরির কমপিউটার ভিত্তিক প্রক্রিয়ার নাম পেজিনেশন। পাতা সাজানোর ব্যাপারটা এখন পিসিতে বা ল্যাপটপে করা হয়। আধুনিক সফটওয়ারকে আশ্রয় করে পেজিনেশন কাজ সারা হয়।

কলাম : কলাম হল একটি নির্দিষ্ট আয়তন, প্রস্থে ৪.৫ থেকে ৫ সেন্টিমিটার। সংবাদপত্রের পাতায় এই আয়তন নিয়ে তৈরি হয় কলাম। লম্বালম্বি নেমে যায় উপর থেকে নীচে। প্রস্থে একটি সংবাদপত্র আট কলামের হয়। আজকাল অবশ্য অনেক কাগজ ছ কলামেও হচ্ছে।

কলামনিষ্ট : সংবাদপত্রে এবং সাময়িকপত্রে ব্যক্তিগত নির্ভর এক ধরনের রচনা প্রকাশিত হয়। এগুলো একেবারে ব্যক্তিগত (personalised) রচনা। খুব অল্প পরিসরে তীক্ষ্ণ স্যাটায়ার, হিউমার ও বিশ্লেষণ সহযোগে এই কলাম লেখা হয়। যিনি লেখেন তাকে বলা হয় কলামনিষ্ট। খুসবন্ত সিং, বরুন সেনগুপ্ত ছিলেন বিখ্যাত কলামনিষ্ট। আর্ট বাখওয়াল্ড (Art Bachwald) ছিলেন Washington Post-এর বিখ্যাত কলামনিষ্ট।

ফিচার : একধরনের রচনা যা সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। মোটামুটি হাজার, দেড় হাজার শব্দ থাকে এই রচনায়। সঙ্গে থাকে ছবি। তথ্য, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, সবকিছুই ফিচারে থাকে। ফিচার পড়ে পাঠক অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। ফিচারের মধ্যে সামান্য বিনোদনের ছোঁয়া থাকে। রচনার আঙ্গিক সাহিত্যধর্মী। ভ্রমণের ওপর ফিচার খুব জনপ্রিয়। বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়েও ফিচার লেখা হয়।

পোষ্ট-এডিট : বাংলায় এর নাম উত্তর সম্পাদকীয়। এর জায়গা এডিট পেজের মাঝখানে। এটিকে বিশেষ নিবন্ধও বলা যায়। সাধারণত হাজার থেকে বারোশো শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এই রচনা। অভিজ্ঞ সাংবাদিক ও লেখকরা এই রচনা লেখেন।

প্রিন্টারস্ লাইন : সংবাদপত্রের একদম শেষ পাতায় একেবারে নীচে দেওয়া থাকে সম্পাদক, মুদ্রক এবং প্রকাশকের নাম ঠিকানা এবং সংবাদপত্রের রেজিস্ট্রেন নম্বর। এটা দেওয়া আইনত বাধ্যতামূলক।

সোলাস অ্যাড : প্রথম পৃষ্ঠার তলায় একেবারে ডান দিকে থাকে যে বিজ্ঞাপন তাকেই বলা হয় Solus Advertisement. এই জায়গাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এর দামও বেশি।

ব্যানার হেডলাইন : প্রথম পৃষ্ঠার আট কলাম জুড়ে এই শিরোনাম তৈরি হয়। খুব বড় হরফে লেখা হয়। খুব গুরুত্বপূর্ণ খবরের শিরনাম ব্যানারে করা হয়। পাঠক দেখেই বুঝতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর এটি।

অ্যাডোব ইন ডিজাইন : পাতা সাজানোর একটি সফট্ওয়ার। মুদ্রণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে এই সফটওয়ারের সাহায্যে সুন্দর পাতা সাজানোর কাজ করা যায়। গ্রাফিক্সের ব্যবহারও করা যায় এখানে।

ইনভারটেড পিরামিড : সংবাদ রচনার সবচেয়ে প্রচলিত আঙ্গিক হল ইনভারটেড পিরামিড। বাংলায় উল্টো পিরামিড। একটি পিরামিড আকৃতিকে উল্টে দিলেই পাওয়া যাবে এই আঙ্গিক, যা inverted pyramid নামে পরিচিত। ওপরদিকটা হবে বড়, তলার দিকটা ছোট। এবং তারপর কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবেশিত হবে। শেষে এমন একটা জায়গা আসবে যেখানে বলার কিছুই থাকবে না। পিরামিডের দুই পার্শ্বরেখা সেখানে মিলিত হচ্ছে। দ্রুত জ্ঞাপনকার্যে এর গুরুত্ব রয়েছে।

স্টপ প্রেস : গভীর রাতে যদি ভুবন কাঁপানো কোনও খবর এসে পৌঁছয় তখন ছাপা থামিয়ে নতুন কপি ছাপতে দিতে হয়। এ অবস্থাকে বলা হয় স্টপ প্রেস। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী গভীর রাতে মারা গিয়েছিলেন তাশখন্দে তখন কলকাতার বহু কাগজকেই স্টপ প্রেস করে নতুন করে সংবাদ পরিবেশন করতে হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম কাগজ ছিল দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান।

এজেন্সি কপি : সংবাদসংস্থা যে সংবাদ পাঠায় তাকে বলা হয় এজেন্সি কপি। আগে এ খবর আসতো টেলিপ্রিন্টারে। এখন আসে ইন্টারনেট মারফৎ ই-মেলে। পিটিআই, ইউএন আই, এপি, রয়টারস প্রভৃতি এজেন্সি দিবারাত্র খবর পাঠাচ্ছে। এই সব খবরের কপিকেই বলে এজেন্সি কপি।

প্রুফরিডিং : ছাপা হওয়ার আগে একটা দুটো ছাপা তুলে ত্রুটি সংশোধন করা হয়, এর নাম প্রুফরিডিং। প্রুফ রিডিং বিশেষ দক্ষতার দাবী রাখে। যারা প্রুফ দেখেন তাদের বলা হয় প্রুফরিডার। তারা কম্পোজ হওয়া কপির ভুলত্রুটি শুধরে দেন। আজকাল কমপিউটার সফটওয়ারই বলে দেয় কোথায় ভুল। তাই সহজেই সংশোধন করা যাচ্ছে।

সাপ্লিমেন্টারি পেজ : মুল সংবাদপত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত চার পাতা বা ছ পাতার যে কাগজ দেওয়া হয় তাকে বলে সাপ্লিমেন্টারি পেজ (supplementary page)। বিশেষ কোনও বিষয়ের ওপর অথবা বিনোদনমূলক সংবাদই এখানে থাকে। রবিবার প্রায় প্রত্যেক কাগজই সাহিত্য বিষয়ে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা দেয়। একে বলে লিটারারি সাপ্লিমেন্ট (Literary Supplement)।

পেজ থ্রি সংবাদিকতা (Page Three Journalism) : এক নম্বর পৃষ্ঠা সংবাদের জন্য, দু নম্বর পৃষ্ঠা সম্পাদকীয় মতামতের জন্য, আর তিন নম্বর পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ বিনোদন সংবাদের জন্য। এই তিন নম্বর পৃষ্ঠাই হল পেজ

থ্রি সাংবাদিকতার পরিসর। বর্তমানে এই পেজ থ্রি বিষয়টি ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে। এখানে ফ্যাশান, সিনেমা পপমিউজিক আর বিশিষ্ট তারকাদের খবর থাকে। টেলিগ্রাফে টি টু, টাইমস অফ ইন্ডিয়ার Calcutta Times হল পেজ থ্রি পেজ।

ডামি : পৃষ্ঠা সজ্জার নকল রূপ হল ডামি। আগে এই ডামি শীটের ওপর পৃষ্ঠা সজ্জার নকশা করা হত। এখন সেটা কমপিউটার পর্দায় সফটওয়ারের সাহায্যে করা হয়।

ফার্স্ট লীড : প্রথম পৃষ্ঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে বলা হয় ফার্স্টলীড। এটা বাঁ দিক অথবা ডান দিকে থাকতে পারে।

সেকেন্ড লীড : প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে বলা হয় সেকেন্ড লীড। এর অবস্থানও পৃষ্ঠা সজ্জার নকশা অনুযায়ী ডান, বাঁ অথবা মধ্যস্থানে হতে পারে।

৩.১.৬ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সম্পাদনা

বেতার

১। অ্যাড-লিব (Ad-lib) : কোনও স্বতস্ফূর্ত ভাষণের অথবা বক্তব্য পেশকে অ্যাডলিব বলা হয়। এই বিষয় আগে থেকে তৈরি থাকে না।

২। ঘোষক (Announcer) : কোনও অনুষ্ঠানের আগে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অল্প কথায় যিনি পরিচিত দেন তিনি হলেন ঘোষক। সুন্দর পরিষ্কার উচ্চারণে তিনি অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে ঘোষণা করেন।

৩। ভয়েস ওভার (Voice Over) : সংবাদপাঠক সংবাদ পড়তে পড়তে অনেক সময় রিপোর্টারকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে বলেন, রিপোর্টার যা দেখছেন শুনছেন তা অল্প কথায় বলেন, এটাই হল ভয়েস ওভার।

৪। প্রযোজক (Producer) : সংবাদ বা কোনও বেতার অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। পরিবেশনার যে প্রক্রিয়া চলে তার তত্ত্বাবধান করেন। সংবাদ বিভাগেও প্রযোজক থাকেন। আবার নাটক বিভাগেও প্রযোজক থাকেন।

৫। ট্রিমিং (triming) : সম্পাদনায় এটা খুব জরুরী। অপ্রয়োজনীয় অংশকে বাদ দেওয়ার পদ্ধতি হল ট্রিমিং। যা দরকার তা থাকবে, বাকীটুকু ট্রিম করা হবে, অর্থাৎ বাদ দেওয়া হবে।

৬। অ্যাকচুয়ালিটি (Actuality) : স্টুডিওর বাইরে অনেক সময় রেকর্ডিং করতে হয়। Act কথাটা থেকে এসেছে Actuality, যা শব্দ গ্রহণ করা হচ্ছে তাই অ্যাকচুয়ালিটি।

৭। ব্লাইন্ড ইনটারভিউ (Blind Interview) : সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য অনেক সময়ই রিপোর্টারদের অনেক মানুষের কথা বলতে হয়। যদি যাদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে তাদের পরিচিতি না দেওয়া হয় তাহলে ঐ সাক্ষাৎকারকে বলা হবে ব্লাইন্ড ইনটারভিউ।

টেলিভিশন

১। অ্যাঙ্কর (Anchor) : তিনি একজন সাংবাদিক। যে কোনও একটি বিষয়কে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেন। অল্প কথায় সূত্র ধরিয়ে দেন বিষয়টির ক্যামেরার সামনে। পরিষ্কার উচ্চারণে সাবলীল ভাবে যে কোনও বিষয়কে উপস্থাপন করার ক্ষমতার অধিকারী হবেন। প্রায়শই আমরা টিভিতে হাতে বুম নিয়ে অ্যাঙ্করদের দেখি।

২। **ফিড (Feed) :** উপগ্রহ মারফৎ অথবা মাইক্রোওয়েভ দ্বারা যে ট্রান্সমিশন হয় তাই হল ফিড। লাইভ কভারেজে সময় এই ফিডের ব্যবহার হয়।

৩। **টেলিপ্রম্পটার (Teleprompter) :** এটি হল একটি ডিসপ্লে ডিভাইস যা সংবাদপাঠক বা অন্য কোনও ব্যক্তি যিনি ক্যামেরার সামনে কিছু বলছেন তাকে সাহায্য করে। ক্যামেরার তলায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লেখা ফুটে ওঠে, যিনি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলছেন তিনি ঐ লেখা থেকে কিউ পেয়ে যান।

৩.১.৭ দৈনিক সংবাদপত্র রবিবারের সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্র—পার্থক্যসমূহ (১) শৈলী (২) আঙ্গিক (৩) প্রেক্ষিত (৪) পন্থা (Difference between daily and sunday newspaper and magazines in (i) style, (ii) format (iii) perspective and (iv) approaches.

দৈনিক সংবাদপত্র, রবিবারের সংবাদপত্র (Daily newspaper and Sunday newspaper) : দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিদিন বেরোয়। প্রধানত ব্রডশীট কাগজ, ব্রডশীট কাজ প্রস্থ আট কলাম। দৈর্ঘ্যে ৫০ থেকে ৫২ সেন্টিমিটার। যেমন আনন্দবাজার, টেলিগ্রাফ, টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া। সন্মার্গ ইত্যাদি। Edwin Emery সংবাদপত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এইভাবে (ক) সংবাদপত্রটি অবশ্যই মুদ্রিত হতে হবে (খ) নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হবে (গ) ক্রয়যোগ্য হবে (ঘ) মানুষ জানতে চায় এমন বিষয় সহজ ভাষায় ছাপবে। এই হল আধুনিক সংবাদপত্রের পরিচয়। যে কাগজ দৈনিক বেরোয়, মানে ২৪ ঘণ্টা অন্তর প্রকাশিত হয় তা হল দৈনিক সংবাদপত্র। হার্ড নিউজ ছাপাই যার প্রধান উদ্দেশ্য।

দৈনিক সংবাদপত্রের অঙ্গ হল রবিবারের সংবাদপত্র, যেখানে অতিরিক্ত চার, ছয় পৃষ্ঠা থাকে রবিবাসরীয়। রবিবারোয়ারি অথবা শুধু রোববার নামে। এককেটি কাগজে একেক নাম, লেখায় ছবিতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তৈরি হয় এই লিটারারি সাপ্লিমেন্ট। রবিবার ছুটির দিন। পাঠকের হাতে সময় বেশি। ধীরেসুস্থে অবসরমতো কাগজ পড়া যায়। সংবাদপত্র পরিচালকরা জানেন, পাঠক ছুটির দিনে থাকেন ছুটির মেজাজে, তাই বিনোদন, সাহিত্য, শিল্প নিয়ে বর্ণময় প্যাকেজ তৈরি করেন।

রবিবারের সাপ্লিমেন্টে যে বিষয়গুলি সাধারণত থাকে তার মধ্যে অন্যতম হল ছোট গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, কলাম এবং একটি লীড ফিচার যেটি একেবারে প্রথম পাতায় ছবিসহ থাকে। ফিচারের শিরোনাম খুব আকর্ষণীয় হয়, একটু নাটকীয় হলে দ্রুত পাঠকদের মনযোগ আকর্ষণ করা যায়। রবিবারের পাতার মূল উদ্দেশ্যই হল পাঠককে আনন্দ দেওয়া। তার অবসরের মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয় নির্বাচন করা। আজকাল অনেক কাগজ আলাদা একটি ম্যাগাজিন দেওয়াও শুরু করেছে, যেমন প্রতিদিন কাগজ 'রোববার' নামে একটি পত্রিকা কাগজের সঙ্গে দেয়।

শৈলী

সংবাদপত্রে উল্টো পিরামিড আঙ্গিকে সংবাদ লেখা হয়। যদিও আজকাল নাটকীয়তা আনার জন্য প্রতিবেদন রচনাও একটু আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে। কিন্তু সংবাদ পরিবেশনের মূল ব্যাপারটি কিন্তু উল্টো পিরামিড রীতি অনুযায়ী লেখা হয়।

সংবাদ রচনার ভাষা হয় খুব সহজ সরল। বিশেষণের আধিক্য সেখানে থাকে না। শুধু কী গুরুত্বপূর্ণ ঘটেছে সেটা জানানোই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। সংবাদ রচনার তথ্যই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই সঠিক তথ্য পরিবেশনের ওপরই জোর দেওয়া হয়। শিরোনামও হয় সোজাসাপটা। একবার চোখ বোলালেই যাতে মূল খবরগুলির হদিশটুকু পাওয়া যায়।

সংবাদ রচনার মূল শৈলীই হল সহজভাবে কোন বিষয়কে প্রকাশ করা। সংবাদে মূল বক্তব্য থাকে একেবারে প্রথমে। তারপর ধীরে ধীরে অল্প গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ পরিবেশিত হয়। ধাঁচটা উল্টো পিরামিডের মতো। শেষে এমন একটা জায়গা আসে যেখানে বলার মতো কিছু আর থাকে না। উদাহরণ হিসেবে অমর্ত্য সেনের নোবেল পাবার খবর কলকাতার কাগজগুলো এইভাবে পরিবেশন করেছিল :

"রবীন্দ্রনাথের পর নির্ভেজাল বাঙালি হিসেবে আবার নোবেল পুরস্কার পেলেন অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। অর্থনীতিতে চলতি বছরের নোবেল পুরস্কারের জন্য আজ রয়াল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স এই বঙ্গ সন্তানকেই বেছে নিয়েছেন।"—বর্তমান

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর ৮৫ বছর পরে নোবেল পুরস্কারের আলোয় জগৎ সভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন দ্বিতীয় বাঙালী অমর্ত্য সেন। দুনিয়াজুড়ে সমীহ জাগানো বিলেতের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজের 'মাস্টার' অমর্ত্য সেন ৬৪ বছর বয়েসে এই দুর্লভ সম্মান প্রাপ্তির অনেকদিন আগে থেকেই অবশ্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ বিশ্ব অর্থনীতির বিবেক হিসেবেই অর্থনীতিবিদদের আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃতি।"—আজকাল

"অমর্ত্য সেন পুরস্কার পেলেন। তাঁর এই পুরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির মূল স্রোতে ফিরে এল মানুষ, অধিকার ও জনকল্যাণ শব্দত্রয়ী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর তিনিই দ্বিতীয় বাঙালী যিনি এই সম্মানে ভূষিত হলেন।"—আনন্দবাজার পত্রিকা

তিনটি রিপোর্টের শুরুতেই মূল কথা বলা হয়েছে। তারপর অমর্ত্য সেনের পরিচয় উঠে এসেছে। যারা সম্মান দিয়েছেন তাদের কথাও উল্লেখ হয়েছে। এসেছে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আর একটি কমন ফ্যাক্টর—বাঙালী। তথ্য পরিবেশনই এখানে মুখ্য, সঙ্গে সামান্য ব্যাখ্যা। আদর্শ প্রতিবেদন রচনার শুরু এভাবেই হয়।

ম্যাগাজিন বা সাময়িকপত্রের লেখার শৈলী সংবাদ রচনার শৈলীর থেকে আলাদা। এখানে পিরামিড সূত্রকেই মেনে চলা হয়। প্রথমেই মূল কথা বলে দেওয়া হয় না। সাসপেন্সকে ধরে রাখা হয়। বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে মূল বক্তব্যের দিকে অগ্রসর হন লেখক। মূল কথা আসে একেবারে শেষে। পুরোটা না পড়লে বোঝা যায় না আসল বক্তব্য কী। এ শৈলী সাহিত্য রচনার শৈলীর কাছাকাছি।

সাময়িকপত্রের রচনা ফিচার বা কলাম রচনার নীতি অনুসরণ করে। সাময়িকপত্রে গদ্যরচনা হবে ঝড়ঝড়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে crisp prose, একেবারে মুচমুচে যা যে কোনও রচনার পাঠযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। লেখক সহজ সরল বাক্যবন্ধ ও সঠিক উপমা ব্যবহারে রচনায় গতি আনবেন। উপস্থাপনায় থাকবে নাটকীয়তা, একটু চমক, মাঝে মাঝে কৌতুক রস ঝিলিক দিয়ে উঠবে। একটু পড়ে আরও একটু পড়তে চাইবেন পাঠক। খিদে উসকে দেওয়ার মতো রচনাশৈলী আরত্ত করতে হবে লেখককে।

আঙ্গিক (Format)

আগেই বলা হয়েছে সংবাদ প্রতিবেদনের আঙ্গিক উল্টো পিরামিড রীতি মেনে লেখা হবে। শিরোনামের পরে থাকবে লীড। অল্প কথার সংবাদের মূল বিষয়বস্তু জানিয়ে দেওয়া হবে। তারপর আসবে বডি। ছোট ছোট অনুচ্ছেদে সংবাদের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু পরিবেশিত হবে।

ম্যাগাজিনে উল্টো পিরামিড রীতি মেনে চলার প্রয়োজন হয় না। কোন অ্যানেকডোট দিয়ে বা উদ্ধৃতি দিয়ে একটা সাসপেন্স তৈরি করে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। প্রথম বা দ্বিতীয় লাইন পড়ে পাঠক বিষয়বস্তুর সন্ধান পাবেন না। হালকা আভাষমাত্র পেতে পারেন। সাহিত্য রচনারীতির সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে কোন অবস্থাতেই তা সাহিত্য হবে না। রূপক, অলংকার হয়তো সামান্য থাকবে, কিন্তু তা কখনই শিল্প নির্মাণের ধার কাছ দিয়েও যাবে না।

সুসংহত, সুন্দর গদ্যরচনার কৌশলই সাময়িকপত্রের রচনায় প্রাণসঞ্চার করতে পারে। সাময়িকপত্রের সমস্ত রচনাকেই বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। প্রতিটি বাক্যই পাঠককে আবিষ্ট করবে, ব্যাঙ্গে, সরসতার মজিয়ে রাখবে। খুব অল্প পরিসরে এমন অভিজ্ঞতা পাঠককে দেবেন যাতে সে একটা নতুন কিছু পায়। তবেই পাঠক বাক্যের পর বাক্য পেরিয়ে যাবেন, একেবারে শেষে তৃপ্তি বোধ করবেন। James M Neal এবং Suzanne S. Brown সাংবাদিক সুলভ রচনায় অনিবার্য বলে মনে করেছেন 'depth of thought and persuasive presentation'-কে। তাঁরা মনে করেছেন লেখায় যদি ভাবনার গভীরতা না থাকে, তাহলে তা পাঠকের মনে দাগ কাটতে পারে না।

প্রতিবেদন রচনায় ভাষার এতো দখলের প্রয়োজন হয় না। যা ঘটছে তা সরাসরি সহজ ভাষার জানালেই কাজ শেষ। ঘটনার টাটকা ভাবটা শুধু বজায় রাখতে হবে। সে জন্য যথাসম্ভব কর্তৃবাচ্যে বা active voice-এ বাক্য লেখা দরকার। রূপক বা আলংকারিক শব্দ প্রয়োগের সুযোগ সেখানে নেই। মতামত দেবারও কথা নয়। শুধুমাত্র সঠিক তথ্যকে সংবাদরচনার আঙ্গিকে পরিবেশন করতে হবে।

প্রেক্ষা ও পন্থা (Perspective and Approaches) : সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র রচনায় প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রেক্ষার মধ্যে সময়, সমাজবাস্তবতা এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিহিত থাকে। রচনা যাই হোক না কেন, তা সৃষ্টি হয় বিশেষ এক প্রেক্ষাপটের মধ্য থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে প্রেক্ষাপট ছিল, আজ আর তা নেই। ইউরোপ, এশিয়া যে ধ্বংসলীলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল তা হাতে গোনা কিছু মানুষ স্মরণ করতে পারে। সেই সময়ের বাস্তবতা আর যে সময়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তার প্রেক্ষিত একেবারে আলাদা। রচনা যে রকমই হোক না কেন এই প্রেক্ষিতের প্রভাবটি অস্বীকার করা যাবে না। আজকের প্রেক্ষিত হল বিশ্বায়নের নলেজ নির্ভর দ্রুত অর্থনৈতিক রূপান্তরে। রচনার ওপর তার ছাপ পড়বেই।

পন্থা বলতে বুঝি পথ যা রচনার দিশা তৈরি করে। প্রতিষ্ঠানের নীতির সঙ্গে যোগ রয়েছে পন্থার। সংবাদপত্র যদি উদার হয়, অর্থাৎ উদারনীতি দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে সংবাদ অন্যান্য রচনা নির্বাচনে তার প্রভাব পড়বে। মার্কিনযুক্ত এবং পশ্চিম ইউরোপের গণমাধ্যমগুলি এই উদারনীতিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশনের কাজে উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়।

প্রতিটি গণমাধ্যম তার নিজস্ব নীতি অনুযায়ী চলে। সামাজিক প্রেক্ষায় সে নীতি উদারনীতিক হতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারে, অথবা চূড়ান্ত রক্ষণশীল হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। নিউইয়র্ক টাইমস্, CNN, BBC, আমাদের দেশের এনডি টিভি, ইন্ডিয়া টুডে, টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া যে নীতি মেনে চলে তার সঙ্গে চীনের পিপলস্ ডেইলি অথবা পশ্চিম এশিয়ার আলজারিরার বিস্তর ফারাক। কেন? এর উত্তর হল গণমাধ্যমগুলির নীতি এবং তার থেকে উদ্ভুত পন্থা বা approach একেবারে আলাদা। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে সত্যকে সন্ধান করছে। সন্ধানের রাস্তা আলাদা, তাই পন্থাও ভিন্ন হতে বাধ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত কাগজ Christian Science Monitors-এ কেউ মারা গেলে 'Died' কথাটা লিখতো না, লিখতো 'passed away'। এটা পুরোপুরি ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপার, কাগজের নীতির সঙ্গে এই বিশ্বাস যুক্ত হয়ে ছিল, এটাই ছিল কাগজের পন্থা বা approach, লিখন ভঙ্গীমাকে যা প্রভাবিত করতো।

৩.১.৮ সারাংশ

সম্পাদনার নীতি আলোচনা করা হয়েছে। একেকটি মাধ্যমের শৈলী আলাদা। প্রত্যেকটি মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বিশেষ শব্দমালা— যা দিয়ে চেনা যায় মাধ্যমের বিশেষত্ব, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সম্পাদনা বুঝতে হবে। দৈনিক সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের সম্পাদনার চরিত্র আলাদা। এই পার্থক্য প্রতিফলিত হয় শৈলী, আঙ্গিক, প্রেক্ষাপট এবং দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী।

৩.১.৯ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১। সম্পাদনা কী? অল্পকথায় লিখুন।

২। পেজিনেশন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

বড় প্রশ্ন :

১। সম্পাদকীয় নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২। দৈনিক কাগজ এবং সাময়িকপত্রের সম্পাদনা বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩। সাময়িকপত্রের শৈলী ও আঙ্গিক নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করুন।

৩.১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। *সমাচার সম্পাদনা* — সৌরীন ব্যানার্জী—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

২। *সংবাদ প্রতিবেদন* — ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—লিপিকা

৩। *সংবাদবিদ্যা* — ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৪। *News Editing and Practices* — Dr. Sourin Banerjee

একক ২ ❑ সম্পাদকের সমস্যা : পক্ষপাত (bias), slants, চাপসমূহ (Pressures)

৩.২.০ গঠন

৩.২.১ উদ্দেশ্য

৩.২.২ প্রস্তাবনা

৩.২.৩ **সম্পাদকের সমস্যা: পক্ষপাত (bias) slants, চাপসমূহ (Pressures)**

৩.২.৪ সারাংশ

৩.২.৫ অনুশীলনী

৩.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৩.২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়ে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা হলো:

সম্পাদকের সমস্যা : পক্ষপাত (bias), slants, চাপসমূহ (Pressures)

৩.২.২ প্রস্তাবনা

আধুনিক দিনের সম্পাদক এমন এক আদর্শ অবস্থায় বাস করেন না যে খাঁটি সাংবাদিকতার বিবেচনার ভিত্তিতে তিনি নিজের হাতে কলম দিয়ে প্রেস রিপোর্টগুলি এবং নিবন্ধগুলি সম্পাদনা করতে পারেন। যে সংবাদ এবং মিডিয়া বর্তমানে একটি বিশাল শিল্প তা বরং একটি নিখুঁত বাণিজ্যিক উদ্যোগ। এটি বেশ কয়েকটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আধুনিক দিনের সম্পাদকের সামনে চ্যালেঞ্জ হল এই কারণগুলির দ্বারা উৎপন্ন সমস্যাগুলি মোকাবিলা করা এবং সাংবাদিকতার মান বজায় রাখা।

৩.২.৩ সম্পাদকের সমস্যা: পক্ষপাত (bias) slants, চাপসমূহ (Pressures)

সংবাদ ও সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান হলেন সম্পাদক। প্রতিটি কাগজেই একজন সম্পাদক থাকেন। যা কিছু সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে তার জন্য তিনি দায়িত্বশীল থাকেন। এই কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ সবসময় অনুকূল থাকে না। বহু সমস্যার সম্মুখীন তাকে হতে হয়। ছোট কাগজে সম্পাদকের কর্তৃত্ব বেশি, কারণ তিনিই শেষ কথা। কাগজের সঙ্গে তিনি অনেক বেশি একাত্ম হয়ে কাজ করেন। বিজ্ঞাপন যোগাড়, বিক্রি, লেখা যোগাড় করা সবকিছুই তাঁকে করতে হয়। খুব অল্প মূলধন নিয়ে কাজ করতে হয়। অনেক সময় সম্পাদক চালাচ্ছেন এক টানাটানির সংসার। মাঝে মাঝে তাকে দেনাও করতে হয়। কষ্ট হলেও সব দিক তিনি সৈনিকের মতো সামলান, কারণ তিনি কাগজকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। মনের মতো লেখা ছাপতে তিনি স্বাধীন, কেউ তার ওপর খবরদারি করতে পারে না। তবে পরিস্থিতির চাপে তাকেও অনেক সময় তার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, যেমন হয়েছিল 'গণশক্র'তে।

সম্পাদক চাইলেও ডাক্তারের লেখা ছাপতে পারেননি। কারণ বাইরের চাপ, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে রাজনীতি।

বড় কাগজের চিত্র একেবারে আলাদা। সম্পাদকের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে সংবাদ, সম্পাদকীয় সীমানার মধ্যে। সংবাদপত্র পরিচালনার সম্পাদকের গুরুত্ব অনেক কমেছে। এখন কাগজ চালায় পেশাদার ম্যানেজাররা। সম্পাদককে সিইও-র নির্দেশ মতোই সম্পাদকীয় বিভাগ পরিচালনা করতে হয়। অনেক সময়ই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বিরোধ বাঁধার সম্ভাবনা থাকে। তখন সম্পাদকের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। আমাদের দেশে বহুবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সম্পাদকের সঙ্গে মালিকের সংঘাত বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই সংঘাত বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে হতে পারে। সংবাদের মূল্যায়ন, সম্পাদকীয় মন্তব্যকে ঘিরে বিরোধের সূচনা হতে পারে। এ অবস্থায় সম্পাদককে যদি পিছু হটতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে সম্পাদকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ঘটছে।

চাপ শুধু ঘরের মধ্য থেকেই আসে না, বাইরের চাপের মুখেও সংবাদপত্রকে পড়তে হয়। বাইরের চাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সরকারি চাপ, বিজ্ঞাপনদাতাদের চাপ, আর সবচেয়ে বড় চাপ হল নিজের পাঠকদের কাছ থেকে আসা চাপ।

শাসনক্ষমতায় যে সরকারই থাকুক না কেন, অনেকক্ষেত্রেই বিরূপ সমালোচনা তারা সহ্য করতে পারে না। একনায়কতন্ত্রে এই প্রবণতা হয় বেশি। হিটলার, মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কো কেউই স্বাধীন সংবাদপত্র পছন্দ করতেন না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও সরকার সব পরিচালনা করে তারাও অনেকসময় পছন্দ করে না স্বাধীন সংবাদ যেন তেন প্রকারেণ চাপ সৃষ্টি করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হয়। ভারতে জরুরী অবস্থার সময় এই ঘটনা ঘটেছিল। বহু সম্পাদক ও সাংবাদিককে জেলে পোরা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সম্পাদক কুলাদীপ নায়ারকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। যে সব সাংবাদিকরা জেলে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ, জ্যোতির্ময় দত্ত, বরুণ সেনগুপ্ত, মিনু মাসানি, কুলদীপ নায়ার প্রমুখ সাংবাদিক।

সংবাদপত্র সরকারি বিজ্ঞাপন প্রচুর পরিমাণে পায়। চলতি কথায় বলা হয় বিজ্ঞাপন হল সংবাদপত্রের লাইফলাইন, যে বিজ্ঞাপন সংবাদপত্র পায় তার একটা বিরাট অংশ আসে সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে। সরকারের কথা না শুনলে সরকার এই বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিতে পারে। এটা প্রায় ভাতে মারার সমান। জরুরী অবস্থার সময় ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং দি স্টেটস্‌ম্যান দীর্ঘ সময় কোন সরকারি বিজ্ঞাপন পায়নি। সরকারের চাপে অনেক বেসরকারি বিজ্ঞাপনও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা বলেন আর কিছুদিন জরুরী অবস্থা চললে এই দুটি বিখ্যাত কাগজই বন্ধ হয়ে যেত। এ অবস্থাটা কিন্তু জরুরী অবস্থা পর্যায়েই শেষ হয়ে যায় নি। এখনও চলছে পরোক্ষভাবে, সরকারের বিরোধীতা করলেই বিজ্ঞাপন বন্ধ। কোনও বড় গণমাধ্যমেই এ চাপ সহ্য করতে পারে না। ফলে সাধারণ মানুষ সরকার বিরোধী কোনও খবরই পায় না। এর দায় পুরোপুরি বর্তায় সম্পাদকের ওপরে। কর্তৃপক্ষ সম্পাদককে বলেন, সাবধানে চলতে, এ অবস্থায় সম্পাদক যা লিখতে চাইছেন তা পারছেন না। এই চাপ তাকে সহ্য করতে হয়।

আধুনিক বৃহৎ সংবাদপত্র চলে বিজ্ঞাপনদাতাদের টাকায়। চার, পাঁচ টাকায় বর্ণময় দশ, বারো পাতার কাগজ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব, কারণ বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে প্রচুর আয় হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতারা যদি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেন তাহলে তৈরি হয় সঙ্কট। এস নটরজান ছিলেন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সহকারি সম্পাদক।

একবার তিনি আয়রন শিল্পের সমালোচনা করে সম্পাদকীয় লেখেন। তারপর সম্পাদক তাঁকে ডেকে পাঠান। নটরাজন তখন তরুণ সম্পাদকীয় লেখক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সম্পাদকীয় তিনি লিখেছিলেন তাতে টাটা শিল্পগোষ্ঠীর সমালোচনা ছিল। কারণ সে সময় লৌহশিল্পের নেতৃত্বে ছিল টাটা গোষ্ঠী। সম্পাদক নটরাজনকে বলেন আপনি কি জানেন টাটারা কী পরিমাণ বিজ্ঞাপন আমাদের দেন। নটরাজনের তা জানতেন না, একজন সহ-সম্পাদক হিসেবে সেটা জানারও কথা নয়। সম্পাদক তাকে বলেন লেখাটা সংশোধন করে আনতে। অর্থাৎ সম্পাদক চাইছেন সম্পাদকীয়টি যাতে টাটা গোষ্ঠীর বিরাজভাজন না হয়। এরপর কী হয়েছিল তা অন্যকথা। এস নটরাজন তার নিজের লেখায় একথা উল্লেখ করেছেন। এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার সম্পাদকের ওপর বিজ্ঞাপনের ওপর চাপ আছে।

জরুরী অবস্থার সময় ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দি স্টেটস্‌ম্যান সরকারি বিজ্ঞাপন পেতই না, কারণ এই দুটি কাগজ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব ছিল। একে তো সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া যাচ্ছে না। তার ওপর সরকারের মন রাখতে বেসরকারি বিজ্ঞাপন আসা্য কমে। কারণ বড় শিল্পপতিরা সরকারের বিরাগভাজন হতে চায় না। এ সময় এই দুটি কাগজ খুবই বিপাকে পড়েছিল। রাজ্য সরকারগুলিও বিজ্ঞাপনকে অস্ত্র করে সংবাদপত্রের ওপর চাপ তৈরি করে। খুব বড় কাগজও এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে, এর প্রচুর নিদর্শন আছে।

সম্পাদকের কাছে সবচেয়ে বড় চাপ হল পাঠকদের মন জুগিয়ে চলা। পাঠকদের চাহিদা, রুচি পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। বাজার সমীক্ষার দ্বারা সম্পাদকের কাছে পাঠকরা কী চাইছেন সেটা কর্তৃপক্ষ প্রতিনিয়ত বার্তা পাঠান। সংবাদপত্রের সার্কুলেশন দপ্তরও প্রতিবার্তা পাঠায় কর্তৃপক্ষের কাছে। ধরা যাক কোনও একটি রাজনৈতিক অথবা সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্র একটি বিশেষ অবস্থান নিচ্ছে যা পাঠকদের ভালো লাগছে না। স্বভাবতই এ অবস্থায় সার্কুলেশন কমবে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে বড় সংবাদপত্র গোষ্ঠী এ ঝুঁকি নিতে চাইছেন না, ফলে তাদের স্ট্রাটেজি পাল্টাতে হচ্ছে। সবচেয়ে অপ্রিয় সত্য হল সংবাদপত্র কোন অবস্থাতেই মুনাফাকে অস্বীকার করতে পারছে না। টিকে থাকলেই মুনাফার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হতে পারে। তাই সর্বাগ্রে টিকে থাকা দরকার।

৩.২.৪ সারাংশ

সম্পাদকের সামনে সমস্যা : পক্ষপাত বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং চাপ, এই বিষয়টি সাংবাদিকতায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাংবাদিকতায় এখনও সংবাদপত্র বিগব্রাদার, যতই তার দাপট কমুক। টেলিভিশন ও নিউমিডিয়ার প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের পরিধি যে সঙ্কুচিত হচ্ছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বড়দার প্রভাব এখন সমাজকে গভীরভাবে প্রবাহিত করছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাজ এখনও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে নিশ্চিত করতে হয় যাতে কোনরকম পক্ষপাত না থাকে সংবাদ ও সম্পাদকীয় নিবন্ধে।

সংবাদ পরিবেশনে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অনেকসময়ই যুক্ত থাকে। সংবাদপত্রের নীতি, সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত থাকে এই দৃষ্টিভঙ্গী, সম্পাদককে দেখতে হয় যাতে এই দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুনিষ্ঠতার নীতিকে মেনে চলে। চাপ আসে রাজনৈতিকভাবে, কখনও বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে। যে দল শাসনক্ষমতায় থাকে তারা সরকারি বিজ্ঞাপন না দিয়ে চাপ তৈরি করতে পারে। আবার শক্তিশালী শিল্পগোষ্ঠি বিজ্ঞাপন না দিয়ে চাপ দিতে পারে। সম্পাদককে এইসব প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগোতে হবে।

৩.২.৫ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন:

১। সম্পাদকের কাজ কী?

২। বস্তুনিষ্ঠা সংক্ষেপে বলুন।

বড় প্রশ্ন:

১। সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

২। বিভিন্ন দিক থেকে আসা চাপ তিনি কীভাবে সামলাবেন? আলোচনা করুন।

৩.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। *সমাচার সম্পাদনা* — সৌরীন ব্যানার্জী—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

২। *সংবাদ প্রতিবেদন* — ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—লিপিকা

৩। *সংবাদবিদ্যা* — ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৪। *News Editing and Practices* — Dr. Sourin Banerjee

একক ৩ ❑ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় সংগঠন

৩.৩.০ গঠন

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

৩.৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩.৩ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় সংগঠন

৩.৩.৪ ম্যাগাজিন সম্পাদনা

৩.৩.৫ সংবাদ সংস্থা

৩.৩.৬ নিউজ ডেস্কর কর্মধারা

৩.৩.৭ সারাংশ

৩.৩.৮ অনুশীলনী

৩.৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়ে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা হলো:

- সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় সংগঠন
- ম্যাগাজিন সম্পাদনা
- নিউজ ডেস্কের কর্মধারা

৩.৩.২ প্রস্তাবনা

একটি সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল সম্পাদকীয় বিভাগ। সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু তৈরি করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে এই বিভাগের ওপরে। প্রকৃতপক্ষে এই বিভাগের উৎকর্ষের ওপরই নির্ভর করে সংবাদপত্রের সাফল্য। সম্পাদকীয় বিভাগের শীর্ষে থাকেন সম্পাদক, তারপর তাকে সাহায্য করার জন্য থাকেন নির্বাহী সম্পাদক (Executive Editor)।

৩.৩.৩ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় সংগঠন

সংবাদ ও তা নিয়ে মন্তব্য সংবাদপত্রের মূল বিষয়। সংবাদের কভারেজ ভালো হলে কাগজের কাটতি হয়, তেমনি সাহায্য করে। বিভিন্ন ঘটনাবলীর ওপর সংবাদপত্রের নিজস্ব মন্তব্য যা উঠে আসে সম্পাদকীয়র মধ্যে। পাঠক জানতে চায়, বুঝতে চায়। সংবাদ তাকে জানায়, সম্পাদকীয় মতামত তাকে পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে।

ভালো সংবাদের প্যাকেজের জন্য উচ্চমানের সংবাদ বিভাগ থাকা দরকার। সংবাদ বিভাগে থাকবে একটি সুসংগঠিত সংবাদকক্ষ, আলোকচিত্র বিভাগ, প্রুফ রিডিং বিভাগ এবং ভালো একটি রেফারেন্স লাইব্রেরী। সংবাদ কক্ষের প্রধান কুশলিরা হলেন প্রতিবেদকরা ও অবর সম্পাদকগণ। প্রতিবেদকরা সংবাদ কভার করে এসে প্রতিবেদন লিখবেন এবং অবর সম্পাদকরা সেই প্রতিবেদনকে ঘষে-মেজে মুদ্রণযোগ্য করে তুলবেন।

প্রতিবেদকদের বিভিন্ন ভাগ আছে। স্টাফ রিপোর্টার, প্রিন্সিপাল সংবাদদাতা এবং বিশেষ সংবাদদাতা। এইসব সংবাদদাতারা নিজেদের পারদর্শিতা অনুযায়ী খবর করেন। স্টাফ রিপোর্টাররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লোকাল নিউজ কভার করেন। এগুলোকে বলা হয় বীট কভারেজ। সরকারের সদর দপ্তর, পৌরসভা, কোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি হল বীট, এগুলো কভার করার জন্য স্টাফ রিপোর্টারদের পাঠানো হয়। আজকাল সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ নিজেদের চুক্তি অনুযায়ী সংবাদদাতা নিয়োগ করছেন। এরা হলেন নিজস্ব সংবাদদাতা, আগে এঁরাই ছিলেন স্টাফ রিপোর্টার।

এর পরের পর্যায়ের সংবাদদাতারা হলেন প্রিন্সিপাল করেসপনডেন্ট। এঁরাও আজকাল সংবাদপত্রের চুক্তি অনুযায়ী নিয়োজিত সংবাদদাতা। কর্তৃপক্ষ নিজেদের পছন্দমতো এদেরও নিয়োগ করেন। ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে নিজস্ব সংবাদদাতা। সমস্যা হল কে স্টাফ রিপোর্টার আর কে প্রিন্সিপাল করেসপনডেন্ট পর্যায়ের তা বোঝা যায় না। সবাই নিজস্ব সংবাদদাতা, এটাই পরিচয়।

সংবাদদাতাদের মধ্যে অভিজাত হলেন বিশেষ সংবাদদাতারা। কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী বিশেষ সংবাদদাতাদের সংবাদপত্র জগতের অভিজাত সম্প্রদায় বলে বর্ণনা করেছেন। সাধারণত তাঁরা রাজধানীতে অথবা খুব বড় শহরে সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্বে থাকেন। কারণ এই সমস্ত জায়গায় বড় খবর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোথায় তিনি থাকবেন সেটা নির্ভর করছে তার কাগজের কর্তৃপক্ষের ওপরে। বিশেষ সংবাদদাতাদের খবর সবসময়ই বিশেষভাবে প্রচারিত হয়।

বিশেষ সংবাদদাতারা নেপথ্য ভাষ্যকারের কাজ করেন। একটি সংবাদকে সাধারণ পাঠকদের কাছে সহজ করে পরিবেশনের জন্য নেপথ্য কাহিনীর উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়। গাছ থেকে ঝুলে থাকা ফলের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা যায়। গাছ থেকে যে ফল ঝুলছে তার সঙ্গে মাটির সম্পর্ক, শিকড়ের মাধ্যমে। শিকড়ের মাধ্যমে ফলের মধ্যে জীবনরস প্রবাহিত হচ্ছে। গাছের নীচে যে ফল পড়ে থাকে তার জীবনীশক্তি নেই। সে মৃত, বিচ্ছিন্ন। একজন দক্ষ বিশেষ সংবাদদাতার কাজ হচ্ছে একটি সংবাদের সঙ্গে যুক্ত সকল প্রাসঙ্গিক তথ্যকে ফলসমৃদ্ধ গাছের মতো প্রতিবেদন লেখা। প্রতিবেদনটি পড়তে গিয়ে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতির প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন পাঠক। বাবরি মসজিদ নিয়ে লেখার সময়, করোনা ভাইরাস নিয়ে প্রতিবেদন রচনার সময় এই প্রেক্ষাপট নির্মাণ জরুরী হয়ে ওঠে।

স্যার ফিলিপ গিবস (Sir Philip Gibbs) বলেছেন সাংবাদিকতা পেশার সবথেকে মহান এবং সবচেয়ে আনন্দদায়ক কাজটি করেন বিশেষ সংবাদদাতারা। তাঁরা বিশেষ সংবাদ বিশেষভাবে কভার করেন। একটু বেশি জায়গা নিয়ে তাঁদের খবর প্রকাশিত হয়। তাঁরা কভার করেন বিশেষ খবর। খুব গুরুত্বপূর্ণ খবরই বিশেষ খবর। এমন খবর পড়ার জন্যই পাঠকরা উন্মুখ হয়ে থাকেন। কখনও গোয়েন্দার মতো তিনি রহস্য উন্মোচন করেন। আবার কখনও কূটনীতিকের মতো রাজনীতির চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। James Gordon Bennett এ জন্যই বিশেষ সংবাদদাতাকে অর্ধেক কূটনীতিবিদ ও অর্ধেক গোয়েন্দা বলে অভিহিত করেছেন।

প্রতিবেদন রচনার পরের পর্যায় হল সম্পাদনা। প্রতিবেদক যা লিখবেন তা হুবহু ছাপা হয় না। ঐ লেখা সম্পাদনার পর মুদ্রণযোগ্য হয়ে ওঠে। এই সম্পাদনার কাজটাও হয় সংবাদকক্ষে। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকেন বার্তা সম্পাদক, মুখ্য অবর সম্পাদক এবং বেশ কয়েকজন অবর সম্পাদক।

অবর সম্পাদকরা প্রতিবেদকের লেখা কপিকে ঘষে-মেজে, ত্রুটি সংশোধন করে মুদ্রণ উপযোগী করে তোলেন। অবর সম্পাদকেরা হলেন সম্পাদনা কার্যে দক্ষ। সম্পাদনার অন্যতম অংশ হল শিরোনাম বসানো। কতটা ছাপা হবে তার আয়তন ঠিক করা ইত্যাদি। একটি ভালো সংবাদপত্র মানেই সেটি অবশ্যই ভালোভাবে সম্পাদিত।

প্রতিটি সংবাদপত্রেই একটি আলোকচিত্র বিভাগ থাকে। ছবি একটি সংবাদ বিষয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। সংবাদ উপযোগী যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তার ছবি তোলার দায়িত্বে থাকেন আলোকচিত্রীরা। সংবাদ-কক্ষের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকেন। এ ছাড়া রয়েছেন প্রুফ রীডাররা, যারা মুদ্রণযোগ্য কপির ভুল সংশোধন করেন। বানান ভুল বাক্যবিন্যাসের ভুল তাঁরা শুধরে দেন।

সংবাদ ছাড়া সম্পাদকীয় মন্তব্য সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সম্পাদকের অধীনে সহ-সম্পাদকেরা সম্পাদকীয় পাতার যাবতীয় বিষয় সম্পাদনা ও রচনার কাজে যুক্ত থাকেন। সম্পাদকীয় নিবন্ধ হল সংবাদপত্রের কণ্ঠস্বর। এই পৃষ্ঠার দায়িত্বে বেশ কয়েকজন সহ-সম্পাদক থাকেন। সম্পাদকীয় লেখা, চিঠিপত্রের কলাম সম্পাদনা করা, উত্তর-সম্পাদকীয় বিভাগ পরিচালনা করা হল সহ-সম্পাদকদের কাজ।

ফিচার আধুনিক সংবাদপত্রে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বিষয়। সব কাগজই বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ফিচার ছাপছে। ফিচার বিষয় দেখার জন্য অনেক কাগজই আলাদা ফিচার সম্পাদক রাখছে। বিশেষ কিছু বিষয়ের জন্য আলাদা পাতা থাকে অনেক কাগজে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে শিশুদের পাতা, খেলাধূলার পাতা, সিনেমার পাতা, বাণিজ্য, ফ্যাশানের জন্য নির্দিষ্ট পাতা। এই পাতার জন্য সহকারি সম্পাদক বা সিনিয়র সাব এডিটরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা লেখাপত্র যোগাড় করে, সম্পাদনা করে, পাতা সাজিয়ে ছাপার ব্যবস্থা করে।

সংবাদ ও সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি রেফারেন্স লাইব্রেরী। পরিভাষায় যাকে মর্গ (morgue) বলা হয়। এখানে থাকে সংবাদের ক্লিপিংস। বিখ্যাত ব্যক্তিদের ওপর প্রয়োজনীয় তথ্য। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রেফারেন্স বইও যাবে। এখন অবশ্য সমস্ত তথ্যই ডিজিটাল আর্কাইভে রাখা হয়। ইন্টারনেট ব্যবস্থায় সব তথ্যই চলে আসে হাতের মুঠোয়।

৩.৩.৪ ম্যাগাজিন সম্পাদনা

সংবাদপত্রের মতো ম্যাগাজিন বা সাময়িকপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের শীর্ষে থাকেন সম্পাদক। অনেক সাময়িকপত্রে থাকেন একজন প্রধান সম্পাদক, তাকে সাহায্য করার জন্য উপ-সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদকরা। নিউজ ম্যাগাজিনে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য থাকে করেসপনডেন্টরা। যদি জাতীয় স্তরের ম্যাগাজিন হয় তাহলে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে তারা অবস্থান করেন এবং সেখান থেকে খবর পাঠান। ইন্ডিয়া টুডে, দি উইক হল জনপ্রিয় প্রথম শ্রেণীর সাময়িকপত্র বা ম্যাগাজিন। প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ কভারেজ থাকে এই ধরনের পত্রিকার। পত্রিকা দুটি সপ্তাহে একবার বেরোয়। বাংলা ভাষায় 'দেশ' একটি বড় সাময়িকপত্র। পনের দিনে একবার বেরোয়। আগে

ছিল এটি সাহিত্য পত্রিকা, বর্তমানে সাহিত্য-শিল্পকলা এবং সংবাদ সবকিছুই থাকে। সাপ্তাহিক বর্তমানও একটি উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্র। এই পত্রিকাগুলিতে প্রচ্ছদ নিবন্ধ থাকে, কোনও একটি বিষয়ের ওপর দু-তিনটি ভালো লেখা ও ছবি থাকে।

সাময়িকপত্রে সম্পাদনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কোনও লেখাই চটজলদি নয়, সংবাদপত্রের মতো দ্রুত লেখার চাপ এখানে নেই। লেখার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পরিকল্পনার অবকাশ বেশি। অনেক ভেবেচিন্তে তথ্য যোগার করার সুযোগ আছে, বিশ্লেষণের পরিসরও বড়। গদ্যে তির্যকভঙ্গী, রূপকের ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। মুচমুচে গদ্যরচনায় লেখক পাঠককে সামান্য হলেও সাহিত্যের আস্বাদন দিতে পারেন।

সম্পাদনা কাজের জন্য সহযোগী সম্পাদক, অবর সম্পাদকরা থাকেন। পত্রিকার নীতিকে সামনে রেখে, তারা সম্পাদনার কাজটি করেন। এখানে শিরোনামে থাকে চমক। সংবাদপত্রের মতো সাদামাটা হয় না। শুধুমাত্র শিরোনাম পড়েই ভিতরের বিষয়বস্তুর আন্দাজ পাওয়া যাবে না। শিরোনাম চুম্বকের মতো আকর্ষণ করবে তার ভিতরে যেতে উৎসাহ দেবে।

সাময়িকপত্রের সম্পাদনায় পৃষ্ঠা সজ্জার গুরুত্ব সংবাদপত্রের চেয়ে বেশি। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা সজ্জা অনেক দ্রুত করতে হয়। প্রথম পৃষ্ঠার সজ্জার ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তারপর অন্যান্য পৃষ্ঠা চলতি রীতি অনুযায়ী করে দিলেই হল। কিন্তু সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জা অনেক ভেবেচিন্তে তৈরি করার সুযোগ থাকে। দৈনিক কাগজের সঙ্গে যেসব ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিন দেওয়া হয় সেখানেও অনেক আগে থাকতে পরিকল্পনার সুযোগ থাকে। এইসব ম্যাগাজিন সংবাদপত্র প্রকাশের কিছুটা আগেই ছাপানো হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কোন সংবাদপত্র হয়তো রবিবারের কাগজের সঙ্গে একটি ম্যাগাজিন দেয়। যেমন প্রতিদিন পত্রিকা দেয় রোববার, একটি বর্ণময় আকর্ষণীয় সাময়িকপত্র। আদর্শ ব্যবস্থাপনা হল শুক্রবারের মধ্যে ছাপা ও বাঁধাই হওয়া উচিত। এটা হলে ডিসট্রিবিউশনে কোনও সমস্যা হবে না।

সাময়িকপত্রে সবসময়ই প্রচ্ছদ কাহিনী থাকে। প্রচ্ছদ কাহিনীর বিষয়ে অনেক আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সবদিক থেকে সুবিধা। লেখা আগে পাওয়া গেলে প্রচ্ছদ নির্মাণে শিল্পী সুবিধা পান। ভিতরের পাতাগুলি রঙিন ও কালোসাদা দু-রকমই হয়। রঙিন পাতাগুলির জন্য রঙিন ছবি বা ভিন্নরকম আর্টওয়ার্ক তৈরি করে রাখতে হয়। রঙিন ও সাদা-কালো পাতার বিভাজন ইচ্ছেমতো করা যায় না। গোটা পত্রিকার ফর্মা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। ম্যাগাজিনের মূল সুরটাই হল বৈচিত্র্য। বিচিত্র রূপের সমন্বয়ে তৈরি হয় এক অপূর্ব কোলাজ, যা পাঠককে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে।

৩.৩.৫ সংবাদ-সংস্থা

সংবাদ-সংস্থা সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহ করে। কেবলমাত্র সংবাদপত্র নয়, বেতার, দূরদর্শনের মতো গণমাধ্যমগুলি সংবাদের জন্য নির্ভর করে সংবাদ-সংস্থার ওপর। দিবারাত্র আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সংবাদ সরবরাহ করে সংবাদ-সংস্থা। রয়টারস, এপি, এফপি, জিনহুয়া, কিয়োডো হল আন্তর্জাতিক সংবাদ-সংস্থা। আমাদের দেশের সংস্থা হল পিটিআই, ইউএনআই। সংবাদ-সংস্থার সংগঠনের চরিত্র সংবাদপত্রের এবং সাময়িকপত্রের চেয়ে একেবারে আলাদা। শুধু সংবাদ সংগ্রহের নেট ওয়ার্কটি সুগঠিত হলেই কাজ চলে যায়।

সংস্থার স্তম্ভ হলেন সংবাদদাতারা। তাদের পাঠানো খবর গ্রহকদের কাছে দিলেই কাজ শেষ। সংবাদ-সংস্থার কাজের কোন বিরাম নেই। সমস্ত ঘটনাকে ধরার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা। সংবাদ-সংস্থাগুলি যেমন রয়টারস্, এপি, এএফপি, কিয়োডো, জিনহুয়া, পিটিআই ইউ এন আই দ্রুত সংবাদ গ্রাহকদের কাছে পৌঁছনোর জন্য নিজেদের মধ্যে দুর্বার প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ওঠে সংবাদপত্রের তো নিজের সংবাদদাতারা আছেন, তাহলে আবার সংবাদ-সংস্থার পাঠানো সংবাদের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন কী! উত্তর হল কোনও সংবাদপত্রের পক্ষেই বিশ্ব এবং দেশের সব খবর দ্রুত যোগাড় করা সম্ভব নয়। সেই পরিকাঠামো প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রেরও থাকে না। সংবাদ সংগ্রহের মালাকে বিস্তৃত করার জন্যই সংবাদসমূহ যৌথ প্রচেষ্টায় সংবাদ-সংস্থা গঠন করেছিল। বর্তমানে সবচেয়ে বড় সংবাদ-সংস্থা এপি এভাবেই আমেরিকাতে তৈরি হয়েছিল।

সংবাদ-সংস্থা অর্থের বিনিময়ে সংবাদ সরবরাহ করে। যে কোনও প্রতিষ্ঠান তার গ্রাহক হতে পারে। গ্রাহক হওয়ার জন্য অর্থ দিতে হয়। সংস্থার সঙ্গে গ্রাহকের সম্পর্ক ব্যবসায়িক। ইউনেসকো (UNESCO) সংবাদ-সংস্থার সংজ্ঞা দিয়েছে এ ভাবে : "সংবাদ-সংস্থা হল এমন একটি সংস্থা যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সংবাদ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে তা সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বেতার, টেলিভিশন এবং যে কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্থের বিনিময়ে সরবরাহ করা "News Agency is an undertaking of which the principal objective is to gather news and news material of which the sole purpose is to express and present facts and to distribute it to a group of news enterprises....against payment.) সংবাদ-সংস্থা এবং গ্রাহকের মধ্যে নির্দিষ্ট চুক্তির অধীনে নিরপেক্ষ সংবাদ সরবরাহ করাই সংবাদ-সংস্থার কাজ।

সংবাদ-সংস্থা যে খবর পাঠায় তার সবটুকু ছাপা হয় না। কতটুকু ছাপা হবে, অথবা আদৌ ছাপা হবে কি না তা নির্ভর করে সংবাদপত্রের ওপরে। মনে রাখতে হবে সংবাদপত্র টাকা দিয়ে সংবাদ কিনছে। এবার ঐ সংবাদ ছাপা হবে কিনা তা ঠিক করার অধিকার সংবাদপত্রের আছে এমনও হতে পারে সংবাদ-সংস্থার পাঠানো কোন কপিই ব্যবহার করা হল না। তবে সাধারণত তা হয় না, কারণ উপযোগিতা না থাকলে পয়সা দিয়ে শুধু শুধু গ্রাহক হবার কোন মানে হয় না।

সংবাদ-সংস্থা যে খবর পাঠায় তার মধ্যে থাকে এক সার্বজনীন আবেদন। এমন ভাবেই সংবাদের প্যাকেজ তৈরি হয় যাতে সকল গণমাধ্যমের প্রয়োজন মেটে। সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা যখন কপি পাঠায়, তখন সংবাদদাতা জানেন তার পাঠক কারা। তিনি বিশেষভাবে তার সংবাদপত্রের কথা মাথায় রেখেই কপি লিখবেন। সংবাদ-সংস্থার পাঠানো কপিতে এরকম স্বাতন্ত্র্যের ছবি পাওয়া যাবে না। সেখানে প্যাকেজ এমন হবে যাতে সকল গ্রাহকের প্রয়োজন মেটে।

সংবাদ-সংস্থা একেবারে টাটকা খবর পাঠায়। পশ্চিম এশিয়ায়, দক্ষিণ আমেরিকায় অথবা ইউরোপে ভয়ানক কিছু ঘটে গেলে তার খবর যোগাড় করা অধিকাংশ সংবাদপত্র, বেতার বা টেলিভিশনের পক্ষে সংবাদদাতা, পাঠিয়ে যোগাড় করা সম্ভব নয়। তখন সংবাদপত্রকে নির্ভর করতে হয় সংবাদ-সংস্থার পাঠানো কপির ওপর। ছবি, কি স্থিরচিত্র, বা ভিডিও সবই পাঠাতে বাজিমাৎ করেছে সংবাদ-সংস্থা। দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্য পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়াতে বনে লেগেছে আগুন, ভারতে দাঙ্গার খবরের ছবি পাঠাচ্ছে রয়টারস্, এপি এবং এএফপি। প্রতিদিন আমাদের কাগজে এই সব ছবি প্রকাশিত হচ্ছে।

সংবাদ-সংস্থার কভারেজ মোটামুটি নিরপেক্ষ হয়। মতামত, পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে বিতর্ক সংবাদ-সংস্থার প্রতিবেদনে থাকে না। কোনও এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ সরবরাহ করা হয় না। সংবাদ-সংস্থার পাঠানো সংবাদ অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ হয়।

আন্তর্জাতিক সংবাদ-সংস্থার কর্মপরিধি সারা বিশ্ব জুড়ে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষকেই এই সংস্থা খবর সরবরাহ করে। রয়টারস্, এপি হল আন্তর্জাতিক সংবাদ-সংস্থা। বর্তমানে সর্ববৃহৎ সংবাদ-সংস্থা হল এপি (Associated Press)। এই সংস্থার আধিপত্যের কথা বলতে গিয়ে মার্ক টোয়েন বলেছিলেন "there are only two forces that can send light to all corners of the Globe — the Sun in the heaven and the Associated Press down here."

৩.৩.৬ নিউজ ডেস্কের কর্মধারা (Functioning of News Desk)

সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও সংবাদ-সংস্থার কপি সম্পাদনার কর্মধারা না বুঝলে সাংবাদিকতার বিষয়বস্তু কীভাবে তৈরি হয় তা আন্দাজ করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনাই সংবাদকে পরিবেশনযোগ্য করে তোলে।

সংবাদদাতারা খবর পাঠায়, সংবাদ-সংস্থা পাঠায় অজস্র সংবাদের কপি। এই বিপুল সংবাদ প্রবাহ থেকে কোন সংবাদগুলি যাবে তা নির্ধারিত হয় সম্পাদনার সময়। বার্তা বিভাগে বার্তা সম্পাদকের পরিচালনায় অবর সম্পাদকেরা এই সম্পাদনার কাজ করেন। সংবাদের কপি ত্রুটিমুক্ত হয়ে, ঘষে-মেজে, শিরোনাম পেয়ে ছাপার জন্য তৈরি হয়। কপি এমন হবে যাতে পাঠক পড়ে বিষয়টি খুব সহজে বুঝতে পারে। রিপোর্টাররা কপি লেখেন, সাব-এডিটররা কপি তৈরি করেন, এমনভাবে কপি নির্মাণ করেন যাতে মনে হয় কপি গান গাইছে। গান যেমন সুন্দর স্বতস্ফূর্ত, কপিই হবে সেরকম।

সাময়িকপত্রের সম্পাদনার কোন তাড়াহুড়ো থাকে না। ধীরেসুস্থে আকর্ষণীয় গদ্য রচনার ওপর জোর দেওয়া হয়। গদ্যপাঠ যেন পাঠকের কাছে উপভোগের বিষয় ওঠে সেটাই হয়ে ওঠে সম্পাদনার অন্যতম উদ্দেশ্য। সাময়িকপত্রের কপির শিরোনামে সামনে থাকে, এর অর্থ হল পাঠক শিরোনামেই বিষয়টি বুঝবেন, সামান্য আভাষ পাবেন। পড়ার জন্য খিদে বাড়িয়ে দেবে। শিরোনাম এমন হবে পাঠক থমকে দাঁড়াবেন, তারপর লেখাটি পড়তে শুরু করবেন।

সংবাদ-সংস্থার কপিতেও সম্পাদনা প্রয়োজন। সংবাদ-সংস্থার মূল কাজ হল দ্রুত সংবাদ সংগ্রহ করা। বিভিন্ন সংবাদ-সংস্থা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলে যথাসম্ভব দ্রুত গ্রাহকদের কাছে সংবাদ পাঠানোর জন্য। বড় ঘটনা ঘটলে যেমন যেমন খবর পাওয়া যাবে, তাই পাঠানো হবে গ্রাহকদের জন্য। কপির কপি আসতে থাকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

সংবাদ-সংস্থার ডেস্কে প্রচুর কপি এসে জমা হয়। নানান প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সংবাদদাতার এই কপি পাঠায়। সংবাদপত্রের কাছে যে কপি আসে, সংবাদ-সংস্থার কপির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি। সম্পাদনার মধ্য দিয়ে কপির পরিমাণ কমতে থাকে। সংবাদ-সংস্থার অবর সম্পাদনার কেটে ছেটে কপিকে সরবরাহ করার উপযোগী করে গড়ে তোলেন। তারপর সম্পাদিত কপি গ্রহকদের কাছে সরবরাহ করা হয়।

সংবাদ-সংস্থার সম্পাদনায় যে বিষয়গুলি প্রাধান্য পায় তারমধ্যে অন্যতম হল কপিকে সার্বজনীন করে তোলা। সংবাদপত্র যখন কপিকে নিজের মতো করে গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়, তখন সংবাদ-সংস্থা চেষ্টা করে কপিকে সমস্ত গ্রাহকের কাছে মূল্যবান করে তুলতে। কপির মধ্যে যদি সার্বজনীন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলেই এটা সম্ভব। সম্পাদনার মাধ্যমে কপিকে এমন রূপ দিতে হবে যাতে সমস্ত গ্রাহকই মনে করে এটা কাজে লাগবে। এই কপি থেকে সংবাদ করা যাবে।

সংবাদ-সংস্থার কপি চেষ্টা করবে যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠা মেনে চলতে। বস্তুনিষ্ঠার নীতি হল নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা। কোনো রকম পক্ষপাত সেখানে থাকবে না। সংবাদপত্রের কপিতেও বস্তুনিষ্ঠা মেনে চলতে হয়, তবে বস্তুনিষ্ঠার পাশাপাশি সেখানে বিশেষ দৃষ্টিকোণ বা angling-এর অবকাশ আছে। কোনও কাগজ সরকারবিরোধী অবস্থান নেয়, আবার কোনও কাগজ মুক্ত অর্থনীতির জয়গান গায়। সংবাদ পরিবেশনে এই দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়। সংবাদ-সংস্থার কপিতে এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ বা angling-এর কোনও অবকাশ নেই। শুধুমাত্র সঠিক তথ্য সরবরাহ করাই একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায় সংবাদ-সংস্থার সম্পাদনায়।

কী সংবাদপত্র, কী সংবাদ-সংস্থা, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকেই সম্পাদনার সময় আইনগত বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। মানহানি, আদালত অবমাননা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইন এবং রচনাসত্ত্ব আইন মাথায় রেখে সম্পাদনার কাজ করতে হয়। আইনের ক্ষেত্রে একটু এদিক ওদিক হলেই বিপদ।

৩.৩.৭ সারাংশ

সম্পাদকীয় সংগঠন সংবাদপত্র পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রভাবশালী সংবাদপত্রের কয়েকটি বিভাগ থাকে। এই বিভাগগুলির সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই উৎপাদিত হয় সংবাদপত্র।

বিভাগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সম্পাদকীয় বিভাগ, সংবাদ বিভাগ, বিজ্ঞাপন বিভাগ, প্রচার বিভাগ ইত্যাদি। প্রতিটি বিভাগের সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করছে সংবাদপত্র প্রকাশনা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিটি বিভাগকে তাদের কাজ শেষ করতে হয়, এই কাজগুলি এমনভাবে সম্পাদিত হয় যাতে দ্রুত একটি খবরের কাগজ সঠিক সময়ে হকারদের হাত ঘুরে পাঠকদের কাছে পৌঁছে যায়।

সাময়িকপত্রের সাংগঠনিক কার্য সংবাদপত্রের কাছাকাছি কাজের তাড়া তুলনামূলকভাবে কম। সংবাদের চেয়ে সংবাদধর্মী ফিচার ছাপার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানেও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সংবাদ-সংস্থা সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সংবাদ-সংস্থার সংগঠন সংবাদপত্রের থেকে আলাদা। সংবাদপত্র তৈরি করছে একটি সংবাদপত্র, আর সংবাদ-সংস্থা শুধুমাত্র খবর সরবরাহ করছে সংবাদপত্রকে। তবে খুব দ্রুততার সঙ্গে।

৩.৩.৮ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১। সম্পাদকীয় বিভাগ কার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়? বর্তমানে তাঁর ভূমিকা কী?

২। সংবাদ-সংস্থা কী? সংক্ষেপে লিখুন।

বড় প্রশ্ন:

১। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় সংগঠন ব্যাখ্যা করুন।

২। সংবাদ সম্পাদনার প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

৩। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র সম্পাদনার পার্থক্য কী বুঝিয়ে বলুন।

৪। সংবাদ-সংস্থার কাজগুলি বর্ণনা করুন।

৩.৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। *সমাচার সম্পাদনা* : সৌরীন ব্যানার্জী—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

২। *সংবাদ প্রতিবেদন* : ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—লিপিকা

৩। *সংবাদবিদ্যা* : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৪। *News Editing and Practices* : Dr. Sourin Banerjee

৫। *আধুনিক গণমাধ্যম*—ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

একক ৪ ❑ সংবাদ প্রবাহ এবং সম্পাদনা: দ্বাররক্ষীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

৩.৪.০ গঠন

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

৩.৪.৩ সংবাদ প্রবাহ এবং সম্পাদনা

৩.৪.৪ দ্বার রক্ষা (Gatekeeping)

৩.৪.৫ সারাংশ

৩.৪.৬ অনুশীলনী

৩.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়ে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা হলো:

- সংবাদ প্রবাহ এবং সম্পাদনা
- দ্বার রক্ষা

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

এই বিষয়টি পড়লে বোঝা যাবে সংবাদপ্রবাহ ও সম্পাদনা এবং দ্বাররক্ষীদের ভূমিকা।

৩.৪.৩ সংবাদ প্রবাহ এবং সম্পাদনা

যে কোনও সংবাদ প্রতিষ্ঠানে দিবারাত্রি খবর আসতে থাকে। খবর আসার কোনও বিরাম নেই। সংবাদ প্রবাহ চলতেই থাকে। সংবাদপত্রে রাজধানী থেকে খবর পাঠাচ্ছেন বিশেষ সংবাদদাতারা, দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে খবর সরবরাহ করছেন সংবাদদাতারা। এছাড়া আছে সংবাদ-সংস্থার পাঠানো সংবাদ। দিবারাত্রি সংবাদ প্রবাহ এলে জমা হচ্ছে নিউজ ডেস্কে। কলকাতার কাগজের খবর আসছে দিল্লি থেকে। জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক খবরের উৎস হল দিল্লি। অভিজ্ঞ বিশেষ সংবাদদাতারা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক খবর পাঠাচ্ছেন, ভারতের বিভিন্ন বড় শহর যেমন মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, পাটনা, গৌহাটি, ভুপাল, চণ্ডীগড়, জয়পুর থেকে সংবাদদাতারা খবর সরবরাহ করছেন। ২৪ ঘণ্টা চলছে সংবাদ প্রবাহ।

নাম করা সংবাদ-সংস্থা এপি, রয়টারস্‌, এএফপি, কিয়ডো, জিনহুয়া পাঠাচ্ছে খবরের আপ-ডেট, বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে যাই ঘটুক না কেন, এই সব আন্তর্জাতিক সংবাদ-সংস্থা তার ওপর বিস্তৃত কভারেজ পাঠায়। এছাড়া

আমাদের দেশের পিটিআই, ইউএনআই প্রচুর খবর পাঠায়। সংবাদ সংস্থা শুধু সংবাদ পাঠায় না, ছবিও পাঠায়। শুধু স্থির চিত্র নয়, প্রচুর ভিডিও ক্লিপিংসও সরবরাহ করে। প্রতিদিন কাগজে এইসব ছবি আমরা দেখি। ক্রেডিট লাইনে দেওয়া থাকে সংবাদ-সংস্থার নাম, এপি, রয়টারস অথবা পিটি আই।

সংবাদ প্রবাহের এই বিপুল সম্ভার কিন্তু সবটাই ছাপা হয় না। সম্পাদক পর্যায়ে অনেক কিছু বাদ পড়ে যায়। সংবাদপ্রবাহের বিপুল জলচ্ছাসে সংবাদ কক্ষের ডেস্ক প্রায় ভেসে যায়। সবকিছু ভাসিয়ে দেওয়াটাতে কোনও কাজের কথা নয়। তাই জলচ্ছাসকে প্রতিহত করার জন্য বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় দ্বাররক্ষীরা, যাঁরা আধিক্যকে বর্জন করে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অংশকে ডেস্কে ধরে রাখেন। বাদবাকী অংশ যা জঞ্জাল বলে প্রতিপন্ন হয় তা চলে যায় ওয়েস্ট বক্সে।

৩.৪.৪ দ্বার রক্ষা (Gatekeeping)

গণমাধ্যম চর্চায় দ্বার রক্ষা (gatekeeping) হল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশনের বিষয় নির্বাচনের দায়িত্বে যারা থাকেন তারাই হলেন দ্বার রক্ষক বা gatekeeper, কী ছাপা হবে বা কী সম্প্রচারিত হবে সেটা তারাই ঠিক করেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় সংবাদপত্রে প্রচুর সংবাদ এসে পৌঁছয়। এর সবটুকু কিন্তু ছাপা হয় না, সামান্য অংশ ছাপা হবার জন্য ছাড়পত্র পায়। কী ছাপা হবে সেটা ঠিক করেন দ্বার রক্ষীরা। সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, মুখ্য অবর সম্পাদক সকলেই দ্বার রক্ষার কার্যে নিযুক্ত থাকেন, সম্পাদক সরাসরি সবসময় যুক্ত থাকতে পারেন না। বার্তা সম্পাদক অথবা মুখ্য অবর সম্পাদককেই এই দায়িত্ব সামলাতে হয়। বেতার এবং টেলিভিশনেও বার্তা সম্পাদক বা ইনপুট এডিটরকে এই দায়িত্ব সম্পাদন করতে হয়।

দ্বার রক্ষার ধারণাটির উদ্ভব হয় কুর্ট লেউইনের (Kurt Lewin) গবেষণায়। লেউইন ছিলেন একজন বড় সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ। ১৯৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়াওয়া শহরের গৃহকর্ত্রীদের বাজার থেকে খাদ্যসামগ্রী কেনার বিষয়টি নিয়ে তিনি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। গিন্নিরা বাজারে যান পরিবারের সকল সদস্যদের চাহিদা মাথায় রেখে। কেনার সময় দেখেন কী কিনলে পরিবারের সদস্যদের পছন্দ হবে, স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারি হবে ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রচুর তথ্য। এগুলি বিশ্লেষণ করে একটি পর্যায়ে ঠিক হয় কী কেনা হবে এবং কী কেনা হবে না। তাহলে যেটা ঘটছে তা হল কিছু বিষয়কে যেমন নেওয়া হচ্ছে, তেমনি কিছু বাদ যাচ্ছে। বাড়িতে যদি সুগারের রোগী তাকে তাহলে বাদ যাচ্ছে সেই সমস্ত দ্রব্য যাতে কার্বোহাইড্রেট আছে। বেছে নেওয়া হচ্ছে সেই সমস্ত দ্রব্য যার সঙ্গে সুগারের কোন যোগ নেই। এই বাছাবাছির প্রক্রিয়াকেই লেউইন 'দ্বারঅঞ্চল' বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে এই গবেষণা গণমাধ্যম চর্চার প্রভাব ফেলেছিল।

১৯৫০ সালে ডেভিড ম্যানিং হোয়াইট (David Manning White) গণমাধ্যমে এই দ্বাররক্ষার কার্য কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তা বিশ্লেষণ করেন। হোয়াইট ছিলেন বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার অধ্যাপক। তিনি আঞ্চলিক কাগজের সম্পাদকদের সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা চালান। তিনি দেখেন সম্পাদকের টেবিলে বিপুল সংবাদ প্রবাহ এসে জমা হচ্ছে। এর অধিকাংশই আসছে সংবাদ-সংস্থার কাছ থেকে। সম্পাদক কিছু সংবাদকে নির্বাচন করছেন ছাপার জন্য। বাদবাকী অংশ ফেলে দিচ্ছেন। হোয়াইট সমীক্ষায় শুধুমাত্র সংবাদ-সংস্থার পাঠানো সংবাদের কথা বিবেচনা করা হয়েছিল, হোয়াইট দেখেন সম্পাদকেরা সেই সমস্ত সংবাদকেই ছাপার জন্য বেছে নিচ্ছেন যেগুলি কাগজের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কাগজের পাঠকের চাহিদা ও কাগজের সম্পাদকদের পছন্দকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয় এই প্রয়োজন। এটা তৈরি হয় কাগজের পাঠকের চাহিদা ও কাগজের সম্পাদকের পছন্দকে

কেন্দ্র করে। হোয়াইট তাঁর সমীক্ষার ফলকে বিশ্লেষণ করে দেখলেন সম্পাদকের মাপকাঠিতে মানবিক আগ্রহমূলক সংবাদই বেশি নির্বাচিত হয়েছে। হোয়াইট সম্পাদকদের "মিস্টার গেট" বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে সম্পাদকেরা হলেন সংবাদ মাধ্যমের দ্বাররক্ষী। কোন সংবাদ ছাপা হবে আর কোন সংবাদ ছাপা হবে না এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় সম্পাদকেরা। হোয়াইটকে সম্পাদকেরা জানিয়েছিলেন "We go for human interest stories in a big way". হোয়াইট স্বীকার করেছেন তাঁর এই গবেষণায় লেউইনের সমীক্ষা প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল।

১৯৬৭ সালে আর একজন গবেষক সুইডার (Suider) সম্পাদকদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা চালিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন সংবাদপত্রের নীতি পাঠকদের রুচি পছন্দ অনুযায়ী প্রভাবিত হচ্ছে। পাঠকরা কী চাইছেন তা সবসময়ই বিবেচনা রাখতে হবে।

শুমেকার ও রিজ (Shoemaker and Reese) বলেছেন দ্বাররক্ষার কার্য কতকগুলি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত। তাঁদের মত হল পাঠকদের চাহিদা ও নির্বাচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে গড়ে ওঠা সহমতই দ্বাররক্ষার কাজকে পরিচালনা করে। সহমত তৈরি হয় এক বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সমাজ-সংস্কৃতিও দ্বাররক্ষা কার্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যাঁরা দ্বাররক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকবেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হয় এই সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষায়।

হোয়াইট যে ব্যক্তি-পছন্দের কথা বলেছেন, সম্পাদনা যার সূত্র ধরে সংবাদ বাছাই করতেন, তার যোগ পাওয়া যায় এই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ভিত্তিক দ্বাররক্ষার সঙ্গে। এক বিশেষ সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে পাঠকের চাহিদাও তৈরি হয়, এবং তার প্রভাব সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর পড়ে। ব্রিটেন অথবা আমেরিকার পাঠক চাহিদার সঙ্গে আমাদের দেশের পাঠক চাহিদার পার্থক্য আছে। কারণ দু ধরনের সমাজ-সংস্কৃতি আলাদা। খুব স্বাভাবিকভাবেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও তারতম্য থাকে। আমেরিকার বা ব্রিটেনের কাগজ যেভাবে সংবাদ নির্বাচন করবেন, ভারতের কাগজের নির্বাচকদের কার্যধারা যে একটু আলাদা হবে এটাই স্বাভাবিক।

৩.৪.৫ সারাংশ

এই পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে সংবাদ-প্রবাহ এবং এ বিষয়ে দ্বাররক্ষীদের ভূমিকা।

প্রচুর সংবাদ আসে সংবাদপত্রের নিউজ ডেস্কে। সংবাদ প্রবাহ চলতেই থাকে। এই বিরামবিহীন সংবাদপ্রবাহ সবটুকুই ছাপা হয় না। সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে থাকে কিছু দ্বাররক্ষী যারা কোনটি ছাপা হবে তার ছারপত্র দেয়। এই দ্বাররক্ষীরা হলেন সম্পাদক, বার্তাসম্পাদক ও প্রধান অবর সম্পাদকেরা। দ্বাররক্ষার কার্য সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক রূপরেখা আছে, সেগুলি আলোচিত হয়েছে।

৩.৪.৬ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১। সংবাদপ্রবাহ বলতে কী বোঝেন, সংক্ষেপে লিখুন।

২। সংবাদপত্রে সম্পাদনার দায়িত্বে কারা থাকেন?

বড় প্রশ্ন:

১। সংবাদপত্রে দ্বাররক্ষা বলতে কী বোঝেন? ব্যাখ্যা করুন।

২। দ্বাররক্ষার ধারণার উদ্ভব আলোচনা করুন।

৩। সংবাদপত্রে দ্বাররক্ষকদের ভূমিকা বিশদে আলোচনা করুন।

৩.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। *সমাচার সম্পাদনা* : সৌরীন ব্যানার্জী—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

২। *সংবাদ প্রতিবেদন* : ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—লিপিকা

৩। *সংবাদবিদ্যা* : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৪। *News Editing and Practices* : Dr. Sourin Banerjee

৫। *আধুনিক গণমাধ্যম* : ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

মডিউল ৪ : সম্পাদনা প্রক্রিয়া

একক ১ ❑ সংবাদ নির্বাচন : সংবাদ মান এবং অন্যান্য পরিমিতি

৪.১.০ গঠন

৪.১.১ উদ্দেশ্য

৪.১.২ প্রস্তাবনা

৪.১.৩ সংবাদ নির্বাচন: সংবাদ মান এবং অন্যান্য পরিমিতি

৪.১.৪ সারাংশ

৪.১.৫ অনুশীলনী

৪.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১.১ উদ্দেশ্য

এই একককটি পাঠ করলে যে বিষয়ে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা হলো:

- সংবাদ নির্বাচন: সংবাদ মান
- অন্যান্য পরিমিতি

৪.১.২ প্রস্তাবনা

গণমাধ্যম পরিবেশনার জন্য প্রচুর সংবাদ নানা প্রান্ত থেকে এসে নিউজডেস্ক এ পৌঁছায়। এত সংবাদকে কোনও অবস্থাতেই পুরোপুরি জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রশ্ন ওঠে নির্বাচনের। অভিজ্ঞ সাংবাদিকরা ঠিক করেন কোন কোন সংবাদ জায়গা করে নেবে পরিবেশনের জন্য। খবরের কাগজ বেতার-টেলিভিশনে প্রতিটি মাধ্যমেই সংবাদ নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় দ্বার রক্ষা। আর যারা নির্বাচন করেন তারা দ্বাররক্ষী।

৪.১.৩ সংবাদ নির্বাচন: সংবাদ মান এবং অন্যান্য পরিমিতি

কুট লিউইনের গবেষণার মধ্যে নিহিত আছে দ্বার রক্ষার ধারণাটি। লিউইন ছিলেন একজন সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ। ১৯৪৭ সালের আয়াওয়া শহরের গৃহকর্ত্রীদের খাদ্য সামগ্রী কেনার বিষয় নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। বাজারে পরিবারের গিন্নি গেছেন জিনিস কিনতে। কি কিনবেন তিনি? লেউইনের পর্যবেক্ষণ বলছে তিনি একটি নির্দিষ্ট নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবেন। খাদ্য সামগ্রী কেনার সময় গিন্নি বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখেন। ভেবে দেখেন কি কিনলে পরিবারের সদস্যদের পছন্দ হবে, স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হবে ইত্যাদি। বিভিন্ন তথ্য যুক্ত থাকে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে। তথ্য বিশ্লেষণ করে ঠিক হয় কি কেনা হবে আর কি কেনা হবে না। যে পর্যায়ে এই নির্বাচনের

কাজটি হয় লেউইন তাকে দ্বার অঞ্চল বলে বর্ণনা করেছেন। লেউইনের এই গবেষণা পরবর্তীকালে গণমাধ্যম চর্চাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে।

১৯৫০ সালে ডেভিড মেনিং হোয়াইট (David Manning White) গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান কিভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা আলোচিত হয়। সাংবাদিকতার অধ্যাপক হোয়াইট আঞ্চলিক কাগজের সম্পাদকের সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা চালান। তিনি দেখেন সম্পাদকের টেবিলে বিশাল সংবাদ প্রবাহ এসে জমা হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ আসছে, নিছক সংবাদদাতা, সরকারি প্রেস রিলিজ, সংবাদ সংস্থার পাঠানো কপি। সিটি এডিটররা এই বিপুল সংবাদ প্রবাহ থেকে অল্প কিছু বেছে নিচ্ছেন। আর বেশিরভাগটাই ফেলে দিচ্ছেন। হোয়াইট চেনা কিছু আঞ্চলিক কাগজের সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখলেন সম্পাদকরা সেই সমস্ত সংবাদই বেছে নিচ্ছেন যেগুলি কাগজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পাঠকের চাহিদা ও সম্পাদকের পছন্দকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয় এই প্রয়োজন। তিনি দেখলেন সম্পাদকের বিচারে মানবিক আগ্রহমূলক সংবাদই বেশি। হোয়াইট সম্পাদকদের "মিস্টার গেট" বলে অভিহিত করেছিলেন। সম্পাদকরা তাকে এক বাক্যে জানিয়েছিলেন "We, go for human interest stories in a big way." হোয়াইট জানিয়েছেন তার এই গবেষণায় লিউইনের গবেষণা সাহায্য করেছিল।

সুইডার (Suider) নামের এক গবেষক ১৯৬৭ সালে একই বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন বিষয়টি আগের মতই আছে অর্থাৎ সম্পাদকরা পাঠকদের রুচি পছন্দ ও কাগজের নীতির দ্বারাই প্রভাবিত হচ্ছেন। এর পরে গবেষকরা সংবাদ নির্বাচনে শুধুমাত্র সম্পাদকের ভূমিকার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেননি। স্যাম্পলিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্বার রক্ষার কাজে আরো বহু ব্যক্তিকে যুক্ত করেছেন। যেমন নির্বাহী সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, বিভাগীয় সম্পাদক প্রভৃতি নির্বাচকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়া হল এক দলীয় কার্যক্রম।

Shoemaker এবং Reise বলেছেন দ্বার রক্ষার কাজ কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাদের বক্তব্য হলো পাঠকদের চাহিদা ও বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গড়ে ওঠা সহমত দ্বার রক্ষার কাজকে পরিচালিত করে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। নির্বাচকরা যে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে করে ওঠেন তার প্রভাব তাদের সিদ্ধান্তের ওপর পড়ে।

Shoemaker এবং Reise দ্বার রক্ষার তত্ত্বে মূল্যবোধকে যুক্ত করেছেন। পাঠকদের চাহিদা, পছন্দের সঙ্গেও মূল্যবোধের যোগ রয়েছে। যে সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে পাঠকরা গড়ে ওঠেন তার প্রভাব তাদের চাহিদার ওপরেও পড়ে। নির্বাচকরা সবসময়ই চাইবেন পাঠকদের চাহিদামাফিক চলতে। অর্থাৎ পাঠকদের রুচি, পছন্দ, মূল্যবোধকে বিবেচনা করে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ভারতের পাঠকদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠকের চাহিদা অবশ্যই আলাদা হবে।

Galtung এবং Ruge দ্বার রক্ষা নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে দেখেছেন সাংগঠনিক ও আবেগগত বিষয়ক সংবাদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। নরওয়ের সংবাদপত্রে বিদেশি সংবাদ কিভাবে নির্বাচিত হয় তা অনুসন্ধান করার সময় এই দুই গবেষক লক্ষ্য করেন নির্বাচকরা সংবাদমূল্য দিয়েই সংবাদ বাছছেন।

যে সংবাদমূল্য নির্বাচকদের নিজস্ব পছন্দের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সেই সংবাদকে তারা গ্রহণ করেন। সাংগঠনিক নীতি ও আদর্শগত অবস্থান নির্বাচকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসেবে তারা পশ্চিমী কাগজে, পশ্চিমী মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন।

Fishman বলেছেন সংবাদ এর মধ্যে যে বাস্তবতা রয়েছে তা নির্বাচকদের বাস্তব আন্তরিকতার সঙ্গে কতটা খাপ খাচ্ছে সেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদমাধ্যমের কাছে যে সংবাদ আসছে, নির্বাচকদের ওপরে কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। Fishman এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নির্বাচকদের চাহিদা, অপছন্দ সংবাদ নির্বাচনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রয়োজন হলে সংবাদমাধ্যম উদ্যোগ নিয়ে সংবাদ তৈরি করতেও এগিয়ে আসে (at times it also has to be internally manufactured or constructed)।

সংবাদ নির্বাচনের সময় যে বিষয়গুলি সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, সেগুলি হল মানুষ (people), স্থান (place) এবং সময় (time)।

সংবাদ মান এবং অন্যান্য পরিমিতি

খবরের মূল্য, সাংবাদিকদের, সম্পাদক, সংবাদকর্মীদের বিচারবোধ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। যে সংবাদগুলি অন্যান্য, প্রধান অ্যাঙ্কর স্টোরি, ব্লার্বস এবং স্নিপেটগুলির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোন সংবাদ চালানো উচিত সেগুলি সিদ্ধান্ত সম্পাদকীয় ডেস্ককে নিয়মিত গ্রহণ করতে হয়। যদিও এই উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সরল কোনও 'নিয়ম-পুস্তক' না থাকলেও এটি ডেস্কের রাজনৈতিক অবস্থান বা আদর্শ বা কাগজের অগ্রাধিকার এবং দৈনিক এজেন্ডা-সেটিং অনুযায়ী পারস্পরি বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে কাজ করে।

নিউজ তৈরির মূল দিকগুলি—

বিভাগগুলি এবং ডেস্কগুলির আমলাতান্ত্রিক আদেশ যা সংবাদকে শ্রেণিবদ্ধ করে।

সংবাদ-মানের একটি সেট যা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ টুকরো থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি ফিল্টার করে।

অর্থবহ সংবাদ—সংজ্ঞাবদ্ধ করা এবং প্রতিবেদকের শব্দভাণ্ডারের কাঠামোর মধ্যে সংজ্ঞায়িত ইভেন্টগুলি আনা।

অন্যান্য পরিমিতি

সংবাদ সূচনা : সরল কথায়, সংবাদ বা তথ্যগুলির একটি নতুন অংশকে বর্তমান পাঠকদের পছন্দ অনুযায়ী নির্মাণ করার চেষ্টা করা।

আপেক্ষিক গুরুত্ব : কাগজে একটি নিউজ আইটেমের স্থান বরাদ্দ আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী ঠিক হয়। জনপ্রিয় নৈতিকতা এবং সংস্কৃতি কোনও সংবাদ আইটেমের নির্বাচন প্রক্রিয়াতে আধিপত্য বিস্তার করে।

সংবাদ প্যাটার্নস : সংবাদমাধ্যমগুলি প্রায়শই যে সংবাদ পেতে চায় তা জনসাধারণকে দেওয়ার চেষ্টা করে। বেশিরভাগ মাধ্যম একটি প্রাক-সেট সূত্র অনুসরণ করে। কখনও কখনও পৃষ্ঠার বিন্যাসে বরাদ্দ করা জায়গার ফিট করার জন্য শব্দ গণনা করা হয়।

মানহানি : প্রেস এবং রেডিওতে মানহানি আইন কার্যকরী। অপমানিত ব্যক্তি কাগজের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। সম্পাদকীয় ডেস্ককে কাগজটিকে কোনও সম্ভাব্য মানহানিকর মামলা থেকে রক্ষা করতে হবে।

৪.১.৪ সারাংশ

এই পর্যায়ে যে বিষয় যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—সংবাদ নির্বাচন।

৪.১.৫ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন:

১। সংবাদ নির্বাচনের প্রাথমিক দিকগুলি কী কী?

২। সংবাদ নির্বাচনের পদ্ধতি ও গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৪.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

Editing Manual—Sourin Banerjee

Handbook of Journalism & Mass Communication—Virbala Agarwal & V S Gupta (Concept) 3.

Mass Communication in India—Keval J Kumar (Jaico)

Mass Communication & Journalism in India—D. S. Mehta (Allied Publishers)

আধুনিক গণমাধ্যম—ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

একক ২ ❑ সংবাদ কপি সম্পাদনা, সংবাদ রচনা (পরিকল্পনা এবং দৃশ্যায়ন)

৪.২.০ গঠন

৪.২.১ উদ্দেশ্য

৪.২.২ প্রস্তাবনা

৪.২.৩ সংবাদ কপি সম্পাদনা পদ্ধতি

৪.২.৪ সংবাদ রচনা (পরিকল্পনা এবং দৃশ্যায়ন)

৪.২.৫ সারাংশ

৪.২.৬ অনুশীলনী

৪.২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪.২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়ে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা হলো:

- সংবাদ কপি সম্পাদনা
- সংবাদ রচনা (পরিকল্পনা এবং দৃশ্যায়ন)

৪.২.২ প্রস্তাবনা

যে কোনও রচনাকে প্রকাশযোগ্য করে তুলতে সম্পাদনার প্রয়োজন। সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে যে লেখা আমরা পড়ি তার প্রত্যেকটি সম্পাদনার ছোঁয়া রয়েছে। সহজ সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করে পরিবেশন করাটাই সম্পাদনার প্রয়োজন।

৪.২.৩ সংবাদ কপি সম্পাদনা পদ্ধতি

সংবাদ কপি সম্পাদনার কাজ সামাল দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিপুল সংবাদ প্রবাহ এসে জমানো হয় সংবাদ কক্ষে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংবাদ আসতে থাকে। সংবাদদাতাদের পাঠানো কপি, সংবাদ-সংস্থার কপি, সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের থেকে আসা প্রেস বিজ্ঞপ্তি এসে হাজির হয় নিউজ ডেস্কে। এই বিপুল সংবাদ প্রবাহকে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সংবাদ মাধ্যমের পরিসর সীমিত। এ যেন 'ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট এ তরী' অবস্থা। তাই নির্বাচন করতে হয়, বার্তা সম্পাদক ও অন্যান্য সহকারিদের সাহায্য নিয়ে কী ছাপা হবে অথবা কী পরিবেশিত হবে তা ঠিক করেন।

দক্ষ হাতে এই সম্পাদনার কাজ করতে হয়। কপির কাজ সামলানো খুব সহজ কাজ নয়। প্রাথমিক কাজই হল বিপুল কপির মধ্য থেকে উপযুক্ত কপিকে বাছা। বার্তা সম্পাদক, মুখ্য অবর সম্পাদক তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে

বুঝে নেন কোন কপি ছাপার উপযুক্ত। তার কাগজের পাঠকরা কী চাইছে সেটা বার্তা সম্পাদক জানেন। এই অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি ঠিক করেন কোন কবিগুলি ছাপা হবে। তারপর সেই কপিগুলির সম্পাদনার ব্যবস্থা করেন। মুখ্য অবর সম্পাদককে দায়িত্ব দেন কপিগুলিকে অবর সম্পাদকদের মধ্যে বিতরণ করতে সম্পাদনার জন্য।

লেসলি সেলার্স (Leslie Sellers) কপি সম্পাদনার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা বলেছেন। সেলার্স দীর্ঘদিন লন্ডন টাইমস্-এর সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি বলেছেন 'a sub editor must be obsessed with accuracy', যে কোনো ধরনের ভুল ধরার জন্য তিনি সবসময়ই সতর্ক থাকেন। প্রতিবেদন রচনার সময় তাড়া থাকে, ডেডলাইনের মধ্যে খবর পাঠাতে হবে। এ অবস্থার ভুল হবার সম্ভাবনা বেশি। অবর সম্পাদক মাউস ক্লিক করে ভুলগুলি সংশোধন করেন।

সম্পাদনার আর একটি দিক হল অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে কপিকে উন্নত করা। এরকম হতে পারে একই কথা বার বার ফিরে আসছে। তখন বাহুল্য অংশ বাদ দিতে হবে। ভেবেচিন্তে কাজটি করবেন অবর সম্পাদক।

সম্পাদনার সময় খেয়াল রাখতে হবে কপি যেন সহজবোধ্য ও বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে ওঠে। কপিকে পাঠযোগ্য করে তুলতে হবে। খুব সাধারণ শিক্ষা ও বোধবুদ্ধি নিয়ে মানুষ কাগজ পড়ে। শব্দ ব্যবহার এবং বাক্যবিন্যাসকে করতে হবে যথাসম্ভব সহজ সরল। একবার চোখ বোলালেই পাঠক বুঝে যাবেন সংবাদের বিষয়বস্তু এবং তর তর করে পড়ে যাবেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাগজ পড়া শেষ হয়। সাধারণত পাঠক ৪৫ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে কাগজ পড়া শেষ করেন। এটা সম্ভব হয় দক্ষ সম্পাদনার গুণে।

প্রেস আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সম্পাদনার সময় এ বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। মানহানি, আদালত অবমাননা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে-কোনো সময় মামলা হতে পারে। সাম্প্রতিককালে Fake News একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য সরকার বা বিচারব্যবস্থা কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। তাই সংবাদ যাচাই করার বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাই সম্পাদনার সময় আইনগত দিকগুলি বিবেচনা করা দরকার।

সম্পাদনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সংবাদের মূল্যায়ন। যিনি সম্পাদনা করছেন তাঁকে অবশ্যই সংবাদের মূল্যায়ন করতে হবে। এটা করতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে পাঠকের চাহিদা, রুচি পছন্দ। খবর বাছার ক্ষেত্রে এই তথ্য তাকে সাহায্য করবে। Charnley বলেছেন, "The newsman must first decide which events and information are of primary importance to a large proportion of the people that his medium reaches", মূল্যায়নের মূল কথাটাই এখানে ধরা আছে। দেশ, কাল, সামাজিক অবস্থান এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

মূল্যায়নের বিষয়টি আবার সকল সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে একরকম হয় না। সিরিয়াস সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যেরকম হবে মূল্যায়নের মাপকাঠি, পপুলার ট্যাবলয়েড সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে তা হবে অন্যরকম। প্রত্যেকটি কাগজের সম্পাদকেরা জানেন কারা তাদের কাগজের পাঠক। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তারা মূল্যায়নের কাজ সারেন।

মূল্যায়নের কাজে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে সংবাদের উপাদানগুলি, যেমন নৈকট্য, নতুনত্ব, সময়োপযোগিতা এবং গুরুত্ব। সম্পাদকরা এইসব উপাদানের কথা মাথায় রেখেই সম্পাদনার কাজ করেন।

দৃষ্টিকোণ : সংবাদ সম্পাদনার সঙ্গে দৃষ্টিকোণেরও যোগ রয়েছে। এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। মূল্যবোধ, নীতিবোধ তৈরি করে এই দৃষ্টিকোণ। ইংরেজিতে একে বলা হচ্ছে 'Framing', একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাই হল 'Framing', যা ঘটেছে তা দেখার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিকোণ গুরুত্বপূর্ণ।

যা ঘটেছে তার হুবহু ছবি আমরা কখনই পাই না। কারণ প্রতিবেদক যা লিখেছেন তা সম্পাদিত হবার পর ছাপা হয়েছে। সম্পাদনার সময় সংযোজিত হয়েছে দৃষ্টিকোণ। সংবাদপত্রের নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে এই দৃষ্টিকোণের। এই দৃষ্টিকোণ ঠিক করে দিচ্ছে আমরা কী পড়ব।

সাংবাদিকের নিজস্ববোধ, পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং সংবাদ প্রতিষ্ঠানের নীতি তৈরি করে দৃষ্টিকোণ বা frame, আমরা এই দৃষ্টিকোণের মধ্য দিয়ে সংবাদ পাই।

এই দৃষ্টিকোণের বিষয়টি শুধুমাত্র সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় গণমাধ্যম টেলিভিশন এবং সাম্প্রতিক অনলাইন মাধ্যমের ক্ষেত্রেও প্রসারিত। বর্তমানে দৃষ্টিকোণের গুরুত্ব সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধুমাত্র বস্তুনিষ্ঠার নীতি মেনে সংবাদ পরিবেশনের দিন শেষ। আগে সংবাদ জানার জন্য আমরা নির্ভর করতাম সংবাদপত্রের ওপরে। এখন বেতার, টেলিভিশন, অনলাইন নিউজ পোর্টাল রাতদিন সংবাদের আপডেট দিচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটিয়ে দিয়েছে তথ্য বিস্ফোরণ। জানার চেয়ে জানার বোঝা বহন করাই কঠিন কাজ হয়ে উঠেছে।

এ অবস্থায় সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের অন্যতম দায়িত্ব হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষকে যে-কোনও বিষয় ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করা। তাই সংবাদ পরিবেশনে দৃষ্টিকোণের প্রাসঙ্গিকতা বেশি উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

৪.২.৪ সংবাদ রচনা (পরিকল্পনা এবং দৃশ্যায়ন)

সম্পাদনা পর্যায়ে সংবাদ রচনা মুদ্রণ উপযোগী হয়ে ওঠে। কতটা জায়গা নিয়ে রচনাটি ছাপা হবে তা ঠিক হয়ে যায়। প্রস্থে পাঁচ কলাম জায়গা পেতে পারে, দু কলাম, আবার এক কলামও হতে পারে। সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী জায়গা ঠিক হয়। লম্বায় পনেরো, কুড়ি সেন্টিমিটার হতে পারে। সাধারণত এরকমই হয়ে থাকে। অনেক সময় এক কলামে লম্বালম্বি তিন চারটি সংবাদ পরিবেশন করা হয়, একে বলে চিমনি কলাম।

কোন সংবাদ কোন পাতায় জায়গা পাবে সেটাও ঠিক হয় সম্পাদনার সময়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসে প্রথম পাতায়। সাধারণত পাঁচ-ছটি খবর থাকে প্রথম পাতায়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হবে প্রথম লীড, তারপর ক্রমান্বয়ে আসবে দ্বিতীয়, তৃতীয় লীড। একটি খবর হবে অ্যাঙ্কর স্টোরি, একেবারে নীচে থাকবে তিন, চার কলাম জায়গা নিয়ে। একেবারে বাঁদিকে অথবা ডানদিকে এক কলামে ছোট ছোট কয়েকটি সংবাদ থাকবে। একে বলে চিমনি কলাম।

সংবাদ কতটা জায়গা পাচ্ছে সেটা ঠিক করার সময় শিরোনামকেও ধরা হয়। শিরোনাম সিঙ্গল ডেক হতে পারে আবার ডাবল ডেক অথবা মাল্টি ডেকও হতে পারে।

প্রথম পৃষ্ঠা থেকে ভিতরের সব পৃষ্ঠাগুলিকে সাজাতে হয়, এটি হল সম্পাদনার অঙ্গ। কখনও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বক্স-এর মধ্যে রাখা হয়। এতে জ্ঞাপন ও পৃষ্ঠাসজ্জার সৌন্দর্য দুটিই সাধিত হয়। দৃশ্যায়ন ব্যাপারটি পৃষ্ঠাসজ্জার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি পৃষ্ঠায় দুটি বক্স রাখলে অক্ষরের ধূসরতা কমে। পাঠকের চোখ বিশ্রাম পায়। পৃষ্ঠাসজ্জাও আকর্ষণীয় হয়। সম্পাদনা পর্বে পরিকল্পনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। দৃশ্যায়নের ব্যাপারটি পরিকল্পনার অঙ্গ হয়ে ওঠে। কীভাবে নিউজ স্টোরিগুলিকে সাজালে জ্ঞাপন এবং সৌন্দর্যায়নকে মেলানো যায় তার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়।

সম্পাদনার সময় সংবাদ রচনা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা সেটা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। সংবাদ রচনা সাধারণ রচনার থেকে একটু আলাদা। সাধারণ রচনায় সাসপেন্সকে ধরে রাখা হয়। বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে মূল বক্তব্যের দিকে অগ্রসর হন লেখক। চূড়ান্ত পরিণতি থাকে একেবারে শেষে। পুরোটা না পড়লে বোঝা যায় না আসল বক্তব্য কী। গল্প রচনায় আসল চমক থাকে একেবারে শেষে। তা জানার জন্য পাঠককে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতেই হবে। ‘বিনোদিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই’। এটা বুঝতে শেষ লাইনে আসতেই হবে।

সংবাদ রচনায় ঠিক এর উল্টো রীতি মেনে চলা হয়। সংবাদে মূল বক্তব্য থাকে একেবারে প্রথমে। একেবারে গোড়াতেই তা বলে দেওয়া হয়। সাধারণ রচনা হল পিরামিডের মতো। ওপর দিকটা সরু, তলার দিকটা চওড়া। যত নীচে নামবে পাঠক ততো বেশি জানবে। কিন্তু সংবাদ রচনার গঠন উল্টো পিরামিডের মতো। ওপর দিকটা চওড়া, তলার দিকটা সরু। মূল বক্তব্য থাকে একেবারে প্রথমে। যত নিচের দিকে যাওয়া যায় তত কম গুরুত্বপূর্ণ অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। শেষে এমন একটা জায়গা আসে যখন আর কিছুই বলার থাকে না।

সংবাদ শুরুর অংশকে বলে লীড। অল্প কথায় সংবাদের মূল বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হয়। সংবাদ রচনার কৌশল অনুযায়ী একেবারে প্রথমেই বলে দেওয়া হয় আসল কথাটা। কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যু হলে অথবা সরকার পদত্যাগ করলে সূচনাতেই মূল ঘটনাটি জানাতে হয়। লীডটুকু পড়লেই পাঠক জেনে যান কী ঘটেছে। সম্পাদনার সময় খেয়াল রাখতে হয় অল্প কথায় সহজভাবে লীড লিখতে হবে। লীডটুকু পড়েই আন্দাজ পাওয়া যাবে সংবাদের মূল কথাটা কী।

সংবাদ রচনার ভাষা হবে সহজ। এমন শব্দ ও বিন্যাস ব্যবহার করতে হবে যাতে একবার পড়েই অল্প শিক্ষিত মানুষও বুঝতে পারে। ছোট ছোট বাক্যে যথাসম্ভব কর্তৃবাচ্যে লিখতে হবে। ক্রিয়াপদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সংবাদটির তাৎক্ষণিকতা বজায় থাকে। পড়ে মনে হবে যেন একটু আগেই ঘটনাটা ঘটেছে। পাঠকের মনে হবে একেবারে টাটকা খবর পড়ছেন।

সম্পাদনার সময় যখন পৃষ্ঠাসজ্জার পরিকল্পনা হবে তখন সেখানে ছবি এবং শিরোনামের ব্যবহার থাকবে। বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম এবং ছবি পৃষ্ঠাসজ্জাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। যত দিন যাচ্ছে পৃষ্ঠাসজ্জার চিত্রময়তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক সময় এর জন্য পেশাদার শিল্পীদের সাহায্য নেওয়া হয়। আজকাল পৃষ্ঠাসজ্জায় গ্রাফিক্সের ব্যবহারও হচ্ছে। প্রিন্ট গ্রাফিক্স পৃষ্ঠাসজ্জাকে করে তুলছে স্মার্ট ও দৃষ্টিনন্দন।

৪.২.৫ সারাংশ

সম্পাদনা সংবাদকে মুদ্রণযোগ্য করে তোলে। দক্ষ হাতে নিউজ কপির গুণমান উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত হয়। সংবাদ রচনার নির্দিষ্ট আঙ্গিক আছে। এর নাম উল্টো পিরামিড। সংবাদের মূল বিষয়টি একেবারে প্রথমে বলে দিতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হবে।

সঠিকভাবে সংবাদ পরিবেশনের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। সম্পাদনা কার্য নির্ভর করে এই পরিকল্পনার ওপরে। শিরোনাম ও ছবি দিয়ে পাতা সাজাতে হয়। সংবাদ রচনায় লীডের গুরুত্ব আছে। উল্টো পিরামিড সূত্রে লীডের মধ্যেই মূল বক্তব্য পরিবেশিত হয়। সম্পাদনার সময় সবসময়ই পৃষ্ঠাকে দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তোলার চেষ্টা থাকে।

৪.২.৬ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন:

১। উল্টো পিরামিড কী? সংক্ষেপে লিখুন।

২। সংবাদ রচনার ভাষা কেমন হবে?

বড় প্রশ্ন:

১। সংবাদ রচনার সম্পাদনা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২। সম্পাদনায় পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে কী?—ব্যাখ্যা করুন।

৪.২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

Editing Manual — Sourin Banerjee

Handbook of Journalism & Mass Communication — Virbala Agarwal & V.S. Gupta (concept)

Mass Communication in India — Keval. J. Kumar—(Jaico)

Mass Communication & Journalism in India — D.S. Mehta (Allied Publishing)

সংবাদ প্রতিবেদন—ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—(লিপিকা)

একক ৩ ❑ শিরোনাম ও ইন্ট্রো

৪.৩.০ গঠন

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

৪.৩.২ প্রস্তাবনা

৪.৩.৩ উদ্ভব

৪.৩.৪ অক্ষরের মাপ

৪.৩.৫ বিভিন্ন শিরোনাম

৪.৩.৬ সূচনা (Intro)

৪.৩.৭ বিভিন্ন ধরনের সূচনা

৪.৩.৮ প্রুফ রিডিং

৪.৩.৯ সারাংশ

৪.৩.১০ অনুশীলনী

৪.৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়ে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা হলো:

- শিরোনাম
- সূচনা (Intro)

৪.৩.২ প্রস্তাবনা

সংবাদের শীর্ষে থাকে শিরোনাম। সংবাদের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় শিরোনামে। কাগজ হাতে নিয়েই আমরা প্রথমে পড়ি শিরোনাম, কারণ শিরোনামই জানায় কী ঘটেছে গতকাল। একটি পাতায় অনেকগুলি সংবাদ থাকে। প্রতিটি সংবাদের মাথায় থাকে শিরোনাম।

সংবাদের মূল নির্যাসটুকু ধরা থাকে শিরোনামে। পাঠক শিরোনাম পড়েই বিষয়বস্তুর আন্দাজ পান। শিরোনাম নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। লেবেলের মতো শুধুমাত্র ইঙ্গিতবাহী নয়। বর্ষাকালের ওপর রচনার শিরোনাম হতে পারে 'বর্ষাকাল'। এটা কিন্তু একটা লেবেল, বিষয়টা চিনিয়ে দিচ্ছে মাত্র। ওষুধের গায়েও থাকে লেবেল, যা দিয়ে ওষুধটি চেনা যায়। সংবাদপত্রে এমন লেবেল শিরোনাম ব্যবহার করা যায় না। বর্ষাকালের ওপর প্রতিবেদনে শিরোনাম

একটি পরিস্থিতির কথা বলবে, সংবাদের আভাষ থাকবে সেখানে, যেমন 'বর্ষা এল বঙ্গে'। আকারে লেবেলের চেয়ে বড় হবে, এবং একটি বিষয়কে যথাযথভাবে প্রকাশ করবে।

শিরোনাম লেখার জন্য প্রয়োজন সঠিক শব্দচয়ন। সংবাদকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে এমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে। শব্দ নির্বাচনের সময় মনে রাখতে হবে প্রতিবেদনটির জন্য কতটুকু জায়গা বরাদ্দ আছে। শব্দচয়ন এমন হবে যাতে বরাদ্দ জায়গায় এঁটে যায়। একটি অক্ষরও যদি বেশি হয় তাহলে ঐ শব্দ বাদ দিতে হবে, প্রয়োজনে আবার নতুন করে লিখতে হবে।

শিরোনামে ক্রিয়াপদের ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিয়াপদকে কর্তৃবাচ্যে প্রকাশ করাই উপযুক্ত। সংবাদের মূল বিষয়কে দ্রুত পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সংবাদকে টাটকা হিসেবে পরিবেশন করতে ক্রিয়াপদ ভীষণ জরুরী। ঘটনা আগে ঘটে, পরে তা সংবাদ হয়। ছাপা হয় আরও পরে। পাঠক যখন সংবাদপত্র পড়ে, তখন অনেকটা সময় চলে গেছে। পাঠক কিন্তু জানতো না। কাগজ হাতে পেয়ে তিনি জানতে পারলেন। খবরটা তখনও তার কাছে তাজা। এই তাজাভাবটা যাতে বজায় থাকে তার জন্য শিরোনামে বর্তমান কাল ব্যবহার করা হয়, যেমন

"৭১,৫৬০ কর্মীকে ছাঁটাই করছে ইসি এল, বন্ধ হচ্ছে ৬৮টি খনি" (দু কলাম)

"আলু পেঁয়াজের দাম কমাতে ধর্মঘট" (পাঁচ কলাম)

"যাত্রীর অভাবে দুটি বিশেষ ট্রেন বাতিল" (হল)

"করোনায় মৃত্যু এক লক্ষ ছাড়িয়ে গেল"

৪.৩.৩ উদ্ভব

সংবাদপত্রের প্রথম যুগে শিরোনামের ব্যবহার ছিল না। উলম্বভাবে পর পর সাজানো থাকতো কিছু লেখা। লেখার মাথায় থাকতো লেবেল, যা বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দিত। শিরোনাম না থাকার দরুণ একটা লেখা থেকে আরেকটি লেখা আলাদা করা কঠিন হত। শিরোনামের ব্যবহার প্রথম শুরু হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি কাগজ মেক্সিকো যুদ্ধের (১৮৪৬-৪৮) খবর শিরোনাম সহযোগে প্রকাশ করতে শুরু করে। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বড় হরফে শিরোনাম তৈরি করে খবরের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হত। তবে প্রথমদিকে কেবলমাত্র দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্যই এই ব্যবস্থা থাকত। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-৬৫) সময় থেকেই শিরোনামের বহুল প্রচলন দেখা যায়। এরপর আসে স্পেনের যুদ্ধ (এপ্রিল ১৮৯৮ - আগস্ট ১৮৯৮)। যুদ্ধের খবরকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করার তাগিদ থেকে শিরোনাম বিন্যাসে এল আমূল পরিবর্তন। ঠিক এই সময়ই আবার ঘটেছিল চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতার সেই যুগান্তকারী প্রতিযোগিতা। হার্স্টের নিউ ইয়র্ক মর্নিং জার্নাল ও পুলিৎজারের নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড শিরোনামকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছিল। এরপর যতদিন গেছে শিরোনামের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব বেড়েছে।

৪.৩.৪ অক্ষরের মাপ

শিরোনাম লেখার সময় অক্ষরের মাপ সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। অক্ষরকে ইউনিট দিয়ে মাপা হয়। ইংরেজিতে

বড় হাতের ও ছোট হাতের অক্ষর আছে। বাংলায় শুধু বড় হাতের অক্ষর। ব্যঞ্জনবর্ণের কিছু অক্ষর আকারে মোটা হয়। যেমন আকার, ইকার, ঈকার, একার, ওকার ও ঔকার যুক্ত অক্ষরগুলি। ক হচ্ছে এক ইউনিট, কা দেড় ইউনিট, আর কো, কৌ হবে দু-ইউনিট। অক্ষর গোনার সঙ্গে যোগ করতে হয় দুটি শব্দের মধ্যে সাদা জায়গাকে, সাদা জায়গার একক হল এক ইউনিট। বাংলা ক হল এক ইউনিট। ইউনিট কাউন্ট করলেই বোঝা যাবে কোন্ শিরোনামের মাপ কত।

টাইপেরও মাপ আছে। পয়েন্টে দিয়ে টাইপ মাপা হয়। এক পয়েন্ট হল এক ইঞ্চির বাহাত্তর ভাগের এক ভাগ। ওপরে নিচে বাহাত্তরটি বিন্দু বসালে এক ইঞ্চির দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে। পয়েন্ট দিয়ে টাইপের দৈর্ঘ্য মাপা হয়। টাইপের প্রস্থ মাপা হয় এম দিয়ে। একটি ইংরেজি এম অক্ষর ১২ পয়েন্টের।

শিরোনাম তৈরি হয় সংবাদের নির্যাস দিয়ে। সংবাদের লীডের মধ্যেই থাকে এই নির্যাস। লীডটি ভালোভাবে পড়লেই শিরোনামের আইডিয়া পাওয়া যাবে। দেখতে হবে কোন বিষয়টি সংবাদের মূল বিষয়। তারপর ঐ বিষয়টিকে যথাসম্ভব অ্যাকশন সমেত তুলে আনতে হবে শিরোনামে। মনে রাখতে হবে শিরোনাম পড়েই যেন পাঠক মূল সংবাদের হদিশ পান এবং প্রতিবেদনটি পড়ার জন্য আগ্রহ বোধ করেন। বাক্য গঠনে যদি নাটকীয়তা থাকে, মানবিক আবেদনের স্পর্শ থাকে, তাহলে তা অবশ্যই আকর্ষণীয় হবে। একটি পাতায় অনেকগুলি সংবাদ প্রতিবেদন থাকে, প্রতিটি প্রতিবেদনের ওপরে থাকে শিরোনাম। প্রতিটি শিরোনাম চেষ্টা করে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে। এ এক নীরব প্রতিযোগিতা, পাঠক পড়ার সময় এর সামান্য আঁচটুকুও পান না। কিন্তু প্রতিযোগিতা জারি থাকে, নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলে পাঠকের মন জয় করার লক্ষ্যে।

৪.৩.৫ বিভিন্ন শিরোনাম

শিরোনাম বিভিন্ন রকমের হতে পারে। দেখার দৃষ্টিকোণ থেকে শিরোনামের শ্রেণী বিভাজন করা হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একটি পাতায় বিভিন্ন শিরোনাম বিন্যাস দেখা যায়। এই বৈচিত্র্য পৃষ্ঠাসজ্জাকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

ব্যানার শিরোনাম (Banner Headline) হল খুব জনপ্রিয় শিরোনাম। খুব গুরুত্বপূর্ণ অথবা দিনের সেরা খবরের শিরোনাম আট কলাম জুড়ে খুব বড় হরফে করা হয়। একে বলে ব্যানার শিরোনাম। প্রযুক্তির কল্যাণে এই শিরোনাম আজকাল সব কাগজই করছে।

উল্টো পিরামিড হল একটি শিরোনাম। এর আকৃতি উল্টো পিরামিডের মতোন। প্রথম লাইন চওড়া, তার পরের লাইন অপেক্ষাকৃত ছোট, তারপরের লাইন আরও ছোট। দুই, বা তিন লাইন নিয়ে গঠিত হয়। নীচের দিকটা ক্রমশ ছোট হওয়ার ফলে উল্টো পিরামিডের আকৃতি নেয়।

ক্রশ লাইন হল আরেক রকমের শিরোনাম। একটি মাত্র লাইন নিয়ে গঠিত হয়। কলামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বিস্তৃত হয়। সাধারণত তিন, চার অথবা পাঁচ কলাম জায়গা নিয়ে থাকে। বাঁ দিকে এবং ডান দিকে সমান ফাঁক বিশিষ্ট কেন্দ্রিভূত (indented) একটি লাইন তৈরি হয় ক্রস (cross) লাইন। সম্প্রতি এই ক্রসলাইনের ব্যবহার বেড়েছে। প্রথম পাতার অ্যাঙ্করে ক্রস লাইন নিয়মিত দেখা যায়। ভিতরের পাতাতেও ক্রস লাইনের ব্যবহার বেড়েছে। এই শিরোনাম পৃষ্ঠাসজ্জায় তীক্ষ্ণতা বা sharpness নিয়ে আসে। পৃষ্ঠাসজ্জা হয়ে ওঠে স্মার্ট।

পিরামিড আকারেও শিরোনাম তৈরি হয়। এখানে ওপরের লাইন ছোট, আর তলার লাইন একটু বড় হয়। প্রায়শই এই শিরোনাম আমরা দেখতে পাই।

বৈচিত্র্য আনার জন্য অনেক সময় ছোট ও বড় হরফের সমন্বয়ে তৈরি হয় কিকার (Kicker) শিরোনাম। বড় হরফে যে লাইন লেখা হবে ঠিক তার বাঁদিকে ওপরে ছোট হরফের খুব অল্প জায়গা নিয়ে একটি লাইন থাকবে। বড় হরফ যা হবে ছোট হরফ তার অর্ধেক হওয়া উচিত।

কিকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ওভারলাইন (overline) এবং আন্ডারলাইন (underline) শিরোনাম। কিকারের মতোই ছোট ও বড় দুই ধরনের হরফের সমন্বয়ে এই শিরোনাম তৈরি হবে। ছোট হরফ যে মাপের হবে, বড় হরফ তার দ্বিগুণ মাপের হওয়া উচিত। ওভারলাইনের ক্ষেত্রে ছোট হরফ ওপরে থাকবে, আর আন্ডারলাইনের ক্ষেত্রে বড় হরফ ওপরে থাকবে। এদের স্ট্র্যাপলাইন (strapline) বা শোল্ডার (shoulder) বলেও অভিহিত করা হয়।

কিকারের বিপরীত ধরনের শিরোনাম হল হ্যামার (Hammer), আমাদের দেশে এর ব্যবহার খুব কম। তবে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে এই শিরোনাম খুব কার্যকরী। ওপরে থাকবে বড় হরফ আর তলায় থাকবে ছোট হরফ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একটা হাতুরির আকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিরোনামের আর একটি রূপ হল কটি রেখা (waist line)। তিনটি লাইন অবশ্যই এখানে থাকবে। ওপরের আর তৃতীয় লাইনটি সমমাপের হবে। মধ্যিখানের লাইনটি হবে ছোট। কোমরের আকৃতি পাওয়া যাবে।

প্রতিবেদনের মধ্যে অনেক সময় অনু শিরোনাম (Sub-heading) দেখা যায়। লেখার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এই ছোট বা অনু শিরোনাম দেওয়া হয়। পাঠকের বিষয়বস্তু বুঝতে সুবিধা হয়। তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে সাহায্য করে এই শিরোনাম। বডি টাইপের ধূসরতাও ভেঙে দিয়ে পাঠকের চোখকে আরাম দেয়।

কম্পিউটার গ্রাফিক্সের ব্যবহার শিরোনাম রচনায় বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে শিরোনাম তৈরি করাও এখন অনেক সহজ। সবসময়ই যে প্রথাগত নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে এমন নয়। ইচ্ছে হলে উদ্ভাবনের সাহায্যও নেওয়া যায়। শিরোনামের বৈচিত্র্য পৃষ্ঠাসজ্জাকেও আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

৪.৩.৬ সূচনা (Intro)

সংবাদের মূল বিষয়বস্তুকে অল্প কথায় একেবারে শুরুতে লিখতে হয়। শিরোনামের পরেই থাকে সূচনা বা Intro, উল্টো পিরামিডের সূত্রে সংবাদের মূল বক্তব্যকে নিয়ে আসা হয় শুরুতে।

পাঠক জানতে চায়। দ্রুত তাকে জানাতে হবে। কীভাবে তা সম্ভব? উত্তর হল সূচনায় বা Intro-তে দু-এক কথায় মূল ঘটনাটি জানিয়ে দিতে হবে। পাঠক সূচনা পড়েই কী ঘটেছে সে সম্পর্কে জানতে পারবে। পুরো খবর না পড়লেও চলবে। সূচনার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, সূচনা সর্বদাই মূল সংবাদের কথা বলবে। দ্বিতীয়ত, সূচনা অত্যন্ত সংক্ষেপে লেখা হবে। তৃতীয়ত, সূচনায় অল্পকথায় অনেক বেশি বলার প্রচেষ্টা থাকবে। চতুর্থত, পাঁচ ডবলু এবং ওয়ান এইচকে ধরে রাখবে। পঞ্চমত, পুরো সংবাদকে পাঠ করতে উৎসাহী করবে সূচনা। পাঠকের পড়ার খিদে বাড়িয়ে দেবে।

এম ভি চার্ণলি (M.V. Charnley) তাঁর Reporting বইতে একটি কেন্দ্রিয় ভাবনার উল্লেখ করেছেন। সূচনা লেখা হবে এই কেন্দ্রিয় ভাবনার ওপর ভিত্তি করে। তাঁর মতে প্রত্যেক সংবাদেরই একটি কেন্দ্রিয় ভাবনা থাকে, যাকে আশ্রয় করে তৈরি হয় সূচনা।

সংবাদে জানানোর ব্যাপারটাই প্রধান। নতুন তথ্য দিয়ে পাঠককে জানাতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আসতে হবে সূচনায়, যাতে পাঠক সূচনাটুকু পড়েই মূল খবরটুকুর আন্দাজ পায়। সংবাদের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটকে ধরতে হবে ছোট সূচনায়। কাজটি করতে গেলে দক্ষতার প্রয়োজন।

প্রথাগত ফর্মুলা অনুসারে সূচনায় পাঁচ ডবলু এবং ওয়ান এইচকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। বাস্তবে দেখা গেছে এতে তথ্যের আধিক্যে স্বচ্ছতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই অনেক সংবাদপত্র মনে করে এর আর প্রয়োজন নেই। New York Times-এর Managing Editor Turner Catledge বলেছেন "We feel it is no longer necessary and perhaps it never was, to wrap up in one sentence or paragraph, all the traditional Five Ws and One H." Catledge-এর কথায় যুক্তি আছে। ছোট সূচনার মধ্যে এতগুলো কথা বলতে গিয়ে সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে যায়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি একটি, দুটি W এবং এক H নিয়ে আসা যায় সূচনায়। যেমন— নয়াদিল্লি ২২ ফেব্রুয়ারী—লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজাল আজ দিল্লির বিধানসভা ভেঙে দিয়েছেন। এখানে কে, কী, কখন উল্লিখিত হয়েছে।

কে—ফেটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজাল

কী—দিল্লির বিধানসভা

কখন—আজ ২২ ফেব্রুয়ারি

সূচনা শিরোনাম লিখতে সাহায্য করে। শিরোনাম লেখার জন্য পুরো লেখা পড়ার দরকার হয় না। সূচনাটুকু পড়েই জানা যায় সংবাদের বিষয়বস্তু কী। সম্পাদনার সময়ের গুরুত্ব বেশি। অল্প সময়ে শিরোনাম লেখা গেলে কাজের সুবিধা।

৪.৩.৭ বিভিন্ন ধরনের সূচনা

ক্লাইম্যাক্স সূচনা (Climax Intro) : যে কোনও ঘটনারই এক চূড়ান্ত পর্যায় থাকে। যাকে বলে Climax, সূচনার যদি এই climax-কে ধরা হয় তাহলে ঐ সূচনাকে বলা হবে ক্লাইম্যাক্স সূচনা। হার্ড নিউজের ক্ষেত্রে ঐ সূচনা বেশি দেখা যায়। যেমন—

"চিংড়িহাটা থেকে সেক্টর ফাইভ হয়ে নিউটাউন পর্যন্ত নতুন উড়ালপুল বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছে কেএমডিএ।" (এইসময়)

উড়ালপুল নিয়ে এটাই ক্লাইম্যাক্স এবং সেটা নিয়ে আসা হয়েছে সূচনায়।

বর্ণনাত্মক সূচনা (Descriptive Intro) : একটি পরিস্থিতিকে বর্ণনা করে সূচনা। বর্ণনা পড়ে পাঠক সংবাদটির সামগ্রিক রূপটি পায়। একেবারে ছবির মতো উঠে আসে ঘটনা। সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মরণে হুল উৎসবের ওপর একটি সংবাদের সূচনা ছিল এইরকম—

“পাহাড় অরণ্য জেগে উঠল দুন্দুভির দ্রিম্‌দ্রিম্ রবে। সাঁওতাল পল্লী থেকে বেরিয়ে এল তরুণ-তরুণীরা। মুখে তাদের বিপ্লবের গান, পায়ে বিদ্রোহের ছন্দ।” (আনন্দবাজার পত্রিকা)

বুলেট সূচনা (Bullet Intro) : এই সূচনায় সংবাদ বুলেটের মতো এসে বিদ্ধ করে পাঠককে। একটি ছোট বাক্য দিয়ে তৈরি হয় এই সূচনা। বাক্যটি ছোট হবে কিন্তু তার প্রভাব হবে বিশাল। এ যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে ধরার চেষ্টা।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পরে বুলেট সূচনা হয়েছিল। ‘নেহেরু আর নেই’। প্রধানমন্ত্রী মারা গেলে সূচনা হতে পারে—

‘প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত।’ এতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

বিলম্বিত সূচনা (Delayed Intro) : গল্পের রহস্য ধরে রাখার মতো সংবাদ সূচনাতেও মূল বক্তব্য না বলে সামান্য আভাষ দেওয়া হয়। এতে সাসপেন্স তৈরি হয়। পাঠকের আগ্রহ বাড়ে। উদ্দেশ্য পাঠকের পড়ার খিদে তৈরি করা। কয়েক লাইন পড়ার পর পাঠক আসল বক্তব্যের সন্ধান পায়। সূচনা রচনার এই রীতি সাহিত্য রচনার কাছাকাছি, গল্পের মেজাজ পাওয়া যায়।

“লখনউ: ‘শুনছেন, কেউ কি রয়েছেন?’ সাহায্যের আর্জি জানিয়ে চিৎকার করছেন ছেলে। কিন্তু জনপ্রাণী দূরের কথা, জবাবে টুঁ শব্দটিও করেননি কেউ। এদিকে ছটফট করছেন মা। খানিক পড়েই থেমে যায় কাতরানি, গোঙানি।” (এইসময়)

উত্তর প্রদেশের হরদৌই জেলার ঘটনা। অসহায় ছেলের বিলাপ নিয়ে একটি মর্মস্পর্শী প্রতিবেদনের সূচনা এটি। এই ধরনের সূচনা আজকাল সংখ্যায় বেশি দেখা যাচ্ছে। কারণ হার্ড নিউজ-এর সবটাই চলে আসছে টেলিভিশনে। সকালে কাগজ পাবার অনেক আগেই মানুষ বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জেনে যায় টেলিভিশনে। কী ঘটেছে সবাই জানে, জানা বিষয়কে কীভাবে নতুনভাবে জানানো যায় এটাই চ্যালেঞ্জ। আসছে গল্পের আঙ্গিক, সাসপেন্স বজায় রেখে নাটকীয়ভাবে সংবাদ লেখার প্রবণতা। এবাবেই বিলম্বিত সূচনার জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

ছোট ছোট বাক্য দিয়ে তৈরি সূচনা (Staccato Intro) : একের পর এক ছোট বাক্য দিয়ে এই সূচনা তৈরি হয়। বাক্যগুলো এমনভাবে লেখা হয় যাতে একটা ছন্দ থাকে। মূল ভাবনাটি ধরা থাকে এই ছন্দের মধ্যে। বাক্যগুলো তৈরি করে এক কোলাজ। একটি দুর্ঘটনার সূচনা লেখা হচ্ছে এভাবে—

“চোখ ধাঁধানো আলো। গগনবিদারি চিৎকার। ভেঙে পড়া দেয়াল। ভাঙা কাঁচ। রক্ত, মৃত্যু”। টুকরো টুকরো বাক্যগুলি একটি দুর্ঘটনার কথা বলছে বোঝা যাচ্ছে। প্রচণ্ড নাটকীয়তা আছে এই সূচনায়।

কালক্রমানুসারী সূচনা (Chronological Intro) : এই ধরনের সূচনায় পর পর ঘটনাকে উল্লেখ করা হয়। এক একটি বাক্য এক একটি দৃশ্য উন্মোচন করে। পাঠক ক্রমশ ঘটনাসমূহের সামগ্রিক রূপটি দেখতে পায়। যেমন—

“বুধবার রাতে সল্টলেক থানার ডিডি ব্লকে একটি পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি হয়। ৪ ডাকাত পাম্প থেকে ৮০ হাজার টাকা, তিনটি মোবাইল ও একটি সোনার চেন নিয়ে চম্পট দেয়। বিনা রক্তপাতে ২০ মিনিটের মধ্যে

ডাকাতি করে বোমা ফাটিয়ে চলে যায় ডাকাতরা। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।" (আজকাল), লক্ষণীয় এখানে পর পর ঘটনা উল্লেখ করে সূচনা তৈরি করা হয়েছে।

ইনট্রো ও লীডের বিশেষ পার্থক্য নেই। আমেরিকানরা ইনট্রোকে বলে লীড। সংবাদকে দ্রুত মানুষের কাছে সহজভাবে পৌঁছে দিতে ইনট্রো বা সূচনার কোন বিকল্প নেই। হার্ড নিউজের ক্ষেত্রে ক্লাইম্যাক্স সূচনার ব্যবহার হলেও সফ্‌ট নিউজের ক্ষেত্রে কিন্তু বিলম্বিত সূচনাই প্রাধান্য পাচ্ছে।

৪.৩.৮ প্রুফ রিডিং (Proof Reading)

যে কোনও মুদ্রণের আগে প্রুফ দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রুফ মানে যে কোনও বিষয় প্রথম কম্পোজ হবার পর ছাপা হলে তৈরি হয় প্রথম প্রুফ। মূল লেখার মিলিয়ে ঐ প্রুফ সংশোধন করতে হয়। যে কোন মুদ্রণেরই এটি একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যে কোন ছাপার ক্ষেত্রে সেকেন্ড প্রুফ অতি আবশ্যিক। প্রচুর ভুল থাকে, সেগুলি সংশোধন করে দিতে হয়। এই সংশোধন প্রক্রিয়ার কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন কোন কিছু বাদ দিতে হলে d এই চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। অতিরিক্ত কিছু কোথাও সংযোজন করতে হলে h এই চিহ্ন দিতে হয়। কোথাও জায়গা বা space দিতে হলে # এই চিহ্ন দিতে হবে। এরকম বহু চিহ্নের ব্যবহার হয় প্রুফ রিডিং-এ।

সংবাদপত্র প্রকাশনাতেও প্রুফ একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। ম্যাটার কম্পোজ হয়ে গেলে প্রুফে সংশোধন করা হত। তারপর পিটিএস পদ্ধতি আসার পর প্রথম ছাপার কপিকে সংশোধনের ব্যবস্থা ছিল। প্রুফ সংশোধনের পর ম্যাটার ছাপার জন্য তৈরি হয়।

বর্তমানে কম্পোজ হয় কম্পিউটারে। হয় পিসি অথবা ল্যাপটপে। কম্পিউটারের পর্দাতেই যাবতীয় সংশোধন-এর কাজ সম্পন্ন হয়। যারা সম্পাদনা করছেন তারাই প্রুফ দেখার কাজ করে দেন। আলাদাভাবে প্রুফ দেখার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। সংশোধনের জন্য সফ্‌ট্‌ওয়ারও আছে।

৪.৩.৯ সারাংশ

শিরোনাম সংবাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। কাগজ হাতে তুলে নিয়েই পাঠক প্রথমে পড়ে শিরোনাম। প্রথম পৃষ্ঠায় চার-পাঁচটি শিরোনাম। কোনটা বড়, কোনটা ছোট, আবার কোনটা সামারি মাপের। বিভিন্ন সাইজের এবং বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম পৃষ্ঠাসজ্জায় বৈচিত্র্য আনে। লেবেল আর শিরোনামের মধ্যে পার্থক্য আছে। শিরোনাম লেখার জন্য সঠিক শব্দ চয়ন দরকার। কতটা জায়গা নিতে পারে সেটাও জরুরী। ক্রিয়াপদের ব্যবহারও শিরোনামকে গতি দেয়। শিরোনামের উদ্ভব হয় আমেরিকার চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতার যুগে। শিরোনাম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে শিরোনামের ধরনও পাল্টায়।

শিরোনামের পরেই থাকে সূচনা বা ইনট্রো (Intro)। আমেরিকান বলে লীড। এখন লীড কথাটাই বেশি চালু। সংবাদের নির্যাসটুকু পাওয়া যায় সূচনায়। সূচনা শিরোনাম লিখতে সাহায্য করে। ব্যস্ত পাঠক শুধু সূচনা পড়েই কাগজ পাঠ শেষ করতে পারেন, কারণ প্রত্যেকটি সূচনাই সংবাদের মূল বক্তব্য পেশ করে। সূচনা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সূচনার প্রকাশভঙ্গী অনুযায়ী সূচনার বিভিন্ন নাম হয়। যেমন ক্লত্রাইম্যাক্স সূচনা। হার্ড নিউজের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সফট নিউজের জন্য হয় বিলম্বিত সূচনা।

প্রুফ রিডিং প্রকাশনার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। ছাপার আগে মূল লেখার সঙ্গে মিলিয়ে ত্রুটি সংশোধন করাই হল প্রুফ রিডিং। বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে প্রুফ দেখতে হয়।

৪.৩.১০ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন:

১। শিরোনাম কী? সংক্ষেপে লিখুন।

২। ক্লাইম্যাক্স সূচনা কী?

৩। প্রুফ রিডিং কী? সংক্ষেপে লিখুন।

৪। শিরোনামের উদ্ভব সংক্ষেপে লিখুন।

বড় প্রশ্ন:

১। শিরোনামে কি শব্দ চয়নের গুরুত্ব আছে? বিভিন্ন ধরনের শিরোনামের পরিচয় দিন।

২। সূচনা কী? সূচনা কি কাগজ পড়তে সাহায্য করে?—ব্যাখ্যা করুন।

৩। বিভিন্ন ধরনের সূচনা বর্ণনা করুন।

৪। বর্তমানে সূচনা লেখার ধরন কি বদলাচ্ছে?—ব্যাখ্যা করুন।

৪.৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১। *সমাচার সম্পাদনা* : সৌরীন ব্যানার্জী—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

২। *সংবাদ প্রতিবেদন* : ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—লিপিকা

৩। *সংবাদ বিদ্যা* : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৪। *News Editing and Practices* : Dr. Sourin Banerjee

একক ৪ ❑ ম্যাগাজিন/সাময়িকী সম্পাদনা

৪.৪.০ গঠন

৪.৪.১ উদ্দেশ্য

৪.৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৪.৩ ম্যাগাজিন/সাময়িকী সম্পাদনা

৪.৪.৪ সারাংশ

৪.৪.৫ অনুশীলনী

৪.৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়ে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা হলো:

- ম্যাগাজিন/সাময়িকী সম্পাদনা

৪.৪.২ প্রস্তাবনা

ম্যাগাজিনকে আমরা 'সাময়িকপত্র' বলেও থাকি। অর্থাৎ মনে রাখতে হবে সংবাদপত্র যেমন প্রত্যেকদিন প্রকাশিত হয়। পাঠক যেমন সংবাদপত্র বা খবরের কাগজের মাধ্যমে আগেরদিনের খবর পায়, ম্যাগাজিন কিন্তু একটা সময় অন্তর প্রকাশিত হয়। ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক, কোনও ম্যাগাজিন পাক্ষিক বা কোনওটা মাসে একবার প্রকাশিত হয়।

৪.৪.৩ ম্যাগাজিন/সাময়িকী সম্পাদনা

আমরা দু ধরনের সাময়িকীর সঙ্গে পরিচিত। বিভিন্ন খবরের কাগজের রবিবারের সংস্করণের সঙ্গে বাড়তি কয়েক পাতার একটি ক্রোড়পত্র বিতরণ করা হয়। এই ক্রোড়পত্রকে ম্যাগাজিন (Magazine) বা সাময়িকী বলা হয়।

তা ছাড়া অনেক পত্রিকা আছে যেগুলি রোজ প্রকাশিত হয় না। সাতদিন, দু'সপ্তাহ বা এক মাস অন্তর পাঠকদের হাতে যায়। সেগুলিও ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্রিকা বলে অভিহিত হয়।

আমরা এই অনুচ্ছেদে খবরের কাগজের রবিবারের ক্রোড়পত্রে বা সাময়িকী সম্পাদনার বিষয়টি আলোচনা করব। খবরের কাগজের সাময়িকী তৈরির ভার একজন সহকারী সম্পাদকের ওপর থাকে। কিন্তু তিনি ম্যাগাজিন এডিটর বলেই পরিচিত হন।

ম্যাগাজিন এডিটর দু'তিনজন সাব-এডিটরের সাহায্যে সাময়িকী সম্পাদনা করেন। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে খবরে কাগজের সাময়িকীতে সাহিত্য সম্পর্কিত লেখা প্রকাশিত হয়। ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী, রসরচনা, পুস্তক সমালোচনা থাকত এই সব সাময়িকীতে।

সংবাদপত্রের সাময়িকীতে রোজ রোজ যা যা ঘটে তার বিবরণ থাকে না। তবে গুরুতর সংবাদের পটভূমি ও পার্শ্বকাহিনী সাময়িকীতে প্রকাশের সুযোগ আছে। তাকে প্রচ্ছদ কাহিনী বলা হয়।

সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য এই সব বিষয়কেন্দ্রিক লেখা যোগাড়ের ব্যবস্থা করবেন সম্পাদক।

এইসব লেখা যোগাড় করার জন্য সাময়িকীর সম্পাদক দ্রুতগতিতে লোক লাগিয়ে (assignment) দেবেন। বিভাগের কোন সাব-এডিটরকে কাগজের পুরানো ফাইল ঘেঁটে একটি লেখা তৈরির দায়িত্ব দেবেন। কোন ফ্রিল্যান্স ফিচার লেখকের কাছে আর একটি লেখা চাইবেন। বার্তা সম্পাদকের মাধ্যমে দিল্লির সংবাদদাতাকে একটি লেখা দেবার জন্য নির্দেশ পাঠাবেন।

লেখার দায়িত্ব বন্টনের সময় কবে, ক'ঘন্টার মধ্যে লেখা জমা দিতে হবে তাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে কোন গড়িমসি খবরের কাগজ সহ্য করে না।

খবরের কাগজের সাময়িকী মূল কাগজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে না। করার চেষ্টা করলেও তাতে এঁটে উঠতে পারবে না। কারণ দৈনিক প্রকাশিত খবরের কাগজে কালকের ঘটা সব গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রতিদিনের সংখ্যায় পাওয়া যায়। কিন্তু সাময়িকী প্রকাশিত হয় প্রতি সপ্তাহের সপ্তম দিনে। তাই টাটকা ঘটনার খবরের বোঝা সাময়িকীতে থাকে না। সেই জন্যই সাময়িকীকে সাহিত্যধর্মী রচনা এবং সংবাদের বিস্তারিত পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতের রচনাগুচ্ছের ওপর নির্ভর করতে হয়।

আমেরিকার পেন্টাগন এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসবাদী বিমান হানার খবর বিস্তারিতভাবে খবরের কাগজে পরদিন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেই খবরের মধ্যে পেন্টাগন এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের খুঁটিনাটি বর্ণনা খুঁজতে গেলে পাঠক হতাশ হবেন। তাঁদের এই ব্যাপারে কৌতূহল মেটাতে পারে সাময়িকী। সেই জন্যই সম্পাদকরা জানেন, সাময়িকী মূল কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

তাই বলে ধরে নেবেন না, সব খবরের কাগজই তার সাময়িকীতে সংবাদের পটভূমি নিয়ে রচনাগুচ্ছ প্রকাশের পথে পা দিয়েছে। কোন কোন কাগজের সাময়িকী এখনও সাহিত্যধর্মী রচনা প্রকাশের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি দৈনিক খবরের কাগজের সাময়িকী সম্পর্কে আপনাদের কয়েকটি কথা জানাই।

আনন্দবাজার পত্রিকার সাময়িকীর নাম "ররিবাসরীয়"। ১৮ অগস্ট, ২০০২ সালের "রবিবাসরীয়" ছটি পাতা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে শেষ পাতাটি কিশোরদের জন্য সংরক্ষিত নিয়মিত পত্রিকা। বিভাগটির নাম "আনন্দমেলা"।

প্রথম পাতায় রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে রাজারামের সম্পর্ক নিয়ে একটি গবেষণামূলক লেখা। তাতে তিনটি প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করা হয়েছে— "রাজারাম রামমোহন রায়ের পুত্র? না, পোষ্যপুত্র? দত্তক? কে এই রাজারাম?"

দ্বিতীয় লেখাটি একটি ছোটগল্প।

তৃতীয় ও শেষ লেখাটি একটি ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাসের একটি অধ্যায়।

লক্ষ্য করুন, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবারের এই সাময়িকীতে চলতি ঘটনা নিয়ে কোন লেখাকে স্থান দেওয়া হয়নি।

ম্যাগাজিনকে আমরা 'সাময়িকপত্র' বলেও থাকি। অর্থাৎ মনে রাখতে হবে সংবাদপত্র যেমন প্রত্যেকদিন প্রকাশিত হয়। পাঠক যেমন সংবাদপত্র বা খবরের কাগজের মাধ্যমে আগেরদিনে খবর পায়, ম্যাগাজিন কিন্তু একটা সময় অন্তর প্রকাশিত হয়। ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক, কোনও ম্যাগাজিন পাক্ষিক বা কোনওটা মাসে একবার প্রকাশিত হয়। উদাহরণ দিয়ে বোঝালে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, যেংত্বমন বাংলা সংবাদপত্রর 'বর্তমান'-এর অন্যতম জনপ্রিয় ম্যাগাজিন হল 'বর্তমান সাপ্তাহিক'। এটি সপ্তাহে একবার করে প্রকাশিত হয়। ঠিক তেমনই 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর সঙ্গে প্রতি রবিবারে বিনামূল্যে 'রোববার' ম্যাগাজিন পাঠক পড়ার সুযোগ পায়। আবার 'বর্তমান' খবরের কাগজেরই 'সুখী গৃহকোণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আবার, 'আনন্দবাজার পত্রিকা সংবাদপত্রের বিনোদনমূলক ম্যাগাজিন 'আনন্দলোক', সাহিত্যমূলক ম্যাগাজিন 'দেশ', লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন 'সানন্দা' মাসে দু'বার অর্থাৎ ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এই ম্যাগাজিনগুলি পাক্ষিক।

মনে রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেকটি ম্যাগাজিনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই যেমন, 'আনন্দলোক' ম্যাগাজিনে টলিউড, বলিউড ও হলিউডের নানান বিনোদনের খবর থাকে। 'বর্তমান' সংবাদপত্রের 'শরীর ও স্বাস্থ্য' নামের ম্যাগাজিনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে লেখা বা ডাক্তারদের পরামর্শ থাকে। আবার, 'সুখী গৃহকোণ' ম্যাগাজিনে যেমন মহিলাদের সাজগোজ, ঘর সাজানো, নানা রান্নার রেসিপির খবর দেওয়া হয়। একই ধরনের বিষয় লক্ষ্য রাখা যায় 'সানন্দা' ম্যাগাজিনেও। পাশাপাশি, বাংলাতেই ভ্রমণ বিষয়ক, চাকরির খবরাখবর সংক্রান্ত ম্যাগাজিনও প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে অনেকগুলি তো পূজাবার্ষিকী প্রকাশ করে।

আসলে, ম্যাগাজিন গণজ্ঞাপনের একটি মাধ্যম, যা সমসাময়িক অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সামাজিক বিষয়ের খবরাখবর বিস্তৃত আকারে পাঠককে জানাতে সাহায্য করে। উল্লেখযোগ্য হল, পাঠক সংবাদপত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অল্প শব্দে জেনেছে, ম্যাগাজিনের মাধ্যমে তাঁরাই বেশি করে জানতে চান। এমনকি, ওই বিষয়ে যদি অজানা তথ্য কিংবা ছবি পাঠকের সামনে হাজির করা যায়, তাহলে অল্পদিনের মধ্যে ওই সাময়িকপত্রটি পাঠকদের ভাল লাগতে বাধ্য।

সাধারণভাবে, ম্যাগাজিন পাঠকের অবসরের সঙ্গী। পাঠক সংবাদপত্রের 'হার্ড নিউজ'-এর জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে খবরের নতুন দিক বা তথ্য, বিশ্লেষণ, গুরুগম্ভীর বিষয়কে বাদ দিয়ে একটু হালকাধর্মী খবর, গল্পের স্বাদ খুঁজে পায় ম্যাগাজিনের মাধ্যমে।

তবে সংবাদপত্রের মতো ম্যাগাজিনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল, পাঠককে খবর জানানো, আনন্দ দেওয়া ও প্রভাবিত করা। একটু ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, অন্যতম প্রাচীন ম্যাগাজিন ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড কাভে সম্পাদিত লন্ডনের 'জেন্টলম্যান ম্যাগাজিন'। এই পত্রিকাই প্রথম ম্যাগাজিন শব্দটি ব্যবহার করে।

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের সুপারিশ ছিল, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটিশ সরকারের প্রেস ও পুস্তক নিবন্ধন সম্পর্কিত আইনের আওতায় সব ধরনের সংবাদ প্রকাশনকে এনে তিনটি বিভাগ করা হোক। তিনটি বিভাগ হল সংবাদপত্র, সংবাদ ম্যাগাজিন বা সাময়িকপত্র এবং পর্যাবৃত্ত।

ম্যাগাজিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রচনারীতি ও রচনাশৈলী। মনে রাখা জরুরি, ম্যাগাজিনের রচনারীতি হবে সহজপাঠ্য, অতি অবশ্যই অতিরঞ্জনবিহীন। লেখার মধ্যে থাকবে একটা টানটানভাব, বর্ণময়তা। ম্যাগাজিনের লেখা মানেই গবেষণার আধার। উল্লেখ্য, ম্যাগাজিনে যেহেতু একটি বিষয়ে একটু বেশি লেখা থাকে, তাই দীর্ঘ লেখাকে বিভিন্ন 'সাব হেডিং'-এ ভাগ করা থাকলে, পাঠকের পড়তেও সুবিধা হয়। সেই কারণে, এ বিষয়ে ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। প্রসঙ্গত, ম্যাগাজিনের লেখাগুলি বেশিরভাগই 'ফিচারধর্মী' হয়ে থাকে।

সাময়িকপত্র বা ম্যাগাজিনের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবসময় 'টাটকা' ও 'আকর্ষণীয়' বিষয়ের দিকে নজর দিতে হয়। যাতে করে পাঠক ম্যাগাজিনের বিষয়গুলি পড়ার আগ্রহ খুঁজে পায়। পাশাপাশি, ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাসজ্জার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হয়। মনে রাখা জরুরি, ম্যাগাজিনের পেজ লে-আউট যত আকর্ষণীয় হবে, তত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেই কারণে, ম্যাগাজিনে কোনও বিষয়ের লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব পায়। পরিশেষে মনে রাখা প্রয়োজন, ম্যাগাজিনে যেমন বিষয় নির্বাচনে বৈচিত্র্য থাকতে হবে, ঠিক তেমন প্রচ্ছদে চমক থাকা আবশ্যিক।

৪.৪.৪ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা সাময়িকী সম্পাদনার ব্যাপারে জানলাম।

৪.৪.৫ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১। সংবাদপত্রের রবিবারের ক্রোড়পত্রকে কী বলা হয়ে থাকে?

২। 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর সঙ্গে প্রতি রবিবারে বিনামূল্যে.............ম্যাগাজিন পাঠক পড়ার সুযোগ পায়।

বড় প্রশ্ন :

১। সংবাদপত্রের সাময়িকীতে কি ধরনের রচনা স্থান পায়?

২। সাময়িকী মূল কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়—ব্যাখ্যা করুন।

৪.৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। *আধুনিক ভারতে সংবাদিকতা*, রোনাল্ড ই উলসলে কর্তৃক সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৮১। সাঁইত্রিশ টাকা।

২। *দাদাঠাকুর*, নলিনীকান্ত সরকার।

৩। *News Editing*, Bruce Westley, Oxford and IBH Publishing Co. Kolkata : New Delhi.

Notes	Notes